শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

প্রথম খণ্ড

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on Srimad Bhagavat Gita
before the students of RKMVERI - Deemed University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভূমিকা

(গীতা কি ও কেন, গীতাকে নিয়ে যে সমালোচনা করা হয়, গীতাকে কেন মোক্ষশাস্ত্র ও সমন্বয় বলা হয়, বর্তমান কালে গীতার প্রাসঙ্গিকতা কতটা)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে আমরা গীতা শাস্ত্রের আলোচনা শুরু করছি। বিষয়বস্তুর নিরিখে গীতা একটি দীর্ঘ শাস্ত্র এবং সাথে সাথে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহের দিক থেকে খুব গভীর। যত আমরা আলোচনার ভিতর প্রবেশ করতে থাকব, তত আমরা বুঝতে পারব গীতা কত গভীর শাস্ত্র, এবং এই গভীরতার জন্য গীতার অর্থ ও বক্তব্য অনুধাবন করা ও ধারণা করা কত কঠিন। প্রথমে গীতার ভূমিকা, অর্থাৎ গীতাশাস্ত্র কি, এর উপর আমাদের আলোচনা করে নিতে হবে।

যাঁরা হিন্দু এবং ভারতবর্ষে যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁরা সবাই গীতার নাম অবশ্যই শুনে থাকবেন, গীতার মূল ভূমিকাটাও তাঁদের জানা আছে। কারণ, বেদের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভারতে যত আধ্যাত্মিক জ্ঞান, চিন্তাধারা ও বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে, সমাজে যা কিছু আচার, আচরণ, প্রথা প্রচলিত আছে, যার উপর মূল ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে, এর সব কিছুই শ্রীমদ্ভগবত গীতাতে সমণ্বিত করা হয়েছে।

মহাভারতে গীতা শুরু হওয়ার আগে বিরাট একটা লম্বা কাহিনী বা ইতিহাস আছে; কৌরব আর পাণ্ডব এরা সবাই ভাই, এদের মধ্যে নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রথম থেকেই বিবাদ চলছিল। তারপর একটা সময় পাণ্ডবদের বারো বছরের জন্য বনবাসে যেতে হল, তার সাথে এক বছর অজ্ঞাতবাস। অজ্ঞাতবাসের শর্ত হল, এই ত্রয়োদশ বছরের মধ্যে কৌরবরা পাণ্ডবদের যে কোন একজনকে দেখে নিলে তাদের সবাইকে আবার বারো বছরের জন্য বনবাসে চলে যেতে হবে। অজ্ঞাতবাসের এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর কৌরবদের কাছে পাণ্ডবরা তাদের রাজ্য ফেরত চাইল। দুর্যোধন রাজ্য ফেরত দিতে চাইল না। এই কাহিনী আমাদের সবারই জানা। কৌরবদের বক্তব্য হল, আমরাই ঠিক, অন্য দিকে পাণ্ডবরা বলছে তারা ঠিক। কৌরবদের দাবী হল অজ্ঞাত বাসের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই অর্জুন আমাদের সামনে এসে গিয়েছিল, অর্জুনকে আমরা দেখে ফেলেছি। পাণ্ডবদের বক্তব্য হল, আমরা শর্ত পূর্ণ হওয়ার পরই সামনে এসেছি। দু-পক্ষের এই বিবাদের কোন মীমাংসা করা গেল না। ফলে যুদ্ধ অবশ্যাম্ভাবি। তারও আগে সমস্ত রকম সন্ধি প্রস্তাব, কথাবার্তা, আলোচনা সব বিফল। কোন ভাবেই মীমাংসাতে আসা গেল না। যুদ্ধ ছাড়া আর কোন রাস্থা নেই। যার পরিণতি –সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। বর্তমান কালেও সব রকম সন্ধিবার্তা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর সবাই যখন বুঝে যায়, এবার আর যুদ্ধকে ঠেকানো যাবে না, যুদ্ধ হবেই; তখন দু-পক্ষই জোর প্রস্তুতি শুরু করে দেয়।

তখনকার দিনে এই ধরণের যুদ্ধকে বলা হত ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ মানে, দুই পক্ষ একটা সীমা বেঁধে দিতেন, এই এই পদ্ধতি মেনে, এই এই নিয়ম মেনে যুদ্ধ হবে। কে কার সাথে লড়াই করবে, কোন কোন পরিস্থিতিতে লড়াই করা যাবে না, ইত্যাদি। কিন্তু যতই নিয়মে বেঁধে দেওয়া হোক না কেন, উত্তেজনার মুহূর্তে সবাইকে নিয়মের গণ্ডিকে লঙ্ঘন করে ফেলতে দেখা গেছে। কুরুক্ষেত্রের এই

যুদ্ধে অনেকেই অনেকবার নিয়মের গণ্ডিকে লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু এনাদের একটা বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিদিনের লড়াইয়ের পর আবার সবাই মর্যাদা রেখার মধ্যে নিজেদের ঢুকিয়ে দিতেন। মহাভারতে এই ধরণের প্রচুর দৃষ্টান্ত আমরা কাহিনী রূপে পাই।

তখনকার সময় এই ধরণের কোন ধর্মযুদ্ধ হওয়ার আগে বিভিন্ন রাজার কাছে আমন্ত্রণ পাঠানো হত। আমি এই এই কারণে অমুকের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছি, আপনি কি আমার পক্ষে যোগদান করবেন? যাঁরা মনে করতেন ইনি ঠিক, তখন তিনি তাঁর পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতেন। আবার অনেক সময় দেখা যেত, যিনি আগে এসে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তিনি কোন বিচার না করে তাঁর পক্ষেই যোগ দিতেন। মহাভারতে একটা ঘটনা আছে, যা খুব বেশী প্রচলিত নয়, এক রাজা ছিলেন, তাঁর নিজস্ব হাতির এক বিরাট বাহিনী ছিল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে গিয়ে বললেন, 'তুমি যদি কৌরবদের ভয় পেয়ে থাক তবে আমি তোমার সঙ্গে আছি, আমি একাই কৌরবদের শেষ করে দেব'। যুধিষ্ঠির হাত জোড় করে বলে দিলেন, 'আমরা ভয় পাইনি, আর এটা ধর্মযুদ্ধ, আমরা নিজেরাই লড়াই করে নেব'। রাজা সেখান থেকে দুর্যোধনের কাছেও যায় এবং দুর্যোধনকে একই কথা বলে। দুর্যোধনও হাতজোড় করে সেই রাজাকে না করে দিয়ে বলছে, 'আমরা ধর্মযুদ্ধ করছি, আপনি যদি মনে করেন আমরা ঠিক, তাহলে আমাদের সাথে থাকুন, তা নাহলে আপনি আসতে পারেন'। শেষ পর্যন্ত কোন পক্ষই তাকে নিতে রাজী না হওয়াতে সেই রাজাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করেই ফেরত চলে আসতে হয়েছিল। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, মহাভারতের যুদ্ধ মানে ভালো লোকেদের সাথে দুষ্ট লোকেদের লড়াই, কিন্তু তা না, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধ।

অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই হিতৈষী, তিনি বলে দিলেন আমি যুদ্ধে অংশ নেব না। শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলরাম যুদ্ধ এড়াবার জন্য এলাকা ছেড়েই বেরিয়ে গেলেন তীর্থ ভ্রমণে। আসলে তিনি নিজের চোখে এই বিনাশ দেখতে চাইলেন না। অর্জুন অনেক অনুরোধ করাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি হতে রাজী হলেন, কিন্তু পরিষ্কার বলে দিলেন তিনি এই যুদ্ধে কোন অস্ত্র ধারণ করবেন না, তার মানেই তিনি কোন যুদ্ধ করবেন না।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের মুহূর্তে অর্জুন হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, আমি একবার দেখে নিতে চাই ঠিক কাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। কুরুক্ষেত্রের বিরাট ময়দানের দু প্রান্তে দু পক্ষের রথী মহারথী, সৈন্যরা ব্যূহ রচনা করে সমবেত হয়েছে। অর্জুন রথ নিয়ে নিজেদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এলেন দেখতে কাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। অর্জুন কি দেখলেন? গীতার প্রথম অধ্যায়ে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্জুন সব দেখার পর হতাশ হয়ে গেলেন।

হতাশার ভাব আমরা সবাই আমাদের জীবনেও কোন না কোন সময় দেখতে পাই। সারা জীবন ধরে একটা জিনিসের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু আসল মুহূর্তটা যখন আসে, তখন আমরা কেমন যেন পিছিয়ে যেতে চাই, কেমন একটা অজ্ঞাত ভয় আমাদের গ্রাস করে নেয়। সারা বছর মন দিয়ে পড়াশোনা করে গেছে, কিন্তু পরীক্ষার ঠিক আগে, এমনকি যারা প্রথম সারির ছাত্র, তারাও কেমন একটা ভয় পেয়ে যায়। আমাদের ক্লাশে যারা ফার্স্ট সেকেণ্ড হত, ওরা যমজ ভাই ছিল। প্রত্যেক পরীক্ষার পর হল থেকে বেরিয়ে এসে কাঁদতে শুরু করত। কাঁদতে কাঁদতে বলত, 'আমার তো ডিস্টিংশানটাও হবে না'। ওকে আমরা পরীক্ষার আগে কাঁদতে দেখতাম, পরীক্ষার পরে কাঁদতে দেখাতাম। বোর্ডের রেজাল্ট বেরোবার পর দেখা গেল, এক ভাই সেকেণ্ড হয়েছে, আরেক ভাই ফিফথ্ হয়েছে। তখনকার দিনে CBSEতে ফিফথ্ হওয়াটা সাংঘাতিক ব্যপার ছিল। বিয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ব্যাপারটা হয়। অনেক দিন ধরে বিয়ের প্রস্তুতি চলছে, শেষ মুহূর্তে হয় ছেলে পালিয়ে যায়, নয়তো মেয়ে পালিয়ে যায়। এগুলো ঠিক না, খুব embarrassing, কিন্তু এই ধরণের ঘটনা হয়। এই ভীতি দুই প্রকারের হতে পারে। যেমন সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে, স্বপ্নেও যদি কোন

সন্ন্যাসীর নারীর রূপ দর্শন হয় বা স্বপ্নে যদি দেখে তাঁর বিয়ে হতে যাচ্ছে, স্বপ্নের মধ্যেই আঁতকে ওঠেন। কারণ স্বপ্নে তাঁর জীবনদর্শন একেবারেই বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে যারা বৈবাহিক জীবনদর্শনে আছে, তারা হয়ত এটাই সারা জীবন চেয়ে এসেছে, কিন্তু আসল সময় পালিয়ে যায়।

এই জায়গায় অর্জুনের ব্যবহার দ্বিতীয় ধরণের, অর্জুন প্রথম ধরণের নন। কোন ব্রাহ্মণ ছেলেকে যদি অর্জুনের জায়গায় দাঁড় করিয়ে বলা হয়, তুমি যুদ্ধ কর, সে অবশ্যই বলতে পারে 'আমি যুদ্ধ করব না'। আমাদের কারুর হাতে যদি বন্দুক ধরিয়ে বলা হয়, একে গুলি করে খুন কর, আমরা পারব না। অর্জুন ব্রাহ্মণ নন, অর্জুন হলেন ক্ষত্রিয়। গীতায় পরে বর্ণনা আসবে, যেখানে বলা হবে যে, যুদ্ধ করাটা অর্জুনের ধর্ম, যুদ্ধ করার জন্য সারাটা জীবন অর্জুন প্রস্তুতি নিয়ে আছেন। তাছাড়া অর্জুন কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে আসার অনেক আগে থেকেই বলে আসছিলেন, আমি এই যুদ্ধ করব। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের মুহূর্তে রণভূমির চেহারা দেখে অর্জুনের মধ্যে স্নায়বিক দৌর্বল্য এসে গেছে। যারা প্রথম বার খুন করতে যায়, তাদের হাত পা কেঁপে যায়, মানুষ খুন করা অত সহজ নয়। সেইজন্য সে চেষ্টা করে ভিতর থেকে সেই সময় প্রচণ্ড রাগ নিয়ে আসার, কিংবা মদ খেয়ে নেয় যাতে মস্তিষ্কটা নিস্তেজ হয়ে যায়। অর্জুনের কাণ্ড দেখে শ্রীকৃষ্ণ অবাক, যে কোন লোকই অবাক হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ একবারও অর্জুনকে বলতে গেলেন না যে, তুমি যুদ্ধ কর বা তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। পরিবর্তে অর্জুনের সামনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটা জীবনদর্শন রেখে দিলেন।

জীবনে চলার পথে দেখা যায়, দুটো জিনিস আমাদের সামনে আসে – একটা হল জীবন, অপরটা হল জীবনদর্শন। বেশীর ভাগ মানুষ জীবনটাকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গতানুগতিক ভাবে একটা ছকে বাঁধা জীবন চালিয়ে যায়। স্কুলে কেন পড়তে যাচ্ছ? বাবা-মা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে তাই যাচ্ছি। পড়াশোনা কেন করছ? আমাকে পড়াশোনা করতে হবে। চাকরি কেন করছ? খেতে হবে, তাই করছি। বিয়ে কেন করলে? বাবা-মা বলেছিলেন। সব ক্ষেত্রে এভাবেই সবাই একটা খাপছাড়া উত্তর দিতে অভ্যস্ত। কিন্তু একবার যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কেন? এই 'কেন'র কোন উত্তর নেই। বিশ্বে যত 'Selfhelp' বই লিখছে, বিশেষ করে আমেরিকা, যারা সবাইকে উপদেশ দিয়ে বেড়ায় কিন্তু নিজের ঘর সামলাতে পারে না; সবাই লিখে যাচ্ছে, how to make money, how to make friend, how to be a happy father or mother, how to breath। কিন্তু কেউ জানতে চাইছে না, 'কেন'? এটাই বিশ্বের সব থেকে বড় সমস্যা।

স্বামীজীর সময় আমেরিকায় রবার্ট ইঙ্গারসোল একজন খুব নামকরা পণ্ডিত ও বক্তা ছিলেন। স্বামীজীর সাথে ইঙ্গারসোলের একবার দেখা হয়। তখন তাঁর অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল। ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে বলছেন, 'আমার সামনে এই কমলালেবু আছে, এই কমলালেবুর ব্যাপারে আমি নিশ্চিত এবং আমি জানি এর রস আমাকে খেতে হবে, এটাই আমার কর্তব্য'। স্বামীজী বলছেন, 'আমি যেহেতু ভারতবর্ষের, তাই আমার ফলটা আলাদা, কমলালেবুর জায়গায় আমার জন্য আম। আমিও আম খেতে চাই, তবে আমি জানি আমার তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। মৃত্যুই আমার শেষ নয়'। সেখানে স্বামীজী বলছেন, 'We look for 'why' and we leave the 'how' for scientists'। স্বামীজী আসলে বলতে চাইছেন, 'how' জিনিসটা হল বালবুদ্ধি সম্পন্নদের জন্য। বাচ্চাদের প্রথমে দেখিয়ে দিতে হয় দাঁত কিভাবে মাজতে হয়, বড় হওয়ার পর বলা হয় দাঁত কেন মাজতে হয়। How বাচ্চা বয়সে শেখানো হয়, Whyটা একটু বেশী বয়সে শেখানো হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে how শেখাতে যাচ্ছেন না, তিনি why শেখাচ্ছেন।

অর্জুনের সামনে ভগবান জীবনদর্শন রেখে দিলেন –এই দেখো জীবনদর্শন। তিনটি জিনিস –প্রথম হল তুমি কে? দ্বিতীয় জগৎ কি আর তৃতীয় পরমসত্তা কি? এই হল জীবনদর্শনের তিনটি সত্য। দুঃখ আমাদের সবারই হয়ে থাকে, যারা বেশী অনুভূতিপ্রবণ তাদের দুঃখ বেশী হয়। কিন্তু

আমরা একবারও কেউ ভেবে দেখতে যাই না, আমি কে, জগৎ কি। একবারও কেউ ভেবে দেখি না, মৃত্যু কি, মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব? যখনই জীবনে দুঃখ আসে তখন যদি আমরা কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে ভাবি, আমি কে, জগৎ কি আর শেষ কি; মৃত্যুতেই যদি সব শেষ হয়ে যায়, তাহলে তো কয়েকটা বছরের ব্যাপার, তার জন্য কিসের এত কান্নাকাটি! আর আমি যদি নিজেকে শুদ্ধ আত্মা ভাবি, আমার জন্ম নেই মৃত্যু নেই, তাহলে আর কিসের কান্নাকাটি। যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, কান্নাকাটি করার কোন কারণ নেই। কিন্তু সবাই আমাদের ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছে, দুঃখ হলে কোথায় গিয়ে মদ খেতে হবে, কোথায় ড্যান্স বারে গিয়ে একটু হৈ হুল্লোড় করতে হবে। কিন্তু কেন কান্নাকাটি করতে নেই, এটা কেউ শেখায় না। কারণ যারা শেখাচ্ছে, তারা নিজেরাও জানে না কেন কাঁদতে নেই; *অন্ধেনৈব নিয়মানা যথান্ধাঃ*, অন্ধ অন্ধকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই তিনটে জিনিসকে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেন, তুমি কে, জগৎ কি আর শেষ সত্য কি।

যে কোন দর্শন, তা সে ঘোর জড়বাদী দর্শনই হোক বা বিজ্ঞান হোক বা অদ্বৈতবাদী দর্শনই হোক, সবাই ঘুরে ফিরে এই তিনটে জিনিসকেই ব্যাখ্যা করে – তুমি কে, জগৎ কি আর ঈশ্বর কি। সেখানে যারা ঘোর ভৌতিকবাদী বা জড়বাদী বা বিজ্ঞানী, তারা বলবে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। তারা বলবে, জগৎটাই সত্য, এই জগতে তুমি কোন ভাবে জন্ম নিয়ে এসে গেছ। তাতেও কিছু আসে যায় না। ব্যাখ্যা তাকেও একটা দিতে হবে এবং সিদ্ধান্তও একটা দিতে হবে। সমস্ত দর্শনে এই তিনটে জিনিসের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নেই।

আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা জানি না ভগবান অর্জুনকে ঠিক কি বলেছিলেন। যেমন যেমন আমাদের আলোচনা গীতার গভীরে প্রবেশ করতে থাকবে, তেমন তেমন আমরা জানতে পারব। ভগবান অর্জুনকে যা যা কথা বলেছিলেন সব কথাগুলোকে ব্যাসদেব সাতশটি শ্লোকের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ ভাবে বেঁধে দিলেন। আমেরিকাতে ভারতের যিনি রাষ্ট্রদূত আছেন, তাঁকে ভারত সরকার বলে দিলেন এই ব্যাপারে আমাদের এই সিদ্ধান্ত। এরপর রাষ্ট্রদূত যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে যাবেন, তখন তিনি ভারত সরকারের বক্তব্যটা তাঁকে গুছিয়ে বলে দিলেন। এই গুছিয়ে যেটা বলা হল, এটা হল ভারত সরকারের মত। সরকার থেকে তাঁকে হয়ত এত কথা বলা হয়নি, একটি কথাই হয়ত বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রদূত সরকারের বক্তব্যকে নিজের মত করে গুছিয়ে বলে দিলেন। সেইজন্য যে কোন রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই কারণে দূত হলেন অবধ্য। কারণ দূত যেটাই বলবেন, সেটা তাঁর কথা নয়, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন ওটা তাঁর কথা। ঠিক তেমনি, গীতা কে রচনা করেছেন, এই ব্যাপারে যদি বলা হয়, তাহলে বলতে হবে গীতা ব্যাসদেবের রচনা, কিন্তু গীতার কথাগুলো সব ভগবানের। এটাই হিন্দুদের মত। শঙ্করাচার্যকে আমরা আচার্য বলে সম্বোধন করে থাকি। আচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে যখনই কিছু বলছেন, সেখানেও তিনি বলছেন, ভগবান এই রকম বললেন। আগেকার কিছু বই আছে, যেখানে গীতাকে উদ্ধৃত করে বলা হচ্ছে, ব্যাসদেব গীতায় এই রকম বলছেন। এখানে দুটোই নেওয়া হয়।

ব্যাসদেব আঠারোটি পর্বে মহাভারত রচনা করেন। যুদ্ধের শুরুতে কৌরবদের সেনাপতি ছিলেন ভীষ্ম, সেই থেকে ওই পর্বের নাম হল ভীষ্মপর্ব। মূল মহাভারতের ভীষ্মপর্বে আমরা পাই যে, যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্মের পতন হয়ে গেল। কাহিনীতে আমরা জানি সঞ্জয়কে ব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন। অনেকের ধারণা যে, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বসে যুদ্ধের রানিং ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন। এই তথ্য মূল মহাভারতে কোথাও নেই, এটা একটা সম্পূর্ণ ভূল ধারণা। আসলে সঞ্জয়ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি যুদ্ধভূমিতেই থাকতেন। দিব্যদৃষ্টিতে ব্যাসদেব সঞ্জয়কে এই ক্ষমতা দিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে সঞ্জয় শুনতে পারবে, জানতে পারবে। সঞ্জয় মাঝে মাঝে যুদ্ধভূমি থেকে বেরিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে চলে যেতেন খবর দিতে। দশম দিনে ভীষ্মের পতন হওয়ার

পর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে খবর দিতে গেলেন। পিতামহ ভীষ্মের পতনের খবর শুনে ধৃতরাষ্ট্র খুব ভেঙে পড়লেন। 'ভীষ্মের তো ইচ্ছামৃত্যু ছিল, তিনি কি করে পড়ে গেলেন'? সঞ্জয় বললেন, 'অর্জুনের বাণে'। তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, 'তুমি প্রথম দিন থেকে সব কিছু বিস্তারে বল'। সঞ্জয় হেডলাইনটা দিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র এবারে বিস্তারে এই কদিনের যুদ্ধের বিবরণ জানতে চাইলেন। গীতার শুরু ঠিক এই জায়গা থেকে।

ধৃতরাষ্ট্র বলছেন, *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ*। কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধারা যখন সবাই যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত, তখন তারা সবাই কি করল? এরপর সঞ্জয় বলতে শুরু করেছেন। এই জিনিসটাকে নিয়ে অনেকে আবার বলেন এই অংশটা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ পরে সংযোজন করা হয়েছে। কিন্তু এটাও একটা ভুল ধারণা। আলোচনা করতে করতে এই জিনিসটাও আমরা দেখব। যাই হোক, এখান থেকে শুরু হয়ে শেষে গীতা সাতশটি শ্লোকে দাঁড়িয়ে গেল। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের এই সাতশটি শ্লোক ভারতের আধ্যাত্মিক হৃদয়ের স্পন্দন রূপে গীতা দাঁড়িয়ে গেল। ভারতের যে দর্শন, ভারতের যে আধ্যাত্মিক ভাব, এর সমস্ত কিছুর রূপরেখা গীতার সাতশ শ্লোকের মধ্যে সঙ্কলিত করে রাখা হয়েছে।

ভারতের জন্য, শুধু ভারতের জন্যই না, সমগ্র মানবজাতির সত্যিকারের যা কিছু শুভপ্রদানকারী, যা কিছু মঙ্গলদায়ক হতে পারে, তা হল উপনিষদ আর গীতা। বর্তমান ভারতের যে ধর্ম, এই ধর্মের মূল বেদান্তের উপর আধারিত। বেদান্ত দর্শনের মূল শাস্ত্র এই তিনটি—গীতা, উপনিষদ আর ব্রহ্মসূত্র। এই তিনটি গ্রন্থকে আধার করে বেদান্ত দর্শন। ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের বাইরে যাদের আমরা হিন্দু বলি, সবাই তাঁরা বেদান্তী। হিন্দু বলতে সবাই বেদান্তী। যাঁদের আমরা শৈব, শাক্ত বলছি, এনারাও কোন না কোন ভাবে বেদান্তের সাথে যুক্ত হয়ে আছেন। আর বেদান্তের সব কথা মূলতঃ আসে গীতা থেকে। যদিও যুদ্ধভূমিতে গীতার কথা বলা হয়েছে, যাঁরা নৈষ্ঠিক হিন্দু, তাঁরা প্রত্যহ গীতা পাঠ করেন, কেউ হয়ত পুরোটা পাঠ করেন, পুরোটা না করলে অন্ততঃ একটি অধ্যায় অবশ্যই নিত্যপাঠ করবেন। যে কোন হিন্দুর মৃত্যুর সময় গীতা গ্রন্থকে মুমূর্ষু রোগীর শিয়রে রাখা হয়, এবং শেষ বিদায় জানাবার সময় গীতা পাঠ করা হয়, গীতা গ্রন্থ দান করা হয়। কোথায় এক যুদ্ধের সময় ভগবান অর্জুনকে কি বললেন, সেই কথাগুলোকে ব্যাসদেব ছন্দোবদ্ধ করে সুন্দর ভাবে গুছিয়ে আমাদের জন্য রেখে দিয়ে গেলেন। আজও যখনই হিন্দু ধর্ম, হিন্দু দর্শনের উপর কোন কথা আসে, সব জায়গায় গীতাকে নিয়ে আসতেই হবে। এই সাতশটি শ্লোকের মধ্যে পুরো হিন্দু দর্শন, হিন্দু জীবনদর্শন, হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিকতা, সবটাই রাখা আছে। ফলে গীতা বোঝা খুব কঠিন। এই যে বলা হল, নিষ্ঠাবান হিন্দুরা প্রত্যহ গীতা অধ্যয়ন করেন, গীতা আবৃত্তি করেন, মৃত্যুর সময় গীতা আবৃত্তি করা হয়; কারণ গীতা হল মোক্ষশাস্ত্র। ঠাকুরও গীতাকে মোক্ষশাস্ত্র বলছেন। স্বামীজী যখন ভারত পরিক্রমা করছিলেন, তখন তাঁর কাছে অন্য কিছু ছিল না, কিন্তু গীতা ছিল। উপনিষদকেও মোক্ষশাস্ত্র বলা হয়।

মোক্ষশাস্ত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে – এই শাস্ত্র যতক্ষণ আমাদের কাছে নিজেকে না উন্মোচন করে দিচ্ছেন, ততক্ষণ এই শাস্ত্রের মর্ম আমরা বুঝতে পারব না। যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত এগুলো কেউ বুঝতে চাইলে সে বুদ্ধির জোরে বুঝে নিতে পারবে। দোকানে কোন জিনিস কিনতে গেলে টাকা দিলাম, কিনে নিলাম। কারুর ঠিক ঠিক ভালবাসা কি আমরা এভাবে কোন দিন কোন কিছুর বিনিময়ে কিনতে পারব? একটা খুব নামকরা কথা আছে, Loyalty can be purchased। কিন্তু এটা মুখের কথা, হৃদয় থেকে যে একজনের প্রতি যে ভক্তিভাব আসবে, সেটা কখনই কেনা যায় না, Loyalty cannot be purchased। ফিজিক্সের আমি বিরাট পণ্ডিত হতে পারি, আইনস্টাইন, নিউটন হয়ে যেতে পারি; কিন্তু মোক্ষশাস্ত্র বুঝতে পারব না, যতক্ষণ না এই শাস্ত্র নিজেকে উন্মোচন

করে দেয়। কি করলে এই গ্রন্থ নিজেকে খুলে ধরবে? খুশী করতে হয় তাকে। আমরা কাউকে খুশী করতে চাইলে তার সেবা করে তাকে খুশী করি। দিনরাত সেবা করে যাচ্ছে, সেবাতেই লেগে আছে। মোক্ষশাস্ত্রকে ঠিকে সেই ভাবে সেবা করতে হয়। নিয়মিত শাস্ত্রের আবৃত্তি, অধ্যয়ন, চিন্তন-মনন এগুলোই শাস্ত্রসেবা। এই শাস্ত্রসেবা করতে করতে যদি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি কৃপা করে নিজেকে উন্মোচন করে দেন, তবেই আমরা মোক্ষশাস্ত্র বুঝতে পারব। তবে এটা নিশ্চিত নয় যে এতেই তিনি কৃপা করবেন কিনা।

ঠাকুরের পার্ষদ স্বামী তুরিয়ানন্দজী মহারাজ বলতেন, গীতার একটা শ্লোক নাও, সেটাকে মুখস্ত কর, এরপর এক মাস ধরে শ্লোকের অর্থের উপর অনুধ্যান করতে থাক, তবে গিয়ে তুমি ওই শ্লোকের মর্ম বুঝতে পারবে। গীতার সাতশ শ্লোক, আমরা না হয় প্রথম অধ্যায়ের সাচল্লিশটি শ্লোক বাদ দিলাম, বাকি থাকল প্রায় সাড়ে ছশো শ্লোক, এরপর এক মাস ধরে এক-একটা শ্লোকের অর্থ যদি ধ্যান করা হয়, তাহলে গীতা বুঝতে লাগবে সাড়ে ছশ মাস। অর্থাৎ কুড়ি বছর বয়সে গীতা যদি শুরু করা হয়, সত্তর বছর বয়সে গিয়ে গীতা বোঝা যাবে। আসলে মহারাজ আমাদের বোঝাতে চাইছেন গীতা কতটা দুর্বোধ্য। আচার্যও বলছেন, গীতা অত্যন্ত কঠিন শাস্ত্র। আমাদের আলোচনা যেমন যেমন এগোতে থাকবে তত আমরা বুঝতে পারব যে, গীতার মর্মার্থ ধারণা করা কত কঠিন। একেবারেই যে বোঝা যায় না তাও না, যদি লেগে থাকা হয়, সাধনা ও তপস্যাদি করতে থাকলে কিছু মর্মার্থ অবশ্যই বুঝতে পারা যাবে। বুঝতে না পারার সব থেকে বড় কারণ হল, একেই গীতা মোক্ষশাস্ত্র আবার অন্য দিকে বলা হয় বেদের সার উপনিষদ, আর সমস্ত বেদ, উপনিষদ, বেদান্তের সার হল গীতা। তার মানে গীতা হল একটা যেন ম্যানুয়াল। গীতা কোন গ্রন্থ না, শাস্ত্র না, এটা পুরো একটা ম্যানুয়াল (Mannual of Hindu Religion and Spirituality)। তার মানে যদি কারুর সমস্ত বেদ জানা থাকে, উপনিষদ জানা থাকে, রামায়ণ মহাভারত যদি জানা থাকে, তবেই সে গীতা বুঝতে পারবে।

বেলুড় মঠের একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী ইয়ং সন্ন্যাসীদের বলতেন, প্রথমে সংস্কৃত ব্যাকরণ ভাল করে পড়বে, ব্যাকরণ আয়ত্ত করার পর প্রকরণগ্রন্থ পড়তে হবে, যেমন বিবেকচূড়ামণি, দিক্‌দৃশ্য বিবেক, অপরোক্ষানুভূতি। এগুলো পড়ার পর উপনিষদ পড়বে। এরপর উপনিষদ কি বলতে চাইছে জানার জন্য ব্রহ্মসূত্র পড়বে। এগুলো সমস্ত ভাল করে বুঝে নেওয়ার পর গীতায় আসবে। বেদের সার কি, উপনিষদের সার কি, সমস্ত সারকে গীতায় ম্যানুয়াল রূপে রাখা হয়েছে। যিনি বেদ, উপনিষদের সার জেনে গেছেন, তিনি গীতার একটা শ্লোক দেখলেই বুঝে যাবেন এই শ্লোকে গীতা কি বলতে চাইছেন। মনে করা যাক, আমার হাতে একটা পুলিশ ম্যানুয়াল দেওয়া হয়েছে, তাতে কি আমি বুঝতে পারব Indian Penal Code কিভাবে চলে? বা ইঞ্জিনিয়ারিংএর একটা Bridge Making Manual যদি দেওয়া হয়, সেটা দিয়ে আমি কিছুই বুঝতে পারব না। যিনি অনেক দিন ধরে খেটেখুটে ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর পড়াশোনা করেছেন, তিনি ওটা দেখলেই বুঝে যাবেন কি বলতে চাইছে। গীতা ঠিক তাই, সেইজন্য গীতাকে বোঝা খুব কঠিন। গীতার যখন যে জায়গাটা নিয়ে আলোচনা হবে তখন সব কিছু পরিষ্কার মনে হবে, কিন্তু যেমনি দশটা শ্লোক এগিয়ে গেলেন, পিছনের গুলো সব হারিয়ে যাবে। সেইজন্য আমাদের আচার্যরা গীতার নিয়মিত পাঠ ও অনুধ্যানের কথা বলেন।

উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রকে যেমন একদিকে মোক্ষশাস্ত্র বলা হয়, অন্য দিকে গীতা একাধারে মোক্ষশাস্ত্র আবার সমন্বয় শাস্ত্রও। সমন্বয় শাস্ত্র হল, দুটো দর্শন বা মতবাদকে পরস্পর বিরোধী বলে মেলানো যাচ্ছে না, কিন্তু সেই দুটো পরস্পর বিরোধী দর্শনকে যে শাস্ত্র যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক ভাবে মিলিয়ে দিচ্ছে, সেটাই সমন্বয় শাস্ত্র। সাংখ্য দর্শন আর যোগ দর্শন দুটো আলাদা, কিন্তু দুটো দর্শনে কিছু কিছু মিল আছে। আবার ন্যায় দর্শন আর বৈশাষিক দর্শনের সাথে এদের কোন

মিল নেই। আর ন্যায় দর্শন আর বেদান্ত দর্শনের সাথে কোন মিল নেই। ন্যায় দর্শনের সাথে আবার মীমাংসা দর্শনের কোন মিল নেই। ভারতে এই কটি খুব নামকরা দর্শন –সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, মীমাংসা আর বেদান্ত। কারুর কারুর সাথে কিছু কিছু মিল পাওয়া যাবে, যেমন সাংখ্য আর যোগের অনেক মিল আছে, মীমাংসা আর বেদান্তের কিছুটা মিল আছে, কিন্তু পুরোটা নেই। আবার ন্যায় ও বৈশাষিকের কিছুটা মিল আছে। গীতা সব কটা দর্শনকে একটা প্ল্যাটফরমে নামিয়ে এনে মিলিয়ে দিচ্ছেন।

আমরা প্রায়ই আলোচনা করি কিভাবে ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য আর শ্রীরামকৃষ্ণ এই তিনজনকে সমন্বয়ের অবতার বলা হয়। ব্যাসদেব কি করলেন, তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় যা কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল, তিনি সব কিছুকে গুছিয়ে মহাভারত ও গীতাতে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। কয়েক হাজার বছর চলার পর শঙ্করাচার্য এসে ঠিক তাই করলেন, ব্যাসদেবের পর কালের নিয়মে হিন্দু ধর্মের যা কিছু আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছিল, সবটাকে তিনি এক জায়গায় নিয়ে এলেন। ঠাকুর কি করলেন, যে মতগুলিকে ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্য ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেইগুলিকেও ঠাকুর নিয়ে এলেন। যেমন শাক্ত মতাদি, এবং অন্যান্য ধর্মের মত। আসলে সব মতই যেন একই রকম কথা বলছে। গীতা শাস্ত্রের এই দুটি বৈশিষ্ট্য – মোক্ষশাস্ত্র আর সমন্বয় শাস্ত্র, এই দুটো বৈশিষ্ট্যের জন্য গীতা বুঝতে খুব কঠিন হয়ে যায়।

আমাদের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, জীবন একটা ক্ষুদ্র রূপে যেমন রয়েছে, আবার বিরাট রূপেও রয়েছে। পদার্থবিদরা অনেক সময় বলেন, একটা এ্যটমের ভিতরে যা যা আছে, যেমনটি আছে, পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তাই তাই আছে। আমাদের ঋষিরা কয়েক হাজার বছর আগেই বলে দিয়েছেন, *যৎ ব্রহ্মাণ্ডে তৎ পিণ্ডাণ্ডে*, ব্রহ্মাণ্ডে যা আছে একটা অণুর ভিতরেও তাই আছে। এটাকেই স্বামীজী Microcosom আর Macrocosom দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন, সমষ্টিতে যা আছে, ব্যষ্টিতেও তাই আছে। গীতার বৈশিষ্ট্য হল সব কিছুকে এই দুটো স্তরেই দেখানো, Microতেও দেখে Macroতেও দেখে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন কর্মের গতিতে চলছে। আর সবটাই যেন যজ্ঞ। বেদের পুরুষসূক্তমে দেখাচ্ছেন, ভগবান যে সৃষ্টি করলেন, এই সৃষ্টিটাই একটা যজ্ঞ। এটাকেই গীতা দেখাচ্ছেন, তোমার যে জীবন, এই জীবনকে তোমাকে যজ্ঞ রূপে দেখতে হবে, এবং জীবনকে যজ্ঞ রূপে চালাতে হবে। চতুর্থ অধ্যায় পুরোপুরি এই জিনিসটাকে নিয়ে চলে।

যেমন অর্জুনকে ভগবান বলছেন বর্ণাশ্রম ধর্মনুসারে জীবনকে পরিচালিত করতে, আবার অন্য দিকে বলছেন এই যে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এটিও একট মহাজাগতিক ধর্মানুসারে চলছে। প্রত্যেক জীবন যেমন একটা ধর্মের উপরে ভিত্তি করে চলছে, ঠিক তেমনি এই জগৎটাও একটা ধর্মের ভিত্তিতে চলছে। আবার এক জায়গায় ভগবান মানুষের জন্ম-মৃত্যুর যেমন আলোচনা করছেন অন্য জায়গায় এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের চক্রকে নিয়েও আলোচনা করছেন। মানে যেটা ছোটতে আছে সেটাই আবার বৃহতেও আছে, যেটা ক্ষুদ্র অনুতে রয়েছে সেটাই আবার মহতে রয়েছে। চৈতন্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে যিনি বিরাজ করছেন, সেই চৈতন্যই সর্বব্যাপী রূপে বিরাজিত। জীবাত্মারও কথা বলা হচ্ছে আবার পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরও কথা বলা হচ্ছে। গীতাতে সব কিছুকে এক সঙ্গে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সৃষ্টিটাও একটা cyclic processএ চলে, আগে ছিল আবার হবে। ঠিক তেমনি জীবনকেও cyclic দেখছেন। তুমি আজ আছ, কাল থাকবে না, আবার তুমি আসবে। যে জিনিসটা বৃহৎ স্তরে আছে, সেই জিনিসটাই আবার লঘু স্তরেও আছে। গীতাও সেই ভাবেই দেখে। গীতা যে একটা বিশেষ কোন একটা মতের বা পথের কথা বলছে, তা বলা যাবে না। গীতার দৃষ্টিভঙ্গীটাই হল

পুরো বিশ্বজনীন। কিছু কিছু জিনিস সরিয়ে দিলে, গীতা খ্রীশ্চানরাও মানতে পারে, বৌদ্ধরাও মানতে পারে, জুহুদিরাও মানতে পারে, অবশ্য তারা যদি চায়। কারণ গীতা যে সত্যগুলিকে নিয়ে আলোচনা করছে, এগুলো সব শাশ্বত সত্য। যখনই আমরা নিজেদের একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে দিই, তার মানেই দাঁড়ায় আমরা বৃহৎকে কোথাও ছোটতে নামিয়ে দিচ্ছি। গীতা সেটা কখনই করে না। যেমন বেদের গায়ত্রী মন্ত্র যে কোন লোক উচ্চারণ করতে পারে, যেখানে খুশী করতে পারে। গায়ত্রী মন্ত্র কোন ধর্মে বাঁধা নয়, ঠিক তেমনি গীতা কোন বিশেষ একটা ধর্মে বাঁধা নয়। আর হিন্দুদের জন্য তো কোন মতেই না। হিন্দুদের যদি কেউ বলে আমি শাক্ত, আমি শৈব, আমি গীতা মানব না, এটা একটা মুর্খের মত কথা হয়ে যাবে। গীতা সব হিন্দুদের জন্য এবং সবারই জন্য।

আমরা এখন দেখব গীতাকে নিয়ে মানুষের মধ্যে যে ভুল, ভ্রান্ত ধারণা হয়ে আছে, সেগুলো কতটা যৌক্তিক। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর অনেক রকম কথা, যদিও বেশীর ভাগই বোকা বোকা কথা, ঘুরতে থাকে। যেমন প্রথমে একটা কথা গীতাকে নিয়ে বলা হয়, যেটা আগেকার দিনের অনেক পণ্ডিতরাও বলতেন, তা হল, গীতা মহাভারতের অংশ না, গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে, পরে কেউ রচনা করে মহাভারতে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাসদেবের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহাভারত ভাল করে পড়লে দেখা যাবে, গীতার যে দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী, এই দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র মহাভারতের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। যদি গীতাকে মহাভারত থেকে বাদ দিতে বলা হয়, তাহলে পুরো মহাভারতকেই বাদ দিতে হবে। গীতাতে যে যে আইডিয়াকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটা আইডিয়া গোটা মহাভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেইজন্য গীতা মহাভারতে পরে ঢোকান হয়েছে, এই কথা ধোপে টিকবে না।

প্রথমে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা এই ধারণাটাকে নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন। হিন্দুদের চিরদিনের দুশমন হল হিন্দুরাই। সব সময় এরা সুযোগ খুঁজতে থাকে, কিভাবে হিন্দু ধর্মকে গালাগাল দেওয়া যায়, কিভাবে বেদ, উপনিষদের সমালোচনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে হয়ত একটা কিছু কথা বলে দিল, সেটাকেই এরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন ভাবে প্রমাণিত করে দেখাবে যে, হিন্দু ধর্ম কত খারাপ। এরা হিন্দু ধর্মের দর্শন ও তত্ত্বের ভিতরে কখন গভীর ভাবে ঢোকার কোন চেষ্টা করবে না। যাঁরা ভিতরে ঢুকে বুঝে নেন, তাঁরা শান্ত হয়ে যান।

তার সাথে বলা হয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কি আদৌ হয়েছিল, কৌরব-পাণ্ডবরা কি সত্যিই ছিল, কৃষ্ণ বলে কি আদৌ কেউ ছিলেন। এগুলো ইতিহাসবিদদের কাজ, গীতার এটা কাজ নয়। দশজন মিলে যুদ্ধ করেছিল, নাকি এক কোটি লোক যুদ্ধ করেছিল, এটা দেখা গীতার কাজ না। ঠাকুর বলছেন, শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশে আছে। চিনি মানে সারতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক সার; বালি মানে হয়, ওটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কেউ যদি বলে আমি আম চাই, আমের খোসা চাই না, আঁটি চাই না। তা কি কখন সম্ভব! আঁটি আছে বলে শাঁস আছে, আর খোসা আছে বলে শাঁস আছে। অবাক লাগে, সাধারণ মানুষ এই সহজ জিনিসগুলো কি করে বুঝতে পারে না। মহাভারতে যে গল্পগুলো আছে, এই কাহিনীগুলির জন্যই গীতা দাঁড়িয়ে আছে। যাঁরা হিন্দু ধর্মকে একটু বোঝেন, তাঁরা জানেন এই কাহিনীগুলির ভিতর থেকে আমাকে সারতত্ত্বটা নিতে হবে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল কি হয়নি, কৃষ্ণ নামে কেউ ছিলেন কি ছিলেন না, আমার অত বিচারে গিয়ে কোন কাজ নেই। কৃষ্ণ নামে কেউ থাকুন বা না থাকুন, কেউ তো একজন ছিলেন, যাঁর মাথা থেকে এই উচ্চ চিন্তন এসেছিল। শুধু হিন্দুরা না, সব ধর্মেই আছে, যতক্ষণ ভগবানের কথা না হবে, ততক্ষণ কেউ মানতে চাইবে না। বাইবেলের এত সম্মান কেন? যীশু, যিনি ভগবানের সন্তান, তাঁর কথা হল বাইবেল। সেইজন্য সব খ্রীশ্চানরা বাইবেলের কথা মানে। মুসলমানরা কোরানকে কেন মানে? আল্লার কথা বলেই মানে। হিন্দুরা তাই যত উচ্চ চিন্তন হোক, যত ভাল কথা হোক, প্রথমেই

বলে দেবে এই কথাগুলো ভগবান থেকে এসেছে। ভগবান থেকে না এলে কেউ মানবে না, তোমার আমার কথা কে শুনতে যাবে, কে মানবে? সেইজন্য এই ধরণের যে আপত্তি করা হয়, এগুলো অত্যন্ত বোকা বোকা কথা।

গীতাকে নিয়ে আর-একটা কথা বলা হয়; অনেক পণ্ডিত, সন্ন্যাসীদেরও এই কথা বলতে দেখা যায় –যুদ্ধ হওয়ার মুখে, যে যুদ্ধে এত এত লোক মারা যাবে, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এত লম্বা একটা ভাষণ, আঠারোটি অধ্যায়ে সাতশ শ্লোকে কেন দিতে গেলেন আর কিভাবেই বা দিলেন। আঠারোটা অধ্যায় খুব তাড়াতাড়ি পাঠ করলে দু ঘন্টার মত বা তা থেকেও বেশি সময় লেগে যাবে। এত বড় একটা যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে, সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ দু ঘন্টা ধরে আবার ছন্দে অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়ে গেলেন, এটা কি কখন সম্ভব? যাঁরা এই ধরণের সমালোচনা করেন, আসলে তাঁরা জিনিসগুলিকে বুঝতে চান না যে, অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে বক্তব্য, সেটাকে ব্যাসদেব সাতশটি শ্লোকে গুছিয়ে সাজিয়ে দিলেন; কিন্তু অর্জুনকে বলার সময় শ্রীকৃষ্ণ হয়ত পনের কি দশ মিনিটে বক্তব্যটা বলে দিয়েছিলেন।

আমরা ছোটবেলা থেকে গীতার উপর আরেকটা অভিযোগ আরোপিত হতে শুনে আসছি, তা হল –অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন। চার পাঁচ বছর আগে রাশিয়াতে গীতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়, কারণ গীতা মানুষকে যুদ্ধে প্ররোচিত করে। কিন্তু গীতাতে একবারও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন না যে, তুমি যুদ্ধ কর। অর্জুনকে ভগবান জীবনদর্শনটা দেখিয়ে দিলেন। জীবনদর্শন দেখিয়ে দেওয়ার পর আঠারো অধ্যায়ে গিয়ে শেষে তিনি অর্জুনকে বলছেন, *যথেচ্ছসি তথা কুরু*, আমার যা বলার তোমাকে বলে দিলাম, এবার তোমার যা ইচ্ছা হয় কর। মাঝে মাঝে একবার দুবার বলছেন, *মামুনস্মর যুধ্য চ*, যদি তুমি যুদ্ধ করতে চাও তাহলে আমাকে স্মরণে রেখে কর। অর্জুন যুদ্ধ করার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে পিছিয়ে যেতে চাইছেন। তখন ভগবান তাঁকে আটকে দিলেন।

লোকেরা ভাবে বয়স হলে গীতা পড়া যাবে, গীতা শেষ বয়সের জন্য। এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা, সারা জীবন ধরে পড়ার জন্য গীতা। যাদের বয়স হয়ে গেছে তার গীতা অবশ্যই পড়বেন, কিন্তু অল্প বয়স থেকে পড়লে সে পড়ার দাম অনেক বেশী। কারণ গীতা আমাদের শক্তি দেয়, জীবন তৈরী করার জন্য গীতা দরকার, জীবনকে বিস্তার করার জন্য গীতার উপদেশ দরকার, সঙ্কট ও সমস্যা সমাধানের জন্য গীতার বাণীকে দরকার। সেইজন্য জীবনযাত্রা সূচনা থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গীতা দরকার।

ভগবান প্রথম যখন অর্জুনকে গীতা বলতে শুরু করছেন, সেখানে বলছেন, *কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং*, কোথা থেকে তোমার মধ্যে এই মোহ উৎপন্ন হল। বলেই পরের শ্লোকে এসে বলছেন, *ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ*, ক্লীব ভাবকে ধারণ করো না, ক্লীব ভাবকে ঝেড়ে ফেলে দাও। ক্লীব মানে নপুংসক। তুমি আসলে কি, তোমার ব্যক্তিত্বটা কি, তোমার আসল সত্তাটা কি? ঠাকুরের একটা খুব সুন্দর গল্প আছে, এক সাধুবাবা এক রাজাকে খুব উপদেশ দিচ্ছেন। রাজাও খুব মন দিয়ে শুনেছেন। উপদেশ দেওয়ার পর রাজাকে সাধুবাবা বলছেন, 'আর কত দিন সংসারে থাকবে, চলো বেরিয়ে পড়ো, রাজ্যটাজ্য ত্যাগ করে আমার সাথে এবার জঙ্গলে চলো ঈশ্বরের সাধনায় ডুবে থাকবে'। রাজা শুনে বলছেন, 'জঙ্গলে গেলে সেখানেও আমি একটা রাজ্য দাঁড় করিয়ে দেব'।

আমাদের যে স্বভাব, এই স্বভাব সহজে কোন দিন যাবে না। সাময়িক একটা আবরণ এসে যেতে পারে, কিন্তু ভোগী মানুষ কোন দিন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবে না। একজন ত্যাগী সন্ন্যাসী কোন দিন সমাজে গিয়ে থাকতে পারবে না, তার আগে সে আত্মহত্যা করে নেবে। কোন সন্ন্যাসী

যদি কোন নারীর মোহে আসক্ত হয়ে সংসার পাতে, সে কোন দিন সুখী হতে পারবে না। যদি সুখী হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সন্ন্যাস জীবন আদৌ তার জন্য ছিল না। ভিতরের যে স্বভাব ওটা বেরিয়ে আসবেই, কিন্তু মাঝে মাঝে আবরণ এসে যায়। গীতা এই আবরণটা সরিয়ে দেয়। স্বভাবে আমি যাই হই না কেন, আমি সন্ন্যাসী, আমি গৃহস্থ, তাতে কিছু আসে যায় না। কেউ বিষাদগ্রস্ত হয়ে ভাবছে আমি মাটিতে পড়ে গেছি। মাটিতে কি কেউ পড়তে পারে? একজন নামকরা সঙ্গীত শিল্পী, তার ভিতর হতাশার ভাব এসে তাকে গ্রাস করে দিয়েছে, বলছে আমি মাটিতে মিশে গেলাম। আপনি কি করে মাটিতে মিশে যেতে পারেন, আপনার core personality হল মিউজিক, তার মানে আপনার আসল যে ব্যক্তিত্ব, তা হল সঙ্গীত, সেটার উপর একটা আবরণ পড়ে গেছে। গীতা এই আবরণটাকে সরিয়ে দেয়। আবরণ সরিয়ে দিলে কি হয়? আপনি যা, আপনি তাই হয়ে গেলেন।

ভাল করে গীতা অধ্যয়ন করার পর আমার কি হবে? আমার কি দুটো শিং বেরোবে? কিছুই হবে না, আমি আসলে যা, আমি তাই হয়ে যাব। যে স্বভাবে কাপুরুষ সে কাপুরুষই থাকবে। কিন্তু ভিতরে যদি দম থাকে, সে অবশ্যই দাঁড়িয়ে যাবে। একজন বড় অভিনেতা, তার আবরণ এসে গেছে, গীতা সেই আবরণকে ছিড়ে তার অভিনয়ের দক্ষতাকে বার করে আনবে। যার ভিতর একটুও যদি দম থাকে, কিন্তু আবরণ পড়ে আছে, গীতা সেই আবরণকে ছিড়ে বার করে আনবে। আমি কি করে জানব আমার ভিতরে দম আছে কিনা? থাকতে বাধ্য। মা-বাবার সম্পর্ক থেকে তোমার জন্ম হয়নি। তুমি এক জীবাত্মা, জন্ম জন্মান্তর থেকে তুমি কর্ম সঞ্চয় করে আসছ; জন্ম জন্মান্তর থেকে তুমি নানা রকম উপলব্ধি করেছ। যতক্ষণ না তুমি নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছ, ততক্ষণ তুমি কি করে জানবে তোমার ভিতর কি আছে!

স্বামীজী যে বলছেন, Arise awake and stop not till the goal is reached, তিনি আমাদের কোন উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই কথাগুলো বলছেন না। স্বামীজী শুধু বলছেন, তোমার উপর যে একটা আবরণ চাপিয়ে দিয়ে রেখেছে, সেটাকে সরিয়ে দাও। ইদানিং একটা নূতন কথা উঠেছে, power of positive thinking, কিসের positive thinking! তুমি হলে শুদ্ধ আত্মা, তুমি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তির মালিক। কোন একটা সময় তুমি হয়ত চাইলে, আমার একটা শরীর হোক, সেই থেকে তোমার এই শরীর হয়েছে। তুমি বললে, আমি ভোগ করব। তোমার ভোগের সামগ্রী এসে গেল, তুমি ভোগ করতে নেমে গেলে, এবার তোমাকে কাঁদতে হবে। কাঁদতে কাঁদতে তুমি ভুলেই গেছ তুমি আসলে কে। ছোট বাচ্চাকে যদি মলে নিয়ে যাওয়া হয়, মলের চাকচিক্য দেখে বাচ্চা বলবে, আমি এবার মলেই থাকব। মা যত বোঝায়, এটা থাকার জায়গা নয়; সে মায়ের কথা মানতে চাইবে না, সে যাবে না। আমরাও ছোটবেলায় মামার বাড়ি গেলে আর ওখান থেকে আসতে চাইতাম না। ওখানে নূতন বন্ধু হয়ে গেছে, কেউ শাসন করার নেই, বাড়ি ফিরতে মন চাইতই না। মা দুটো চড় মারতেই আমার চোখে জল এসে গেল। যখনই চোখে জল আসে, বুঝতে হবে জগজ্জননী এবার আমাকে চড় মারছেন; এটা তোমার জন্য নয়, বাড়ি চল।

গীতা আমাদের চড় মারছে না, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে চড় মারলেন না। কারণ অর্জুন ছিলেন মহা শক্তিধর পুরুষ, আগে থেকেই তাঁর মধ্যে শক্তি আছে। কিন্তু অর্জুনের মধ্যে একটা সাময়িক অবসাদ এসে চিত্তকে গ্রাস করে নিয়েছে। সেই অবসাদকে কাটাবার জন্য ভগবান অর্জুনের সামনে জীবনদর্শন রাখলেন। অনেক সময় ইয়ং ছেলেরা এসে বলে, গীতা খুব ভাল বই, কিন্তু আজকালকার দিনে চলে না। আজকালকার দিনে চলে না মানে? যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেখানে একটু পরেই মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার লোক মরতে যাচ্ছে, সেই ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ জায়গাতে দাঁড়িয়ে গীতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কে উপদেশ দিচ্ছেন? একজন চঞ্চল, উদ্বিগ্ন মানুষ এই উপদেশ দিচ্ছেন না, দিচ্ছেন শান্ত, ধীর, স্থির মনের মানুষ শ্রীকৃষ্ণ। ওই যুদ্ধের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে ঝঞ্ঝা, বিক্ষুব্ধ অশান্তির মধেও শান্ত, স্থির, অচঞ্চল হয়ে থাকা যায়। আমাদের এখানে চারিদিকে তো এখন আগুন লেগে আছে,

একদিকে ইনক্লাব জিন্দাবাদ, অন্য দিকে আমাদের দাবী মানতে হবে, আরেক দিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ, তার সাথে দুর্নীতির পাঁকে মানুষ জর্জরিত। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ময়দানে হয়েছিল, এখন এই যুদ্ধে অফিসে অফিসে, রাস্থায় রাস্থায়, অলিতে গলিতে, চৌমাথায় নেমে গেছে। আজকের দিনে গীতা তো আরও বেশি বেশি দরকার। গীতার উপদেশ শুনে অর্জুন যদি শক্তি পেয়ে থাকে, তাহলে আমি আপনি কেন শক্তি পাবো না, এর কারণ তো আমরা খুঁজে পাই না। প্রাথমিক ভাবে এই হল সংক্ষেপে গীতাকে নিয়ে দু-চারটি কথা। এরপর আমরা ধীরে ধীরে আরও গভীরে গিয়ে আলোচনা করতে থাকব।

গীতার বিষয়বস্তুটা কি আমাদের জানতে হবে। বিষয়বস্তুর উপর আমরা আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব, সেখানে আচার্য শঙ্কর কি বলছেন দেখব। অনেকেই জানতে চান, গীতা আমাদের কি বলতে চাইছে, গীতা জিনিসটা ঠিক কি। প্রথম কথা, গীতার একটাই উদ্দেশ্য মোক্ষ লাভ করা, সেইজন্য গীতা হল মোক্ষশাস্ত্র, যার কথা আমরা আগে বললাম। মোক্ষশাস্ত্র মানে, যে শাস্ত্র আমাদের মুক্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছে; মুক্তি মানে জন্ম-মৃত্যুর যে চক্র, সেই চক্র থেকে মুক্তি। এ-ছাড়া গীতার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

ঋষিরা, শাস্ত্র প্রণেতারা বারবার বলেন যাদের মন শুদ্ধ পবিত্র, তারা সব কিছু ত্যাগ করবে। এই শুদ্ধ পবিত্র বলতে কি বোঝায়? যে কাউকে এই প্রশ্ন করলে একটাই উত্তর সবার থেকে বেরিয়ে আসবে, শুদ্ধ পবিত্র মানে, সত্যি কথা বলে, চুরি করে না, পরনারী সঙ্গ করে না ইত্যাদি। একেবারেই তা না, শুদ্ধ পবিত্র মানে –নিঃস্বার্থপরতা, কোন স্বার্থ তার থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ যে এই যুদ্ধ করাচ্ছেন, সেখানে তাঁর কোন স্বার্থ নেই, করাতে হবে তাই করছেন। পুরো গীতার এটাই বক্তব্য। মানুষ বিষয়ের সাথে নিজেকে কখন জড়িয়ে নেয়? জিনিসগুলি কখন সে সংগ্রহ করে? মানুষ যখন স্বার্থপর হয়। স্বার্থপর মানে, যার অস্তিত্ব দেহকেন্দ্রিক, নিজের আপনজনদের নিয়ে অস্তিত্ব। তার মানেই, স্বার্থবোধ এসে গেল। স্বার্থবোধ আসা মানেই সে এখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। এবার সে যা কিছু চাইবে সব নিজের জন্য, আমার টাকা-পয়সা লাগবে, আমার নিরাপত্তা চাই, আমার বাড়ী লাগবে। শুধু যে ভোগের জন্যই যে এসব লাগবে তা না, জীবন রক্ষার জন্যও দরকার।

কিন্তু যে বলছে, জগতে আমার আপনার বলে কেউ নেই, হয়ত সত্যিকারের তার কেউ নেই, নিজেকে সে সেভাবেই দেখছে। তাকে এনারা বলছেন, তুমি মন থেকে সন্ন্যাসী। সব কিছু ছেড়ে তুমি পূর্ণ রূপে আত্মজ্ঞানের পথে চলে যাও। গীতা এই জিনিসটাকে বিস্তারে বর্ণনা করবে। আচার্যের ভাষ্য যখন আসবে তখন এই জিনিসগুলো আরও বিস্তারে বলা হবে, আমরা এখানে সংক্ষেপে বলছি।

আচার্য বলবেন, যাদের মন পরিষ্কার নেই, যাদের মধ্যে আমিত্ব বোধ প্রবল, আমি ও আমার ভাব খুব জোরালো; যারা বলছে, আমি আমার ভাল চাই, অন্যেরও ভাল চাই, তাদের বলছেন, তুমি পুরোদমে কাজ কর, be the best। সেখান থেকে তুমি ধীরে ধীরে এটাকেই কর্তব্য রূপে কর, আমাকে এটাই করতে হবে। মা-বাবার সেবা, দেখাশোনা আমাকে করতে হবে; সেখানে কোন প্রত্যাশা করো না। সন্তানকে কেন প্রতিপালন করব, কেন ভালবাসব? আমার দায়ীত্ব। স্ত্রীকে কেন ভালবাসব? আমার দায়ীত্ব। স্বামীকে কেন ভালবাসব? আমার দায়ীত্ব। পুরো মহাভারত এই দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পুরো আদর্শ হিন্দু জীবন এটার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। গীতা এই দর্শনের উপরেই বলছে। প্রথমে মনকে শুদ্ধ কর। কিভাবে মনকে শুদ্ধ করবে? প্রথম হল কর্ম কর। দ্বিতীয়, কর্মকে কর্তব্য বোধে নিষ্কাম ভাবে করো। নিষ্কাম কর্ম মানে, আমি ও আমার বোধ থেকে বেরিয়ে এসে কর্ম করা। এভাবে মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলে, এবার এখান থেকে তুমি পুরোপুরি আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যাও। পুরো গীতা শুধু এই দুটি জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করে। ত্যাগ কি? ত্যাগ কিভাবে হয়? কর্ম কি? কর্ম কিভাবে হয়? নিষ্কাম কর্ম কি? নিষ্কাম কর্ম কিভাবে হয়? আমরা আগে

why আর how নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি কেন ত্যাগ করতে যাবো? কারণ আসল সত্য এই, তুমি আসলে এই, এটাকে পাওয়ার জন্য তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

শাস্ত্রের কিছু কিছু শব্দ এখানে technical term রূপে আসবে, শাস্ত্রে এই ধরণের শব্দগুলি ব্যবহার হয়। যেমন প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, প্রবৃত্তি মার্গ, নিবৃত্তি মার্গ, আবার আসবে অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স, যার অর্থ জাগতিক কল্যাণ আর পারমার্থিক কল্যাণ। এই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, এই দুটো জিনিসকে গীতা ঘুরে ঘুরে আলোচনা করবে। অভ্যুদয় মানে জাগতিক কল্যাণ, জীবনে উঠে দাঁড়াও। নিঃশ্রেয়স মানে, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে পরমার্থ লাভের বা ঈশ্বরকে পাওয়ার চেষ্টা কর। পুরো গীতা এই জিনিসগুলিকেও নিয়ে আলোচনা করছে –কখন নিঃশ্রেয়স, কখন অভ্যুদয়। ইদানিং কালে অনেকে বলছে Gita for Management, আসলে গীতা অভ্যুদয়কে নিয়ে বলছে, তাই ম্যানেজমেন্টের কোর্সেও গীতাকে নিয়ে আসা হয়েছে। মানবজাতির জাগতিক কল্যাণের জন্য, অর্থাৎ তোমার ভাল কিভাবে হবে, এর উপর যে কথাগুলো বলেছেন, এটাই অভ্যুদয়ের উপর বলা হচ্ছে। আমরা এগুলো আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখব, কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা মানে এই না যে, এর কোনটাকেই জাগতিক দৃষ্টিতে লাগানো যায় না।

একজন নামকরা শিল্পী ছিলেন, খুব কঠিন কোন জিনিসকে সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঠাকুর যে গল্পগুলি ভক্তদের বলতেন, সেই গল্পগুলিকে তিনি ছবির মাধ্যমে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একটা পত্রিকায় ওনার আঁকা ছবিগুলো ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত। তিনি এক জায়গায় বলছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাব যাই হোক, তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কিন্তু তাঁর কথাগুলি ছবিতে যখন আঁকা হয়, তখন এর একটা বিরাট দাম হয়ে যায়। গীতার একাদশ অধ্যায়ে যে বর্ণনা আছে, এর একটা আধ্যাত্মিক মূল্য আছে, ধ্যানের জন্যও এর একটা দাম আছে, কিন্তু যদি কাব্যের দিক দিয়ে দেখা হয় তাহলেও এটা খুব উচ্চমানের কবিতা। একটা জিনিস যে শুধুই আধ্যাত্মিক হবে তা না, ওর অন্য ভাল দিকও থাকতে পারে। ঠিক তেমনি, অভ্যুদয় জিনিসটা আমরা আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে দেখি, কিন্তু এটাকে দৈনন্দিন জীবনে নামিয়ে মানুষের জাগতিক কল্যাণ সাধনের দিকটাও দেখতে হবে। যার জন্য বলা হয়ে থাকে, একটা মানুষের জীবনে যত রকমের সমস্যা থাকতে পারে, গীতা সব সমস্যাকে নিয়ে আলোচনা করে। একজন এই কথা শুনে প্রশ্ন করেছিল, role of liquid money in market, গীতায় কি এর সমাধান আছে? ভাই, এটা তো জীবনের সমস্যা না, এই সমস্যা তো তোমাদের সৃষ্টি। গীতা মানবজীবনের সমস্যাকে নিয়ে আলোচনা করছে, যেখান আমাদের মন যুক্ত রয়েছে। গীতা এই ধরণের সব সমস্যার সমাধান দেন।

গীতার আঠারোটি অধ্যায়ে সাতশটি শ্লোককে বিভিন্ন ভাবে শ্রেনী বিন্যাস করা হয়। গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায়ের যে নামকরণ করা হয়েছে, তাতে শেষে 'যোগ' এই শব্দটা যোগ করা হয়েছে। যেমন অর্জুনবিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি। যোগ মানে যেটা আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় বা ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করিয়ে দেয়। যোগ শব্দকে যুক্ত করার অর্থ হল, গীতার আঠারোটা অধ্যায়ের প্রত্যেকটা জিনিস দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে পেতে পারি, ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। যেমন প্রথম অধ্যায়ের নাম অর্জুনবিষাদযোগ, তার অর্থ, মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত যে দুঃখ-কষ্ট আসছে, এই দুঃখ-কষ্ট দিয়েও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। একমাত্র গীতাই এই কথা বলছে।

প্রথম অধ্যায়ে গীতার যে ভাব, এই ভাবকে আধার করে অধ্যায়ের নাম অর্জুনবিষাদযোগ। বিষাদ মানেই সংসার, পরে আচার্য বলবেন, শোক আর মোহ এটাই সংসার, এই সংসার থেকে বেরোতে হবে। প্রথম অধ্যায় হল বেরোনর পথ, এটাই গীতার ভাব। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাপারে বলা হয়, গীতা যে মূল বিষয়বস্তুগুলিকে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছে, ওর প্রত্যেকটি বিষয়কে সূত্রাকারে অর্থাৎ খুব সংক্ষেপে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলে দেওয়া হয়েছে। এরপর তৃতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে

সতের অধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকটি বিষয়কে আলাদা আলাদা করে বিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার মানে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে যেটা বলা হয়েছে, সেটাকেই পরের পনেরোটি অধ্যায়ে বিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে আবার পুরো জিনিসটাকে গুটিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

গীতার পুরো বক্তব্য এই দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে –অভ্যুদয় আর নিঃশ্রেয়স; অভ্যুদয়টাও ঠিক অভ্যুদয় রূপে নয়, এখানেও ত্যাগের ভাব আছে। ঠাকুর বলছেন, দশবার গীতা বললে যা হয় গীতার অর্থ তাই, অর্থাৎ ত্যাগী। শেষ কথা হল ত্যাগ, সব কিছু ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে যাও, তোমার স্বরূপকে জানো এবং এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও। তোমার মন যদি পুরোপুরি শুদ্ধ পবিত্র, তাহলে তুমি সম্পূর্ণ ত্যাগ কর। মন যদি পুরোপুরি শুদ্ধ পবিত্র নয়, তাহলে কর্মফল ত্যাগ কর। শুদ্ধ হয়ে গেলে কর্মত্যাগ। মনের মধ্যে যদি আমিত্ব ভাব থাকে তাহলে কর্মফল ত্যাগ। কেউ যদি বলে, আমি কর্মফল ত্যাগ করতে চাই না, তাহলে গীতা তার জন্য নয়। সেইজন্য প্রথম থেকে আমরা বলে আসছি, গীতা খুব কঠিন। আচার্য শঙ্করও বলবেন, গীতা কত কঠিন। আবার আচার্য শঙ্করের যে গীতার ভাষ্য, খুব উচ্চমানের যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধক একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারেন। শুধু ভাষ্যকে নিয়েই কঠিন বলা হচ্ছে না, গীতাকে নিয়েও বলা হচ্ছে। এমনিতে উপর উপর গীতার অর্থ যে কেউ বলে দিতে পারে। কিন্তু গীতার ভিতরে প্রবেশ করতে হলে, বৌদ্ধিক ও চিন্তন দিয়ে গীতাকে বোঝার চেষ্টা করতে গেলে একটু পরিশ্রম ও সাধনা লাগে।

মধুসূদন সরস্বতী, শঙ্করাচার্যের পরম্পরার এবং তখনকার দিনের একজন বাঙালী হয়ে ঘোর বেদান্তী ছিলেন। গীতার উপর তাঁর খুব সুন্দর বই আছে, *গূঢ়ার্থদীপিকা*। তিনি নিজের মত অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মধ্যে একটা বলছেন তত্ত্বমসি, বেদান্তের খুব নামকরা কথা। তত্ত্বমসি মানে, তুমি নিজেকে যা মনে করছ, আসলে তুমি তা নও, তুমি সেই পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম। মধুসূদন সরস্বতী গীতাকে তত্ত্বমসি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, গীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায় ত্বম্‌কে বোঝাতে চাইছে তুমি কে। পরের ছয়টি অধ্যায়, সপ্তম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় তৎ এটাকে বোঝাতে চাইছে। তৎ সম্বন্ধ বলা মানে ঈশ্বরীয় কথা বলে। তারপরের বাকি ছয়টি অধ্যায় তত্ত্বমসি এর পুরো জিনিসটার অর্থ নিরুপণ করেন। সবার বুদ্ধি তো এক রকম নয়, যার যেমন বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি দিয়ে তাঁরা গীতাকে নিজের নিজের মত নানান ভাবে বিভাজন করেছেন। কিন্তু এনাদের মূল কথা হল, গীতার সব কটি অধ্যায়ের বক্তব্য হল অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, জাগতিক উত্থান আর শেষে সম্পূর্ণ ত্যাগ, এই দুটি। এই হল খুব সংক্ষেপে গীতার ভূমিকা, গীতা কি। এরপর আমরা দেখব আচার্য শঙ্কর গীতার ভূমিকাতে কি বলছেন, আর কিভাবে গীতার মূল বিষয়বস্তুকে আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন।

আচার্য শঙ্করের গীতা-ভাষ্যের সম্বন্ধ-ভাষ্য

এবার আমরা গীতার মর্মকে নিয়ে আলোচনা করব। এখানে আমাদের কোন কথা নেই আচার্য শঙ্কর গীতার ভূমিকাতে যা বলছেন, সেটাকেই আমরা সরাসরি তুলে ধরব। স্বামী নিখিলানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ পরম্পরার একজন খুব উচ্চমার্গের সন্ন্যাসী ছিলেন। নিউইয়র্কের রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন, রামকৃষ্ণ ভাবধারার উপর ইংরাজী ভাষায় ওনার খুব ভাল ভাল বই আছে। আচার্য শঙ্করের সব বই উনি ইংরাজীতে সার সংক্ষেপে অনুবাদ করেছিলেন, যার মধ্যে অনেকগুলো অংশ তিনি আক্ষরিক ভাবে অনুবাদ করেছেন। তার মধ্যে শঙ্করাচার্যের গীতার এই ভূমিকাকেও তিনি অক্ষর অনুযায়ী অনুবাদ করে গেছেন। আচার্য শঙ্করের গীতার এই সম্বন্ধ-ভাষ্যকে যদি বুঝে নেওয়া যায়, তাহলে গীতার মর্মার্থ, গীতার কি বক্তব্য, সবটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় *উপোদ্‌ঘাৎ*, এটাও একটা টেকনিক্যাল টার্ম। আমরা যাকে Foreword বা Introduction বলি, ওনারা

সেটাকে উপোদ্‌ঘাৎ বা অনেক সময় সম্বন্ধ ভাষ্য বলছেন, যেখানে সব কিছুকে যুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু তারপর এরও বিস্তার আসে।

কোন ভাল বইয়ের যদি কোন Foreword থাকে, তাতে সাধারণত সেখানে ওনারা প্রথমে বলতে চান, এই বইয়ের বিষয়বস্তুটা কি। Forewordএ একজন লিখে জানিয়ে দিলেন, এই বইটা পড়ে তাঁর কি মনে হল, সেখানে ওনারা বিষয়বস্তুটাকে বিরাট করে বলে দেন। এরপর আসল যিনি লেখক, তিনিও একটা ভূমিকা লেখেন। এখানে লেখক ব্যাসদেবের কোন ভূমিকা নেই, যিনি ভাষ্যকার তাঁর একটা ভূমিকা রয়েছে।

সম্বন্ধ-ভাষ্যে ওনারা প্রথমে চারটে জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করেন, এই চারটেকে একসাথে অনুবন্ধ চতুষ্টয় বলা হয়। অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের এক নম্বরে বলেন অধিকারী কে? এই গ্রন্থ অর্থাৎ এখানে এই গীতা ঠিক ঠিক কার জন্য? দ্বিতীয় হল, এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি? তৃতীয় হল, এর প্রয়োজনীয়তা কি? গীতা কেন, কি প্রয়োজন? সব শেষে চতুর্থ হল সম্বন্ধ। লেখক যেটা বলতে চাইছেন, তার সাথে এই বইয়ের কি সম্পর্ক। বিষয়টা তো আপনি বলে দিলেন, কিন্তু বইয়ের সাথে এর কি সম্পর্ক আছে? বা অধিকারীর সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে? যখনই এই ধরণের কোন ভাষ্য লেখা হয়, তখন সেখানে প্রথমেই এই চারটে জিনিসকে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয় – অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন। উপনিষদের উপর আচার্য শঙ্করের যত ভাষ্য আছে, সেখানেও প্রত্যকটি ভাষ্যে প্রথমে এই রকম সম্বন্ধ-ভাষ্য দেওয়া আছে। প্রত্যেকটি সম্বন্ধ ভাষ্যে উনি এই চারটে জিনিসকে নিয়ে প্রথমে আলোচনা করেছেন।

এখানেও আচার্য চারটে জিনিসকে নিয়ে বলবেন, গীতা কার জন্য, গীতার বিষয়বস্তু কি, গীতা কেন দরকার এবং শেষে কার সঙ্গে কার কি সম্পর্ক আছে। পরে আচার্য শঙ্কর বলবেন, গীতা এত গভীর, কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি গীতার ভাষ্য লেখার। আবার অন্য দিকে আচার্যের এই উপোদ্‌ঘাৎ বা সম্বন্ধ-ভাষ্য, যেটাই বলি না কেন, এটাও এত গভীর যে, প্রত্যেকটা লাইনকে ধরে ধরে ব্যাখ্যা করতে হয়। যদিও এই সম্বন্ধ-ভাষ্য খুবই ছোট, কিন্তু আমরা যেখানে গিয়ে এর আলোচনা শেষ করব, ততক্ষণে আমরা ভুলে যাব এটা কেন শুরু হয়েছিল।

আচার্য এখানে মূলতঃ চারটে জিনিসকে ধরছেন। প্রথম, ঈশ্বরকে পরিভাষিত করছেন। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা যেভাবে নির্গুণ নিরাকার মনে করি, সেভাবে না ধরে তিনি ভগবানের অবতারের রূপটাকে ধরছেন। এখানে আমরা অবতার কি, ঈশ্বর কি, এটাকে নিয়ে আলোচনা করতে পারব না, যদিও পরে পরে গীতাতে এই আলোচনা ঘুরে ঘুরে আসবে। যেমন যেমন আসবে আমরা তেমন ভাবে আলোচনা করে যাব।

প্রথমে আচার্য ঈশ্বর ও অবতার এই দুটোকে নিয়ে আলোচনা করছেন। দ্বিতীয় সৃষ্টি এবং সৃষ্টি কিভাবে হল খুব সংক্ষেপে বলে দিচ্ছেন, পরে গীতাতে এটাই আবার বিস্তারে আসবে। সৃষ্টি হয়ে গেলেই তো সব হয়ে যাবে না, সৃষ্টিকে তো এবার ধরে রাখতে হবে। সেইজন্য তৃতীয় বলছেন, এই স্থিতিটা কিভাবে হয়। স্থিতিটা কিভাবে হয়, সেটাকে পরিভাষিত করতে গিয়ে নিয়ে আসছেন ধর্ম। সৃষ্টি ও ধর্মকে নিয়ে বলার আগে একটা ছোট্ট কথা বলে নিতে হয়। বেদের সুস্পষ্ট বক্তব্য ঈশ্বর থেকে সমস্ত সৃষ্টি। হিন্দুরা কখনই বলে না, সৃষ্টি শূন্য থেকে এসেছে, এবং শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।

ভগবান যখন সৃষ্টি করেন, তিনি এলোপাতাড়ি কিছু সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টি রচনার পিছনেও ভগবানের একটা বিধান আছে। ভগবানের এই বিধানেরও একটা টেকনিক্যাল টার্ম আছে, যাকে বলা হয় ***ঋতম্***। ঠাকুরের আরাত্রিক বন্দনায় স্বামীজীও ঠাকুরকে বলছেন, *ওঁ হ্রীং ঋতম্; ঋতম্* বেদের শব্দ। স্বামীজী ঠাকুরের স্তবে তিনটে শব্দ নিয়ে আসছেন, **ওঁ** হল সেই ভগবানের, শ্রীরামকৃষ্ণের

প্রতীক, ***হ্রীং*** হল শক্তির প্রতীক, আর ***ঋতম্*** হল বিধি-বিধান, যেটা দিয়ে ঠাকুর এই সৃষ্টি রচনা করেছেন, আর যেটাকে দিয়ে তিনি এই সৃষ্টিকে পালন করছেন। মুণ্ডকোপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্র, যা আমরা অনেক জায়গায় লেখা দেখতে পাই, *সত্যমেব জয়তে নানৃতং*, *নানৃতং* এর সন্ধি ভাঙলে হয় *ন+অনৃতম্*। ঋতমের বিপরীত হল *অনৃত*। *ঋতম্* অনেক অর্থেই ব্যবহৃত হয়, সত্যের অর্থে আসে, ধর্মের অর্থে আসে, তপস্যার অর্থে আসে, অনেকগুলো অর্থেই আসে। আমাদের শাস্ত্রে এখন আর ঋতম্ শব্দের সে-রকম ব্যবহার হয় না। *ঋতম্* শব্দ ধীরে ধীরে ধর্মে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আচার্য এখানে সংক্ষেপে, ঈশ্বর, সৃষ্টি, সৃষ্টি তত্ত্ব আর ধর্ম, এই তিনটেকে নিয়ে আলোচনা করছেন।

ধর্ম কোথায় পাওয়া যাবে? শাস্ত্রে। গীতা শাস্ত্র, শুধু শাস্ত্রই না, আমরা আগে বললাম কিভাবে গীতা মোক্ষশাস্ত্র। সেইজন্য গীতার কি বৈশিষ্ট্য সেটার আলোচনা করা দরকার। আমাদের আচার্যের এই সম্বন্ধ ভাষ্যের প্রত্যেকটা লাইনকে ধরে ধরে আলোচনা করতে হবে, তা নাহলে আমরা হারিয়ে যাব। তবে এটুকু মনে রাখলেই হবে –আচার্য এখানে এই চারটে জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করছেন –ঈশ্বর, ঈশ্বরের স্বরূপ, বিশেষ করে অবতার রূপে, সৃষ্টি, স্থিতি আর তার সাথে ধর্ম। এই কয়েকটি জিনিস যার পরিষ্কার হয়ে যাবে, গীতা বুঝতে তার অনেক সহজ হবে। আমরা আগেও বলেছি, পরেও আবার বলতে হবে – ভাসা ভাসা গীতা বুঝতে হলে কোন ব্যাপারই না, গীতার যে কোন একটা বই খুলে অর্থ দেখে নিলেই হল; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবে না। গীতাকে বুঝতে হলে অনেক গভীরে যেতে হবে।

এটা খুবই আশ্চর্যের যে, আচার্য পুরাণের একটি মন্ত্র দিয়ে গীতার ভাষ্য রচনা শুরু করছেন। পুরাণের মন্ত্র দিয়ে শুরু করাতে এটা প্রমাণ করছে, বেদ যা বলছে উপনিষদও তাই বলছে, গীতাও তাই বলে আর পুরাণও তাই বলে, সব শাস্ত্র একই কথা বলছে।

ওঁ নারায়ণঃ পরোহব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।।

আচার্য এমন একটি মন্ত্রকে নিয়ে এসেছেন যে মন্ত্র দিয়ে পুরো হিন্দুধর্মের পুরো দর্শনকে স্পষ্ট করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। এটি একটি প্রণাম মন্ত্র। আগেকার দিনে লেখকরা যে কোন বড় কিছু রচনা শুরু করার আগে একটা প্রণাম মন্ত্র দিয়ে তিনি শুরু করতেন। আচার্শ শঙ্কর একজন খুব বড় কবি ছিলেন, তাঁর রচিত অনেক স্তুতি আছে, স্তোত্র ও প্রার্থনা আছে। কিন্তু প্রণাম মন্ত্রটি তিনি নিজে রচনা না করে পুরাণ থেকে নিয়ে এলেন। এর দ্বারা আচার্য প্রমাণিত করে দিচ্ছেন, হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্র একই কথা বলে।

আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি হিন্দুদের মূল শাস্ত্র বেদ। কিন্তু বেদের প্রচুর সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথম কথা বেদের ভাষা অনেক প্রাচীন, বৈদিক সংস্কৃত একটা আলাদা category, সংস্কৃতের মধ্যে ধরাই হয় না। দ্বিতীয় হল, প্রথমের দিকে চারটি বর্ণেরই বেদ পাঠের অধিকার ছিল। পরের দিকে শুধু ব্রাহ্মণরাই বেদ পড়তে ও পড়াতে শুরু করলেন। সেখান থেকে দেখা গেল, যারা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, যারা আশ্রমে গিয়ে বেদ অধ্যয়ন করত, তারা ছাড়া আর কেউ বেদ অধ্যয়ন করতে পারত না। তৃতীয়ত, সময়ের সাথে বেদের ভাষা, বিষয়বস্তু ধীরে ধীরে এমন ভাবে হারিয়ে গেল যে, বেদের কিছুই বোঝা সম্ভব না। আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে আমরা এখন যে বেদ পড়ছি, এগুলো কি পড়ছি? আমরা এখন যে বেদ পড়ছি, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সায়নাচার্য বেদের ভাষ্য লিখলেন। সায়নাচার্যের ভাষ্য আসার পর আমরা আজকে বেদ বুঝতে পারছি। সায়নাচার্যের ভাষ্য পড়ে প্রথমের দিকে অনেকেই বলতেন, উনি বেদের অর্থগুলি নিজের মত করেছেন; কিন্তু পরে পরে অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে উনি যেটা বলেছেন, সেটাই ঠিক। মূল কথা হল, আমরা বেদ আজ যতটা বুঝতে পারছি, সায়নাচার্যের জন্য। ঠিক তেমনি, আজ যে আমরা উপনিষদ

বুঝতে পারছি শঙ্করাচার্যের জন্য। গীতা অনেক পরের কাজ, যেটা পরের কাজ সেটা অনেক সহজে বোঝা যায়। পুরনো দিনের কাজকে বোঝা যাবে না, কারণ ভাষা পাল্টে গেছে।

ভারতের আধ্যাত্মিক ভূমিতে ব্যাসদেবের আবির্ভাবের পর উনি দেখলেন, বেদ যেভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অগোছাল অবস্থায় রয়েছে, এভাবে থাকলে বেদ একদিন ইতিহাসের গহ্বরে হারিয়ে যাবে। উনি তখন সমস্ত বেদরাশিকে সংগ্রহ করে এক জায়গায় নিয়ে এলেন। বেদ সংকলন করার পর উনি দেখছেন, এই বেদ সাধারণ মানুষ কিছুই বুঝতে পারবে না। উনি তখন রচনা করলেন মহাভারত। বেদের যা কিছু বক্তব্য, সবটাই উনি মহাভারতে ঢেলে দিলেন। বেদেরই শেষ অংশ হল উপনিষদ। প্রত্যেকটি ধর্মের, তা সে যে ধর্মই হোক, সবারই চারটি করে শাখা থাকে। প্রথমটি হল দর্শন। যে কোন ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে সেই ধর্মের নিজস্ব দর্শনের উপর, যে কোন ধর্মের যদি দর্শন না থাকে, সেই ধর্ম নাশ হয়ে যাবে। ওই দর্শনকে আবার আধ্যাত্মিকতার উপর আধারিত হতে হবে। এখন যেমন একটা নূতন ইজম্ এসেছে, বলছে হিউম্যানিজিম্, কিন্তু হিউম্যানিজিম্ কোন ধর্ম নয়, কারণ কোন দর্শন নেই তার। একজন বাবাজী ইদানিং বলতে শুরু করেছে, science is my religion, খুব ভাল কথা। কিন্তু তোমার দর্শনটা কি? কিছুই নেই। ধর্ম মানে তার প্রথম স্তম্ভ হবে দর্শন। হিন্দু ধর্মের দর্শন পুরোটাই আসে বেদ থেকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা জায়গায়তে দর্শন focus করা আছে, সেটা হল উপনিষদ, আর তার সাথে গীতা। গীতা অবশ্য মহাভারতের অংশ। এর আগে আমরা বললাম গীতা হল উপনিষদের সার, উপনিষদ আর গীতা মিলে হিন্দু ধর্মের দর্শন তৈরী হয়েছে।

ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভ হল, কথা-কাহিনী বা পুরাণ। হিন্দুদের কথা-কাহিনী আসে বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণ থেকে। এর আগে বলা হল, কথা-কাহিনী যদি না থাকে, তাহলে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি আমরা ধরতে পারব না। ধর্মের তৃতীয় স্তম্ভ আসে, পূজা, অর্চনা বিধি থেকে। পূজা অর্চনা আমরা কিভাবে করব? সেটা আসে মূলতঃ তন্ত্র থেকে, আর কিছুটা আসে পুরাণ থেকে। আমরা যে নিত্য বা বিশেষ পূজা-অর্চনাদি করি, তার বেশীর ভাগটা এসেছে হয় তন্ত্র থেকে, নয়তো পুরাণ থেকে। পুরাণ থেকে কম আসে, পুরাণ মানেই বেদ থেকে আসছে, যেমন সরস্বতী পূজা বৈদিক পূজা, কালীপূজা আবার তন্ত্রের পূজা, দূর্গাপূজা আবার তন্ত্র ও বেদ দুটো মিলিয়ে করা হয়। বেদের সব পূজা কখন রাত্রিতে হয় না, সব দিনেই সম্পন্ন করতে হয়। অথচ বিবাহ অনুষ্ঠান পুরো বৈদিক মন্ত্র দিয়ে হয়, কিন্তু রাত্রিবেলা হয়; এটাই একটা ব্যতিক্রম। ধর্মের চতুর্থ ও শেষ স্তম্ভ হল আচার-সংহিতা, আচার-সংহিতা আসে স্মৃতি থেকে। হিন্দুদের শত শত স্মৃতিশাস্ত্র রয়েছে, এর মধ্যে সব থেকে নামকরা মনুস্মৃতি।

বেদকে কোন দিন পাল্টানো যাবে না, বেদ যেমনটি আছে তেমনটিই থাকবে। কিন্তু দর্শন, কথা কাহিনী, পূজা-অর্চনা আর আচার-সংহিতা, এই চারটে পাল্টাতে থাকে। যেমন স্বামীজীর দেববাণী, এটাও একটা দর্শন, হিন্দু ধর্মের দর্শনকে ব্যাখ্যা করছে। এটাও পুরো বেদের উপর আধারিত, কিন্তু সময়োপযোগী করে নূতন করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই চারটের সবটাতে নূতন করে সংযোজন করতে পারি, কিন্তু বেদে কোন ভাবে হাত দেওয়া যাবে না। ব্যাসদেব বেদকে যেভাবে বেঁধে দিয়ে গেছেন, সেভাবেই তাকে রাখতে হবে। কোন গ্রন্থকে আমরা বলতে পারি কলিযুগের বেদ, বা পঞ্চম বেদ কিন্তু বেদ মানে সেই চারটি বেদ, যাতে কোন ভাবেই হাত দেওয়া যাবে না। তবে দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি এই চারটেতে হাত দেওয়া যাবে।

পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ, যে গ্রন্থের এই পাঁচটি লক্ষণ থাকবে সেটাকেই পুরাণ বলা যাবে। প্রথম লক্ষণ হল সৃষ্টি, সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে পুরাণ বর্ণনা করে। সৃষ্টির এই বর্ণনা কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আধার করে। আমি যদি বলে সৃষ্টির বর্ণনা বিজ্ঞানের সাথে মিলছে না, তাহলে বলা হবে;

মেলানোটা বিজ্ঞানের কাজ, সেটা পুরাণের নয়। আর্যভট্ট, ভাস্করের মত বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিকে বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে বলবেন। পুরাণাকাররা বলবেন, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে। পুরাণে এটাই বলছেন *ওঁ নারায়ণঃ পরোহব্যক্তাদ্*,, ওঁ রূপী নারায়ণ, তিনি প্রকৃতি, cosmic energy, সমষ্টির সব কিছুর পারে। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে এই জিনিসটার উপর বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর বলছেন, সেখান থেকে হিরণ্যগর্ভের জন্ম, যেটাকে বলা হয় ব্রহ্মাণ্ড। তার সাথে বলছেন সেই ব্রহ্মাণ্ডেই *অণ্ডস্যান্তস্ত্রিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী*। তার মানে এই চোখে সমস্ত লোকের যা কিছু দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে অন্তরীক্ষ, galaxy, super galaxis, ইত্যাদি সব আছে; আবার ধ্যানের গভীরে যে জিনিসগুলো দেখা যায়, যেমন ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ, সত্য এই সাতটি লোকের যে কথা বলা হয়, এর সবটাই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। ভূঃ, ভূবঃ আদি এগুলো আধ্যাত্মিক লোক, যাঁরা ধ্যান ধারণা করেন তাঁরা এগুলো দেখতে পান। বলছেন, যে সৃষ্টিটা আমার চোখের সামনে আছে, যে সৃষ্টিটা আমার চোখের সামনে নেই, যে সৃষ্টিটা শেষ হয়ে গেছে আর যে সৃষ্টিটা আগামী দিনে আসবে, এর সমস্ত কিছু হচ্ছে cosmic energyর জন্য। এই cosmic energyর জন্ম ঈশ্বরের ইচ্ছাতে, কিন্তু তিনি এরও পারে। হিন্দুরা তাই এটাই মনে করে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। তিনি ইচ্ছা করলেন সৃষ্টি হোক, সৃষ্টি হয়ে গেল। কিভাবে হল? বলছেন, energy রূপে।

সত্ত্ব, রজ ও তম, এই তিনটে শব্দ হিন্দুদের যে কোন শাস্ত্রের আলোচনায় ঘুরে ঘুরে আসবে। গীতাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। রজোগুণ মানে যেখানে ক্রিয়া ও ক্রিয়াকলাপ রয়েছে, তমো মানে যেখানে জড়তা, স্থবিরতা রয়েছে আর সত্ত্বগুণ সব কিছুকে ভারসাম্য করছে। তিনটে প্রাইমারী রঙ মিলে বিশ্বের সমস্ত রঙের সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি এই তিনটে গুণ মিলে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম দিয়েছে। *সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী*, পৃথিবীকে এনারা সপ্তদ্বীপা বলতেন, সাতটা দ্বীপ নিয়ে এই পৃথিবী। কেন বলতেন আমাদের জানা নেই। তখনকার দিনে ঋষিদের আমেরিকা, ইউরোপ সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল কিনা আমাদের সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষকে ওনারা জম্বুদ্বীপ বলতেন। অনেক সময় বর্ণনা করা হয়, গঙ্গা যমুনা নদীর মাঝখানটা একটা দ্বীপের মত ছিল, আর সেখানে প্রচুর জাম গাছ ছিল, সেইজন্যই জম্বুদ্বীপ বলছেন কিনা জানা নেই। এনাদের কাছে ছিল মেদিনী হল পৃথিবী, এই পৃথিবীতে সাতখানা দ্বীপ, এর সবটাই ভগবানের সৃষ্টি। এখানে এসে আচার্য থেমে যাচ্ছেন, এরপর বলছেন –

স ভগবান সৃষ্ট্বৈদং জগৎ, তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুঃ মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা, প্রজাপতীন্‌প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্। ততোহন্যাঞ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য, নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।

এই অংশটাও আচার্য ভাগবত পুরাণ থেকেই নিয়েছেন, তবে তিনি নিজের মত করে একটু অন্য ভাবে বলছেন –*স ভগবান*, মানে সেই যিনি নারায়াণ তিনি এই জগৎ বা লোক, এখানে ভূঃ, ভূবঃ ও স্ব অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ আর স্বর্গ এই তিনটে লোক সৃষ্টি করলেন। পরের দিকে বলা হয় উপরে সাতটা লোক আর নীচের দিকে সাতটা লোক নিয়ে এই চতুর্দশভুবন। আচার্য ভালো করে জেনে বুঝেই পুরাণের একটা মন্ত্র দিয়ে শুরু করেছেন। তার কারণ, যদিও উপনিষদ সৃষ্টিকে অত গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু গীতা জগৎকে একেবারে সত্য বলে মনে করে নিয়ে এগিয়ে গেছে। জগৎ যদি সত্য হয় তাহলে তার সৃষ্টিটাও পুরোপুরি সত্য হতে বাধ্য। মানুষ যেমন সত্য, মানুষের সমস্যাও ততটাই সত্য। ভগবান তো সৃষ্টি করে দিলেন, তাঁর ইচ্ছাতে সৃষ্টি হয়ে গেল। সৃষ্টি হয়ে গেলেই তো হবে না, তাঁর রক্ষণা-বেক্ষণ তো করতে হবে। শুধু টাকা আয় করে গেলেই তো হবে, টাকাকে ঠিক মত রাখতে হবে, সঞ্চয় করতে হবে, খোঁজ নিতে হবে কোথায় ইনভেস্ট করলে বেশী সুদ পাওয়া যায়, ইনকাম ট্যাক্স থেকে বাঁচাতে হবে। চোর ডাকাতরা যেন টাকা-পয়সা লুট করে না নিয়ে যেতে

পারে ইত্যাদি। ঠিক সেই রকম জীব সৃষ্টি করলেই তো হবে না, জীবকে, জীবের জীবনকে সব দিক দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।

আমরা ভগবানরই মূর্তি, ভগবান চাইছেন আমি সৃষ্টি করলাম, এই সৃষ্টিকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। শ্রীমা বলছেন, যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই জানেন, সৃষ্টিকে সামলে রাখা কত কঠিন। আমরা বলে থাকি, তাঁর ইচ্ছা হলে এক্ষুণি সব কিছু হাজির হয়ে যেতে পারে। আমরা মনে করি ভগবান একজন ম্যাজিশিয়ান, কিন্তু ভগবান কোন ম্যাজিশিয়ান নন। আমরা এখানে কথা বলছি, হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র আর বাঁশি নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন, ভগবান কোন জাদুকর নন, ভগবান কখনই আমাদের এই ধরণের জাদুখেলা দেখান না। ভক্তরা মনে করে ঠাকুর মা মা করে কাঁদতেন বলে ঠাকুরের মা কালীর দর্শন হয়েছিল, ভক্তরাও তাই ভাবে আমরা এত জপ করছি, এত ঠাকুরকে ডাকছি, কই আমাদের তো ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে না। এগুলো সব মুর্খ ভক্তদের চিন্তা-ভাবনা।

আসলে বলা হয়, ভগবান হলেন সর্বশক্তিমান, তিনি সবারই উপরে। তাঁর ইচ্ছামাত্রই যেমন সৃষ্টি হয়ে গেল, তেমনি তাঁর ইচ্ছামাত্রই এই সৃষ্টির সংহার হয়ে যাবে। তার মানে এই নয় যে, ভগবান হঠাৎ এসে বলবেন, ভারতবর্ষে এখন প্রচুর গোলমাল, দুর্নীতিতে দেশটা গোল্লায় চলে গেছে; চলো দেশটাকে এক্ষুণি শেষ করে দেওয়া যাক। ভগবান কখনই এভাবে কোন কিছুকে নাশ করে দেবেন না। যেটাকে তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এবার সেটাকে তিনিই রক্ষা করেন। কিভাবে রক্ষা করেন? রক্ষা করার জন্য তিনি কি করেন?

মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা, প্রজাপতীন্প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্। বেদ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের কথা বলছেন, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে, যেখানে কাজ করতে হচ্ছে। প্রবৃত্তি মানে কোন একটা কিছুতে মনকে লাগানো; আমরা যেমন বলে থাকি, আমার এই কাজে বা এই জিনিসে প্রবৃত্তি নেই। বেদে একটা ধর্ম হল, যেখানে কোন কিছু করা হয়, সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে, Path of action। হিন্দু ধর্মের প্রথম পথ হল, Path of action, কাজ কর, কাজ করে যাও। তার সাথে বলছেন, *প্রজাপতীন্*, এটা বোঝার জন্য আমাদের একটু পিছনের দিকে যেতে হবে, যদিও এখানে এটা আমাদের বিষয় নয়।

ভগবান ম্যাজিকালী কিছু সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টিতে প্রথম আসে হিরণ্যগর্ভ, যেটা ভগবানের প্রথম রূপ, যাকে আমরা ব্রহ্মাণ্ড বলছি; যেটাকে স্বামীজী দেশ, কাল, নিমিত্ত বলছেন। এই দেশ, কালের যে পর্দা, সেখানে এই ভগবানকে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মা রূপে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ ভগবানেরই তিনটে রূপ। আগেকার দিনে পর্দার পিছনে আলো ফেলে হাত ও আঙুল নাড়িয়ে ছায়ার মাধ্যমে অনেক খেলা দেখানো হত। ভগবান পর্দার পিছনে আছেন, পর্দাটাই হল মায়া, এই পর্দাই প্রকৃতি, এই পর্দাটাই শক্তি। এবার তিনি যে দেখা দিচ্ছেন, এখানে তিনি তিনটে রূপে দেখা দেন– সৃষ্টি কর্তা, পালন কর্তা ও সংহার কর্তা। সৃষ্টি কর্তাকে বলা হয় ব্রহ্মা, পালন কর্তা বিষ্ণু এবং সংহার কর্তা হলেন শিব। এটা দিয়েই বোঝা যায় যে, সৃষ্টিতে একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। সৃষ্টি হঠাৎ দুম্ করে কিছু হয়ে যাচ্ছে না।

বাইবেল বলছেন, Let there be light and there was light, তারপরেই বলছেন, তিনি পৃথিবী তৈরী করলেন, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র সব কিছু তৈরী করলেন। কিন্তু আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এভাবে কিছু হয় না। বেদ বা পুরাণে হিন্দুদের সব শাস্ত্রই দেখিয়ে আসছে যে, সৃষ্টি ম্যাজিকালি কিছু হয় না। খ্রীশ্চানদের সৃষ্টিকে বলে creationist theory। আমাদের সৃষ্টি creationist theoryতে হয় না। শ্রীমাও এক জায়গায় সৃষ্টির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলছেন, চিত্রকার যেমন ছবি বানায়, ভগবান সেভাবে সৃষ্টি করেন না, বীজ থেকে অঙ্কুর, সেখান থেকে যেভাবে গাছ বড় হয়, সৃষ্টি

সেভাবে হয়। চিত্রকর কোন মানুষের ছবি আঁকছেন, তিনি তাঁর খুশী মত প্রথমে হাতটা আঁকতে পারেন বা পা আঁকতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টিতে গাছের ক্ষেত্রে আগে ফল এসে গেল, তারপর গাছ হল, এ রকম কিছু হয় না। তার মানে, যতক্ষণ আমরা এই সৃষ্টিতে আছি ততক্ষণ কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকবে। সৃষ্টির মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে।

ব্রহ্মা যখন বুঝে গেলেন তাঁকে সৃষ্টি করতে হবে, তখন তিনি ধ্যানের গভীরে চলে গেলেন। তপস্যা করে তিনি পুরোপুরি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তাঁর শুদ্ধ পবিত্র মন থেকে চার কুমারের সৃষ্টি হল – সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার। আচার্য এখানে আগে প্রজাপতিদের কথা বলছেন, যদিও পুরাণে এভাবে নেই। আচার্য কেন প্রথমে প্রজাপতিদের নিয়ে আসছেন আমাদের জানা নেই। আচার্য বলছেন, ভগবান প্রথমে প্রজাপতিদের সৃষ্টি করলেন। যাই হোক, ব্রহ্মার শুদ্ধ পবিত্র মন থেকে এই চার কুমারের জন্ম হওয়ার জন্য চারজনেরই মন একেবারে শুদ্ধ পবিত্র।

ভারতবর্ষে এখনও অনেক দম্পতি পাওয়া যাবে, বিয়ের পর তাঁরা যখন সন্তান লাভের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁরা মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিতে থাকেন। ইদানিং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও স্বীকার করছে, অন্তঃসত্ত্বা মায়ের মনে যে ধরণের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে, সেই চিন্তা-ভাবনা গর্ভস্থ সন্তানের উপর ছাপ ফেলে। মনু তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে পরিষ্কার বলছেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে পাওয়া যে সন্তান, এই সন্তানই ঠিক ঠিক সন্তান। স্বামীজীও বলছেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যে সন্তান আসে, এই সন্তানই সমাজের আশীর্বাদ স্বরূপ। কারণ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে মন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় কিনা। এখানেও চারজন কুমার ব্রহ্মার শুদ্ধ পবিত্র মন থেকে সৃষ্টি। এনাদেরও মন তাই শুদ্ধ পবিত্র; এত শুদ্ধ পবিত্র যে তাঁরা জন্ম নিয়েই বলে দিলেন, আমরা সংসারের দিকে যাচ্ছি না। এই কথা বলে তাঁরা কমণ্ডুলু নিয়ে তপস্যায় বেরিয়ে গেলেন। এতে আবার ব্রহ্মা খুব মনঃক্ষুণ্ন হয় গেলেন, আমি সংসার দাঁড় করাতে চাইছিলাম, আর এত কষ্ট করে এদের সৃষ্টি করলাম যাতে আমাকে সৃষ্টির কাজে সহায়তা করে, কিন্তু চারজনের কেউ আমাকে সাহায্য না করে সবাই তপস্যায় বেরিয়ে গেলেন!

ব্রহ্মার ভিতর রাগ উৎপন্ন হওয়াতে ওনার মধ্যে রজো গুণের আধিক্য এসে গেল। রজোগুণ আসাতে শুদ্ধ পবিত্রতা কিছুটা কমে গেল। চব্বিশ ক্যারেট সোনা দিয়ে গয়না হবে না। সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা কাজ করতে চান না, তাঁদেরকে বলা হয় চব্বিশ ক্যারেট সোনা, এনাদের দ্বারা কিছু হবে না। স্বামী প্রেমেশানন্দ খুব মজা করে বলতেন, He is so good, so good that he is good for nothing। সংসারের দিক থেকে ব্রহ্মার প্রথম যে সৃষ্টি সেটাও so good so good কিন্তু good for nothing। জাগতিক দৃষ্টিতে, সাংসারিক দৃষ্টিতে তাঁরা কোন কাজের নন, ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া তাঁরা কিছু জানেন না। আজও তাঁরা সৃষ্টিতে আছেন, আজও তাঁরা সেই প্রথম দিনের মত বাচ্চা কুমার, কিন্তু জ্ঞানে পরিপক্ক। ব্রহ্মা রেগে যাওয়ার পর তাঁর মন থেকে এবার যাঁরা সৃষ্টিতে এলেন, এনাদেরকেই বলা হয় প্রজাপতি।

প্রজাপতিদের মধ্যে যাঁরা খুব উচ্চমার্গের ছিলেন, তাঁরা হলেন সাতজন ঋষি। সপ্তর্ষিতে যে সাতজন ঋষিদের নাম পাওয়া যায়, বিভিন্ন পুরাণে এই নামগুলো পাল্টে যায়। কিন্তু যে সাতজন খুব নামকরা ঋষির নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন মরীচ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু আর বশিষ্ঠ। এখানে বলতে চাইছেন সপ্তর্ষির ঋষিরা সবাই খুব উচ্চমার্গের ঋষি। আচার্য এখানে বলছেন *মরীচাদি*। এখানে এর অতটা গুরুত্ব নেই, কিন্তু আমাদের ঋষিদের নামগুলো জেনে রাখা ভাল। প্রজাপতিদের কাজ হল জগতে সৃষ্টির প্রসার করা, কিন্তু নারীরা কোথা থাকে আসছেন সেই ব্যাপারে কিছু বলা নেই। তবে এনারাও সবাই ধ্যানের মাধ্যমেই সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। প্রজাপতিদের অনেক সন্তানাদি হল, অন্য সপ্ত ঋষিরা আছেন, তাঁদেরও বিবাহ হল। ব্রহ্মা দেখছেন ধ্যানের মাধ্যমে সৃষ্টি খুব মন্থর ভাবে এগোচ্ছে; এভাবে ধ্যানের মাধ্যমে মন দিয়ে সৃষ্টি করলে সৃষ্টি এগোবে না। তখন তিনি নারী ও

পুরুষ রূপে নিজেকে বিভাজন করে দিলেন। ব্রহ্মার বিভাজনে এলেন মনু ও শতরূপা। সেই থেকে প্রজনন ক্রিয়া দিয়ে সৃষ্টি শুরু হল। এরপর ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি ছেয়ে গেল।

এখানে এত যা কিছু বলা হল, এগুলো বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আচার্য বলছেন, যখন সৃষ্টি হয় তখন মরীচাদি, যাঁরা প্রজাপতি, তাঁদেরকে ভগবান কর্ম করা শেখালেন। আর তার সাথে আচার্য বলছেন, *ততোঽন্যাঞ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য, নিবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস*, তারপর ভগবান সনক সনাতনাদিকে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দিলেন। নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম সম্বন্ধে বলছেন, *জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং*, এই ধর্মে জ্ঞান আর বৈরাগ্য রয়েছে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম দিয়েও জ্ঞান বৈরাগ্য হয়, আমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন ওঠে, সংসারে কি আমাদের কিছু হবে না? কেন হবে না, গীতা শুরুই করছে প্রবৃত্তি দিয়ে। ঋষিরা সবাই প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মে ছিলেন। ঈশোপনিষদে প্রথম মন্ত্রটাই হল সন্ন্যাসীদের জন্য, দ্বিতীয় মন্ত্র যাঁরা সংসারে আছেন তাঁদের জন্য। সংসার মানে, যেখানে মানুষ কাজ করে এগোতে চাইছে, তাদের জন্য প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। এখানে বলছেন, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, এই দুটি ধর্ম ভগবান নিজেই শেখালেন তাঁর দুই ধরণের সন্তানদেরকে, সনক সনন্দনাদি আর মরীচাদিদের। এই কথা বলার পর আচার্য বলছেন –

দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চং জগতঃ স্থিতি কারণম্। প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্মো ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিরাশ্রমিভিশ্চ শ্রেয়োর্থিভির্নুষ্ঠীয়মানঃ। দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাৎ হীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেন অধর্মেণ অভিভূয়মানে ধর্মে প্রবর্ধমানে চ অধর্মে, জগতঃ স্থিতিং পরিপিপালয়িষুঃ স আদিকর্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য চাভিরক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাৎ অংশেন কৃষ্ণঃ কিল্ সম্বভূব। ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্মঃ, তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদনাম্।

দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ, এই লাইনটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কথাগুলো আমাদের মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু এর ভাবটাকে আমাদের মনের মধ্যে বসিয়ে নিতে হবে। বেদের যে ধর্ম, অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, দুটোকেই সমান ভাবে গুরুত্ব দেয়। বিশ্বে একমাত্র হিন্দু ধর্মই দুটো ধর্মকে সমান গুরুত্ব দেয়, অন্য কোন ধর্ম এভাবে দুটোকে সমান ভাবে গুরুত্ব দেয় না। যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম পুরোপুরি বৈরাগ্যের ধর্ম, সন্ন্যাসীর ধর্ম। যদিও খ্রীশ্চানরা বিশ্বে ধর্মের নামে বেশী লুটপাট করেছে। ভগবান বুদ্ধের ধর্মও সন্ন্যাসীর ধর্ম। অন্য দিকে জুহুদিদের ধর্ম পুরোপুরি গৃহস্থ ধর্ম, তাদের সন্ন্যাসের কোন ধারণাই নেই। পার্সীদের ধর্মেও সন্ন্যাসের কোন ধারণা নেই। একমাত্র হিন্দু ধর্মে দুটোকেই আদর্শ রূপে নেওয়া হয়েছে, আদর্শ গৃহস্থ ধর্ম এবং আদর্শ সন্ন্যাসের ধর্ম, দুটো প্রথম থেকেই চলে আসছে। আচার্য শঙ্কর তাই পরিষ্কার বলছেন, বেদের ধর্ম এই দুই প্রকার – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম। যাঁরা সন্ন্যাসী তাঁরা নিবৃত্তির পথ অবলম্বন করেন। নিবৃত্তি পথের লক্ষণ হল –জ্ঞান ও বৈরাগ্য। এই জ্ঞান মানে ঈশ্বরের জ্ঞান, ফিজিক্স কেমেস্ট্রি, ইতিহাসের জ্ঞান না। সংসারীদের ধর্ম প্রবৃত্তিলক্ষণ, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বলে তুমি কাজ কর, কর্মেই তুমি প্রবৃত্ত হও।

এরপর আচার্য ধর্মকে পরিভাষিত করছেন। জগতের যখন স্থিতি হয়, *জগতঃ স্থিতি কারণম্* আর তার সাথে বলছেন *প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্মো*, ধর্ম মানে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স। যে ধর্ম শুধু জাগতিক উত্থানের কথা বলে, সেই ধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম না, অসম্পূর্ণ ধর্ম কখনই ঠিক ঠিক ধর্ম হতে পারে না। অন্য দিকে যে ধর্ম শুধু ত্যাগের কথাই বলে, সেই ধর্মও সম্পূর্ণ ধর্ম নয়, ঠিক ধর্ম নয়। ঠিক ঠিক ধর্ম দুটোরই কথা বলবে, সংসার-ধর্মের কথাও বলবে, এবং ত্যাগের কথাও বলবে। কারণ প্রকৃত ত্যাগীর সংখ্যা খুব কম হয়। ত্যাগীরাও সংসারীদের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্করাচার্যের কোন চাষের জমি ছিল না, চাষবাশ করতেও জানতেন না, খাওয়ার জন্য ভিক্ষা

করতে হবে। ভিক্ষা মানে, তাঁকে গৃহস্থের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। গৃহস্থ ধর্মের উপরেই সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিরাশ্রমিভিশ্চ শ্রেয়োর্থিভির্নুষ্ঠীয়মানঃ, বলছেন সমাজে যাঁরা আছেন, যদি তাঁরা চান আমি ভাল হব, যদি তুমি তোমার ভাল চাও। হিন্দুরা কাউকে জোর করেন না, সেইজন্য হিন্দুরা ধর্মান্তরণ করে না। বলছেন, সমাজে যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ তাঁরা সমাজে এই ধর্মটাকে ধরে রাখেন। যাঁরা ধর্মকে ধরে রাখতেন, তাঁদের বলা হত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বর্ণকে এখানে শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলতে চাইছেন না, আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানে বিচরণ করেন, ঈশ্বরের জ্ঞানে যাঁরা সব সময় ডুবে আছেন। আমরা 'পাণ্ডা' শব্দটা শুনে থাকি, 'পাণ্ডা' শব্দের অর্থ হল, *আত্মবিষয়ক ধৃতি এষা তে পাণ্ডা*। পণ্ডিত বা পাণ্ডা কে? আত্মবিষয়ে যাঁর বুদ্ধি আছে। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে যাঁরা ধরে রাখেন, তাঁরাই ব্রাহ্মণ। মনুস্মৃতিতে অনেকবার বলা হচ্ছে, যার বেদের বোধে ডুবে নেই, যাঁরা বেদরূপী আচরণ করেন না, তাঁরা ব্রাহ্মণ না।

বর্ণাশ্রমের উপর পরে আরও বিস্তারে আলোচনা করা হবে। এখানে সংক্ষেপে হল, আমাদের মনে রাখতে হবে আচার্য শঙ্কর ছিলেন অষ্টম শতাব্দীতে, আমরা বার'শ বছর আগেকার শাস্ত্র পড়ছি। যখন অবতাররা আসেন, বড় আচার্যরা যখন আসেন, তাঁরা কোন কিছু ভাঙতে আসেন না। আজকে আমরা রাস্থায় নেমে বলতে পারি, সমাজের এই ভুল, সেই ভুল। আজকে লোকেরা মনুস্মৃতি না পড়েই জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আবার বলে, যে শাস্ত্রে নারী ও শূদ্রকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, সেটাকে কিনা অধ্যয়ন করা হয়! কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় মনু কোন শ্লোকে নারী ও শূদ্রকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন দেখান তো? কোথাও মনু এই ধরণের কথা বলছেন না, দুম্ করে না পড়ে একটা কথা বলে দিল। এইসব মিথ্যাকে আশ্রয় করে বুদ্ধিজীবীরাও চেঁচিয়ে যাচ্ছে, সব ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও। তাহলে রাখব কি? কিছু রাখতে হবে না, সব ভেঙে সমান করে দাও। কিন্তু অবতাররা কক্ষণ কিছু ভাঙবেন না।

একটা কোন ব্যাপারে স্বামীজী আপত্তি করাতে, শ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীকে বলছেন, বাবা, ঠাকুর ভাঙতে আসেননি, গড়তে এসেছেন। যিনি ঠিক ঠিক গড়েন, তিনি কক্ষণ কোন কিছু ভাঙবেন না। যে কোন মানুষ যখন revoltএর কথা বলে, বুঝে নিতে হবে সে একজন অসফল ব্যক্তিত্বের মানুষ। যে আরও বড় অসফল পুরুষ সে আগাম revoltএর স্বপ্ন দেখে, একদিন সব মিশে যাবে, তখন আমি রাজা হব। কোন কারণে যদি একবার রাজা হয়ে যায়, যেমন মাও সে তুং হয়েছিল, তারপর নিজের দেশের যে কি করবে নিজেই জানে না। একটা যুদ্ধে যত লোক মারা যায়, তার থেকে ঢের বেশী লোক মারা গেছে একটি মাত্র লোক, স্ট্যালিনের হাতে।

আচার্যরা কক্ষণ কোন কিছু ভাঙবেন না, সমাজ নিজের গতিতে চলছে, নিজের মত চলবে। যেটা সমাজের জন্য মঙ্গল, সেটাকে নিয়ে তিনি এগিয়ে যান। আজকের দিনে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা যেভাবে সম্মান করছি, ঠিক সেভাবে তখন সবাই ব্রাহ্মণকে সম্মান করত। ব্রাহ্মণরাও সম্মান রক্ষার জন্য বিদ্যাচর্চাতে নিজেদের পুরোপুরি ঢেলে দিতেন, তাঁর থেকেও বেশী ছিল, সবাই ধর্মচর্চা করতেন। আজকালকার দিনে ব্রাহ্মণ বলে কিছু নেই। স্বামীজী বলছেন, ঠাকুর আসার পর সত্যযুগের শুরু। সত্যযুগ মানে একটি বর্ণ, সবাই ব্রাহ্মণ; হয় সবাইকে বলতে হবে ব্রাহ্মণ, না হলে বলতে হবে সবাই শূদ্র। আমরা কি চাইছি সেটা দেখতে হবে। আগেকার দিনে শূদ্র বলতে যা বোঝাত, সেটা কি আমরা হতে চাই? না, সবাই ব্রাহ্মণ হতে চাই? চরিত্রের দিক দিয়ে দেখলে ব্রাহ্মণদের দ্বারাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে, ব্রাহ্মণ মানেই তাই। আচার্য বলছেন, ভগবান সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে তিনি তাতে ধর্ম প্রদান করলেন। এই ধর্মের যাতে নাশ না হয়ে যায়, তাই ধর্মরক্ষা ও ধর্মকে মানুষের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ ব্রাহ্মণদের হাতে দিলেন।

বিষয় থেকে সরে গিয়ে আমাকে কয়েকটা কথা বলা নিতে হচ্ছে, যা কিনা এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক। এরপরেই আচার্য অবতার তত্ত্ব, অবতার কেন আসেন, এই নিয়ে বলবেন। সেখানে আচার্য বলবেন, ধর্ম রক্ষা এবং ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত, তাঁদের রক্ষা করার জন্য। ঠাকুরও এই ধর্মকে রক্ষা করতেই এলেন। স্বামীজী হলেন তাঁর মুখপাত্র বা প্রধান সেনাপতি। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, তার সাথে ব্রহ্মবিদ্যা, কিভাবে এই জিনিসগুলি রক্ষিত থাকবে, ঠাকুর সেটা দেখিয়ে গেলেন। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল ব্রহ্মবিদ্যা বা জীবনমুক্তির বিদ্যা, গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে যার উপর বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। স্বামীজী বলে দিলেন, এই ব্রহ্মবিদ্যাকে রক্ষা করতে হবে। ব্রহ্মবিদ্যা রয়েছে একমাত্র হিন্দুদের কাছে, তাই আগে হিন্দুদের রক্ষা করতে হবে। হিন্দুরা মূলতঃ বাস করে ভারতে, তাই ভারতকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করতে হবে। স্বামীজীর বাণী ও রচনার দশটি খণ্ডে এই কটি জিনিসই পুরো ছেয়ে আছে –ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দু আর ভারতবর্ষ, চতুর্থ আর কিছু নেই। এই তিনটির অবস্থা যখন সঙ্কুচিত হয়ে যেতে থাকে, তখনই অবতার আসেন; একটু পরে আচার্য এর উপর বলবেন। সেইজন্য স্বামীজী তাঁর লেকচারে, রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা খুব কম বলেছেন, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা, হিন্দু ও ভারতবর্ষ, মূল এই তিনটের উপর বেশী জোর দিয়েছেন।

একটা সময় স্বামীজীর চিন্তার জগতে একটা জিনিস ঘুরপাক খাচ্ছিল, তিনি দেখলেন, এই ব্রহ্মবিদ্যা একদিন নষ্ট হয়ে যাবে, কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ, বাণী ও রচনা একদিন হারিয়ে যাবে। সেই সময় আমেরিকাতে স্বামীজী মিসেস লজেটের বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। স্বামীজী একদিন হঠাৎ তাঁকে বললেন, আমার মনে এখন একটা temptation এসেছে। মিসেস লজেট ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, Who is she?। স্বামীজী বলছেন, it is not She, it is an organisation। বলার পরই তিনি খুব নামকরা কথা বলছেন, আমি জানি প্রত্যেক নূতন সম্প্রদায়, নূতন সংগঠন নূতন ধরণের সমস্যা সৃষ্টি করে, কিন্তু আমার কোন উপায় নেই, আমাকে একটা organisation করতেই হবে এই ব্রহ্মবিদ্যাকে রক্ষা করার জন্য। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বীজ স্বামীজী সযত্নে মনের মধ্যে প্রতিপালন করতে থাকলেন, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা, এই হল রামকৃষ্ণ মিশনের সূত্রপাত।

রামকৃষ্ণ মিশন বলছে, *আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ*, *আত্মনোমোক্ষার্থং* মানে নিঃশ্রেয়স, *জগদ্ধিতায়* মানে অভ্যুদয়। বেদের সময় থেকে যে ধর্মের কথা বলে আসছে, আচার্য শঙ্কর যার কথা বলছেন, ঠাকুর এসে যার শিক্ষা দিলেন, স্বামীজীও যার শিক্ষা দিলেন ও প্রচার করলেন, এটা যেন হেলাফেলায় নষ্ট না হয়ে যায়, খেলো না হয়ে যায়। এটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য স্বামীজী এই বিদ্যা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের দিয়ে বলে দিলেন, তোমরা এটাকে ধরে রাখো। রামকৃষ্ণ মিশনের কেবলমাত্র *জগদ্ধিতায়* কাজ নয়, শুধু মানুষকে বলে দেওয়া। রামকৃষ্ণ মিশনের আসল লক্ষ্য হল *আত্মনোমোক্ষার্থং*, এটাই প্রধান কাজ, এটারই শিক্ষা দাও।

এই কাজটাই আগেকার দিনে ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণরা ত্যাগ তপস্যা নিয়ে থাকবেন, ভোগের দিকে যাবেন না, সঞ্চয় করবেন না, সমাজের মঙ্গলের জন্য ধর্মের প্রচার প্রসার করবেন। এই কাজটাই বর্তমান যুগে এসে ব্রাহ্মণদের থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সন্ন্যাসীদের কাছে চলে গেছে। শুধু রামকৃষ্ণ মিশন না, ভারতের যেখানেই সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসীদের দেখতে পাওয়া যায়, তাঁরা সবাই এই কাজটাই করছেন। আচার্য এটাই বলছেন, কল্যাণকামী যাঁরা, যাঁরা নিজের মঙ্গল চায়, তাঁরাই এই ধর্ম পালন করেন। তাহলে দেশের সর্বত্র যারা আমাদের দাবী মানতে হবে বলে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, আন্দোলন করছে, ইনক্লাব জিন্দাবাদ করে যাচ্ছে, এরা কি কেউ নিজের মঙ্গল চাইছে না? আসলে ওরা কি চাইছে কেউ বুঝতে পারছে না। বাচ্চার কথা বাচ্চা বোঝে না, বাচ্চার মা ভাল বোঝে। বাচ্চার ভাল কিসে হবে মা জানে, বাচ্চা জানে না। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা সমাজের মা, তাঁরাই

বুঝতে পারছেন না, এরা কি চাইছে। তবে এটুকু আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, নিজের বিনাশ আর অপরের বিনাশ ছাড়া এরা কিছুই চায় না।

হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য যে কোন ধর্মে কি হয়, সেই ধর্মে একজন প্রফেট এলেন, এসে একটা কিছু বলে দিয়ে চলে গেলেন, সেটাই যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে, এখনও চলছে। জুহুদিদের ধর্মে একটু সামান্য তফাৎ আছে, এদের ধর্মে প্রফেট আছেন, কিন্তু ওদের প্রফেট আমাদের এখানকার ভগবানের মত নন। জুহুদিদের ঠিক ঠিক প্রফেট হলেন এ্যব্রাহাম। ওদের প্রফেট মানে হয় শিক্ষক। যীশুকেও প্রথমের দিকে ওনারা যে প্রফেট বলতেন, তখনও প্রফেট ছিল শিক্ষকের অর্থে। মুসলমানরা প্রফেটকে ভগবানের দূত রূপে দেখে। জুহুদিদের একবার যিনি প্রফেট হয়ে এলেন, তাঁর শিক্ষাকে পরে একটু ডান দিক বাম দিক করা হয়। জুহুদি বাদে প্রত্যেকটি ধর্ম একজনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। জৈন ধর্মে পরম্পরা আছে, তাদের চব্বিশজন জিন ছিলেন। হিন্দুরা জানে, এটা কখনই হতে পারে না। প্রফেটের কথা বাদ দিন, স্বয়ং ভগবান যদি সাক্ষাৎ এসে যা যা শিক্ষা দিয়ে যাবেন, দেখা যাবে তাও ওই শিক্ষা স্থায়ী রূপে থাকবে না। কালের নিয়মে ওর মধ্যে আবরণ পড়বেই। প্রত্যেকটি ধর্মের এই সমস্যা আছে। হিন্দুদের নিয়ে প্রায়ই বিদ্রূপের ছলে বলা হয়, হিন্দুদের এত এত অবতার কেন, তোমাদের ধর্মের এত গ্লানি কেন?

অবতার যখন আসেন, তিনি প্রবৃত্তিলক্ষণ আর নিবৃত্তিলক্ষণ দুটো ধর্মেরই শিক্ষা দেন। জুহুদি ধর্মের যা কিছু শিক্ষা তা হল, জীবনযাত্রাটা কেমন হবে, শুধু এই নিয়ে। কিন্তু যেটা নিউ টেস্টামেন্ট, পরে খ্রীশ্চানরা নূতন যে বাইবেলকে অনুসরণ করে, সেটা হল পুরো বেদান্ত। কিন্তু ওরা এগুলো শুধু মুখে বলে, আসলে ওদের সব কিছু শিক্ষার কেন্দ্র হল – জীবনধারা। ইসলামও পুরোপুরি জীবনধারা কেমন হবে, সেটাকে নিয়েই চলে। যে ধর্ম জীবনধারা নিয়ে চলে, সেই ধর্মকে বেশী ডান দিক বাম দিক করতে হয় না। শুধু interpretation করে দিলেই হল, যেমন ইসলামে যেমন করা হয়, ওরা বলে ফতোয়া। প্রফেট মহম্মদ কি করেছিলেন, কোরানে কি আছে, হাদিসে কি আছে, এগুলোকে দেখে একটা ফতোয়া দিয়ে দেয়, আর এখানেই ধর্ম শেষ।

হিন্দুরা হল আধ্যাত্মিক জগতের রাজা, আধ্যাত্মিক রাজার দু-পয়সায় কাজ চলবে না। রাজা এমনি চলে না, সঙ্গে তার চার-পাঁচজন মন্ত্রী ও আমলা থাকে। প্রধানমন্ত্রী এলে আগে পিছনে চল্লিশটা গাড়ি থাকে, আমি আপনি রাস্থায় চললে কেউ টেরও পাবে না। প্রধানমন্ত্রী কোন রাজ্যে গেলে পুরো রাজ্য জেনে যাবে প্রধানমন্ত্রী এসেছেন। হিন্দুরা হল আধ্যাত্মিক জগতের রাজা, একটু ডান দিক বাম দিক চলে না। হিন্দু ধর্ম হল ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপহার এই জগতের জন্য। এটা আমার আপনার কথা না, স্বামীজী বলছেন। স্বামীজী বলছেন, জগৎ থেকে হিন্দু ধর্মকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে জগতের যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা; যে বিদ্যার দ্বারা মানুষ জেনে যায় আমি সেই শুদ্ধ চৈতন্যের সাথে এক, আমিই সেই ব্রহ্ম, এই বিদ্যাটা চিরতরে হারিয়ে যাবে। অন্য কোন ধর্ম এই কথা বলে না যে, আমি ঈশ্বরের সাথে এক, আমিই সেই শুদ্ধ আত্মা। বৌদ্ধরা কোন দিন বলবে না যে, আমিও যা বুদ্ধও তাই; কোন খ্রীশ্চান বলবে না, আমি যা যীশু খ্রীষ্টও তাই। আর মুসলমানরা আল্লার কথা ছেড়েই দিন, মহম্মদের সঙ্গেও এক করবে না। ব্রহ্মবিদ্যা কোন থিয়োরী না, কারুর মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে সেটাকে বলছে, একেবারেই তা না। এই সত্যকে একমাত্র হিন্দু জাতি ধরে রেখেছে। এই বিদ্যাকে ধরে রাখার জন্যই ভগবানকে এখানে বার বার আসতে হয়।

আচার্য বলছেন, *দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাৎ হীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেন অধর্মেণ অভিভূয়মানে ধর্মে প্রবর্ধমানে চ অধর্মে*। আচার্যের কী অপূর্ব কথা, বলছেন, ধর্ম যত ভালই হোক, এই ধর্ম যারা অনেক দিন ধরে পালন করে আসছে, ধীরে ধীরে তাদের মনে কামনা-বাসনা জন্ম নেয়, সেখান থেকে লোভ আসে, কারণ সবাই তাকে সম্মান করছে, লোকেরা সম্মান করছে বলে

মনে করে এই সম্মানে আমার অধিকার। এরপর তার যোগ্যতা থাকুক না থাকুক, তারা চাইবে আমি যেন আমার সম্মান থেকে বঞ্চিত না হই। আজকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কত সম্মান, কারণ রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে ঠাকুর জড়িয়ে আছেন, স্বামীজীর মত মানুষ ছিলেন বলে। সব সন্ন্যাসীরা তাঁদের ধারে কাছেই নেই। কিন্তু এইভাবে সম্মান পেতে পেতে তাঁদের একটা ক্ষমতা হয়ে যায়, এবং ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে অনেক রকম কামনাও বেড়ে যায়। হিন্দুদের কোন মন্দিরে গেলে যে পাণ্ডাদের দেখা যায়, এদের মধ্যেও ঠিক একই জিনিস দেখা যায়।

আমরা মন্দিরে কেন যাই? আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে বলেই যাই। কোন এক সাধক হয়ত সেখানে ছিলেন যিনি ওখানে সাধনা করেছিলেন, বা কোন এক ঋষি হয়ত ছিলেন, তাঁদের ত্যাগ তপস্যার জোরে যে পবিত্রতা এসেছে, সেই টানেই আমরা যাচ্ছি। কিন্তু বর্তমানে ওই মন্দিরের দায়ীত্বে যারা আছে, তাদের মধ্যে ওই ক্ষমতাটা নেই। কারণ কালের নিয়মে তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি নীচে চলে গেছে, অন্য দিকে কাম-বাসনা বেড়ে গেছে। ধর্মের এই নিম্নমুখিতা প্রত্যেক ধর্মে হবেই হবে। যে অবতারই এসে থাকুন না কেন, শ্রীরামচন্দ্রই আসুন, শ্রীকৃষ্ণ আসুন, ভগবান বুদ্ধ আসুন, শ্রীরামকৃষ্ণই আসুন, কোন ধর্ম, কোন অবতারের কথা, কোন শাস্ত্র শাশ্বত হবে না। কেন বেদও তো শাশ্বত? কিন্তু তা না, আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখায়।

একটা জিনিস ভাবলেই অবাক লাগে, স্বামীজী যে সময় আমেরিকায় গেলেন, সেই সময় ভারতে ও ভারতের বাইরে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদেরকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করত। ভারত এক পরাধীন দেশ, ইংরেজদের বুটের তলায় আমরা পড়ে আছি। সেই ভারতের মাটি থেকে, সেই হিন্দু ধর্মের একজন প্রতিনিধি রূপে স্বামীজী আবির্ভূত হলেন। সেদিন থেকেই স্বামীজী আমেরিকায় সম্মান পেলেন, কত বিদেশীরা স্বামীজীর শিষ্য হলেন। স্বামীজীর কাজে হাত লাগাবার জন্য তাঁরা অনেকে ভারতেও এলেন। আজকেও স্বামীজীর কথা পড়ে দেশ বিদেশ থেকে সব ছেড়ে কত যুবক বেলুড় মঠে চলে আসছে শুধু সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য। শুধু হিন্দু ধর্ম থেকেই না, খ্রীশ্চানরা আসছে, মুসলিম ধর্ম থেকেও কেউ কেউ আসছে, অন্যান্য ধর্ম থেকেও আসছে। বিদেশে বিখ্যাত সব ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করা, পোস্ট ডক্টরেট করা ইয়ং ছেলেরা বিদেশে নামকরা ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসারী করা ছেড়ে বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী হতে চলে আসছেন। স্বামীজীর এমন শক্তি যে, এই ধরণের লোকেরা নামযশ, অর্থ সব ছেড়ে চলে আসছেন ভিক্ষাপাত্র তুলে নিতে।

অন্য দিকে বর্তমান হিন্দু ধর্মের দিকে তাকিয়ে দেখুন, সবাই এসে হিন্দু ধর্মকে পদাঘাত করে যাচ্ছে। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যত না এসে হিন্দুদের গালাগাল দিচ্ছে, তার চাইতে বেশি হিন্দুরাই বেশি হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করছে, হিন্দু ধর্মকে নিয়ে হাসাহাসি করছে; আজ হিন্দুরাই নিজেদের হিন্দু বলতে লজ্জা পায়। এখন আবার একটা নূতন শব্দ এসেছে, আমরা সবাই সেকুলার। হিন্দুরা হয় নিজেকে বেদান্তী বলবে, নয় সনাতনী বলবে, আর এখন বলছে সেকুলার, কারণ নিজেকে হিন্দু বলতে লজ্জা পায়। কিন্তু বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা কি বীরদর্পের সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেখানেই যান সেখানেই তাঁরা সম্মান পান। কেন সন্ন্যাসীদের এত সম্মান? একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের জন্য।

কিন্তু হিন্দু ধর্মের নামে এত নিন্দাবাদ, হাসাহাসি করছে কেন? কারণ আমরা নিজেরা হিন্দু ধর্ম নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারে পালন করছি না। আজকে যদি কেউ আধ্যাত্মিকতায় মহৎ হয়, নৈতিকতায় যদি স্বচ্ছ হয়, আর্থিক ভাবে যদি সমৃদ্ধ হয়, মনের দিক দিয়ে যদি বীর হয়, লোকেরা তাঁকে দেখেই বলবে, আমি হিন্দু হতে চাই। আমার যদি এই রকম দম থাকে, তাহলে লোকেরা নিজে থেকেই এসে বলবে, আমি আপনার মত হতে চাই। আজ কেন আমাদের মধ্যে সেই দম নেই? কারণ, এটাই আচার্য বলছেন, *দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৃণাং*, দীর্ঘকাল ব্যাপী এর অনুষ্ঠান হতে হতে জিনিসটার মধ্যে ঘুন ধরে গেছে। এই অবস্থা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। হিন্দু ধর্মে মাঝে মাঝে

অবতাররা আসেন বলে ধর্মটা এবার উপরে উঠে আসে। অন্যান্য ধর্মগুলিকে নিয়ে এই ব্যাপারে আলোচনা না করাই ভাল। ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তি একমাত্র হিন্দু ধর্মেই রয়েছে।

আচার্য বলছেন, একদিকে ধর্ম অন্য দিকে কাম। ভগবান ধর্মের স্থাপন করে দিয়ে গেলেন, বেদ রেখে দিলেন, ব্রাহ্মণদের সেই বেদ সংরক্ষণের দায়ীত্ব দিলেন। কিন্তু যে ব্রাহ্মণরা ধর্মকে আধার করে বেদের প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, ধীরে ধীরে সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঢুকে গেল কামনা-বাসনা। ফলস্বরূপ অধর্ম বেড়ে গেল। যেদিন থেকে আমরা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবানের কথা শুনলাম –*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত*, সেই থেকে আমরা মনে করছি অসুরদের মারার জন্য ভগবান অবতার হয়ে আসেন। কিন্তু অসুরদের মারার জন্য ভগবান কখনই আসেন না। ভগবান আসেন এটার জন্য, যার কথা আমরা এতক্ষণ বললাম।

এই যে দুটি ধর্ম, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, একদিকে জ্ঞান, বৈরাগ্যের ধর্ম আর অন্য দিকে কর্মের ধর্ম, এই দুটো ধর্ম করতে করতে মানুষের মধ্যে লোভের জন্ম হয়, কামনা-বাসনার বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমন হয়। ঋষিদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, ঋষিরা কাজ করতেন, লোভ করতেন না। আমরা এখন কাজ করি না, লোভ করি। সবাই এখন বলছে, সরকার ভরতুকি কেন দিচ্ছে না, চাকরি কেন দিচ্ছে না। যারা এসব কথা বলে, তারা নিজেরা কি কোন কাজ করছে? সবারই অভিযোগ আর অভিযোগ, ব্যাঙ্কের সুদ কেন কমে যাচ্ছে, রেশনের বরাদ্দ কেন কম করে দিচ্ছে। সবাই চাইছে, আমি বসে থাকব, কিন্তু টাকাটা যেন আমার ব্যাঙ্কে ঢুকে যায়। টাকার সাথে আমার যেন সব রকমের সুখ সুবিধা এসে যায়। আমি ভোট দিয়েছি, ভোট দিয়ে আমি আপনাকে রাজা করে দিয়েছি, এরপর আমাকে কেন কাজ করতে বলছেন?

অন্য দিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাবাজীদের দিকে তাকান, তাদের লাইফস্টাইল, সম্পত্তির বহর দেখলে ভিরমি খেয়ে যেতে হবে। এই বাবাজীর শত কোটি, ওই বাবাজীর হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি। ট্রাস্ট করে রেখেছে, দেখাচ্ছে নিজের কাছে একটা পয়সা নেই। এই হল তাদের বৈরাগ্য। আর জ্ঞান? ইউটিউব, টিভি চ্যানেলে জ্ঞান বিতরণ করে যাচ্ছে। আর ভারতের লোকেরা এত মুর্খ হয়ে গেছে যে, ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পুরুষকে চিনতে পারছে না! এইভাবেই ধর্ম নাশের দিকে চলে যায়। ধর্ম এই রকম অবস্থা নেমে গেলে তখন ভগবান অবতার হয়ে আসেন। কিভাবে আসেন?

জগতঃ স্থিতিং পরিপিপালয়িষুঃ, তিনি জগতের সৃষ্টি করেছেন কিনা, তাই জগতের পরিপালনের হেতু তিনি একটা রূপ নিয়ে এসে যান। *স আদিকর্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুঃ*, তাঁকে নারায়ণ নামে ডাকা হয়। 'নারায়ণ' শব্দের অনেক অর্থ হয়, যার মূল একটা অর্থ হল, সৃষ্টির যেটা আদি, সেটাকে জলের সাথে তুলনা করা হয় এবং বলা হয় 'নার'। আগে বলা হল, তিনি সৃষ্টির পারে, আর এখন বলা হচ্ছে তিনি সেই নারের উপর শয়ন করে আছেন, সেইজন্য তাঁর নাম হল 'নারায়ণ'। আবার আরেকটা অর্থে বলা হয়, 'নর' মানে মানুষ, সেই মানুষের ভিতরে যিনি আছেন, সেখান থেকে তাঁকে বলা হয় 'নারায়ণ'।

বিষ্ণুরও অনেক অর্থ করা হয়। বিষ্ণু 'বিশ' ধাতু থেকে, বিশ ধাতু তালব্য 'শ' দিয়েও হয়, আবার মূর্ধণ্য 'ষ' দিয়েও হয়। যখন মূর্ধণ্য 'ষ' দিয়ে হয়, তখন তার অর্থ সমস্ত কিছুতে ছেয়ে থাকা। আর যখন ধাতু তালব্য 'শ' দিয়ে হয় তখন অর্থ হয়, যিনি ভিতরে অবস্থিত। সাধারণ ভাবে বিষ্ণু অর্থ, ভিতরে ঢুকে আছেন এই অর্থে হয়। তার মানে, আমার ভিতর, তোমার ভিতর, অতি সাধারণ যারা, সবার ভিতর সেই বিষ্ণু, সেই ভগবান ঢুকে আছেন। সেই নারায়ণ হলেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনি সব জায়গায় আছেন, আবার তিনিই সমস্ত প্রাণীর ভিতরে প্রবেশ করে আছেন।

তার সাথে বলছেন, *ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য চাভিরক্ষণার্থং*, ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করার জন্য তিনি অবতার হয়ে আসেন। অবতার কেন আসেন, এই প্রশ্নের এটাই উত্তর, ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করার জন্য। অবতার তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা শুনেছি, অনেক আলোচনা করেছি, ভবিষ্যতেও অবতার তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা হবে, এর উপর অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেবেন। কিন্তু আচার্য খুব সহজ ভাষায়, অত্যন্ত সহজ ভাবে বলছেন, অবতার আসেন এই জন্য – ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করার জন। ব্রাহ্মণত্ব কি? যেটা আগে এতক্ষণ ধরে বলা হল, দ্বিবিধ ধর্ম – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম, এটাই ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণদের কাজ হল এই ব্রাহ্মণত্বকে রক্ষা করা, অর্থাৎ প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকে রক্ষা করা। ব্রাহ্মণ হল সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ মানে অবশ্যই আধ্যাত্মিক পুরুষ।

বলছেন, *ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্ব চাভিরক্ষণার্থং*, ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, যে কোন রূপে বা ভাবেই আসুন, তিনি দূত পাঠান অবতার রূপে, সন্তান পাঠান যীশু রূপে, স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ হয়ে সন্ত রূপে আসুন, কপিল মুনি হয়ে আসুন, শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে আসুন, যে রূপেই ভগবান আসুন, তাঁর কাজ একটাই – *ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য চাভিরক্ষণার্থং*, ব্রাহ্মণের যে ভাব, এটাকে রক্ষা করার জন্য। এখানে ব্রাহ্মণ বলতে জাতি, বর্ণের মধ্যে যেতে হবে না, এখানে ব্রাহ্মণ তিনি, যাঁর ভিতর থেকে পুরো আধ্যাত্মিক ভাব বেরিয়ে আসছে; যাঁকে দেখে মানুষ আকর্ষিত হয়ে তাঁর কাছে ধর্মের কথা শুনতে চাইছে।

কেউ যদি এসে বলে, আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, আমি জীবনমুক্ত, এটাকে অপ্রমাণিত করার কোন উপায় নেই। ফলে প্রচুর ভেক বাবাজীর সমাজের মাঝখানে আবির্ভাব হয়ে যায়। নকল বাবাজী এসে যাওয়া মানেই হল, আসলটা আছে। কেন আসলটা আছে? খবরের কাগজের দৌলতে আমরা জানি ভারতে প্রচুর নকল টাকা চলে। কাগজে প্রায়ই দেখা যায়, এত এত নকল দু হাজার নোট ধরা পড়েছে। কোন দিন খবরে দেখা যায় না, নকল ডলার ধরা পড়েছে। কিংবা কোন দিন শোনা যায় না, পাকিস্থানি টাকা, বাংলাদেশী টাকা বা পাউণ্ড নকল হচ্ছে। কিন্তু নকল টাকার প্রচুর খবর পাওয়া যায়, কারণ এখানে আসল টাকা আছে। যেখানেই fraud, যেখানেই fake দেখা যাবে, বুঝতে হবে এখানে আসলটাও আছে। দু নম্বরী যেখানে আছে, তার মানে বুঝে নিতে হবে এখানে এক নম্বরী বাজার আছে বলেই দু নম্বরী চলছে। যখন বাবাজীরা টাকা আয় করছে, লোকেরা বোকা বনছে, তার মানে এখানে আসল বাবাজীরা আছেন। ভারতের মাটিতেই একমাত্র fraudগিরি চলে, অন্য দেশে চলে না। কারণ তাদের আসলটা নেই বলে নকলটাও নেই। এখানে আসলটা আছে বলে নকলটা আছে। আসল কিছু থাকলে তবেই তো নকল হবে। পাকিস্থান, বাংলাদেশে কেন fraudগিরি হয় না, ওখানে আসলটাই নেই তাই হয় না।

আসলটাকে ঠিক রাখার জন্য ভগবান মাঝে মাঝে অবতার হয়ে আসেন। আর ভগবান এসে ম্যাজিকালি কিছু করে দিয়ে বেরিয়ে যান না। ভগবান এসে কিভাবে করেন? যাঁর ভাল করবেন, তাঁর হয়ে তিনি আসেন। জাতক কথা গল্পে দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নিয়েছেন। যখন যে যোনিতে জন্ম নিয়েছেন, তখন সেখানে তাঁদের কিছু মঙ্গল করেছেন। আমরা মনে করি, ভগবান বিভিন্ন রকম লীলা করেন, সেই রকম সৃষ্টিটাও তাঁর লীলা। দেবতাদের মধ্যেও তাঁর লীলা, ঈশ্বরের মধ্যেও তাঁর লীলা আর মানুষ রূপে এসেও তিনি লীলা করেন। গীতার সময়ে ভগবান কি লীলা করছেন? *দেবক্যাং বসুদেবাৎ অংশেন কৃষ্ণঃ কিল্ সম্বভূব*, বসুদেব থেকে ভগবানের নাম বাসুদেব। বসুদেবের সন্তান বাসুদেব। দেবকী ও বসুদেবের থেকে সেই ভগবানের অংশ কৃষ্ণ রূপে জন্ম নিলেন।

কেন তিনি এভাবে জন্ম নিলেন? *ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্মঃ, তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদনাম্,* ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যদি রক্ষা করা হয়, তাহলেই ধর্মের রক্ষা হবে। কারণ বর্ণাশ্রমভেদ ব্রাহ্মণদের হাতেই রয়েছে। এখানে আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম আসছে। আচার্য যখন গীতার ভাষ্য লিখছেন, তখনও হিন্দু ধর্ম বর্ণাশ্রমের উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল। হিন্দুদের চারটি বর্ণ –ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারটি বর্ণ ঠিক করে দিচ্ছে সমাজের প্রতি তোমার কি কর্তব্য। আবার আছে চারটি আশ্রম – ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। চারটি আশ্রম ঠিক করে দিচ্ছে তোমার নিজের প্রতি কি কর্তব্য। তার মানে এটা হল তোমার অধিকার আর আগেরটা হল তোমার কর্তব্য। লোকেরা যখন বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে গালাগাল দেয়, তখন তারা ভুলে যাচ্ছে যে, বর্ণটা তোমার সমাজের প্রতি কর্তব্য আর আশ্রমটা হল তোমার অধিকার। তুমি নিজে ঠিক করবে তুমি কি হবে। তুমি কি ব্রহ্মচারী হয়ে সারাজীবন অধ্যয়ন করে জীবন অতিবাহিত করবে, নাকি সংসারী হবে, নাকি বাণপ্রস্থী হবে, নাকি সন্ন্যাসী হয়ে শুধু ঈশ্বর চিন্তনে ডুবে যাবে। এখানে তোমার option, তুমি যেমনটা পছন্দ করবে, তেমনটা বেছে নিতে পার। অন্য দিকে তুমি সমাজ থেকে সুযোগ সুবিধা নিচ্ছ, খাওয়া-দাওয়া করছ, সেটা সমাজকে তোমায় ফেরত দিতে হবে। হয় তুমি মানুষকে বিদ্যাদান করে ফেরত দেবে, তখন তুমি ব্রাহ্মণ; নয়ত দেশের সম্পদ রক্ষা করবে, যেমন আমাদের সৈন্যরা করছে, তাহলে তুমি ক্ষত্রিয়; দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে তুমি যোগদান দিতে চাইছ, ব্যবসা বাণিজ্য করে সম্পদ বৃদ্ধি করতে চাইছ, তখন তুমি হয়ে গেলে বৈশ্য।

আর এই তিনটের বাইরে চতুর্থ থাকল সেবা, সেবা মানে যে কোন ধরণের সেবা। এখন যেমন হোটেল, হাসপাতাল চলছে, এটা হল সেবা, পরিচর্যা, এরা হল শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এগুলো এক-একটা টেকনিক্যাল শব্দ। কিন্তু পরের দিকে সবাই সুযোগ নিতে শুরু করে দিল। যে সম্মান পায় সেও সমাজ থেকে সুযোগ সুবিধা নেয়। বর্তমান কালে যত পার্টি আছে, একটা দুটো পার্টি বাদে সব পার্টির মাথায় আছে একজন লোক। ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে তারই পরিবারের লোকজন পার্টির ক্ষমতায় এসে যাচ্ছে। রাজনীতিতেও এটা ঢুকে গেছে। অথচ আমরা এই বলে চেঁচিয়ে যাচ্ছি, আমরাই গণতন্ত্রের পতাকার ধারক ও বাহক। প্রত্যেকটি পার্টির যিনি মাথায়, পরে তার ছেলেমেয়েরা, নয় তো তার পরিবারের কেউ এসে ওই চেয়ারে গিয়ে বসছে, এটাকে বলে প্রিভিলেজ। বর্ণাশ্রম ধর্ম হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু ধর্ম ও ভারতকে রক্ষা করল, তারপর এর মধ্যে এসে ঢুকলো প্রিভিলেজ। ব্রাহ্মণরা প্রিভিলেজ নিতে শুরু করে দিল। শূদ্রদের ওই ক্ষমতা ছিল না, তাই তারা প্রিভিলেজ নিতে পারল না, ধীরে ধীরে তারা সমাজে পদদলিত হয়ে গেল। তার মানে, বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্যটা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল।

আমরা পরে আলোচনা করব কিভাবে বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ এই চার ভাবে আমরা নিজেকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারি। এই চারটের নাম না নিয়ে বলা যেতে পারে, সমাজকে আমি যখন বিদ্যাদানের মাধ্যমে সেবা করছি বা ব্যবসা করে দেশের সম্পদ সৃষ্টি করছি বা যে কোন রূপে সমাজের সেবা করছি, এই তিনটি হল পথ। আর তা নাহলে সব কিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বা ভক্ত হয়ে ঈশ্বরের পথে চলে যাওয়া। এই চারটে হল সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য। এই চারটের মাধ্যমে আমরা নিজেদের উপরে উঠে নিয়ে আসতে পারি। আগেকার দিনে এটাই বর্ণাশ্রম রূপে চলত।

প্রথমেই বলা হয়েছিল, যারা নিজেদের মঙ্গল চাইছে, তাদের জন্য এটা, যারা নিজেদের ভাল চাইছে না, তারা যা ইচ্ছা করুক, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। যদি তুমি নিজের ভাল চাও, চুরি না করে, অপরকে না ঠকিয়ে যদি টাকা-পয়সা পেতে চাও, চালবাজি না করে যদি ধর্ম অর্জন করতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমাকে এই পন্থাই অবলম্বন করতে হবে। উদ্দেশ্য হল, তোমার নিজের উত্থান, তার সাথে জগতের প্রতি তোমার কর্তব্য পালন করা। এই দুটোকে মিলিয়েই ধর্ম

হয়। যখন এই ধর্মে গ্লানি আসে, তখন ভগবান কোন গর্ভকে আশ্রয় করেন, কোন ম্যাজিকালি আসেন না, এসে তিনি আবার এই ধর্মের শিক্ষা দেন; যেমন বর্তমান কালে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে শিক্ষা দিলেন।

অবতার তত্ত্ব

আমরা এতক্ষণ দেখলাম কিভাবে হিন্দু ধর্ম বেদের দুটো ধর্ম প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্মকে ধারণ করে আছে। তার সাথে আমরা দেখলাম কিভাবে ধীরে ধীরে ধর্মের গ্লানি হয়। যাঁরা ধর্মের পালন করছেন তাঁদের মনে কাম, লোভ, বিশেষ করে কাম, কাম একটা generic term, যেটার মাধ্যমে সব কিছুই এসে যায়, তখন তাঁরা ধর্মকে আর প্রত্যক্ষ রূপে দেখে না। ধর্ম তখন শব্দ মাত্র হয়ে যায়। যেমন বেদের খুব নামকরা মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র, গায়ত্রী মন্ত্র হল একেবারে সাক্ষাৎ মন্ত্র। কেউ যদি গায়ত্রী মন্ত্রকে নিয়ে সাধনা করেন, জপ করেন, ধ্যান করেন, তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থকে স্পষ্ট সাক্ষাৎ দেখতে পাবেন। ঈশ্বর দর্শন তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার কথা। বিশ্বামিত্র সাধনা করে, ধ্যানের গভীরে এই মন্ত্র সাক্ষাৎ করলেন। বিশ্বামিত্রের পর অনেকেই সাধনা করে এই মন্ত্রের সাক্ষাৎ করেছেন।

একটা অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে, বলা হয় যে, সন্ন্যাসীদের গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করেতে হয় না। হিমালয়ে এবং অন্য অনেক মণ্ডলে নিষেধ আছে, আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনেও তাই। যেহেতু গায়ত্রী মন্ত্র বেদের মন্ত্র, এবং সন্ন্যাসীরা বেদের পারে চলে যান বলে এই মন্ত্রের জপ করেন না। স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ যখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন আমার সন্ন্যাস হয়েছিল। ব্রহ্মচারী হওয়ার সময় সবাইকে গায়ত্রী মন্ত্র দেওয়া হয়। সন্ন্যাস হওয়ার পর আমরা সবাই স্বামী ভূতেশানন্দজীকে প্রণাম করতে গেলাম। একজন নূতন সন্ন্যাসী মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ, আমাদের তো এখন আর গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হবে না? মহারাজ কিন্তু যে ব্রহ্মচারীদের সন্ন্যাস হয়েছিল তিনি তাঁদের গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে বলে দিলেন। সন্ন্যাসীরা শুনে চমকে উঠলেন, সিনিয়র সন্ন্যাসীরাও শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কি করে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে বললেন, সন্ন্যাসীরা তো করেন না। একজন নূতন সন্ন্যাসী এগিয়ে গিয়ে মহারাজকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, সন্ন্যাসীরা তো গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন না, আপনি আমাদের করতে বলছেন'? মহারাজের মধ্যে একটা কৌতুকরসবোধ ছিল। তখন তাঁর পচানব্বই বয়স, খুব মিষ্টি করে নূতন সন্ন্যাস হওয়া মহারাজকে বলছেন, 'গায়ত্রী মন্ত্রে তুমি সিদ্ধ হয়ে গেছ'? কথাটা নূতন সন্ন্যাসীর কাছে একটা shockএর মত লাগল। সন্ন্যাসী মানেই তাঁর গায়ত্রী মন্ত্র সিদ্ধ হয়ে গেছে, তার মানে তিনি সাক্ষাৎ দেখছেন গায়ত্রী মন্ত্রের তত্ত্ব এই। এরপর তিনি বলছেন, আমি এরও পারে যেতে চাই। সন্ন্যাসের শুরু হয় সেখান থেকে।

তিনি যত বড়ই ঋষি হয়ে থাকুন বা তিনি অবতার হয়ে থাকতে পারেন, পরম্পরাতে চলতে চলতে কি হয়, শিষ্যরা ধীরে ধীরে নিম্নগামী হতে থাকে। কেন নিম্নগামী হয়, আমরা আগে আলোচনা করেছি। একটা সময় এই ভাবে ধর্মটা গোল্লায় চলে যায়। যে কোন ধর্মের দিকে তাকালেই এই জিনিসটা দেখা যাবে। আমেরিকাতে যেত বড় বড় চার্চ ছিল; চার্চগুলি এখন সব শপিং মল হয়ে যাচ্ছে। চার্চে নাকি এখন আর কেউ যায় না। যায় না মানে, লোকেরা কি ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে গেছে, নাকি একেবারে হীন হয়ে গেছে? একেবারেই তা নয়। যারা ধর্ম শেখাচ্ছেন তারাই হীন হয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য ধর্মে যাই হয়ে থাকুক, এখানে হিন্দু ধর্ম পুরোপুরি অন্য রকম। আর আচার্যও হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম জানতেন না। এবার তিনি অবতার তত্ত্বকে নিয়ে বলছেন। এখান থেকে আমরা গীতার মর্ম আলোচনা করব। গীতা ভগবান নিজের মুখে বলেছেন। আমরা দেখব, গীতায় ভগবানের কি বক্তব্য।

প্রথমে আমরা আলোচনা করব ভগবানের অবতার রূপটা কি। এরপর আমরা দেখব বেদের সত্যকে ভগবান কিভাবে দাঁড় করালেন এবং সেটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ালো। ভগবান যখন রামকৃষ্ণ রূপে এলেন তিনি কথামৃত বললেন। কেউ যদি কথামৃতের ব্যাখ্যা রচনা করতে বসেন, প্রথমে তিনি যে একটা ভূমিকা দেবেন তাতে তাঁকে দেখাতে হবে, ঠাকুর কথামৃতে কি বলেছেন। কথামৃতে বেদেরই কথা বলা হয়েছে, বেদের বাইরে কিছু নেই। কথামৃত বেদেরই কথা, কিন্তু নূতন একজন অবতার বললেন। ঠিক তেমনি সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে কথা বলছেন, সেখানে তিনি বেদেরই কথা বলছেন, কিন্তু তৎকালীন নূতন একজন অবতার বলছেন। আচার্য এখন এই দুটো জিনিসকে নিয়ে আলোচনা করবেন। আচার্য এবার বলছেন –

স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য, অজোঽব্যয়ো ভূতানাং ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্, স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে। স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্মদ্বয়ং অর্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ, গুণাধিকৈর্হি গৃহিতোঽনুষ্ঠিয়মানশ্চ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্ম ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ।

আচার্য বলছেন, *স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্ন*, ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন, তখন তাঁর এই ছয়টি গুণ সব সময় থাকে। এমন কোন অবস্থা হবে না যে, এর একটা কি দুটো গুণ থাকবে না, ছটা গুণ সব সময় ভগবানের সাথে সমান ভাবে থাকবে। প্রথম হল জ্ঞান, শাস্ত্রের কথায় জ্ঞান মানে, সচ্চিদানন্দ কি, জগৎ কি, জীব কি, এই তিনটে মিলিয়ে বলে জ্ঞান, এই জ্ঞান তাঁর সব সময় থাকবে। কথামৃতে ঠাকুর খুব সুন্দর ভাবে এই জিনিসটাকে পরিভাষিত করছেন। নরেন, রাখালাদিদের উদ্দেশ্য করে ঠাকুর বলছেন, এই ছোকরারা শুধু যদি এটুকু জানে, এরা কে, আমি কে, আর এদের সাথে আমার কি সম্পর্ক, তাহলেই সব হবে।

সমস্ত ধর্ম, শুধু হিন্দু ধর্ম না, কেবল বেদ, উপনিষদ না, কথামৃত না, যে কোন ধর্ম ঘুরে ফিরে এই তিনটে শব্দে চলে যায় – ঈশ্বর কি, আমি কে, জগৎ কি, আমার সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক কি। ঠাকুর তিনটি শব্দে বলে দিচ্ছেন – এরা কে, আমি কে, এদের সাথে আমার কি সম্পর্ক, এদের শুধু এটুকু জানলেই হবে। এর বাইরে ধর্মের আর কিছু নেই। এটাকেই বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন দর্শনের পণ্ডিতরা বিভিন্ন ভাবে পরিভাষিত করেন। কেউ বলবে আমরা জীব, আমরা চিরন্তন রূপে ঈশ্বর থেকে আলাদা। কেউ বলবেন, আমিও যা, ঈশ্বরও তাই। পরিভাষিত করা হচ্ছে আলাদা আলাদা ভাবে, এরপর যার যেমন সাধনা হবে, তার তেমন সিদ্ধি লাভ হবে।

এই জ্ঞান ভগবানের কাছ থেকে কখনই চলে যাবে না, তিনি সবটাই জানেন, এবং সব সময় জানেন। ঠাকুরের কাছে যারাই আসত, তিনি তাদের সবারই কথা জানতেন, কে কোন ভাবের, কোন ঘরের, কার ভিতর কি কি সম্ভবনা আছে, কোথায় সে আটকে আছে, সবটাই তিনি জানতেন। ভগবান কখন ভাঙতে আসেন না, গড়তে আসেন। তিনি কাউকে কক্ষণ দুম্ করে কিছু করে দেবেন না। লোকেরা বলে তিনি জগতে এত দুঃখ-কষ্ট কেন দিলেন, কেন তিনি মানুষের দুঃখ নিবারণ করছেন না? ভগবান কেন দুঃখ মেটাতে যাবেন, তিনিই এই জগতের সৃষ্টি করেছেন, দুঃখটাও তিনিই দিচ্ছেন, মৃত্যুটাও তিনিই দিচ্ছেন। আমার আপনার কাছে মৃত্যুটা বিরাট কিছু, কিন্তু তাঁর কাছে মৃত্যুটা কিছুই না, তাঁর কাছে মৃত্যু হল এ-ঘর আর ও-ঘর। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি সম্পন্ন, এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে নিজের নিজের সংকীর্ণ জীবনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, সেইজন্য আমাদের এত কান্না, ভগবানের তাতে কি এসে যায়!

দ্বিতীয় হল ঐশ্বর্য। ভগবানের কখন কোন কিছুর অভাব থাকে না। এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিশেষ করে রামানুজ সম্প্রদায়রা নিয়ে এলেন লক্ষ্মী দেবীকে, যিনি বিষ্ণুর সঙ্গে থাকেন। শিব আর শক্তির যে সম্পর্ক, বিষ্ণু আর লক্ষ্মীর সেই সম্পর্ক না, অনেক আলাদা। আমরা যখন শিব ও শক্তি বা ঠাকুর ও মা বা ব্রহ্ম ও শক্তি বলি, তখন বলি এনারা দুজন এক। কিন্তু বিষ্ণু আর লক্ষ্মী এক নন, লক্ষ্মী এখানে inferior, এমনকি লক্ষ্মীর জন্মও সমুদ্র মন্থন থেকে। প্রথমের দিকে লক্ষ্মীর এতটা গুরুত্ব ছিল না, কিন্তু পরে শ্রী সম্প্রদায় অর্থাৎ রামানুজের সম্প্রদায় লক্ষ্মীকে অনেক উপরে নিয়ে গেছেন। আমরা যে শ্রীমন্নারায়াণ বলি, তাতে প্রথমে 'শ্রী' বলাতে এটাই বোঝাচ্ছে যে, ভগবানের সাথে শ্রী সব সময় আছে, শ্রী মানে ঐশ্বর্য। এখন লক্ষ্মী, যিনি বিষ্ণুবক্ষবিলাসিনী, তখন বিষ্ণুর ঐশ্বর্যের কিসের কম হবে।

এগুলো ধারণা করা আমাদের পক্ষে অনেক সময় কঠিন হয়। এই জিনিসগুলিকে বোঝানর জন্য আমাদের ঋষিরা অনেক গল্প তৈরী করেছেন। যেমন একটা গল্পে বলছেন, কুবেরের বিরাট ধন সম্পদ, প্রচুর ঐশ্বর্য, যার জন্য তাঁর খুব অহঙ্কার। কিন্তু এই সম্পদ কাউকে দেখাতে তো হবে, তবে না অহঙ্কার করা যাবে। সেইজন্য কুবের ঠিক করল, একদিন শিবকে নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে এনে খাওয়াতে হবে। কুবের শিবকে গিয়ে বলেছেন, 'একদিন কৃপা করে আপনি আমার বাড়িতে এসে দুটি শাকান্ন গ্রহণ করুন'। শিব হলেন অন্তর্যামী, তিনি কুবেরের মনের ভাব বুঝে গেছেন। শিব বললেন, 'আমি কোথাও যাই না, তুমি গণেশকে নিয়ে যাও, ওকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়ায়, তাতেই আমি তৃপ্ত হয়ে যাব'। বাচ্চা গণেশ এখন শুঁড় নাচাতে নাচাতে কুবেরের বাড়ি পৌঁছে গেছে নেমন্তন্ন খেতে। প্রথমে অনেক লাড্ডু দেওয়া হল। যত লাড্ডু ছিল সব খেয়ে নিল। একটু দেরী হতেই গণেশ হাঁক দিয়েছে জলদি খাবার নিয়ে এসো। কারিগররা লাড্ডু আর বানাবার ফুসরৎ পাচ্ছে না, লাড্ডুর মাল-মশলা সবটাই গণেশের সামনে রেখে দিয়েছে। আনার সাথে সাথেই সব শেষ। একটু দেরী সহ্য করতে পারছেন না গণেশ। খুব রেগে গিয়ে বলতে শুরু করল, 'নিমন্ত্রণ বাড়ি ডেকে এনে খাওয়াতে পারছ না, কেন নিমন্ত্রণ করতে গেলে'। এই বলে নিজেই এবার ভাণ্ডারে ঢুকে গেলেন। ভাণ্ডারে যত চাল, ডাল, আটা, ময়দা, তেল, নুন, মশলাপাতি আছে সব খেয়ে নিয়েছেন। এরপর রেগেমেগে কুবেরকে বলছেন, 'তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করে এনেছো, আমার তো পেট ভরল না, এবার আমি তোমাকেই খাবো'।

কুবের এবার প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েছে। দৌড়ে আর কোথায় যাবে, সেই শিবের কাছেই গিয়ে উপস্থিত, 'প্রভু আমাকে বাঁচান'। হন্তদন্ত হয়ে একটু পরেই গণেশও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। শিব দুজনকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার তোমাদের'? গণেশ বলছেন, 'আমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল, আমাকে খাওয়াতেই পারল না; খাওয়াতেই যদি না পারে, নিমন্ত্রণ করে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল কেন? আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে'। শিব গণেশকে খুব ঠাণ্ডা করে বললেন, 'কেন এ-রকম করছ, খিদে পেলে যাও মায়ের কাছে, মা তোমাকে পেট ভরে খাইয়ে দেবে'। এই হল কাহিনী। কুবের একদিন একবেলা পেট ভরে যে গণেশকে খাওয়াতে পারছে না, আর তাতেই তার ঐশ্বর্যের কত অহঙ্কার; আর পার্বতী এই গণেশকে দু বেলা রোজ পেট ভরে খাইয়ে যাচ্ছেন। মা অন্নপূর্ণা কিনা, তিনি জগতের সমস্ত ঐশ্বর্যের মালকিন। শিব তাঁর উপর বসে আছেন। এইসব কাহিনী দিয়ে বোঝান হয় ভগবানের ঐশ্বর্য কেমন। ভগবান বা অবতারের ঐশ্বর্যের কথা যা বলা হয়, এটাই তাঁর ঐশ্বর্য।

এরপর হল শক্তি, *বলবীর্য*। বল হল ভিতরের দম। ভিতরের এই প্রাণশক্তি যখন কাজে লাগে, তখন এটাকে বলা হয় শক্তি। অনেকে বলে, আমি তোমার ক্ষতি করে দিতে পারি, কিন্তু করব না। এই কথা যে বলছে, তার ভিতরে আদৌ দম আছে কিনা জানার কোন উপায় নেই। আমি যদি চাইতাম আমি ফার্স্ট হয়ে দেখাতে পারতাম; আরে ভাই করে দেখাও না আগে। আমি যদি চাইতাম

তো আমি অনেক কিছু হতে পারতাম; কিছুই তো হয়ে দেখাতে পারছ না। এই বল যখন কাজে নামে, তখন তাকে বলে শক্তি। অনেকের মধ্যে হয়ত শক্তি এসে গেছে, কিন্তু সেই শক্তিকে ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু যে বলছে আমার শক্তিকে আমি যখন খুশী কাজে লাগাবো, যখন খুশী এই শক্তিকে আমি আটকে রাখব; এটাকে বলে বীর্য। বীর্য মানে ধারণ করার ক্ষমতা, নিজের শক্তিকে ধারণ করার ক্ষমতা। নিজের বল বা শক্তিকে ধারণ করার ক্ষমতা সবারই থাকে না।

স্বামীজী যখন বলছেন বীর্যবান হও, তখন তার অর্থও এটাই, তোমার ক্ষমতা বা শক্তিকে ধরে রাখ। আমাদের সমস্যা হল, যেমনি একটু ক্ষমতা হয়ে যায় তখনই আমরা ক্ষমতা দেখাতে শুরু করি। একজন সামান্য ট্রাফিক পুলিশ রাস্থার মোরে একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সামান্য একটু কিছু হলেই গাড়ির উপর দুম্ করে এক ডাণ্ডার বারি মারবে। সেও নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে দিতে চাইছে। ক্ষমতা ধারণ করার দম নেই।

আর শেষে হল তেজ, উনি যেখানে দাঁড়াবেন, সেখানে অন্যরা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। পরে এক জায়গায় আচার্য তেজের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, তেজ মানে চামড়ার ঔজ্জ্বল্য না। কসমেটিক দিয়ে আমরা শরীরের ত্বকের চাকচিক্য বাড়িয়ে নিই। এখানে ত্বকের চাকচিক্য না, তাঁর ব্যক্তিত্বটা এমন যে, যেখানে গিয়ে দাঁড়াবেন সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইবে। বাল্মীকি রামায়ণে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, শ্রীরামচন্দ্র রাজসভায় এসে দাঁড়ালেন, মনে হল যেন কোটি সূর্যের উদয় হল। অনেক জায়গায় বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র সভায় উপস্থিত হয়ে সবার তেজ হরণ করে নিলেন। ছোটবেলা এগুলো পড়লে আমাদের মনে হত এটা কোন ম্যাজিকাল জিনিস, যার যার ক্ষমতা আছে তিনি কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তা না, যেমন কোন জায়গায় প্রধানমন্ত্রী এসে গেলেন, তখন সেখানে বাকিরা নিষ্প্রভ হয়ে যান, সবার দৃষ্টি ওনার উপর গিয়ে পড়ে।

ভগবানের এই ছটি ঐশ্বর্যের বর্ণনা আচার্যের নয়, পুরাণে এই বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান, 'ভগ' মানে ঐশ্বর্য, যাঁর ঐশ্বর্য আছে তিনি ভগবান। যেমন আমরা বলি যার ধন আছে তিনি ধনবান, যার জ্ঞান আছে, তিনি জ্ঞানবান ইত্যাদি। ভগবান কেন? যাঁর মধ্যে এই ছটি গুণ সব সময় আছে – জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজ। যখন উনি গর্ভে আছেন, তখনও আছে; যখন জন্ম নিলেন তখনও আছে, বাচ্চা হয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছেন তখনও আছে, কৃষ্ণ হয়ে যখন কান্নাকাটি করছেন তখনও আছে। এই ছটি গুণ কক্ষণ তাঁর থেকে চলে যাবে না।

লীলাপ্রসঙ্গে ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যের ব্যাখ্যা যেখানে আছে, সেই জায়গাতে ঠাকুরের ব্যাপারে বলতে গিয়ে স্বামী সারদানন্দ পরিষ্কার এই কথাই বলছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে পার্বতী শিবকে জিজ্ঞেস করছেন, 'শ্রীরামচন্দ্রকে অনেকেই ভগবান বলেন, তিনি কি সত্যিই ভগবান? ভগবানই যদি হন তাহলে তিনি সীতার জন্য এভাবে প্রাকৃত পুরুষের মত কাঁদলেন কেন'? আবার বলা হয় পরে ঋষিদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান পেয়েছিলেন; যার অর্থ দাঁড়ায়, শ্রীরামচন্দ্র একজন আত্মজ্ঞানী পুরুষ, একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম নন। তখন ভগবান শিব বলছেন, না, তিনি ভগবান। কখন এমন সময় ছিল না যে, শ্রীরামচন্দ্রের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তিনি কখন সখন এমন ব্যবহার করতেন যে, মনে হতে পারে তখন তাঁর জ্ঞান ছিল না, সেইজন্য এটাকে বলা হয় লীলা। ওটা সত্যও না, মিথ্যাও না। তুলসীদাস তাঁর রামচরিতমানসে, এমনকি অধ্যাত্ম রামায়ণেও দেখানো হয়েছে যে, রাবণ কর্তৃক সীতার অপহণ হওয়া, এগুলো শ্রীরামচন্দ্র আগে থেকেই জানতেন। তিনিও সীতাকে এই ব্যাপারে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছেন। তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু শাস্ত্রের দিক থেকে ভগবানের জ্ঞান কখন মলিন বা ধুম্রাচ্ছাদিত হয় না, সব সময় পরিষ্কার থাকে।

আচার্য বলছেন, *সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য*, এখানে অনেকগুলো শব্দ আছে, যার অর্থ হয় মায়া। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে মায়ার উপর ভগবান আলোচনা করবেন। আমরাও যখন সপ্তম অধ্যায়ে আসব তখন মায়ার উপর বিস্তারে আলোচনা করব। এখানে সংক্ষেপে আমরা একটু আলোচনা করে নিচ্ছি।

আমাদের শাস্ত্রের কথা মানার দরকার নেই। শুধু আমাকে আগে নিজে ঠিক করে নিতে হবে, আমি সাধন-ভজন, জপ-ধ্যানে আমার জীবন অতিবাহিত করব কিনা। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আগে আমরা যেমন সেখানকার একটা গাইডবুক দেখে ঠিক করি, কিভাবে আমরা যাব। ঠিক তেমনি এখানেও সাধনা করার জন্যও আমাদের একটা গাইডবুক দরকার। সাধন পদ্ধতির খুব নামকরা গাইডবুক হল রাজযোগ। কিংবা ঠাকুরের সাধনার কথার খুব নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যাবে লীলাপ্রসঙ্গে, সেদিক থেকে লীলাপ্রসঙ্গও একটা খুব ভাল গাইডবুক। রাজযোগের practical manual, অর্থাৎ সাধনার যে মূল বিষয় এবং তার সাথে ঠাকুরের সাধনার কথা, এই দুটোকেই আমরা রাখতে পারি।

সাধনা শুরু করতে গিয়ে দেখছি মন আমার খুব চঞ্চল, এই চঞ্চল মনকে শান্ত করতে শুরু করার পর ধীরে ধীরে মনের একটা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং মন শান্ত হয়। শান্ত মন মানেই শক্তিশালী মন। শান্ত না হলে মনের শক্তি হয় না। মনকে শান্ত করতে করতে মন এমন একটা অবস্থায় চলে যায়, যেখানে মনে একটি মাত্র চিন্তা থাকে, অন্য কোন চিন্তা থাকে না। এই জিনিসটা হয় একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তায়। এরপর ওই চিন্তাটাও শান্ত হয়ে যায়, যেমন ঠাকুরের হয়েছিল। তোতাপুরী ঠাকুরকে অদ্বৈত সাধনা শেখাতে এসেছেন, সব কিছু শিখিয়ে দিলেন। ঠাকুর তাঁর নির্দেশানুসারে সব কিছু ঠিক ঠিক করছেন, কিন্তু বারবার মা কালীর রূপ ঠাকুরের সামনে এসে যাচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, জ্ঞান অসি দিয়ে তিনি মা কালীর রূপকে খণ্ডিত করে দিলেন। এরপর কি হয়, সেটা কাউকে বোঝান যায় না। উপনিষদেও বলছেন, সাধক ওই জায়গার কথা বাক্য দিয়ে বোঝাতে পারে না, কারণ ওই জায়গাতে মন থাকে না। ঋষিরা সেইজন্য এটাকে বলছেন, সচ্চিদানন্দ, সৎ, চিৎ ও আনন্দ – ঈশ্বর আছেন, চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

সব প্রফেট, সব শাস্ত্র, তা কোরান হোক, বাইবেল হোক, সবাই একই কথা বলে। আমাদের কাছে সত্য হল এই দৃশ্যমান জগৎ, কিন্তু তিনি দেখছেন ঈশ্বর বৈ কিছু নেই, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই, আত্মাই আছেন। শুধু গীতা বলছেন না, যে কোন সাধক তাঁর সিদ্ধির অবস্থায় পৌঁছে এটাই দেখেন। হিন্দু ধর্ম মহৎ কেন? হিন্দু ধর্মে এই ধরণের অনেক মহাত্মার আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা এই সত্যের সাক্ষাৎ করেছেন। কবীর দাসের লেখা পড়লে মনে হবে উপনিষদের তত্ত্ব পড়ছি নাকি কবীর দাসের রচনা পড়ছি। কবীর দাস একজন জোলা, তিনি কোন দিন কাগজ কলম ছুয়ে দেখেননি, কোন পড়াশোনা নেই, সবটাই তাঁর নিজের অনুভব থেকে লিখে গেছেন।

কিন্তু জগৎটা তো সত্য। যেটা অনন্ত, সেটা সীমিত কি করে হয়ে যায়? যিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি দুঃখস্বরূপ কি করে হয়ে যান? দুঃখ-কষ্টে সব সময় আমাদের চোখ থেকে জল বেরোচ্ছে। একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে অভিমান, একটা কিছু অন্য রকম হয়ে গেলে রাগ, ক্রোধ এসে যাচ্ছে। যিনি আনন্দস্বরূপ তিনি এমন কেন করছেন? কারুর কাছে এর কোন ব্যাখ্যা আছে কি? কোন ধর্মে এর কি কোন ব্যাখ্যা আছে? কোন ব্যাখ্যা নেই। অন্য ধর্ম বলে দেয় তাঁর ইচ্ছা। আমরা 'তাঁর ইচ্ছা' এটাকে একটা টেকনিক্যাল শব্দ দিয়ে বলি 'মায়া'। মায়া একটা টেকনিক্যাল শব্দ, মায়া হল ত্রিগুণাত্মিকা, এর ব্যাখ্যা আমরা পরে করব। এই মায়া, বা আমাদের ভাষায় আরও সহজ করে বলতে পারি, world of mind, যাবতীয় যা কিছু আছে সবটাই মন। যেখানেই মন আছে, এটাই মায়া। তাহলে কি ভগবান বিশ্বমন? না, ভগবান ঠিক তার পারে। তাঁর ইচ্ছাতেই বিশ্বমন সৃষ্টি হয়। আমরা সবাই মনে আবদ্ধ, প্রথমে আমি আমার মনে আবদ্ধ, পরে আমি আপনার মনে আবদ্ধ।

আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, বেলুড় মঠ আমাকে যেমন বলবে আমাকে তেমনটা করতে হবে। এর বাইরে, আমার সাথে যার ভালবাসার সম্পর্ক, সে আমাকে যা বলবে আমি তাই করব। যার সাথে খারাপ সম্পর্ক, সে যা বলবে আমি তার বিপরীত করব। সবটাতেই আমি বাঁধা। ভগবান কক্ষণ কোন অবস্থাতেই বাঁধা থাকেন না। অথচ এই মনের জগতেই তিনি কাজ করেন, কিন্তু পুরো স্বাধীন। একজন কয়েদীকে যখন কোথাও স্থানান্তর করা হয় তখন তাকে চার-পাঁচজন আর্মড পুলিশ ঘিরে থাকে। প্রধানমন্ত্রীও যখন কোথাও যান তখন তাঁকে শ'দুয়েক আর্মড পুলিশ ঘিরে থাকে। প্রধানমন্ত্রী যেদিকে যাবেন, সব কটা পুলিশকে সেদিকে যেতে হবে। আর এখানে পুলিশ যেদিকে নিয়ে যাবে, বন্দীকে সেদিকে হাঁটতে হবে। মায়ার রাজ্যে আমরা হলাম এই একজন কয়েদীর মত। এই মায়ার রাজ্যেই ভগবান হলেন প্রধানমন্ত্রীর মত। আমরা যেমন মায়ার রাজ্যে পুলিশের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছি। মায়ার রাজ্যে ভগবানও পুলিশ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছেন; কিন্তু পুলিশরা চলবে তাঁর কথামত, আমাকে চলতে হবে পুলিশের কথাতে, এইটুকু তফাৎ। বলছেন, *মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য*, মালিক বলে কথা, যেমনটা বলবে তেমনটাই হতে হবে।

ঈশ্বরের গুণ নিয়ে বলা হল, এবার বলছেন ঈশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বরের স্বরূপ কি? *অজোহব্যয়ো ভূতানাং ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধোমুক্তস্বভাবোহপি সন্*, তিনি ***অজঃ***, যাঁর জন্ম হয় না, কারণ তিনি সব সময়ই আছেন। ***অব্যয়ঃ***, তাঁর কখন ক্ষয় হয় না। তিনি গতকাল যেমন ছিলেন, আজও তেমন আছেন, ভবিষ্যতেও এই রকমই থাকবেন। আমরা প্রতি মুহূর্তে পাল্টাচ্ছি। ***ভূতানাং ঈশ্বরঃ***, ঈশ্বর শব্দের অর্থই হয় যিনি সব কিছুর নিয়ন্তা, সমস্ত ভূতের নিয়ন্তা। ***নিত্য***, তিনি সব সময় আছেন, গতকালও ছিলেন, আজকেও আছেন, আগামীকালেও থাকবেন। ***শুদ্ধ***, ঈশ্বরের কোথাও কোন ধরণের খাদ নেই, জিনিসটা যেমনটি থাকার তেমনটি আছে। যেমন চব্বিশ ক্যারেটের সোনা, সোনা যেমনটি তেমনটি, কোথাও কোন খাদ নেই। ***বুদ্ধঃ***, তিনি হলেন চৈতন্যস্বরূপ, ভগবান বুদ্ধকে সেইজন্য বুদ্ধ বলা হত, চৈতন্যের সাথে এক হয়ে গেছেন। ***মুক্তস্বভাবঃ***, তিনি চিরন্তন মুক্ত। ঈশ্বর কখন কারুর, কোন কিছুর বন্ধনে থাকেন না।

অপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে, যাঁর এই রকম স্বভাব, তিনি তো অনন্ত, সনাতন, শুদ্ধ চৈতন্য। অথচ তাঁর এমন একটা শক্তি, যেটাকে ম্যাজিক বলা যায় না, সেইজন্য লীলা বা মায়া বলা হয়। এই কারণে বলা হয় যেন তিনি জন্ম নিলেন, যেন তিনি কর্ম করলেন। কর্ম তিনি যা কিছু করেন, সেটাও *লোকানুগ্রহম্*, মানুষের মঙ্গলের জন্য করেন। ঈশ্বরের দ্বারা কোন পরিস্থিতিতে এমন কোন কাজ কখনই হয় না, যে কাজের দ্বারা কারুর ক্ষতি হবে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবতারা দেবীকে স্তুতি করে বলছেন, মা তোমার দৃষ্টিতেই অসুরদের নাশ হয়ে যেত, কিন্তু তুমি তা করলে না, তুমি তাদের তোমার অস্ত্র দিয়ে বধ করলে। কারণ তোমার স্পর্শ যদি এরা পায়, মৃত্যুর পর দেবলোকে যাবে, এরা আর কেউ নরকে যাবে না। তোমার দৃষ্টিতে যদি এদের নাশ হত, তাহলে সবাই এরা নরকে যেত। মা ভগবতী জগজ্জননী, তাঁর কাছে দেবতা অসুর আলাদা কিছু না, সবাই তাঁর সন্তান। মা যদি কাউকে বধ করেন, সেখানেও তিনি তার ভালর জন্যই মারছেন। তত্ত্বের দৃষ্টিতে হিন্দুরা ভাল-মন্দ আলাদা ভেবে কিছু করে না; পরে এর উপর পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। যেটাতে মন্দ হচ্ছে, সেখানেও হিন্দুরা দেখে এবার সে ঘুরে দাঁড়াবে। আচার্যরা সেইজন্য ভালমন্দের কোন তফাৎ করেন না। গীতার এটা একটা বড় আলোচ্য বিষয়, যা অনেকবার ঘুরে ঘুরে আসবে। এখানে ভাল আর মন্দ বলে কিছু নেই।

আমরা এখন ঠাকুরের জন্মতিথিতে জন্মোৎসব পালন করি। আগেকার দিনের মহারাজরা জন্মোৎসব বলতেন না, বলতেন আবির্ভাব তিথি। এর পিছনে যুক্তি হল, ভগবানের কিসের জন্ম, কিসের মৃত্যু, তাঁর আবির্ভাব। তিনি অনন্ত, তিনি কি করে শরীরে আবদ্ধ হবেন। আচার্য এটাই

বলছেন, তিনি ভগবান, তিনি যখন অবতার হয়ে আসেন, তখন মনে হয় যেন তিনি জন্ম নিলেন। তাঁর তিরোধান হলে মনে হয় যেন তিনি চলে গেলেন। আসলে কিন্তু তা কখনই হয় না। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে পুরোপুরি এটাই হয়। তখন বলছেন, ভগবান কেন আসেন? জীবকুলকে অনুগ্রহ করার জন্য।

আচার্য বলছেন, *লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে, স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া*, এর আগে আমরা বললাম, ঈশ্বর আসেন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এখানে অবতার রূপে ঈশ্বরের আসার আরও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসছেন। কোন পরিস্থিতিতে, কক্ষণ ভগবানের কোন প্রয়োজন থাকে না। যাঁরা উচ্চমানের সাধু, মহাত্মা, ওনারা যদিও ঈশ্বরের মত নন, কিন্তু তাঁদেরও কোন প্রয়োজন থাকে না, স্বার্থ কোথাও থাকে না। *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া*, ভূত বলতে সমস্ত প্রাণীকুলকে বোঝায়, মানুষ, জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, সবাইকে মিলে ভূত বলা হয়। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের নামে বলছেন, যারা ঠাকুরকে দেখেছে, এমনকি যে ঘোড়ারা ঠাকুরকে টেনেছে, যোনিমুক্তি সবারই হবে। *ভূতানুজিঘৃক্ষয়া*, সবারই ভালোর জন্য তিনি অবতার হয়ে আসেন।

বৈদিকং হি ধর্মদ্বয়ং অর্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ, এখান থেকে আচার্য গীতার মর্ম নিয়ে আলোচনা শুরু করছেন। প্রথমে বললেন, ভগবান অবতার হয়ে এসেছেন। অর্জুন এখন শোক-মোহের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমরা শুরুতে বলেছিলাম, গীতা কেন চিরদিন প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে, সমস্ত যুগে, সমস্ত দেশে, সমস্ত জাতির জন্য গীতা দরকার। কারণ শোক আর মোহ সব কালেই আছে, সব দেশে আছে, সব জাতিরই আছে। যে জিনিসটা আছে, সেটা চলে গেলে যে দুঃখ হয়, এটাকে বলে শোক। একটা জিনিসকে আমার পাওয়ার খুব ইচ্ছা আছে, কিন্তু পাচ্ছি না, এটাকে বলে মোহ। আসলে দুটো একই জিনিস, দুটো ক্ষেত্রেই জিনিসটা আমার কাছে নেই, একটা স্থূল রূপে আমার কাছে ছিল, এখন নেই; আরেকটা কখনই আমার কাছে ছিল না, সেটাকে পেতে চাইছি। দুটোতেই কিন্তু মনের একটাই অবস্থা। একজনের বাবা মারা গেলেন, মেয়েটির এখন কান্নাকাটির শেষ নেই, এটা একটা mental state, ছিলেন, চলে গেলেন। আবার একজন আছে সে কেবল এটা চাই, সেটা চাই করে যাচ্ছে, এটাও একটা mental state। একটাতে কিছু একটা পাওয়ার জন্য মন লেগে আছে। মন সব সময় কিছু চায়। যাদের কাজকর্ম কম থাকে তাদের এগুলো বেশী হয়। প্রচুর কাজকর্মের মধ্যে যারা দিনরাত ডুবে থাকে, তাদের এত শোক-মোহ হয় না।

মনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মন প্রচণ্ড শক্তিশালী আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মন কখন ফাঁকা থাকতে চায় না। এটা সত্য যে অবতার ছাড়া সবার মন সমান। তার মানে, স্বামী বিবেকানন্দের মন আর আমার মন, ক্ষমতার দিক থেকে দুটো মনই সমান। স্বামীজীর মনটা খুলে যাওয়ার পর ওই স্তরে চলে গেছে, আমার মন এখনও বদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। মন কিন্তু সব সময় জানে, আমারও ক্ষমতা আছে। অনেকে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলে, আমরা আসলে জমিদার বংশের লোক। কোন এক সময়ে হয়ত জমিদার ছিল, প্রচুর জমি-জায়গা ছিল, এখন দু কাঠাও জমি আছে কিনা ঠিক নেই, কিন্তু মনের মধ্যে ওই ভাবটা থেকে গেছে। স্বামী বিবেকানন্দের মন যে বংশের, আমার মনও জানে যে আমিও ওই একই বংশের।

ইদানিং কালের ব্রাহ্মণরা কোন দিন বেদ চোখে দেখেনি, একটা মন্ত্র জানে না, অথচ বলার সময় বলবে, 'আমি কিন্তু ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে'। 'পৈতে হয়েছে'? 'না, তা হয়নি'। 'গায়ত্রী মন্ত্র জানো'? 'রেকর্ডে অনেকবার শুনেছি'। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ওই ভাবটা আছে। আমাদের মনটাও ঠিক সেই রকম, মনও তাই বলে, আমারই বংশের লোক স্বামী বিবেকানন্দ, আমারই বংশের লোক আইনস্টাইন, আমারই বংশের লোক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সবাই মন দিয়েই সব করছে। সেইজন্য মন কখন চুপ করে বসে থাকতে চাইবে না, ব্যস্ত থাকতে চায়। সেই কারণে যেটা চলে গেছে সেটার

জন্য কান্না, আর যেটাকে জানে, পেলে আমার খুব ভাল হয়, কিন্তু আসছে না, সেটার জন্য হা পিত্যেশ করে যাচ্ছে, তাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। মন নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য কখন শোক করবে, কখন ক্রোধ করবে, কখন মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। কিন্তু কাজ যদি করতে থাকে, মন তখন একটা জিনিসকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাতে ওগুলো আর মনের মধ্যে মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ পায় না।

অর্জুনের মন এখন শোক-মোহের মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। নিজের জ্ঞাতি ভাই, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু, আচার্য সবাইকে এখন শেষ করে দেওয়ার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে; তাঁর নিজের সন্তান, আত্মীয়স্বজন সবাই সবাইকে মারতে যাচ্ছে। ছোটবেলা যাঁর কোলে কত খেলা করেছি, কত আবদার করেছি, একটু পরে নিজের হাতে সেই পিতামহকেও আমায় মারতে হবে। কল্পনা করলে আমাদেরও গা শিউড়ে ওঠে।

সিভিল ওয়ারের উপর একটা গল্প, সিভিল ওয়ার মানেই যে যাকে পাচ্ছে তাকেই মারছে। গল্পে দেখাচ্ছে একটা শহরে ছাদের উপর থেকে রাস্থার এপার ওপারে এক অপরকে গুলি চালাচ্ছে। দু পক্ষেই খুব দক্ষ। অনেকক্ষণ ধরে গুলি চলছে। কিছুক্ষণ পর একটা দিক শান্ত হয়ে গেছে। তখন এদিককার লোকটি ভাবল, দেখি তো ওইদিকে কে এমন দক্ষতার সাথে, এমন নির্ভুল নিশানায় গুলি চালাচ্ছিল। ও বুঝে গেছে ওই দিকের লোকটি মারা গেছে। নীচে নেমে ডেডবডির সামনে গিয়ে দেখছে, নিজের ভাই। দুই ভাই কখন দু দিকে চলে গেছে, নিজেরাও বুঝতে পারেনি। এর নিশানা যত নিখুঁত, ওরও নিশানা তত নিখুঁত, এর বুদ্ধি যত তুখড়, ওরও বুদ্ধি সেই রকম তুখড়।

এখানে শুধু ভাই না, একটা পুরো বংশকে অর্জুন নাশ করতে যাচ্ছে। এই মোহ থেকে অর্জুনের শোক, শোক থেকে চোখে জল। গীতার প্রথম অধ্যায়ে এই দৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান কিন্তু অর্জুনকে কোন ধমক দিয়ে বলছেন না যে, ওঠো, লড়াই করতে এসেছো, লড়াই করো। ঠাকুরের কাছেও যখন কেউ শোকাহত হয়ে আসত, ঠাকুর তার কথা শুনতেন, কিছু বলতেন না। তারপর হঠাৎ একটা গান গাইতে শুরু করে দিতেন। এমন একটা গান ধরতেন, যে গান শোকাহত ব্যক্তিকে একটা জীবনদর্শন দেখিয়ে দিত। কেউ কোন দিন কাউকে সাহায্য করতে পারে না, সাহায্য মানুষ নিজেকেই নিজে করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, *উদ্ধরেদাত্মনাত্মনং*, নিজেকে দিয়েই নিজেকে উদ্ধার করতে হবে, কেউ কাউকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমরা খুব জোর দুটো কথা বলে দিতে পারি, ওই দুটো কথা বলে দিলে তার ভিতরের শক্তিটা জেগে যায়। ভগবানও কাউকে সাহায্য করেন না। তাহলে তিনি কি করছেন? *উপদিদেশ*, উপদেশের মাধ্যমে তিনি একটা জীবনদর্শন দিয়ে দেন।

তার সাথে খুব সুন্দর কথা বলছেন, *গুণাধিকৈর্হি গৃহিতোহনুষ্ঠিয়মানশ্চ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি*, যার মধ্যে প্রচুর গুণের সমাবেশ, তাকে যদি উপদেশ দেওয়া হয়, তাহলে সেই উপদেশের প্রচার প্রসার খুব ভাল হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, ভগবান এখানে কিছু উপদেশ, ওখানে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু ভগবান যখন মর্ত্যভূমি ছেড়ে চলে যাবেন, তখন তিনি উদ্ধবকে উপদেশ দিলেন, এর নামই হল উদ্ধবগীতা। কিন্তু আমরা সবাই জানি, ভাগবত গীতাই শ্রেষ্ঠ। যাদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, তাদের মধ্যে সব থেকে গুণের সমাবেশ হয়েছিল অর্জুনের মধ্যে। সেইজন্য গীতার এত প্রসার প্রচার হয়েছে।

ঠাকুরের সময় কলকাতায় তখন কত বড় বড় স্কলার, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত শশধর, কিন্তু দম ছিল নরেনের মধ্যে। ঠাকুর নরেনকে দেখেই চিনে নিয়েছিলেন, এই হল সেই গরু, যার লেজে হাত দিলে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে উঠবে। ঠাকুর নরেনকে ধরলেন, আর তাকে উপদেশ দিলেন। স্বামীজীর মাধ্যমে ঠাকুরের উপদেশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল। আমাদের

বেশির ভাগই সব চরিত্রবান গরু, বিরাট দাম গরুর, কিন্তু এই গরু কোন দিন বাছুর দেয়নি, দুধ দেবে না, কোন দিন পাল খায়নি; তবে গরুটার চরিত্র আছে। এই ধরণের চরিত্রবানদের দিয়ে কিছু হয় না। অবতারও যখন ধরেন, এই ধরণের চরিত্রবান লোকেদের তিনি ধরেন না।

আলেকজাণ্ডারের যে ঘোড়া ছিল, কেউ সেই ঘোড়াকে কাবু করতে পারছিল না। আলেকজাণ্ডার সেই ঘোড়াকে কাবু করলেন, আর সেই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সারা বিশ্ব জয় করলেন। ঘোড়া মারা যাওয়ার পর, তার নামে একটা শহর দাঁড় করিয়ে দিলেন। দম চাই, শক্তি না থাকলে কিছু হবে না। আচার্য এখানে এই কথা বলছেন। আচার্য মণ্ডন মিশ্রের কাছে গেলেন, বিরোধী পক্ষের, তা হোক; কিন্তু লোকটার দম আছে। ওকে তিনি হারিয়ে নিজের শিষ্য তৈরী করে নিলেন। তারপরই আচার্যের কথা সারা ভারতে ছড়িয়ে গেল।

যা কিছু কথা ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন, বেদব্যাস, যিনি সর্বজ্ঞ, সাতশটি শ্লোকে সব কথাকে তিনি গীতাতে লিপিবদ্ধ করে দিলেন। ভূমিকাতে আমরা এর উপর আলোচনা করেছি। এখন গীতাতে যা যা কথা আসবে, এটাকে আমরা ব্যাসদেবের কথা বলতে পারি, আবার শ্রীকৃষ্ণের কথাও বলতে পারি। বেদব্যাস সর্বজ্ঞ, কোথায় কি হচ্ছে তিনি সব কিছু জানেন, অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যা যা কথা বলেছেন, সেটাও তিনি জানেন। ব্যাসদেবের পক্ষে তাই এগুলও কোন ব্যাপারই না। শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য আমরা যাতে বুঝতে পারি সেইজন্যকে ব্যাসদেব নিজের মত করে গুছিয়ে, সহজ করে সাতশটি শ্লোকে বললেন। ব্যাসদেব সব কথা গীতাতে গুছিয়ে সুন্দর করে রেখে দেওয়ার পরেও আমরা গীতা পড়ে কিছু বুঝতে পারি না বলে শঙ্করাচার্য গীতার উপর ভাষ্য রচনা করলেন। আচার্য শঙ্কর যে ভাষ্য রচনা করলেন সেটারও অনেক কিছু আবার বোঝা যায় না, সেইজন্য আনন্দগিরি আচার্যের ভাষ্যের উপর টীকা লিখলেন। মধুসূদন সরস্বতী অনেক বড় মহাত্মা ছিলেন, তিনি দেখলেন, টীকা পুরোটা ঠিক হয়নি, অনেক ফাঁক থেকে গেছে। তিনি তাই শঙ্করাচার্যের ভাষ্যকে আধার করে আবার গূঢ়ার্থদীপিকার মত একটা মোটা বই লিখলেন। ভগবান অর্জুনকে ঠিক কি বলেছিলেন আমরা এখন জানতে পারব না। কিন্তু সমস্ত বেদের যে সার, বেদের যে মূল বক্তব্য, সেটাকে নিয়ে বেদব্যাস দাঁড় করিয়ে দিলেন গীতার মত এক কালজয়ী গ্রন্থ।

অনেকে নিন্দা করে বলে, আদৌ কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদের মত ঘটনা হয়েছিল; আদৌ কি যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এত কথা বলেছিলেন? আমরা এর উপর আগে আলোচনা করে নিয়েছি। আচার্য এখানে পরিষ্কার করে বলছেন, *তং ধর্ম ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিবব্ধ*, এই যে প্রবৃত্তিলক্ষণ আর নিবৃত্তিলক্ষন দুটি ধর্মের কথা অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, সেটাকেই ব্যাসদেবস সাতশটি শ্লোকের মধ্যে বেঁধে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কিছু কথা বলেছিলেন, হয়তো তিনি দশ মিনিট কি পাঁচ মিনিট বলেছিলেন কিংবা হয়তো কুড়ি মিনিটি ধরেও বলতে পারেন আর সেটা আলোচনার মাধ্যমে বলেছিলেন। এই পুরো কথাবার্তাটুকুকে ব্যাসদেব, যিনি একজন কবি, একজন সর্বজ্ঞ মানুষ, তিনি সাতশটি শ্লোকের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ করে সঙ্কলন করে দিলেন।

এরপর আচার্য বলছেন, *তদিদিং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞায়ার্থং তদর্থাবিষ্করণায় অনেকৈর্বিবৃতপদার্থবাক্য-বাক্যার্থন্যায়ং অপি অত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহ্যমাণং উপলভ্যাহং বিবেকতোহর্থনির্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি*। গীতা সমস্ত বেদের সার, এর অর্থ বোঝা খুব কঠিন। আচার্য শঙ্কর নিজেই বলছেন, গীতাকে ধারণা করা খুব কঠিন। আচার্য এও বলছেন, এর আগে আগে অনেকেই গীতার অর্থ বোঝানর চেষ্টা করেছিলেন, আমিও চেষ্টা করছি। গীতা বোঝা বা ধারণা করা কেন কঠিন, এর আগে এটাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গীতা কেন কঠিন যদি বলতে হয়, তাহলে বলা যায়, একদিক ওই বিশাল বেদ, যার

মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্যময় প্রার্থনা রয়েছে, সেই বেদের সারকে গীতায় রাখা হয়েছে; অন্য দিকে ভগবান যে কথাগুলো অর্জুনকে বললেন, সেটাকে সংক্ষেপে বিস্তার করছেন।

গীতার অর্থ বার করার জন্য অনেকেই পদচ্ছেদ, পদার্থ, বাক্যার্থ, আক্ষেপ ইত্যাদি নানান রকমের ভাষ্য লিখেছেন। সাধারণ ভাবে কোন কিছুর অর্থের ব্যাখ্যা করাকে ভাষ্য বলা হয়, কিন্তু ভাষ্যের ধরণ আলাদা হয়। টীকায় শুধু শব্দ ও তার অর্থ দেওয়া হয়। কিন্তু লোকেরা যখন এই ব্যাখ্যাগুলো পড়ছে, তখন তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। খুশবন্ত সিং একবার স্বামীজীর নামে লিখতে গিয়ে বলছেন, স্বামীজীকে পড়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু দেখছি সব জায়গায় contradiction। উচ্চমানের যে কোন জিনিসকে বোঝার জন্য বা ধারণা করার জন্য একটা ভাল ট্রেনিং লাগে। যে কোন লোককে গীতা ব্যাখ্যা করতে দিলে একটা না একটা ব্যাখ্যা করে দেবে। কিন্তু যেমনি বলা হবে, গীতার এই শ্লোক আর ওই শ্লোক তো মিলছে না, তখন আর এটাকে মেলাতে পারবে না। শুধু তাই না, অনেক জায়গায় এর দর্শন এমন হয়ে যায় যে, যেমন আচার্য অনেক জায়গায় বলবেন, শ্লোকের এই শব্দকে ব্যকরণের নিয়মে ভাঙলে শ্লোকের এই অর্থ হয়, কিংবা সাধারণ দৃষ্টিতে এই অর্থ হয়। কিন্তু এই অর্থ যদি নেওয়া হয় তাহলে আগে একটা শ্লোকে এই রকম যেটা বলেছেন, তার বিরোধী বক্তব্য হয়ে যায়। গীতা কখনই শ্লোক অনুসারে চলে না, পুরো ছবিটাকে একসাথে না নিয়ে অর্থ করতে গেলে এই সমস্যা হবে।

এনাদের একটা বিধি আছে, কোন শ্লোকের অর্থ যদি বলতে হয়, সেখানে তার সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়, সেই সীমার বাইরে কেউ যেতে পারে না। সেইজন্য এখানে এই অর্থ, সেখানে এর এই অর্থ, এভাবে অর্থ নিরূপণ করা যায় না। আচার্য তাই খুব সুন্দর কথা বলছেন, *অত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন*, অর্থ যখন বার করছে, তখন এক জায়গায় এক রকম অর্থ করছে, অন্য জায়াগায় অন্য রকম অর্থ করছে। সেইজন্য আচার্য খুব সুন্দর মিষ্টি করে বলছেন, *অহং বিবেকতোহর্থনির্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি*। আচার্য এখানে বলছেন, বিভিন্ন ভাষ্যকাররা এর আগে গীতার অর্থ বিভিন্ন ভাবে নিরুপণ করে গেছেন, লোকেদের মনে গীতার অর্থ নিয়ে এত রকম বিভ্রান্ত হওয়ার কারণে আমি খুব সংক্ষেপে গীতার অর্থ, গীতা ঠিক কি বলতে চাইছে, তার ব্যাখ্যা করলাম। আমাদের পরম্পরাতে বলা হয় যে, আচার্য তাঁর ষোল বছর বয়সে গীতার এই ভাষ্য রচনা করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের যে জীবনী আমরা পাই, তাতে বলা হয় যে, তিনি আট বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান, পরের চার বছর তিনি সাধনা করেন, তার পরের চার বছর তিনি উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা ষোল বছর বয়সে শেষ করেন। আগামী ষোল বছর সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে হিন্দু ধর্মের জাগরণ ঘটালেন এবং ভারতের চার প্রান্তে চারটি ধাম করে দিলেন। আচার্য শঙ্করই পঞ্চ দেবতার পূজা প্রবর্তন করেন। ব্যাসদেব যেমন একা হাতে হিন্দু ধর্মের সমস্ত শাস্ত্র রচনা করলেন, ঠিক সেইভাবে আচার্য শঙ্কর একা হাতে হিন্দু ধর্মকে একত্রিত করে একটা ছাতার নীচে নিয়ে এলেন। স্বামীজীও একা হাতে হিন্দু ধর্মকে বিদেশে নিয়ে গেলেন।

সত্যিই তাই হয়েছে, গীতার একটি শব্দ নেই যেটার অর্থ আচার্য বলেননি। একটি শব্দ নেই, যে শব্দের ব্যাখ্যা করার দরকার, আচার্য ব্যাখ্যা করেননি। বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে একজন আচার্য ছিলেন, তিনি বলতেন, যখনই কিছু লিখবে আচার্য শঙ্করের মত লিখবে, কোথাও যেন একটি অতিরিক্ত শব্দ না থাকে, যতক্ষণ খুব দরকার না হয় ততক্ষণ কোন উদাহরণ দেবে না, আর শেষে লিখবে, *ইতি শ্রুতে*। মহারাজদের মধ্যে মজা করা হয়, কোন মহারাজকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই কথা আপনি কোথায় শুনেছেন বা পেয়েছেন? উত্তর দেবেন, *ইতি শ্রুতে*। শ্রুতির অর্থ বেদ। আচার্য বলবেন, বেদেও এই রকম কথা আছে। কোথায় বলা হয়েছে? *ইতি শ্রুতে*, আপনি খুঁজে নিন। আমাদের কিছু লিখতে দিলে, যদি গরুর রচনা লিখতে দেওয়া হয়, প্রথমেই বলতে থাকব, রবীন্দ্রনাথ এই বলেছেন, স্বামীজী এই বলেছেন, নিজের কোন বক্তব্য নেই, রচনা পড়ে কেউ জানতে পারবে

না, গরুর চারটে পা নাকি দুটো পা। আচার্য কক্ষণ এভাবে বলবেন না, সব জায়গায় উনি নিজের বক্তব্য বলে যাবেন, কিন্তু যে জায়গাতে একটু বিতর্কমূলক মনে হবে, সেখানে তিনি শ্রুতি থেকে উদ্ধৃতি এনে দেখিয়ে দেবেন, শ্রুতিও এই কথা বলছে।

উদ্ধৃতি নেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যখনই কোন উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে কোন বাক্য নেওয়া হয়, তখন সেখানে পুরো বাক্যটাই বলতে হবে। দ্বিতীয়, আমি কথাটা বলছি, কিন্তু আপনি হয়ত মানবেন না, আপনি বলতে পারেন, তোমার কি অথরিটি বলার। তখন আমি বলব, রবীন্দ্রনাথও এই রকম বলেছেন। আপনি যদি রবীন্দ্রনাথকে না মানেন, তখন বলতে পারেন, আমি এই যুক্তিটা মানতে পারলাম না; এটাই নিয়ম। কিন্তু আমরা সবাই অমুক কি বলেছিলেন, তমুক কি বলেছিলেন উল্লেখ করতে থাকি, নিজের কোন বক্তব্য নেই। আচার্য কোথাও এভাবে কিছু বলবেন না। একটি শব্দ নেই যেটার উনি ব্যাখ্যা করবেন না, কোন জটিল, বিতর্কিত বিষয়কে ছাড়বেন না, অথচ ছোট ছোট করে বলবেন, সব কিছু জলবৎ পরিষ্কার, কোথাও কোন সংশয় আচার্য রাখেননি। কিন্তু তারপরেও আচার্যের ভাষ্যের উপর মধুসূদন সরস্বতী আবার একটা ভাষ্য লিখলেন। অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে, দরকার নেই, তা সত্ত্বেও মধুসূদন সরস্বতী কেন লিখলেন? তখনকার দিনে সাধু সন্ন্যাসীদের খুব বেশী কাজকর্ম থাকত না, কিন্তু একটা ভাল উচ্চ চিন্তন নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য ওনারা একটা কিছুর উপর ভাষ্য লেখাতে নেমে যেতেন।

এরপর আচার্য কি বলছেন, সংক্ষেপে আমরা বলে দিচ্ছি। আমরা আগে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপর আলোচনা করেছি। অভ্যুদয় হল জাগতিক উত্থান আর নিঃশ্রেয়স হল পরম কল্যাণ। আচার্য এখানে পরপর গীতা থেকে, অনুগীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অনেক কিছু বলছেন। আমরা এখানে প্রসঙ্গটাকে পাল্টে একটা অন্য বিষয়ের উপর বলছি। আমাদের ভাষায় অভ্যুদয়ের অর্থ হল সাংসারিক উত্থান, পুরুষার্থের দিক থেকে ধর্ম, অর্থ ও কাম। অন্য দিকে মোক্ষ হল পরম নিঃশ্রেয়স। আমরা যদি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের দিকে তাকাই, তখন কোথাও আমাদের মনে হয়, এই দুটো যেন পুরো আলাদা। আচার্যও প্রথমে বলছেন, বেদের দুটি ধর্ম – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। আমাদের অধিকারই নেই আচার্যের কথার বিরোধীতা করার, কিন্তু স্বামীজীর এই মত ছিল না। প্রবৃত্তি মানে কোন কিছুতে মনকে লাগানো আর নিবৃত্তি মানে মনকে তুলে নেওয়া। আমি এখন গীতার ক্লাশ শুনছি, এটা প্রবৃত্তি। ক্লাশের পর বাড়িতে গিয়ে বই পড়ব, এটা প্রবৃত্তি। তার মানে গীতার ক্লাশ শোনা থেকে নিবৃত্তি নিয়ে আমি বই পড়ছি, একটা থেকে নিবৃত্তি নিয়ে আরেকটা জিনিসে প্রবৃত্ত হলাম। যদি আমরা পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আলাদা কিছু না। কারণ প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিতে নিবৃত্তি লাগে। যেমন একজন গৃহবধূ রান্না করছিলেন, তিনি এখন টিভি দেখছেন। তার মানে তাঁকে আগে রান্না থেকে নিবৃত্ত হতে হয়েছে, তবেই তিনি টিভি দেখাতে প্রবৃত্ত হতে পারলেন। যে কোন প্রবৃত্তির আগে একটা নিবৃত্তি থাকবেই। বাচ্চাদের খেলায় নিবৃত্তি হলেই পড়াতে প্রবৃত্তি আসবে, পড়াতে নিবৃত্তি হলে তবেই সে খেলাতে প্রবৃত্ত হবে। প্রবৃত্তিতে আগে নিবৃত্তি থাকতে হবে, এটা খুবই উচ্চমানের কথা। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে এভাবে বলে দিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, সব কিছু তিনিই করেন, ওই আমি বোধটাও তিনিই রেখেছেন। তখন একজন বলছেন, কেন আমি বোধ তিনি রাখলেন? ঠাকুর তার উত্তরে বলছেন, তা নাহলে জগতে পাপের বৃদ্ধি হত, পাপকে কেউ ভয় পেত না। হিন্দুরা বলে, ঈশ্বরই আছেন, একজন খুনী সেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরেরই রূপ। একজন খুনী বা ধর্ষণকারী সেও ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছে, কোন ধর্ম এই সত্যকে নিতে পারবে না, অসম্ভব নেওয়া। আমেরিকাতে খ্রীশ্চানরা স্বামীজীকে বলত, How can you have a religion without sin, পাপ ছাড়া কি করে আপনারা ধর্মকে মানছেন? কিন্তু

একটু ভাল করে চিন্তা করলে দেখা যাবে, যে কোন প্রবৃত্তি, তা যতই নোংরা হোক, আসলে মানুষকে নিবৃত্তির দিকেই নিয়ে যায়।

খুন কে করে? যার মধ্যে হিংসা আছে। হিংসা ভাব কম বেশী আমাদের সবারই ভিতর আছে। মশারির ভিতর একটা মশা ঢুকে ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। বিরক্ত হয়ে রাত একটায় ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বেলে সেই মশাকে মারার জন্য অনেক কসরৎ করে একবার বাগে পেলে পিশে মেরে ফেলবে। কারণ ভিতরে হিংসার ভাবটা আছে কিনা। ভিতরের এই হিংসা ভাবকে যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তবে এটাই তাকে ক্রমশ নীচের দিকে নামিয়ে নামিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে বুঝতেও দেবে না। শেষে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাবে, একদিন সে কাউকে খুনও করে দিতে পারবে। প্রথম খুনটা করার পর হয়ত সে ধরা পড়ল না, বেঁচে গেল। এরপর দুটো খুন করবে, তিনটে খুন করবে। যেদিন সে ধরা পড়বে, সমাজ তাকে এমন শাস্তি দেবে যে তাতেই সে শিক্ষা পেয়ে যাবে। যদি না শিক্ষা হয়, তারপর আরও করবে। একজন লোক অন্যায় করতে থাকলে, প্রথমে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হল এগুলো অন্যায় কাজ, তাতে কাজ না হলে তিরস্কার করা হল, তাতেও না শোধরালে দণ্ড দেওয়া হল। এরপরও যদি শিক্ষা না পায়, তাহলে বুঝতে হবে এখনও তার বাকি আছে। যার শোনার একবার শুনেই নিজেকে শুধরে নেবে; যার বোঝার একবারেই বুঝে যাবে। যার এখনও সময় হয়নি, তাকে বোঝালেও বুঝবে না। উল্টে যে উপদেশ দিচ্ছিল তাকে বলবে, 'আপনি কি জানেন আমি কি সমস্যায় আছি? আপনি কি আমার সমস্যা জানেন, না জেনে জ্ঞান দিতে আসবেন না'। এদের দ্বারা কিছু হবে না, এদের যেমনি কিছু কেউ বলতে যাবে, উল্টে তাকে আরও চারটে কটূ কথা শুনিয়ে দেবে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ছিলেন সাক্ষাৎ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান, পরে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, বেলুড় মঠের ঠাকুরের মন্দিরের নকশা তিনিই করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন অস্টম এডওয়ার্ড, যাঁর সাম্রাজ্যে কখন সূর্য অস্ত যেত না। তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়নি। বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা, কত ক্ষমতাবান লোক। তিনি এক আমেরিকান মহিলার প্রেমে পড়েন। সেই মহিলাকে তিনি এমন ভালবাসলেন যে, নিজের স্ত্রী, রাজপ্রাসাদ, সাম্রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, শুধু ওই মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য। তখনকার ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের নিয়ম ছিল, পরিবারের কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না, ডিভোর্সিকে বিয়ে করতে পারবে না, এই ধরণের কিছু করলে তাকে রাজপরিবার থেকে চলে যেতে হবে; আরও অনেক রকম নিয়ম ছিল। দুটো পথ – হয় রাজ সিংহাসন ছাড় নয়ত মেয়েটিকে ছাড়। এডওয়ার্ড বললেন, আমি রাজ সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি সত্যিই বৃটিশের সাম্রাজ্যের সিংহাসন ছেড়ে দিলেন, যে সাম্রাজ্যে সূর্য কখন অস্ত যায় না। শ্রীরামচন্দ্রের কাছেও এই ধর্মসঙ্কট এসেছিল –প্রজার কল্যাণ করবেন, নাকি সীতার রক্ষা করবেন। একই সঙ্কট অষ্টম এডওয়ার্ডের কাছে এলো, এডওয়ার্ড বললেন, আমি এই মেয়েটিকে ছাড়তে পারব না। রাজ সিংহাসন ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সেই সময় একজন সন্ন্যাসী স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজকে বললেন, 'দেখলেন! লোকটা কি রকম স্ত্রৈণ! একটা মেয়ের জন্য কি কাণ্ড করল'। বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ শুনে বললেন, 'না না এটা কিছু না, এটাও ত্যাগেরই রূপ। যে লোকটি আজ ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য ছেড়ে দিল একটি মেয়ের জন্য, একটি মেয়েকে ছাড়তে তার কতক্ষণ লাগবে! এই জন্মে না ছাড়ুক, পরের জন্মে ছাড়বে, তা নাহলে পরের জন্মে ছাড়বে, এখানে কমন ব্যাপার হল ত্যাগ'। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের এই কথা পড়ার পর আমাদের হতবম্ব হয়ে যেতে হয়।

দেওঘরের রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের খুব সিনিয়র সাহেব মহারাজ স্বামী পাবনানন্দ স্বামী শিবানন্দের শিষ্য, শম্ভু মহারাজ নামেই তিনি বেশী পরিচিত ছিলেন। একবার দেওঘর বিদ্যাপীঠে

সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রের এসেছিলেন, একজন আইএএস অফিসারও তখন এসেছিলেন। ওই আইএএস অফিসার দেওঘর বিদ্যাপীঠে দু-তিন মাস পড়েছিলেন। আইএএস অফিসার কেরল থেকে বিহারে বদলি হতে চাইছিলেন। শম্ভু মহারাজের সাথে তাঁর পরিচয় করানো হল। উনি কোন দিকে মন দিতেন না, কথা বলার সময় বেশীর ভাগ সময় চোখ বন্ধ করে কথা বলতেন। তিনি সেই অফিসারকে খুব মিষ্টি করে বললেন, 'দেখো, এটাই হল ত্যাগের চিহ্ন। আজকে এটা তোমার ভাল লাগছে না, এটাকে ছেড়ে কাল যেটা নেবে সেটাও তোমার ভাল লাগবে না। এই করে ধীরে ধীরে মানুষ ঈশ্বরের দিকে এগোচ্ছে'। এই হল একজন উচ্চমানের সন্ন্যাসী, একজন আইএএস অফিসার রাজ্য পাল্টাতে চাইছেন, সেখানেও তিনি ত্যাগের আদর্শ দেখছেন।

এই ত্যাগের ভাব যখন তুঙ্গে চলে যায়, তখনই ধর্মের জন্ম হয়। আমরা অনেক সময় বলে থাকি, তোমার কোন কিছুতেই শান্তি হয় না, তুমি কোন কিছুতেই খুশী হও না। কারণ যেটা পেয়েছে সেটাকে ফেলে দিয়ে আর-একটা ধরছে, সেটাকেও ফেলে দিয়ে আর-একটা পেতে চাইছে, এই ভাবে সে এগিয়ে যাচ্ছে, সে নিজেকে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভাল ছেলে, চরিত্রবান গরুর মত বসে আছে, একে নিয়ে কি হবে! কিন্তু দুর্দান্ত ছেলে, তাকে আটকানো যাচ্ছে না। আসলে সে কিন্তু উন্নতি করছে। এরপর একটা অবস্থায় গিয়ে তার মধ্যে প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা আসবে। স্বামীজী বলছেন, ধর্ম কখন শুরু হয়? যখন প্রচণ্ড dissatisfaction আসে, কোন কিছুতেই তার আর শান্তি পায় না, আমার আর লাগবে না। ঈশোপনিষদের শেষের দিকে আছে, ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে প্রার্থনা করছেন, এই যে আমার আসা-যাওয়া চলছে, একবার জন্মাচ্ছি, জন্মে মরছি, মরে আবার জন্মাচ্ছি, আমি তিতি বিরক্ত হয়ে গেছি, আমার আর লাগবে না। *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্,* আবার জন্ম হবে, আবার মরব, আবার কোন মায়ের গর্ভে গিয়ে দশ মাস বাস করতে হবে, বিরক্তি ধরে গেছে, complete dissatisfaction, ধর্ম তখন শুরু হয়। যদি তোমার মনে হয়, সব কিছুতেই তুমি সুখী আছো, তাহলে বুঝে নাও, তোমার এখনও সময় হয়নি। কোথাও একটা বিরক্তির ভাব থাকতে হবে, তবে বিরক্তির মধ্যে একটা আদর্শ থাকলে পরিষ্কার বোঝা যায়।

সমস্যা হল, এসব কথা কাঁচা মনের লোকেদের বললে, ট্রেনিং পাইনি এমন লোকেদের বললে, তাদের কাছে এটা একটা ভুল বার্তা হয়ে চলে যাবে। আজ যে অনাচার করে বেড়াচ্ছে, বর্তমান কালে আজকে এই ছেলের সাথে ঘুরছে, কাল অন্য ছেলের সাথে ঘুরছে, এই মেয়ে আজকে যে ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করছে, কাল অন্য ছেলের সাথে, পরশু আর-একটা ছেলের সাথে বন্ধুত্ব করছে। এরা বলবে, কেন, আমি তো ধর্মের পথেই এগোচ্ছি। ঠিকই বলছ, তুমি এগোচ্ছ, কিন্তু লম্বা রাস্তা নিয়ে ফেলেছ। কারণ তোমার কাছে পরিষ্কার নেই যে, তুমি কেন এগোচ্ছ। যত তুমি এগুলো করতে থাকবে তোমার অনাচার বাড়বে। এই করে করে তুমি গোল্লায় যাবে, তোমার সর্বনাশ হবে, অনেক জন্ম তুমি পিছিয়ে যাবে। পিছোতে পিছোতে এমন গাড্ডায় গিয়ে পড়বে যে তুমি সেখান থেকে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না কোন সৎপুরুষ তোমার দিকে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে দিচ্ছে।

যতক্ষণ তুমি স্থির ততক্ষণ তুমি মৃতবৎ হয়ে আছ, যতক্ষণ তুমি মুভ করছ ততক্ষণ তুমি মুক্তির দিকেই এগোচ্ছ। এটা হল স্বামীজীর ভাব। প্রবৃত্তি বলে কিছু হয় না, যেটা হয় নিবৃত্তিতেই হয়। এটাকে আচার্য সমন্বয় করছেন, কিন্তু অন্য ভাবে। আচার্য বলছেন, স্বর্গাদির যে কামনা হয়, এটা আমাদের কাছে highest প্রবৃত্তি, এটাই যখন অনাসক্ত ভাবে করা হয়, এটা আমার কর্তব্য তাই করছি, তখন এটাই মুক্তির কারণ হয়ে যায়।

তার মানে তিনটে পথ এসে গেল। একটা হয় ত্যাগের পথ, যেখানে কর্ম ত্যাগ। দ্বিতীয় হয় কর্মযোগ, লেগে আছি, কারণ আমি একটা কিছু হতে চাইছি। সেখান থেকে আসছে, আমার এটা

কর্তব্য, তাই আমি এটা করছি, now you are as good। যিনি ত্যাগী আর যিনি যোগী, দুটো সমান হয়ে গেল। কর্ম ত্যাগ আর কর্মফল ত্যাগ দুটো প্রায় একই রকম হয়ে যায়। কর্ম ত্যাগে তাও বিপদ থাকে, কারণ যারা অলস, ফাঁকিবাজ, সে বলতে পারে আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। কোন সন্ন্যাসীকে কিছু একটা কাজ করতে দিলে বলবে, সবাইকে কি কাজ করতে হবে, আগের জন্মে সব কাজ করা হয়ে গেছে। এই ধরণের অপদার্থদের দিয়ে কোন কাজ হয় না। শাস্ত্রের দুটো কথা শিখে নিয়েছে, হজম করতে পারিনি, তাই যেখানে সেখানে বমন করে যাচ্ছে।

আচার্য মোটামুটি তিনটে category আনছেন, যার মধ্যে গীতা ঘুরঘুর করবে – কর্ম, কর্মফল ত্যাগ ও কর্মত্যাগ। কিন্তু আমরা যদি গভীর ভাবে দেখি, তখন দেখা যাবে সবটাই এক। কাজ করতে করতে একটা সময় বিরক্ত হয়ে গিয়ে মনে হবে, আমি এসব কি করছি।

অনেক আগেকার কথা, স্বামী সুহিতানন্দজী তখন দেওঘর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি নূতন ব্রহ্মচারীদের বলতেন, দেখ, যারা বিয়ে-থা করে, তারা মনে করে ভোগ করব, তারপর কিছু দিন পর দেখে, সারাটা জীবন গরুর মত সংসারে খেটে যাচ্ছে। একটা লোক স্কুলে শিক্ষকতা করে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে, তারপর কিছু টিউশিনিও করছে। কিন্তু কত টাকা সে নিজের জন্য খরচ করে? নিজের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ সহজ, কারণ ছেলেমেয়েকে দিতে হবে, স্ত্রীকে দিতে হবে, বাবা-মার ওষুধপত্রের জন্য দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত হিসাব করে দেখলে দেখা যাবে, তার নিজের জন্য খুব বেশী হলে তিন থেকে চার হাজার তার মাসে খরচ হয়। বাকি পুরো টাকাটা অপরের জন্য খরচ হয়ে যায়। এরপরেও যদি বৈরাগ্য না আসে, আর কবে বৈরাগ্য আসবে! গাধার মত খাটনি আমি কার জন্য খাটছি? এখান থেকে বেরোনর কোন উপায় নেই। বিয়ে করে এনেছে, একটা দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে, আবার তুমি বলবে আমি বৈরাগী হব, স্ত্রী কি তোমাকে অত সহজে ছেড়ে দেবে! এইভাবে দু জন্ম, চার জন্ম চলবে, তখন একটা সময় বলবে, আমার আর লাগবে না, আমাকে ছেড়ে দিন। ঠাকুর গরুর বর্ণনা করছেন, গরু হাম্বা হাম্বা করে, তাকে কত পেটায়, রোদে, জলে লাঙল টানায়, পেটপুরে খেতে দেয় না, তারপর মরার পর কসাইএর কাছে নিয়ে যায়, সেখানে ছাল চামড়া ছাড়ায়, তারপর তার নাড়িভুড়ি দিয়ে তাঁত তৈরী হয়, সেই তাঁত যখন ধুনুরীর হাতে পড়ে তখন বলে তুঁহু তুঁহু। ঠাকুর বোঝানর জন্য বলছেন। যতক্ষণ 'আমি আমি' থাকবে ততক্ষণ সে সংসারে ফেঁসে থাকবে। সংসারে সবাই সবাইকে শুষে নিচ্ছে, কেউ বুঝতেও পারছে না।

বিদেশে এক চিত্রকরের আঁকা একটা বিখ্যাত ছবি আছে। একটা ঘোড়া, তার পিঠে ঘা, সেই ঘায়ের উপর মাছি ভন ভন করছে। তার অর্থ হল, ঘোড়াটি সারাদিন বাইরে খাটছে, সারাদিন খাটার পর বাড়ি এসেছে, বাড়িতে আসার পর বাড়ির সব মাছিগুলো তার ঘায়ের উপর বসে তাকে শুষছে। বাইরে সে খেটে যাচ্ছে, বাড়ির ভিতরে মাছিরা তাকে শুষছে। আমাদের জীবনটাও তাই, বাইরে খেটে যাচ্ছে। সারাদিন খাটাখাটনির পর বাড়ি ফিরেছে, সন্তান বাবা বাবা বলে দৌড়ে এসেছে, তার মানে এবার সে কিছু আদায় করবে। কথামৃতে ঠাকুর খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, গিন্নী খুব সুন্দর করে অনেক পদ রান্না করে স্বামীকে খেতে দিয়েছে, স্বামী খুব সুখে তৃপ্তি করে খাচ্ছে। পাশ থেকে গিন্নী বলতে শুরু করেছে, 'ওগো জানো, পাশের বাড়ির ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে কেমন সুন্দর একটা গয়না কিনে দিয়েছে'।

ভগবান এই প্রসঙ্গটা শেষ করছেন এই বলে, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ*। তোমার ভালমন্দ যা কিছু আছে, সব ছেড়ে ঈশ্বরের শরণ নাও। গীতার এটাই উদ্দেশ্য। গীতার মর্ম হল, ত্যাগ কর, তা নাহলে কর্মফল ত্যাগ কর, এবং শেষে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ সমর্পণ। এর বাইরে গীতায় অন্যান্য যে আলোচনা গুলো আসে, এগুলো হল গীতার বাইপ্রোডাক্ট। গীতার মূল উদ্দেশ্য হল, মানুষকে মুক্তির দিকে অর্থাৎ পরম নিঃশ্রেয়সের দিকে

নিয়ে যাওয়া। তার আগে নিষ্কাম কর্ম করে মন শুদ্ধি করতে হবে, মন শুদ্ধ হলে জ্ঞান, আর পূর্ণত্যাগ, সবটারই মূলে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ সমর্পণ।

সব বলার পর আচার্য শেষে বলছেন, *ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং। পরমার্থতত্ত্বং বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতঃ অভিব্যঞ্জয়দ্বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেভিধেয়বদ্‌গীতাশাস্ত্রং যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ। অতঃ তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া*। পরম কল্যাণ, এটাই প্রয়োজন। *যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিঃ*, যদি গীতাশাস্ত্রের অর্থ বুঝে নেওয়া হয়, তাহলে সমস্ত পুরুষার্থের, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সিদ্ধি হয়ে যায়। *অতঃ তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া*, আগে আচার্য বললেন আমি সংক্ষেপে গীতার অর্থের ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছ, এখন বলছেন, সেইজন্য আমি গীতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।

আমাদের মনে হয়, আচার্য যখন ভাষ্য লিখতে শুরু করেছিলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল, গীতা এত কঠিন যে এর পুরো ব্যাখ্যা হবে কি হবে না। এর আগে চারটে কথা বলা হয়েছিল, প্রয়োজন, অধিকারী, বিষয় ও সম্বন্ধ। গীতার ঠিক ঠিক অধিকারী হল, যে নিজের পরমকল্যাণ চাইছে। বিষয় হল, আচার্য বলেননি, কিন্তু আনন্দগিরি যিনি আচার্যের ভাষ্যকে আধার করে যে গূঢ়দীপিকা লিখেছেন, তাতে তিনি বলছেন, গীতার বিষয় হল, পরমব্রহ্ম = বাসুদেব (কৃষ্ণ) = পরমার্থ, পরমার্থ হল জীবনে কৃষ্ণপ্রাপ্তি। কৃষ্ণপ্রাপ্তি মানেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তার মানে গীতার বিষয়বস্তু কৃষ্ণেরই রূপ। গীতার প্রতিটি অধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজের বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন। আসলে কৃষ্ণের বর্ণনা নয়, এগুলো হল পরমব্রহ্মের বর্ণনা, সেই পরমব্রহ্ম তিনিই হলেন বাসুদেব। গীতার প্রয়োজন কি? প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি দ্বারা নিঃশ্রেয়স বর্ণনা। মুক্তি কিভাবে পাওয়া যাবে? প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দিয়ে। সম্বন্ধ হল, গীতাতে বিষয় আর অধিকারীর সম্বন্ধ। যে কোন অধিকারী যদি এই বিষয়কে বুঝে নিয়ে পালন করে, তাহলে তার প্রয়োজন সিদ্ধি হবে। এটাই আচার্যের উপোদ্‌ঘাৎ বা সম্বন্ধ ভাষ্য। এরপর আমরা গীতার মূল গ্রন্থে প্রবেশ করব। এখন আমরা গীতার প্রথম অধ্যায় অর্জুনবিষাদযোগ আলোচনা করতে যাচ্ছি।

প্রথম অধ্যায়

অর্জুনবিষাদযোগ

কিছু সাধারণ বর্ণনা আর তার সাথে অর্জুনের বিষাদের বর্ণনা, এই নিয়ে প্রথম অধ্যায় – অর্জুনবিষাদযোগ। প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের বিষাদের বর্ণনা ছাড়া বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা করার নেই। সাধারণ বর্ণনাগুলির ব্যাখ্যা করার কিছু নেই। এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটাই খুব তাৎপর্যপূর্ণ। গীতার প্রথমের দিকে ভূমিকাতে বলা হয়েছিল, ব্যাসদেবের প্রচুর যোগ ক্ষমতা ছিল। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম থেকে অন্ধ। পরে পরে ভাষ্যকাররা জন্মান্ধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞানের দিক থেকে অন্ধ, সন্তানের মোহে একেবারে মোহান্ধ হয়ে পড়ে আছেন। ব্যাসদেব যুদ্ধের পূর্বে ধৃতরাষ্ট্রকে গিয়ে বললেন, 'তুমি জন্মান্ধ, কিন্তু তোমাকে আমি দিব্যদৃষ্টি দিচ্ছি, যার ফলে তুমি যুদ্ধে যা যা হবে সবটাই তুমি নিজের চোখে ঘরে বসেই দেখতে পারবে'। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, 'আমি এই চোখে এই বিরাট নরসংহার দেখতে চাই না'।

ধৃতরাষ্ট্রের সারথি ছিলেন সঞ্জয়, খুবই বিশস্ত, প্রায় মন্ত্রীর মর্যাদায় ছিলেন। সঞ্জয় আবার ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন, আর খুব প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ব্যাসদেবের কোন বাছ-বিচার ছিল না, কে ক্ষত্রিয়, কে শূদ্র, ভাল আধার পেলে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিতেন। সঞ্জয় সূত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাসদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। সঞ্জয়কে তিনি সেই দিব্যদৃষ্টিটা দিলেন। এই জায়গাতে এসে, অনেক কিছু পরিষ্কার বোঝা যায় না। কোথাও কোথাও মনে হয় যুদ্ধের সময় সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের কাছেই বসে থাকতেন। কিন্তু মহাভারতে এর কোন সাক্ষ্য নেই, বরং বর্ণনা আছে, সঞ্জয়কে কৌরবদের হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে দেখা যাচ্ছে।

যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্মের পতন হওয়ার পর সঞ্জয় হতাশ হয়ে হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের পতনের খবর দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র এই মর্মান্তিক সংবাদ নিতে পারছিলেন না। তিনি সঞ্জয়কে বললেন, 'তুমি প্রথম দিন থেকে আমাকে পুরোটা বিস্তারে বলো'। এখান থেকে গীতার শুরু। এই অংশটাকে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলেন, তার মানে মহাভারতে পরে সংযোজন করা হয়েছে। আগেকার কিছু কিছু ভাষ্যকাররা এটাকে আখ্যায়িকা বলছেন। কঠোপনিষদে যেমন যমরাজ আর নচিকেতার সংলাপ, এটা একটা আখ্যায়িকা, একটা গল্প। গল্পের মাধ্যমে দুটো চরিত্রকে রেখে পুরো একটা শাস্ত্র দাঁড় করা হয়েছে। কিন্তু আচার্য বলছেন, যেটা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, অর্জুনের মধ্যে বিষাদ এসেছে, এরপর অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যা কিছু বলেছিলেন, সেটাকে ব্যাসদেব সাতশটি শ্লোকে নিবদ্ধ করে দিলেন।

এখানে একটা মজার ব্যাপার দেখার আছে, প্রথম অধ্যায়ে পর পর কয়েকজন রাজা বা যোদ্ধার নাম আসছে। মহাভারতে যেখানেই যুদ্ধের বর্ণনা এসেছে, তার প্রত্যেকটিতে যোদ্ধার বর্ণনা আছে। গীতা যদি কেউ পরে রচনা করে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করে থাকেন, তাহলেও তিনি এত সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে করেছেন যে, খুব সুন্দর ভাবে খাপে খাপে বসে গেছে। আমাদের কাছে ঐতিহাসিকতার কোন দাম নেই, আমাদের কাছে মহাভারত, গীতা হল আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বেদের পুরো আধ্যাত্মিক ভাব কিভাবে উপনিষিদে নিহিত। আর সব উপনিষদের যা বক্তব্য, সেটা গীতাতে এসেছে, আর তার সাথে ভক্তির কথাও এসেছে। কারণ উপনিষদে যদিও ভক্তির কথা আছে, কিন্তু গীতার মত এত পরিষ্কার ভাবে নেই। যাই হোক, ভীষ্মের পতনের খবর শোনার পর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলছেন –

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।।১।।

(ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন – হে সঞ্জয়, পূণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়ে কি করেছিল?)

কিমকুর্বত সন্ধি ভাঙলে হয় *কিম্+অকুর্বত*। *কিম্ অকর্বুত* বলাতে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সঞ্জয় কোন ধারাভাষ্য দিচ্ছেন না। *অকুর্বত* শব্দের অর্থ হল, কি করল তারা? কি করছেন বলছেন না। অনেক নেতা, গণ্যমান্য লোকেরা বড় বড় গলায় বলতে থাকেন, মহাভারতের সময় টেলিভিশনের টেকনলজি ছিল, সঞ্জয় টিভি দেখে ধৃতরাষ্ট্রকে সুন্দর ভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ধারাবিববরণী দিয়ে যাচ্ছেন। এরা একবার যদি শাস্ত্রটা খুলে পড়েন, তাহলে তাঁদের এই অজ্ঞতাগুলো পরিষ্কার হয়ে যেত। বাচ্চা বয়সে ঠাকুরমা, দিদিমার কাছে যে গল্প শুনে এসেছে, সেই গল্পগুলিই জ্ঞান রূপে এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে পরিষ্কার, গীতা শুরুই হচ্ছে *কিম্ অকুর্বত* দিয়ে, *অকুর্বত* শব্দের অর্থ হয় গত দশ দিনে কি হয়েছে। এটা যদি ধারাভাষ্য হত, তাহলে বলা হত, কি করছে।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের কাছে জানতে চাইছেন, আমার সন্তান আর পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধারা সমবেত হয়ে কি করলেন। *যুযুৎসবঃ*, যুযুৎস শব্দের অর্থ যুদ্ধ করার ইচ্ছা। এখানে আমরা দুটো শব্দকে নিয়ে আলোচনা করছি, *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে*। গীতার নাম যখনই বলা হয় তখন সবাই এই *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে* এই দুটোকেই মনে রাখে। ধর্ম মানে যে কোন জিনিসের স্বভাব বা স্বরূপ, যেমন অগ্নির ধর্ম হল দহন করা, দাহ্য শক্তি। সেইজন্য কোন জিনিসকে পরিভাষিত করার সময় বলা হয়, যে জিনিসটা ওটাকে ধরে আছে। গীতায় ধর্ম নিয়ে আলোচনা অনেক বার আসবে, বিশেষ করে স্বধর্ম, আমরা তখন বিস্তারে আলোচনা করব। যেটা আমাকে ধরে আছে, সেটাই ধর্ম। যেমন ঠাকুর মানুষকে পরিভাষিত করতে গিয়ে বলছেন, যার মানে হুঁশ আছে, অর্থাৎ আমিত্ব বোধ যার আছে। পরে অর্জুনকে বোঝাতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলবেন, তোমার আমিত্ব ক্ষত্রিয় ধর্মে, তুমি যে বীর এটাই তোমার আমিত্ব, এটাকে নষ্ট হয়ে যেতে দিও না। বাইবেলে যীশু খুব সুন্দর বলছেন, লবণের লবণত্ব যদি চলে যায়, ওটাকে তখন পাথর বলে ফেলে দেওয়া হবে। যেমন স্বামী-স্ত্রী, স্বামী হওয়া মানেই তার একটা ধর্ম এসে গেল, ঠিক তেমনি স্ত্রী হলেই তার একটা ধর্ম এসে গেল। ছাত্রের ধর্ম কি? বলেন, *ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ*। অধ্যয়ন করাটাই ছাত্রের ধর্ম, যদি অধ্যয়ন না করে, তাহলে আর সে ছাত্র নয়। একটা সময় আমাদের রচনা লিখতে দেওয়া হত, ছাত্রের রাজনীতি করা ঠিক কিনা। ছাত্রের কাজ হল অধ্যয়ন করা, রাজনীতি করবে কি করবে না, এই প্রশ্ন আসে কোথা থেকে। ছাত্রের ধর্মই হল অধ্যয়ন করা, যদি তা না করে, সে আর ছাত্র না।

একবার নকশাল আন্দোলনের সময় কিছু ছাত্রকে পুলিশ লাঠি চালাতে সবাই চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। ছাত্রদের উপর লাঠি চালানোর প্রতিবাদে সবাই সমালোচনা করতে শুরু করে দিল। সমালোচনা করার কি আছে, ওরা তো ক্রিমিনাল, অধ্যয়ন ছেড়ে দিয়েছে মানেই তারা আর ছাত্র নয়।

কিন্তু শাস্ত্রে গিয়ে ধর্মের অর্থটা বিশেষ হয়ে যায়। সেখানে ধর্মের একটা সংজ্ঞা হল, ধর্ম অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করায়, আর প্রাপ্ত বস্তুর বৃদ্ধি করে। যে জিনিসটা আমার কাছে নেই, সেটা এনে দেবে, আর যে জিনিসটা আমার আগে থেকেই আছে সেটার বৃদ্ধি করবে। যেমন আমার টাকা নেই, সে আমাকে টাকা পেতে সাহায্য করবে; টাকা যদি আগেই থেকে থাকে, সেটার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। শাস্ত্রে যখন ধর্মের অর্থ আসে, তখন এই অর্থেই আসে। এখানে যখন ধর্মক্ষেত্রে বলছেন, তখন এই অর্থেই বলা হচ্ছে। হিন্দু জীবনদর্শনে চার পুরুষার্থের কথা বলা হয়। আমি কেন বেঁচে আছি? হিন্দুদের মনে অনেক আগেই এই প্রশ্ন জেগেছিল। হিন্দুরা বলে, যতদিন তোমার মুক্তি না

হচ্ছে, ততদিন তোমার জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলতে থাকবে। এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে যদি বেরোতে চাও, যদি তুমি উপরের দিকে যেতে চাও, তাহলে তোমাকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থের সাধনা করতে হবে।

খুব সংক্ষেপে অর্থ হল, টাকা-পয়সা ন্যায় পথে অর্জন করা। অর্থ মানুষের শরীরের চাহিদা থেকে মুক্তি দেয়। যেমন আমাদের ক্ষুধা আছে, শরীর রক্ষার জন্য একটা আশ্রয় দরকার, শরীরকে রোগব্যাধি থেকে মুক্ত রাখা দরকার। অর্থ থাকলে দেহের যা যা আবশ্যিক চাহিদা, সেগুলো মেটানো সম্ভব। মনের মধ্যে চাঞ্চল্য থাকে, কাম মনকে এই চাঞ্চল্য থেকে মুক্তি দেয়। প্রথমটা শরীর থেকে, দ্বিতীয়টা মন থেকে মুক্তি দেয়। মন থেকে মুক্তি দেওয়া মানে, মনের মধ্যে ভোগের ইচ্ছা আছে, মনটা ছটফট করছে, ভোগ হয়ে গেল, মনটাও শান্ত হয়ে গেল। ধর্ম মানুষকে অশুভ যোনি থেকে রক্ষা করে। মৃত্যুর পর পরের জন্মে কুকুর বেড়াল বা কোন তীর্যক প্রাণী বা অসুর, রাক্ষস যোনিতে জন্ম নেওয়া থেকে ধর্ম রক্ষা করে। মোক্ষ জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি দেয়। হিন্দু ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। মুক্তি ছাড়া হিন্দু ধর্ম আর কিছু জানে না। শুধু যে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি তা না, দেহের চাহিদা থেকে মুক্তি, মনের চাহিদা থেকে মুক্তি, মৃত্যুর পর শুভ যোনি না পাওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্তি আর জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। আগে যে ধর্মের সংজ্ঞায় বলা হল, অপ্রাপ্ত বস্তুকে প্রাপ্ত করায়, প্রাপ্তকে সমৃদ্ধ করে, এখানে ধর্মক্ষেত্রের ধর্মও একই অর্থে বলা হচ্ছে।

ধর্মে কিছু করণীয় জিনিস থাকে আবার কিছু অকরণীয় বা নিষিদ্ধ জিনিস থাকে। যে কর্মগুলি করতে বলা হয়, সেগুলিকে বলছেন বিধি। এর মধ্যে নিত্যকর্ম থাকে, যে কর্ম আমাদের প্রত্যেক দিন করতে হবে, যেমন জপধ্যান, পূজা, পাঠ ইত্যাদি। নৈমেত্তিক কর্ম, বিশেষ সময়ে যে কর্মগুলি করতে হয়। কিছু আবার আছে কাম্য কর্ম, ভোগের ইচ্ছার জন্য যে কর্মগুলি করা হয়। যেমন কোন কিছু একটা পেতে চাইছি, তখন একটা যজ্ঞ করল। তার সাথে আছে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, একাদশী ব্রত পালন করা, তীর্থে যাওয়া, এগুলো প্রায়শ্চিত্ত কর্মের মধ্যে পড়ে। এগুলো আবার একটার সাথে আরেকটা মিলেমিশে যেতে পারে। যেমন গঙ্গাস্নানাদি একজনের কাছে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম হতে পারে আবার যারা গঙ্গার কাছাকাছি থাকে তার রোজ গঙ্গায় স্নান করে, গঙ্গাস্নানটা তার কাছে নিত্যকর্ম। গঙ্গা থেকে যারা অনেক দূরে থাকে, তাদের কাছে গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাস্নান করাটা একটা তীর্থ হয়ে যায়; একটা বিশেষ দিনে গঙ্গায় স্নান করল।

আগেকার দিনে, অর্থাৎ হাজার হাজার বছর আগে বেদের সময় যে ঋষিরা ছিলেন, ওনাদের কাছে ধর্মের অর্থ ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞ করাটাই তাঁদের ধর্ম ছিল, যে কোন জিনিসের জন্য ওনারা যজ্ঞ করবেন। আগে যে নিত্যকর্মের কথা বলা হল, যজ্ঞটাও তাঁদের নিত্যকর্ম ছিল, যেমন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম। কেরলে, মহারাষ্ট্রে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁরা এখনও নিত্য অগ্নিহোত্র করেন। সকাল বিকাল অগ্নিতে বৈদিক মন্ত্রে আহুতি দেন আর অগ্নিকে সব সময় প্রজ্জ্বলিত রাখেন। অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে কখন নির্বাপিত করা হয় না, চব্বিশ ঘন্টা প্রজ্বলিতে থাকে।

সেখান থেকে ধীরে ধীরে তাঁরা একটা ধারণা নিয়ে এলেন, সব সময় সবাইকে কেন যজ্ঞ করতে হবে, কারণ মনই হল আসল। এরপর এই যজ্ঞ চলে গেল তপস্যাতে। তখন ধর্মের অর্থ হয়ে গেল, তপস্যা করা, উচ্চ চিন্তন করা, মনন করা ইত্যাদি। একটা জিনিসকে নিয়ে বা ঈশ্বর চিন্তনে বা আত্মার চিন্তনে একজন ডুবে আছেন, এটাও ধর্ম। মহাভারতে এসে ধর্মের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই পাল্টে গেল। মহাভারতে ধর্ম হয়ে গেল স্বধর্ম। যে যেখানে আছে, যে জাতিতে আছে, যে বর্ণে আছে, যে আশ্রমে আছে, যে বংশে আছে, সেখানে তার যা যা কর্তব্য, সেই কর্তব্য পালন করাটাই ধর্ম। যেমন

একজন ব্যাধ, সে শিকার করে না, কিন্তু মৃত পশুর মাংস কেটে বিক্রী করছে, মহাভারত দেখাচ্ছে সেই ব্যাধও পুরোপুরি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত।

নারী জাতিকে নিয়ে অন্যান্য ধর্ম থেকে, বিদেশ থেকে হিন্দুদের কত রকম নিন্দা করা হয়, তারা বলে যে হিন্দুরা নারীদের সব দিক দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। আসলে মেয়েদের বেঁধে রাখা হয়নি। হিন্দু সমাজ একমাত্র সমাজ, যে সমাজে নারীদের সব থেকে বেশী স্বাধীনতা ছিল। বেদের সময় ঋষিদের সাথে ঋষিকারা ছিলেন, তাঁরাও ঋষিদের সাথে বেদের মন্ত্র রচনা করেছেন। আর স্বয়ম্বরের প্রথা ছিল, যেখানে একজন মেয়ে নিজেই নিজের স্বামীকে বেছে নিতে পারত। আবার এও দেখা যেত ছেলে মেয়ে উভয় উভয়কে পছন্দ করে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করছে, দুষ্মন্ত শকুন্তলা কাহিনীতে যেমন আছে। মেয়েদের সব রকম স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু পরে কোথাও সামাজিক স্তরে এসে কিছু একটা গোলমাল লেগে গেল, যার সাথে মূল হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্কই নেই।

ব্যাসদেব এসে বললেন, আগে দেখ, তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারটেই তোমার উদ্দেশ্য কিনা। একজন আদর্শ গৃহিণী হয়েও তুমি এই চারটে পুরুষার্থ সাধন করতে পারবে। এর জন্য তোমাকে কোন তপস্যা করতে হবে না। তপস্যার একটা গ্ল্যামার আছে, সুবিধাও আছে; যজ্ঞেরও একটা গ্ল্যামার আছে, সুবিধাও আছে। তুমি দেখ তোমার উদ্দেশ্য কি গ্ল্যামার, নাকি তোমার কোন কামনা পূরণ করা? কামনা পুর্তির ব্যাপার যদি হয়, তাহলে তোমাকে ঘরবাড়ি ছাড়তে হবে না। সংসারে থেকেও তুমি স্বধর্ম পালনের মাধ্যমে এই চারটে পুরুষার্থের সাধন করতে পারবে। অনেক পড়াশোনা করা লোকেরা হিন্দুদের নিয়ে অনেক সমালোচনা করে, এরা কেউ হিন্দু ধর্মের গভীরে গিয়ে দেখতে চায় না। হিন্দুদের সব কিছুই খুব খোলামেলা, শুধু একটা জিনিস, মুক্তিকে ওরা ধরে রেখেছে। হিন্দুদের আচার-আচরণ, বিধি-নিষেধ সব কিছু মুক্তি কেন্দ্রিক, আমার মুক্তি কিভাবে হবে। এরপর তুমি যজ্ঞ করে ধর্ম পালন করবে, নাকি তপস্যা করে পালন করবে, নাকি স্বধর্ম পালন করবে, এটা তোমার ব্যাপার, তুমি নিজে ঠিক করে নাও। মুসলমানদের যেমন পাঁচটা জিনিস সবাইকে করতেই হবে, হিন্দুদের এই ধরণের কিছু নেই, খুব লিবারাল সোসাইটি, সব খুলে রেখেছে। কিন্তু সেই খোলার মধ্যেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমা বেঁধে দিয়েছে –এটা করবে, ওটা করবে না। কিন্তু সেটাও খুব অনমনীয় নয়। মহাভারত পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়, হিন্দু ধর্ম কাউকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে না।

আমরা এখানে তিনটে জিনিসকে নিয়ে এলাম, যজ্ঞ, তপস্যা ও স্বধর্ম। স্বধর্ম নিয়ে গীতায় পরে বিস্তারে আলোচনা চলবে। আমাদের কিছু প্রাচীন গ্রন্থাদি আছে, যেমন জাবাল উপনিষদ, সৎপথ ব্রাহ্মণ, সেখানে অনেক কিছুর বর্ণনা পাওয়া যায়; যেমন বলছেন, কুরুক্ষেত্রকে পূণ্যভূমি বলা হত, সেখানে তপস্যা করলে, যজ্ঞ করলে ফল দেয়। প্রাচীন কালে কোন ঋষি হয়ত একটা সময় কুরুক্ষেত্রে তপস্যা করেছিলেন। সব ধর্মেই এই ব্যাপারটা আছে, যেমন বৌদ্ধ ধর্মে, তিনি যেখানকারই বৌদ্ধ হন, জাপানের হোক, ইন্দোনেশিয়ার হোক, ওদের একটা ইচ্ছা থাকে যে, আমাকে বুদ্ধগয়ায় যেতে হবে, কারণ ভগবান বুদ্ধ ওখানে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কপিলাবস্তুতে না গেলেও বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করবে, কারণ সেখান ভগবান বুদ্ধের বোধি প্রাপ্তি হয়েছিল। তেমনি মুসলমানদের জন্য মক্কা বা খ্রীশ্চানদের জন্য জেরুজালাম।

কিন্তু এখানে ধর্মক্ষেত্র বলতে এটা হিন্দুদের তীর্থস্থান নয়, ধর্মক্ষেত্রের অর্থ হয়, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খুব ভাল স্থান। আজকের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে নেগেটিভ ইমোশান, নেগেটিভ এনার্জির কথা খুব শোনা যায়। যদিও এগুলো একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, এগুলো দিয়ে কিছু হয় না। কিন্তু একটা যেটা হয়, একজনের সংস্পর্শে এলে, আমার নিজের চিন্তা-ভাবনার জন্যই হোক বা সেই লোকটার জন্যই হোক, আমার ভিতরে কিছু একটা হতে থাকে। হিন্দুরা এই জিনিসটাকে খুব বেশী মানে।

স্থানমাহাত্ম্যের কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। স্থানমাহাত্ম্য হল, প্রত্যেকটা দ্রব্যের যেমন তন্মাত্রা থাকে, ঠিক তেমনি সব স্থানেরই তন্মাত্রা থাকে। বিভিন স্থানে বিভিন্ন রকম তন্মাত্রার তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। কিছু কিছু স্থান আছে, সেখানে যদি কিছু দিন থাকা হয় সেই স্থানের একটা ভাইব্রেশান পাওয়া যায়। যেমন ভোগের স্থানে গেলে, আমাদের মনে ভোগের যে বাসনাগুলো থাকে, সেগুলো জেগে ওঠে। একটা প্রচলিত কথা আছে, কাশীতে সকালবেলায় আধ্যাত্মিক তরঙ্গ চলতে থাকে, বৃন্দাবনে নাকি মাঝ রাত্রিতে চলে। একজন মহারাজ স্বামী ভূতেশানন্দজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বেলুড় মঠে কখন আধ্যাত্মিক তরঙ্গ প্রবল থাকে'? স্বামী ভূতেশানন্দজী হেসে বলছেন, 'চব্বিশ ঘন্টা'। তাই বেলুড় মঠে থেকে কেউ যদি জপধ্যান করে, তার আধ্যাত্মিক উন্নতি অনেক দ্রুত হবে।

স্বামীজীও এই জিনিসটাকে নিয়ে বলতেন, তিনি মনে করতেন, কেউ যদি কোন গুহায় বসে ধ্যান করে, বা শুভ চিন্তন করে, তার এই শুভ চিন্তন কখন নষ্ট হবে না। ওই শুভ চিন্তন দিয়ে সে বিশ্বকে সমৃদ্ধ করছে। লোকেরা মানুক আর না মানুক, তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু এটা সত্য। অন্ধের কাছে সূর্যের কোন দাম নেই, তার কাছে সূর্য নেই, তাই বলে সূর্যের অস্তিত্ব তো চলে যাবে না। আমরা যে তীর্থ করতে যাই, তীর্থের স্মৃতির জন্য আমরা যাই না। অন্যান্য ধর্মে তীর্থে স্মৃতির জন্য যায়। বুদ্ধ ভগবান হয়ে গেলেন, তাতে আমার কি, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ছিলেন, তাতে আমার কি, স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোতে বক্তৃতা দিয়ে প্রচুর হাততালি পেয়েছিলেন, তাতে আমার কি হল, সেটাকে নিয়ে আমি কি করব। আপনার সম্পত্তির খবর জেনে আমার কি হবে, আপনার গুণগান করে আমার কি হবে। হিন্দুরা এদিকে যাবেই না, সেইজন্য কার জন্মস্থান, কার মৃত্যুস্থান এই জিনিসগুলো হিন্দুদের কাছে ছিলই না। হিন্দুদের কাছে সব সময় উদ্দেশ্য ছিল আত্মোন্নতি। সেই জায়গাতে গিয়ে যদি আমার মনে হয় এখানে একটা ভাইব্রেশান আছে, তাহলে আমি সেখানে গিয়ে আরও জপধ্যান করব। যদি মনে হয় আমার আধ্যাত্মিক উত্থান হচ্ছে, তাহলে সেই জায়গার বিশেষ দাম আছে। বেলুড় মঠে যখন উৎসবাদি হয় তখন অনেক লোক খিচুরী খেতে আসে আবার সারা ভারতে যে পকেটামারদের এ্যসোসিয়েশান আছে, তাদের লোকেরাও আসে, ওরা ওদের আধ্যাত্মিক উত্থানের জন্য আসে না, পকেট উত্থানের জন্য আসে। আর ছেলে আর মেয়েরা যারা হাতে হাত ধরাধরি করে আসে, ওরা সবাই আসছে প্রেমের উত্থানের জন্য। এগুলো তো আমাদের উদ্দেশ্য না, আমাদের উদ্দেশ্য হল, আমার আধ্যাত্মিক উত্থান হবে কিনা।

কামাখ্যা মন্দিরের কথা বললেই আমাদের মনে ভেসে উঠবে যে, কামাখ্যা হল খুব নামকরা শক্তিপীঠ। ওখানে মায়ের পা পড়েছিল, কি যোনি পড়েছিল, সেটার জন্য কামাখ্যার দাম কি? তা না, পরের দিকে এই সব তীর্থের সাথে অনেক রকম পৌরাণিক কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কোন এক কালে ওখানে নিশ্চয়ই বড় কোন সাধক সাধনা করেছিলেন। স্মৃতি রূপে নিশ্চয়ই যাওয়া যেতে পারে। কামারপুকুর ঠাকুরের জন্মস্থান, একদিন দুদিনের জন্য ঘুরতে যাওয়া হল, খুব ভাল। কিন্তু কামারপুকুরের একটা আলাদা দাম এইজন্যই আছে, কারণ আগেকার অনেক মহারাজরা ওখানে অনেক সাধন-ভজন তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু বেলুড় মঠ সবারই রাজা। এখানে বসে একটু জপধ্যান করার চেষ্টা করলে সহজেই মন বসে যাবে। সিনেমা হলে বসে জপধ্যান করার চেষ্টা করলে মন বসতে চাইবে না।

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা থাকার অর্থই হল, এই স্থানে আগেকার দিনে অনেকেই তপস্যা করেছিলেন, তাই এখানে তপস্যা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে আর্যরা পশ্চিম দিক থেকে ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। মনুস্মৃতি লেখার সময় দেখা যায় সেখানে ভারতবর্ষ বা আর্যবর্তকে পরিভাষিত করছেন, কালো হরিণ যত দূর চলে অর্থাৎ কাল হরিণ যেখানে যেখানে আছে, এটাই ভারতবর্ষ। মূলতঃ এটাই গাঙ্গেয় উপত্যকা।

কুরুক্ষেত্র এই ভূমির কেন্দ্রে অবস্থিত, সেইজন্য কুরুক্ষেত্রে আর্য সভ্যতা খুব পুরনো আর পবিত্র বলে মনে করা হত। তার সাথে বলা হয়, গ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে গ্রহণের পাপ লাগে না। সম্রাট আকবরও গ্রহণের সময় আগ্রা ছেড়ে কুরুক্ষেত্রে চলে আসতেন। এই হল কুরুক্ষেত্রের মাহাত্ম্য। দিল্লী থেকে চণ্ডীগড়ের দিকে যাওয়ার সময় চণ্ডীগড় আর আম্বালার মাঝামাঝি জায়গায় কুরুক্ষেত্র অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির জন্য অনেক চেষ্টা করলেন, হস্তিনাপুরে নিজে গিয়ে কৌরবপক্ষকে বোঝালেন, কিছুই হল না। কর্ণকে আলাদা ভাবে বার করে এনে একান্তে অনেক বোঝালেন। কর্ণকে এটাও বললেন যে, তুমি জ্যেষ্ঠ কুন্তি পুত্র, তুমি পাণ্ডবদের দিকে চলে এসো। কর্ণ রাজী হলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রকে দেখিয়ে বললেন, এই জায়গাটা সমান ভূমি, জলের সুবিধা আছে, আর এখন শরৎকাল, সব দিকে প্রশস্ত সময়, তুমি তোমার সেনাবাহিনী নিয়ে এসো। পাণ্ডবরা তখন বিরাট রাজার ওখানে ছিলেন, পাঞ্জাবের দিকে। এবার ধীরে ধীরে সেখান থেকে উভয়পক্ষের সেনারা কুরুক্ষেত্রে এসে হাজির হয়েছে।

মহাভারতে বর্ণনা আছে, ঠিক যুদ্ধের আগে উভয়পক্ষের সেনারা সমবেত হওয়ার পর, সেখানে ঘোষণা করা হল, এখনও যদি আপনাদের কারুর মনে হয় কেউ ভুল দিকে আছেন তাহলে শিবির পাল্টে নিতে পারেন, কারণ এটা ধর্মযুদ্ধ। তখন শেষ মুহূর্তে একজন দুজন শিবির বদল করে নিয়েছিলেন। বাকিরা সব এবার তৈরী। এরপর ঠিক হবে কে সেনাপতি হবে। কৌরবদের পক্ষ খুব শক্তিশালী, বড় বড় রথী মহারথীরা আছেন, ভীষ্ম আছেন, দ্রোণাচার্য আছেন, কর্ণ আছেন। কিন্তু আগে ভীষ্ম কর্ণকে কিছু কটূ কথা বলাতে কর্ণ বলে দিলেন যত দিন ভীষ্ম সেনাপতি থাকবেন, ততদিন আমি যুদ্ধ করব না। শ্রীকৃষ্ণ তখন কর্ণকে আরও একবার বলছেন, 'ভীষ্ম থাকলে তুমি যুদ্ধ করবে না, ততদিন তুমি পাণ্ডবদের পক্ষে এসে যুদ্ধ করো, পরে না হয় তুমি কৌরবদের দিকে চলে যেও'। এর অর্থটা কি? এই যুদ্ধ হল তোমার শৌর্য, বীর্য, তেজ দেখানোর একটা মহা সুযোগ। কতকটা মোহনবাগ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মত। একবার এক ফুটবল খেলোয়াড়কে, যে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে মোহনবাগানে চলে গিয়েছিল, জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনার অস্বস্থি লাগে না, এতদিন যাদের হয়ে খেললেন, এখন থেকে তাদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে'? খেলোয়াড়টি খুব অবাক হয়ে বলল, 'অস্বস্থি লাগবে কেন, এটা তো ক্লাব, আজ আমি এই ক্লাবে আছি, সামনের বছর অন্য ক্লাবে যাব'। ইদানিং আইপিএলএ কয়েকটা টিমের মধ্যেই প্লেয়ারগুলো ঘুর ঘুর করে, যে টিম টাকা বেশী দিল সেই ক্লাবে চলে গেল। এখানে ছিলে শৌর্য দেখানো, একদিকে ধর্মযুদ্ধ, অন্য দিকে নিজের শৌর্য দেখানো। কর্ণ এবারও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। দুর্যোধন জানত, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু, তাঁকে কেউ হারাতে পারবে না, সেইজন্য তাঁকে সেনাপতি করল। পাণ্ডবদের মধ্যে অনেক আলোচনা হওয়ার পর, তাঁরা ঠিক করলেন আমাদের সেনাপতি হবেন দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন, যজ্ঞ থেকে যাঁর জন্ম। দ্রোণাচার্যকে সে বধ করবে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল, পরে একটা কথা আসবে। যুদ্ধে একজন সেনাপতি থাকেন, আর তার নীচে অনেকেরই সৈন্য থাকে। ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধরা যাক, ধৃষ্টদ্যুম্ন কমাণ্ডার ইন চীফ, তাঁর নীচে অর্জুন আছেন, ভীম আছেন, এনাদের অনেকেরই আলাদা করে অনেক সেনা থাকত। পরবর্তিকালে যে যুদ্ধ হত, তখন যিনি নামকরা কমাণ্ডাররা ছিলেন, যেমন জুলিয়াস সিজার, আলেকজাণ্ডার, এনারা হলেন সেন্ট্রাল কমাণ্ডার। আলেকজাণ্ডার যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন, সামনা সামনি অনেক সময় যুদ্ধ হত, যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছেন, আর পুরো সেনাবাহিনীও এগিয়ে যেত, মনে হত যেন পুরো একটা শরীর এগিয়ে যাচ্ছে। ইরানের রাজা ছিলেন ডারিয়াস, যাকে আলেকজাণ্ডার বিভিন্ন ভাবে পরাস্ত করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার নিজের সেনাবাহিনীকে কয়েকটা টুকরো করে বলে দিলেন, তোমরা এই সময় পিছন দিক থেকে আক্রমণ করবে। ডারিয়াসের

সৈন্যবাহিনী অনেক শক্তিশালী ছিল, কিন্তু হেরে যায়। নেপলিয়ন, চেঙ্গিস খাঁ এরাও খুব নামকরা কমাণ্ডারস। চেঙ্গিস খাঁও সিঙ্গল আর্মি নিয়ে চলত।

নেপলিয়নই এসে প্রথম এই জিনিসটাকে পাল্টে দিলেন। তিনি যুদ্ধের কৌশলটাই পাল্টে দিলেন। নেপলিয়ন corpus system করলেন, সৈন্যবাহিনীকে তিনি কয়েকটা টুকরোতে ভেঙে দিলেন। আর প্রত্যেকটি টুকরো নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ। তার ঘোড়া আছে, কামান আছে, সবটাই আছে। একটা সেনা, কিন্তু তার মধ্যে যেন পাঁচ খানা সেনা, কেউ কারুর সাথে যুক্ত নয়। আর বিভিন্ন জায়গা থেকে নেপলিয়নের কাছে খবর আসত। মহাভারতের যুদ্ধ, traditional যুদ্ধ আর নেপলিয়নের corpus system, দুটোর combination। এক-একজন যাঁরা কমাণ্ডার ছিলেন, তাঁর complete army। এই নয় যে, যে হাতি দেখছে, সে হাতিই দেখছে, যেমন পোরাস যখন যুদ্ধ করছিলেন, ওটা single army। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ, যেমন অর্জুনের সেনা নিজের মধ্যে complete, ভীমের সেনা নিজের মধ্যে complete। অথচ ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে পুরো জিনিসটা চলছে, formationটা একটু অন্য ধরণের ছিল। বলা হয়, হিন্দুদের যুদ্ধ কৌশল খুব উচ্চমানের ছিল, এটা কোন কাহিনীকে আধার করে বলা হচ্ছে না। এমনকি আলেকজাণ্ডার যুদ্ধ করতে করতে যখন ভারতে এলো, তখন তাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল, মগধের রাজার সাথে তুমি যুদ্ধ করতে পারবে না। আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ কৌশলটাকে চন্দ্রগুপ্ত নিয়ে ভারতের যুদ্ধের কৌশলকে আরও উন্নত করে দিল। সেইজন্য সেলুকাসকে এখানে এসে বেদম মার খেতে হল। এই হল মহাভারতের তখনকার যুদ্ধ কৌশল।

কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ মিলে মোট আঠারো অক্ষৌহিনী সৈন্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। কৌরবদের এগারো অক্ষৌহিনী আর পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিনী। এত চেষ্টা করেও পাণ্ডবরা কিন্তু বেশী লোক নিজেদের দিকে টানতে পারেননি। কারণ বেশীর ভাগ লোকেরা মনে করছিল কৌরবরাই ঠিক। এখানে একটা শব্দ আসবে চমূ, তিন নম্বর শ্লোকেই এসে যাবে। 1:1:3:5, একটি হাতি এবং একটি রথ। যত হাতি থাকবে তার তিন গুণ হবে ঘোড়া, হাতির পাঁচ গুণ হবে সৈন্য। এটা হল একটা ইউনিটের ফরমেশান, তার মানে একটা ইউনিটে একটা হাতি, একটা রথ, তিনটে ঘোড়া আর পাঁচজন সৈন্য। চমূতে থাকে সাতশ ঊনত্রিশ হাতি, ৭২৯ হাতি মানে ৭২৯টি রথ, ২১৮৭ ঘোড়া আর ৩৬৪৫ পদাতিক সৈন্য। অক্ষৌহিনীতে এই সংখ্যাটা অনেক বেড়ে যায়, চমূর তিরিশ গুণ হয়ে যায়। এক অক্ষৌহিনীতে ২১,৮৭০ হাতি, সম সংখ্যক রথ, ৬৫,৬১০ ঘোড়া এবং ১,০৯,৩৫০ পদাতিক সৈন্য। এখন আঠারো অক্ষৌহিনীতে পদাতিক সৈন্য হবে প্রায় আঠারো লক্ষ, তার সাথে রথ, হাতি, ঘোড়া এসবও রয়েছে। এটাকে নিয়েই অনেকে বলে একটা জায়গায় এত কিছু সমাবেশ কি কখন সম্ভব! মহাভারত, রামায়ণের কাহিনীকে আমরা গল্প বলিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু এটা তো সবাইকে মানতে হবে যে, বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডারকে ভারতে এসে থেমে যেতে হয়েছিল, তার মধ্যে একটা প্রধান কারণ ছিল ভারতের সৈন্য ক্ষমতা আর নিপুণ রণকৌশল। যাই হোক, *ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে.....*, এখান থেকে গীতা শুরু। তারপর ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় বিস্তারে বলতে শুরু করছেন –

সঞ্জয় উবাচ
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবনীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ।।২।।

(সঞ্জয় বললেন – তখন রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্যদের বূহ্যাকারে সজ্জিত দেখে আচার্য দ্রোণের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন।)

সঞ্জয় এবার প্রথম থেকে কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা দিতে শুরু করেছেন, দু পক্ষই ব্যূহ রচনা করে পরস্পরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, ভীষ্ম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের সেনাদের নিজের নিজের মত

সাজিয়েছেন। তখন দুর্যোধন আচার্য দ্রোণের কাছে গিয়ে বললেন, 'এই দেখুন আমাদের সেনারা এই ভাবে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়িয়েছে'। যদিও কুরুক্ষেত্রের মত একটা ছোট্ট জায়গায় এত লোকের সমাবেশকে নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু কিছু আঁলা ছবি যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন সেখানে দেখানো হয়েছে, বিরাট মাঠ, সেই বিশাল মাঠে দু পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কুরুক্ষেত্রে এত লোক, এত রথ এবং হাতি, ঘোড়া কি করে সমবেত হতে পারে, এটাকে বুঝতে হলে আমাদের এই ছবিগুলোই দেখতে হবে। সৈন্য সংখ্যার বর্ণনা অতিশয়োক্তি কিনা আমাদের জানা নেই। তবে মহাভারতে যুদ্ধের যে বর্ণনা আমরা পাই, আর প্রত্যেকটা নাম করে করে যে লড়াইয়ের বর্ণনা আছে, তাতে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারে যে, এই লড়াই খুব সাধারণ লড়াই ছিল না। বেদেও একটা যুদ্ধের বর্ণনা আছে, যেখানে দশজন রাজার মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। তেমনি মহাভারতের এই যুদ্ধেও তখনকার দিনে ভারতের যত বড় বড় রাজারা ছিলেন, সবাই ওর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। আবার অনেক রাজা নিজের রণকৌশল ও বীরত্ব দেখাবার জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। সেইজন্য এত লোকের সমাবেশকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে নিজের সৈন্যদের দেখিয়ে পাণ্ডবদের সৈন্যদেরও দেখাচ্ছেন।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা।।৩।।

(হে আচার্য, আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই ব্যূহ রচনা করেছেন। আপনি পাণ্ডবদের এই বিপুল সৈন্যসমাবেশ অবলোকন করুন।)

এর আগে আমরা 'চমূ' নিয়ে কথা বললাম, চমূ হল কতকটা নেপলিয়নের corpusএর মত, চমূরের কম্বিনেশান হল 1:1:3:5, হাতি, রথ, ঘোড়া ও সেনা এই অনুপাতে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৈন্যদল। কেউ যদি বলে একটি চমূ থেকে একটা হাতি বা দুটো ঘোড়া নিয়ে যাবে, তা কখনই নেওয়া যাবে না, যখন চলবে পুরোটাই এক সঙ্গে চলতে থাকবে। দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে পাণ্ডব সৈন্যদের দেখিয়ে বলছেন, এই দেখুন পাণ্ডবদের মহতী সেনা। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদের পুত্র, আবার দ্রোনাচার্যের শিষ্য। যজ্ঞ থেকে জন্ম, জন্মাবার পর প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রশিক্ষা দরকার, দ্রোণের কাছে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আনা হল। সবাই দ্রোণকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মই হয়েছে আপনাকে বধ করবার জন্য, একে কী আপনি শিক্ষা দেবেন'! দ্রোণাচার্য বললেন, 'ওর যদি জন্ম হয়ে থাকে আমাকে বধ করার জন্য, আমি যদি ওকে শিক্ষা নাও দিই, তাও সে আমাকে বধ করবে, মাঝখান থেকে আমি কেন আমার ধর্ম ছাড়ব'! ধর্ম বলতে এখানে আচার্যধর্ম। দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে শিক্ষা দিলেন। দুর্যোধন এখন এটাই বলছেন, ওই যে আপনার ধীমান শিষ্যকে দেখুন। এগুলো কাব্যিক বর্ণনা। তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্যিকারের একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। মহাভারতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে একজন মহারথী বলা হয়েছে, তার মানে অর্জুনের সমকক্ষ। অর্জুন বিরাট বড় যোদ্ধা ঠিক, কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরো সময় পাণ্ডবদের সেনাপতি হয়েই থাকলেন। অন্য দিকে কৌরবদের সেনাপতি পাল্টাতে থাকল। দুর্যোধন বলছেন, ওই দেখুন আপনার ধীমান শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কে কে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে শুধু নামগুলো আছে, এখানে বর্ণনা করার কিছু নেই, তার সাথে যে কিছু কিছু চারিত্রিক গুণ, সেটারও কোন দাম নেই।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।।৪।।
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ।।৫।।

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ।।৬।।

(এই পাণ্ডবসেনাদের মধ্যে যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের সমকক্ষ সাত্যকি, মৎস্যরাজ বিরাট, মহাযোদ্ধা দ্রুপদ, শিশুপালের পুত্র ধৃষ্টকেতু, যদুবংশীয় বীর চেকিতান, মহাবীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, রাজা কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, পাঞ্চালদেশীয় রাজা পরাক্রমশালী যুধামন্যু ও মহাশক্তিধর উত্তমৌজা, সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং অন্যান্য মহাধনুর্ধর বীরপুরুষগণ আছেন। এনারা সবাই মহারথী।)

সমবেত যোদ্ধাদের মধ্যে সবাই কেউ রথী, অতিরথী ও মহারথী। রথী, অতিরথী ও মহারথী এই তিনটে শ্রেনীতে বিভাগ করা হয়, রথী একটু নীচের দিকে, অতিরথী আর মহারথী, inter changeable। অতিরথী ও মহারথীর তফাৎটা ঠিক বোঝা যায় না, কারণ যাঁকে এখন অতিরথী বলছেন, আবার কখনো তাঁকেই মহারথী বলছেন। মহারথী মানে খুব বড় যোদ্ধা, এর মধ্যে একজন হলেন সাত্যকি, ইনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতম শিষ্য বলে মনে করতেন। শ্রীকৃষ্ণের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন কৃতবর্মা, তিনি আবার কৌরবদের দিকে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ আবার অর্জুনের সারথি, এদিকে সাত্যকি কৃষ্ণ ছাড়া কোন কথাই বলবেন না। সেইজন্য যদুকুলের সমস্ত সেনা কৌরবদের দিকে চলে গেলেও সাত্যকি কৃষ্ণকে ছেড়ে কৌরবদের দিকে যায়নি। সাত্যকি পুরো সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, মানে পাণ্ডবদের দিকেই থাকলেন। পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন মৎস্যদেশের রাজা বিরাট, যার রাজ্যে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় ছিলেন, পাণ্ডবদের শ্বশুর দ্রুপদ আছেন। এদের সাথে আছেন, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, অভিমন্যু আর দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র। এনারা সবাই মহারথী। পাণ্ডব পক্ষের যোদ্ধাদের দেখানোর পর দুর্যোধন বললেন, এবার আমাদের পক্ষে যাঁরা যাঁরা আছেন দেখে নিন।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে।।৭।।

(হে বিপ্রবর, আমাদের পক্ষে যে-সকল বিশিষ্ট যোদ্ধা ও সেনাপতি আছেন তাঁদেরকে অবগত হন। আপনার অবগতির জন্য তাঁদের নাম বলছি।)

আমাদের দিকে যাঁরা বড় বড় যোদ্ধা ও সেনাপতিরা আছেন, আপনার অবগতির জন্য এবার তাঁদের কথা বলছি শুনুন।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথাঃ।।৮।।

(আমাদের পক্ষে আপনি ছাড়া ভীষ্ম, কর্ণ, সমরজিৎ কৃপ, অশ্বত্থামা, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আছেন।)

ভবান্ মানে আপনি, আপনি হলেন আমাদের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, আর আছেন প্রধান সেনাপতি ভীষ্ম, কর্ণ যদিও তখন যুদ্ধ করছে না, কিন্তু সাথে আছে, সমরবিজয়ী কৃপাচার্য, কৃপাচার্য দ্রোণাচার্যের শ্যালক, অশ্বত্থামা, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভুরিশ্রবা ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যাক্তজীবিতাঃ।।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদঃ।।৯।।

(আমার জন্য প্রাণ দান করতে কৃতসঙ্কল্প অন্যান্য অনেক বীর আছেন। এনারা সকলেই নানা শস্ত্রনিক্ষেপে সুদক্ষ ও যুদ্ধনিপুণ।)

আরও অনেক বীর আছেন, যাঁরা আমার জন্য প্রাণ ত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প এবং এনারা সবাই অস্ত্র ও প্রহরণ পরিচালনায় সুদক্ষ ও যুদ্ধনিপুণ।

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম।।১০।।

(হে আচার্য, পিতামহ ভীষ্ম কর্তৃক সুরক্ষিত আমাদের সৈন্যদল অপরিমিত(যুদ্ধজয়ে সমর্থ), কিন্তু ভীম কর্তৃক পরিচালিত পাণ্ডবসৈন্য পরিমিত(যুদ্ধজয়ে অসমর্থ)।)

বলছেন, ভীষ্ম দ্বারা রক্ষিত আমাদের সৈন্যবল *অপর্যাপ্তং*, অর্থাৎ অপরিমিত। বাংলায় যখন পর্যাপ্ত বলছি, তখন তার অর্থ হয় প্রচুর, অপর্যাপ্ত মানে কম, কিন্তু সংস্কৃতে অপর্যাপ্ত মানে সীমাহীন, আর পর্যাপ্ত মানে সীমিত। ভীমের সেনা অর্থাৎ পাণ্ডবদের সেনা সীমিত, কিন্তু আমাদের সেনা সীমাহীন, অপর্যাপ্ত, প্রায় দ্বিগুণ। একটু কম হলে তো এক আর দুইএর অনুপাত হয়ে যাবে। পর্যাপ্তের অর্থ হচ্ছে পরি+য়াপ্ত = পর্যাপ্ত, মানে সীমিত, একটা নির্দিষ্ট সীমানা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। আর অপর্যাপ্ত মানে হচ্ছে যেটার কোন সীমা দিয়ে নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না। কিন্তু হিন্দী, বাংলাতে এসে পর্যাপ্তের অর্থ হয়ে যায় sufficient, আর অপর্যাপ্তের অর্থ less than sufficient, আর সংস্কৃতে অপর্যাপ্তের অর্থ হচ্ছে more than sufficient, এই জন্যই বলা হয় সংস্কৃত খুব জটিল ভাষা। আসলে দুর্যোধন বলতে চাইছেন – আমাদের সৈন্য অপরিমেয়, আর ভীমের সৈন্যবল পরিমিত।

এখানে আরেকটা সংশয় এসে যায়, এর আগে বলছেন *দ্রুপদপুত্রেণ* আবার এখানে বলছেন *ভীমাভিরক্ষিতম্*। একবার ভীষ্মের সাথে ধৃষ্টদ্যুম্নের তুলনা করে এখানে ভীমের কেন তুলনা করা হচ্ছে, ভীম তো প্রধান সেনাপতি নন? একদিকে ভীষ্ম যাদের রক্ষা করছেন আরেক দিকে ভীম যাদের রক্ষা করছেন, হঠাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম না করে ভীমের কথা কেন বলা হল, কারণ ভীমতো প্রধান সেনাপতি নন? আসলে এগুলো কিছুই নয়, এগুলো হচ্ছে কবিতার ছন্দকে একটা ধারাতে নিয়ে যাবার জন্য শব্দের ব্যবহার, ভীষ্ম আর ভীম শব্দ দুটি খুব কাছাকাছি উচ্চারণ, ছন্দ মেলানোর জন্য এই ধরণের ব্যবহার কবিতাতে প্রয়োগ করার স্বাধীনতা কবিদের দেওয়া থাকে। কবিদের এমন স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয় যে প্রধান সেনাপতির নামটাই পাল্টে দেওয়া হল। যারা মহাভারত না পড়ে প্রথমেই যদি গীতা অধ্যয়ণ করে তারা বলবে দ্রুপদের পুত্রের নাম কি? ভীম। পুরো তালগোল পাকিয়ে যাবে। কেননা আগে বলা হয়েছে দ্রুপদের পুত্র, দ্রোণাচার্যের শিষ্য পাণ্ডবদের প্রধান সেনাপতি, ভীমও দ্রোণাচার্যের শিষ্য, তাহলে দ্রুপদের ছেলের নাম ভীম। কবিতা পড়তে গেলে এই সমস্যা আসবে। ছন্দ মেলানোর জন্য, কাব্যিক সৌন্দর্যকে বাড়াবার জন্য কবিদের এই ধরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে। আবার অন্য দিকে ভীমের নাম করে কোন ভুল কিছু করা হয়নি, কারণ ভীম নিজেই প্রচণ্ড শক্তিশালী, যে দলে ভীমের মত বিরাট শক্তিধর আছে তাদের সহজে পরাজিত করা যাবে না। শুধু যে প্রধান সেনাপতির উপরে সমস্ত সৈন্যের দায়ীত্ব থাকে তা নয়, অন্যান্য বড় বড় যোদ্ধাদের উপরেও অনেক গুরু দায়ীত্ব থাকে। কিন্তু এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কবিতার ছন্দ মেলানো, আর শ্রুতি মধুর করার জন্যই ভীমের নাম করা হয়েছে।

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি।।১১।।

(এখন আপনারা সকলে নিজ নিজ বিভাগানুসারে সব ব্যূহদ্বারে অবস্থিত থেকে ভীষ্মকেই সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন।)

দুর্যোধন তখন আচার্যকে বলছেন, 'আপনারা এখন নিজের নিজের জায়গায় অবস্থান করুন এবং সর্বপ্রকারে ভীষ্মকে রক্ষা করুন, কারণ তিনি হলেন আমাদের অর্থাৎ কৌরবদের সেনাপতি'। কারণ ভীষ্মকে যদি একবার পাণ্ডবরা বন্দি করে নিতে পারে, তার মানে, কৌরব সৈন্যবাহিনীর পরাজয় হয়ে গেল। আগেকার দিনের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি সামনে থেকে লড়াই করতেন, এখনকার দিনের প্রধান সেনাপতি পিছন থেকে পুরো যুদ্ধকে পরিচালনা করে থাকেন। সেইজন্য দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বলছেন, আপনারা সবাই পিতামহ ভীষ্মকে সব দিক থেকে রক্ষা করুন।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।।১২।।

(কুরুকুলের প্রতাপশালী প্রবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম উচ্চ সিংহনাদপূর্বক শঙ্খধ্বণি করতে লাগলেন এবং তাতে দুর্যোধনের হৃদয় হর্ষপূর্ণ হয়ে উঠল।)

যুদ্ধে সবাই প্রস্তুত হয়ে আছেন। ভীষ্ম, যিনি প্রধান সেনাপতি, তিনি এবার উচ্চ সিংহনাদে শঙ্খধ্বণি করলেন। এতক্ষণ বিভিন্ন বড় বড় প্রধান যোদ্ধাদের বর্ণনা করা হচ্ছিল। এবার বিভিন্ন সেনানায়করা যে যে শঙ্খ ব্যবহার করতেন, তাঁর কথা বলছেন। এখনকার দিনের যুদ্ধেও নানা ধরণের ড্রাম, বিউগেল থাকে। আগেকার দিনে যুদ্ধে শঙ্খধ্বণি করা হত। বিভিন্ন যে যোদ্ধারা ছিলেন, তিনি তাঁর যে শঙ্খ দিয়ে শঙ্খধ্বণি করতেন, সেই শঙ্খের ধ্বণি শুনে তাঁর সৈন্যরা বুঝতে পারতেন, আমার সেনাপতি শঙ্খ বাজিয়ে আমাদের সজাগ করে দিচ্ছেন বা কোন সঙ্কেত দিচ্ছেন। শঙ্খধ্বণি শুনে বোঝা যেত যুদ্ধ এখন কি অবস্থায় আছে। পিতামহ ভীষ্ম শঙ্খধ্বণি করে দুর্যোধনের মনে আনন্দবিধান করলেন। দুর্যোধন বুঝে গেল, যুদ্ধ এবার আরম্ভ হতে যাচ্ছে, আর দুর্যোধন নিশ্চিত ভাবে ভেবে রেখেছিলেন যে, তিনিই এই যুদ্ধে জয়লাভ করবেন। কারণ তাঁর সেনার সংখ্যা বেশী, তাঁর পক্ষের রথী, মহারথীরা খুব যুদ্ধপারদর্শি। এখন পর পর কয়েকটা শ্লোকে শঙ্খের বর্ণনা চলবে।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহনন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ।।১৩।।

(পিতামহ শঙ্খধ্বণি করতেই রণক্ষেত্রে অসংখ্য শঙ্খ, ভেরী, ঢাক, মৃদঙ্গ ও রণশিঙ্গা বেজে উঠল। সেই রণবাদ্য এক ভয়াবহ আবহাওয়া তৈরী করল।)

নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র রয়েছে, যার সাহায্যে যোদ্ধাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হয়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ঢোলক আছে, বড় বড় ঢাক রয়েছে, বিভিন্ন ধরণের শঙ্খ, ভেরী আছে, সব রণবাদ্য হঠাৎ করে তুমুল সশব্দে বেজে উঠল, যা কিনা শত্রুপক্ষের ভয়দায়ক হয়ে উঠল।

ততঃ শ্বেতৈহয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।।১৪।।

(তারপর বহু শ্বেতাশ্বযুক্ত এক মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজালেন।)

অর্জুনের রথের ঘোড়াগুলি সাদা রঙের ছিল, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি, রথে বসে তাঁরা দুজনেই নিজের নিজের শঙ্খধ্বণি করলেন।

পাঞ্চজন্যং হৃষিকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।।১৫।।

(হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ঘোরকর্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজালেন।)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য, অর্জুনের শঙ্খের নাম দেবদত্ত। ভীম ছিলেন মল্লবীর, ওনার শঙ্খ অন্যান্যদের তুলনায় খুব ভারী, তাঁর শঙ্খের নাম পৌণ্ড্র। তিনিও সেই শঙ্খ বাজালেন যাতে তাঁর সেনারা বুঝতে পারে, আমার সেনাপতি এই শঙ্খ বাজিয়ে আমাদের সজাগ করে দিচ্ছেন।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ।।১৬।।

(কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ এবং নকুল ও সহদেব যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয় বাজালেন।)

কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম অনন্তবিজয়। নকুলের শঙ্খের নাম সুঘোষ আর সহদেবের শঙ্খের নাম মণিপুষ্পক। তিনজনই নিজ নিজ শঙ্খ বাজাতে শুরু করলেন।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ।।১৭।।
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্।।১৮।।

(সঞ্জয় বলছেন, হে পৃথ্বীপতি ধৃতরাষ্ট্র, মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবীর অভিমন্যু নিজ নিজ শঙ্খ পৃথক ভাবে বাজালেন।)

মহাধনুর্ধর কাশী নরেশ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র অভিমুন্য – এনারা সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজালেন। এখানে এক-একজন যোদ্ধার নাম করে বলা হল, তাঁদের যে আলাদা আলাদা শঙ্খ ছিল, সবাই নিজের নিজের শঙ্খ বাজালেন। এখনও আমরা যে বাড়িতে শঙ্খ বাজাই, দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের শাঁক বিভিন্ন রকমের আওয়াজ করে। এনারা সবাই বড় বড় যোদ্ধা ছিলেন, প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা শঙ্খ বেছে নিয়েছিলেন, যাতে সবাই বুঝতে পারে এটা কার শঙ্খ বাজছে।

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্।।১৯।।

(সেই তুমুল শঙ্খধ্বণি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনাদির হৃদয় বিদীর্ণ করে আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে প্রতিধ্বণিত করল।)

বলছেন, সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও তাদের সৈন্যদের বুকে যেন কম্পন ধরিয়ে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে প্রতিধ্বনিত করল। এটা একটা কাব্যিক বর্ণনা। একজন মহারাজ মজা করে খুব সুন্দর বলতেন, সঞ্জয় ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের সারথি ও মন্ত্রী, ঠিক মন্ত্রীও না, বুদ্ধি দিতেন। এখন তিনি যখন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বর্ণনা করছেন, তখন সঞ্জয়ের পক্ষে বলা, হে রাজন্ আপনার সন্তানদের বুক কেঁপে উঠল, এটা যেন আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না। তবে এগুলোকে কাব্য বলে, আর সুন্দর ভাবে কাব্যিক বর্ণনা করছেন বলে আমাদের এগুলো মেনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষিকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।।২০।।

(হে মহীপতি, তখন রথারূঢ় অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখে শস্ত্র-নিক্ষেপে উদ্যত হয়ে ধনু উত্তোলনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন।)

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, যেমন আলাদা আলাদা শঙ্খ ছিল, তেমনি রথে আলাদা আলাদা ধ্বজা থাকত। অর্জুনের রথের ধ্বজায় একটা বানরের ছবি থাকত। বনবাসে থাকার সময় একবার মহাবীর হনুমানের সাথে ভীমের দেখা হয়েছিল, তিনি তখন ভীমকে বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথে থাকব। হনুমানের পাণ্ডবদের সঙ্গে থাকাটা অর্জুনের রথের পতাকা রূপে ছিলেন। পরের দিকের কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, মহাবীর হনুমান নাকি অর্জুনের রথে বসে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন সব সেনারা তৈরী হয়ে আছে, সবারই হাতে অস্ত্র উদ্যত করে নিয়েছে, তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন।

অর্জুন উবাচ
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।।২১।।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমদ্যুমে।।২২।।
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।।২৩।।

(অর্জুন বললেন, আমি যাতে যুদ্ধার্থ অবস্থিত এদেরকে আমি নিরীক্ষণ করতে পারি ও এই মহারণে আমাকে কাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে তা নির্ণয় করতে পারি এবং দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকামী যে-সকল বীরপুরুষ যুদ্ধ করবার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি, সেইহেতু হে শ্রীকৃষ্ণ, উভয়পক্ষীয় সেনাদলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন।)

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, ‘হে কৃষ্ণ, যুদ্ধ শুরু করার আগে আমি ভাল করে দেখে নিতে চাই, কারা কারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাইছেন, কাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে’। বড় বড় নামকরা বক্তারা যখন বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে ভাষণ দিতে যান, তখন ভাষণ দেওয়ার আগে শ্রোতৃমণ্ডলীদের দিকে একবার অবলোকন করে দেখে নেন, শ্রোতারা যাঁরা আছেন, এনারা কারা, কাদের সামনে আমাকে বলতে হবে। একজন মহারাজ ছিলেন, খুব ভাল বক্তা, তিনি বলতেন, ‘আমি প্রথমে একবার শ্রোতাদের দেখে নিই, তারপর ঠিক করি কি রকম বলব’। হয়ত তিনি বড়দের বলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন, কিন্তু এসে দেখছেন বেশীর ভাগ শ্রোতারাই অল্প বয়সী, তখন তিনি তাঁর ভাষণের বিষয়টা একটু পাল্টে নেন।

দুর্যোধন যে প্রকার দুর্বুদ্ধি, দুর্মতি সম্পন্ন ব্যক্তি, এই ধরণের ব্যক্তির পক্ষে কারা সমবেত হয়েছেন, এর জন্য কারা যুদ্ধ করতে চাইছেন, কারা এর জন্য প্রাণ দিতে চাইছেন, একটু ভাল করে আমি দেখতে চাই। অনেক সময় আমরা বলি, দেখি তো ওর মুখটা, কে আমার সাথে পাল্লা দিতে চাইছে। এখানে অর্জুন সব জানেন কে ও কারা দুর্যোধনের হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে, তাও বলছেন, একবার তো দেখে নিই কারা এই রকম দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। অবশ্য অর্জুন শেষ একবার দেখে নিতে চাইছেন, এটা হয়। আগেকার দিনে সামনা সামনি যুদ্ধ হত, এখন তো অনেক দূর থেকে হয়, কয়েক শত মাইল দূর থেকে মিশাইল ছুঁড়ছে, বা যুদ্ধ বিমান গিয়ে বম্বিং করে আসছে। এখানে শুধু তাই না, অর্জুন যেন দেখতে চাইছেন, ওরা কিভাবে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ ব্যুহ রচনা কেমন হয়েছে।

সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্তো হৃষিকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপিয়ত্বা রথোত্তমম্।।২৪।।

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি।।২৫।।

(সঞ্জয় বললেন –হে ধৃতরাষ্ট্র, গুড়াকেশ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য মহীপতিগণের সম্মুখে উত্তম রথ স্থাপন করে বললেন –হে পার্থ, যুদ্ধার্থ সমবেত কৌরবগণকে অবলোকন কর।)

গুড়াকেশ মানে যিনি নিদ্রাকে জয় করেছেন, অর্জুন নিদ্রাকে জয় করেছিলেন বলে তাঁকে গুড়াকেশ বলা হয়। বলা হয়, যাঁরা খুব উচ্চমানের হন, তাঁরা নিদ্রা জয় করে নেন। গান্ধীজীও এই রকম গুড়াকেশ ছিলেন। গান্ধীজী যখন চাইতেন ঘুমিয়ে পড়তেন, যখন ঘুম থেকে উঠতে হবে, ঠিক সেই সময় উঠে পড়তেন। বেলুড় মঠে অনেক মহারাজদের দেখেছি যাঁদের এই ক্ষমতা আছে। একটা খুব নামকরা ঘটনা আছে, ভারত বিভাজন নিয়ে সেই সময় খুব ঝামেলা চলছিল, তখন নেহরুজী, প্যাটেলজী এই নিয়ে গান্ধীজীর সাথে কথা বলছেন। খুব লম্বা সময় ধরে আলোচনা চলছে, রাত বারোটা বেজে গেছে। গান্ধীজী তখন শুতে চলে গেলেন। গান্ধীজীর কোমরে ঘড়ি থাকত, তিনি ওখানে ঘড়ি বার করে সবাইকে দেখিয়ে বললেন, রাত বারোটা হয়ে গেছে, আমার ঘুমোবার সময় এটা। প্যাটেল তখন খুব নামকরা কথা বলছেন, Bapu, India is burning, how can you sleep। গান্ধীজী তখন বললেন, কারণ তোমরা আসক্ত, আমি আসক্ত নই। এই কথা বলে তিনি ওখানেই মাদুরের উপর শুয়ে পড়লেন, আর সেকেণ্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। নেহরুজী আর প্যাটেলজী উঠে চলে গেলেন। নিজের উপর এমন নিয়ন্ত্রণ যে, এত ঝামেল তাতেও তিনি ওই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়তে পারলেন। সকালে ঠিক সময়ে উঠে আবার তাঁর দিন শুরু হয়ে গেল। অর্জুনেরও নিদ্রার উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি, অর্জুন বলাতে তিনি রথকে দু পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, ইনি ভীষ্ম, উনি দ্রোণাচার্য। অর্জুন তখন দেখলেন –

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।।২৬।।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিমব্রবীৎ।।২৭।।

(সেখানে অর্জুন উভয় সেনার মধ্যেই অবস্থিত ভূরিশ্রবাদি পিতৃব্যগণ, ভীষ্মাদি পিতামহগণ, দ্রোণাদি আচার্যগণ, শল্যাদি মাতুলগণ, ভীম-দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ, লক্ষ্মণাদি পুত্রগণ, পৌত্রগণ, অশ্বত্থামাদি বন্ধুগণ, দ্রুপদাদি শ্বশুরগণ এবং কৃতবর্মাদি বন্ধুবর্গকে উপস্থিত দেখলেন। সব বন্ধুদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখে অতীব করুণাবিষ্ট হয়ে দুঃখিত চিত্তে অর্জুন এই কথা বললেন।)

তত্রাপশ্যৎ, অর্জুন দেখলেন, এখানেও কিন্তু বলছেন 'এরপর অর্জুন দেখলেন', বলছেন না যে তিনি দেখছেন। কি দেখলেন? অর্জুন দেখছেন, দু দিকে সেনারা দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে বাবা, কাকা, জ্যাঠা, ছেলে, দাদু, গুরু, ভাই, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, সুহৃদ, দুই পক্ষেই দাঁড়িয়ে আছে। একটা যেন গৃহযুদ্ধের মত পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে, ভাই ভাইএর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তবে মহাভারতের এই যুদ্ধ সিভিল ওয়ার নয়, এটা ধর্মযুদ্ধ। আগে যেমন বলা হয়েছে, এখানে সবাইকে উভয় পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, আপনি যদি আমাকে ঠিক মনে করেন, তাহলে আমার পক্ষে আসুন। এভাবে ভাই ভাইকে, বাবা সন্তানকে, সন্তান বাবাকে, শিষ্য গুরুকে, গুরু শিষ্যকে, মামা ভাগ্নেকে, ভাগ্নে মামাকে মারার জন্য অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে দেখে, অর্জুন একেবারে মুষড়ে পড়লেন।

বলছেন – *তান্ সমীক্ষ্য কৌন্তেয়*, অর্জুন দেখছেন, কিভাবে এক অপরকে মারার জন্য অস্ত্র উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই নিজের লোক, আত্মীয়-কুটুম্ব অথচ এক অপরকে মারার জন্য এখানে সমবেত হয়েছে, এই দৃশ্য দেখে অর্জুন একেবারে বিষন্নচিত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন। ইংরাজীতে বলে, moment of reckoning, অর্জুনের চোখটা যেন খুলে গেল, এ কি হতে যাচ্ছে!

অর্জুন উবাচ
দৃষ্ট্বেমান স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।।২৮।।

(অর্জুন বললেন – হে কৃষ্ণ, যুদ্ধকামী এই স্বজনদের সামনে অবস্থিত দেখে আমার শরীর অবসন্ন হচ্ছে; মুখও শুকিয়ে যাচ্ছে।)

কোন মানুষের মনে যখন প্রচণ্ড বিষণ্নতা আসে, বিষণ্নতায় সে যখন একেবারে ভেঙে পড়ে, তখন তার শরীরের কি কি অবস্থা হয়, এখানে তারই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। এখানে শরীরের যে যে লক্ষণের কথা বলছেন, তার একটাও যদি কারুর শরীরে দেখা যায়, বুঝতে হবে তার মধ্যে depression আছে। অর্জুন বলছেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধাকাঙ্খী আমার আত্মীয়-স্বজনদের সামনে অবস্থিত দেখে দেখুন আমার শরীরের কি অবস্থা হয়েছে, *সীদন্তি মম গাত্রাণি*, আমার শরীর অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে, অঙ্গগুলি শিথিল হয়ে যাচ্ছে। যখন দেখা যাবে, আমার কাজ করার ইচ্ছে হচ্ছে না, মনে কোন উৎসাহ পাচ্ছি না, তার মানে আমার মধ্যে depression এসেছে। অর্জুনও তাই বলছেন, *সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি*, শরীর শিথিল হয়ে আসছে, মুখও শুকিয়ে আসছে। দেখা যায়, বিষম পরিস্থিতি এলে মুখের ভিতরটা শুকিয়ে যায়; অনেকের ত্বকেও সমস্যা দেখা যায়, চামড়ায় র‍্যাশ বের হয়। এটা হল ভিতরে stress থাকার লক্ষণ।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে।।২৯।।

(আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছে। হাত থেকে আমার গাণ্ডীব খসে পড়ে যাচ্ছে এবং গায়ের চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে।)

অর্জুনের শরীর থেকে প্রচুর ঘাম বেরোচ্ছে, ভয়ে তাঁর গায়ের রোমগুলি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গাণ্ডীব হাত থেকে আলগা হয়ে পড়ে যাচ্ছে, ধরে রাখতে পারছেন না। গাণ্ডীব খুব ভারী ধনুক। আর শরীর থেকে যেন আগুন বেরোচ্ছে, জ্বালা অনুভব করছেন।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।।৩০।।

(হে কেশব, আমি আর স্থির থাকতে পারছি না; আমার মন যেন ঘুরছে; আমি নানা প্রকার অমঙ্গলসূচক লক্ষণ দেখছি।)

অর্জুন নিজের মানসিক অবস্থা ভগবানকে বর্ণনা করছেন, হে কেশব, আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। অশুভ কিছু হলে মানুষ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, বসে পড়ে। *ভ্রমতীব চ মে মনঃ*, আমার মনটাও যেন ঘুরছে, কিছু দেখতে পাচ্ছি না। *নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব*, হে কেশব, পুরো জিনিসটাই আমি বিপরীত দেখছি। '*নিমিত্ত*' শব্দ আমাদের শাস্ত্রে দুটো অর্থে আসে, এখানে নিমিত্ত শব্দের অর্থ হল, প্রথমের দিকে একটা আভাস দেখে বুঝে নেওয়া কি হতে যাচ্ছে। পরে গীতাতেই ভগবান অর্জুনকে বলবেন, *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্*, সব কিছু আমিই করছি, তুমি শুধু এর নিমিত্ত হও। নিমিত্ত হল সামনেরটা দেখলে বোঝা যায় পিছনটা কি হবে। অনেকে বিশ্বাস

করে বেড়াল রাস্থা কাটলে যাত্রা অশুভ হয়। আসলে বেড়াল রাস্থা কাটার জন্য যাত্রা অশুভ হচ্ছে না, ওটা হল তার বিপরীত নিমিত্ত। তার সব খারাপ হওয়াটা আগেই ঠিক হয়ে আছে, তাই বেড়ালটা রাস্থা কেটেছে। বিশাল ঝড়বৃষ্টি হওয়ার আগে মিষ্টি মিষ্টি বাতাস চলে, এখানে মিষ্টি বাতাস আসছে বলে ঝড় আসছে তা না, ঝড় আসবে বলেই মিষ্টি বাতাস আসছে।

গীতায় নিমিত্ত শব্দ দু-বার আসে, একবার প্রথম অধ্যায়ে এখানে আসছে, দ্বিতীয় আর-একবার একাদশ অধ্যায়ে আসবে। দুটোরই এক অর্থ। ইংলিশে এটাকে বলে soothsaying, এই জিনিসটা বিশ্বের সব জায়গাতেই আছে। এগুলোকে নিয়ে আবার প্রচুর চালবাজী, লোক ঠকানো কারবার হয়। দুটো শালিক দেখেছি, আজকের দিনটা এই রকম হবে, একটা শালিক দেখেছি, এই রকম হতে যাচ্ছে, এগুলো যার যার বিশ্বাসের ব্যাপার, নাও মিলতে পারে। কিন্তু মানুষ যখন প্রচুর বিপদে আপদে পড়ে, তখন তারা তান্ত্রিক, জ্যোতিষী, সাধুবাবাজীদের কাছে গিয়ে নিজের বিপদের কথা বলতে থাকে। তারপর এরাও নানা রকমের কায়দা করে বলতে থাকবে, তোমার এই গ্রহ খারাপ, শনির দশা চলছে, এই এই যোগ চলছে। এগুলো কাটাবার জন্য এত টাকা খরচ করে একটা তাবিজ নিতে বলবে, নয়ত একটা যজ্ঞ করতে বলবে। এসব কিছু না করেই অনেক কিছু আগাম বলে দেওয়া যায়। আন্দাজে যদি আগাম কিছু বলে দেওয়া হয়, তাতেই শতকরা নব্বুইটা মিলে যাবে। বলে, ঝড়ে বক মরে যোগীর নাম বাড়ে। আসলে মানুষ যখন খুব হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ে, তখন সে এগুলো বিচার করে না, যার কাছে যাবে সে এমন কিছু করতে বলে দেবে, যেটা তার পক্ষে অসম্ভব করা। সব বলে দেওয়ার পর আবার বলবে, তোমার একটা গুপ্ত শত্রু আছে, কোন কারণে সে যদি কিছু করে, তাহলে কিন্তু কিছু হবে না। দুটোই খুলে রাখল, যদি হয়ে গেল, তার নাম হবে, যদি না হয় তাহলে বলবে, আমি আগেই বলেছিলাম, ওই গুপ্ত শত্রুর জন্য হচ্ছে না। কোন দিন জানা যাবে না, গুপ্ত শত্রুটা কে।

কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে অনেক কিছু বলা হয়, বলা হয় যে, স্বপ্নে কি দেখলে কি হয়, আবার কিছু কিছু লক্ষণ আছে। সেগুলো আবার সবার উপর এক ভাবে খাটবে না। যেটা আমার উপর খাটবে, সেটা আপনার উপর খাটবে না। অর্জুন এটাই এখানে বলছেন, *নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব*, যা কিছু লক্ষণ দেখছি এগুলো শুভ না।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।।৩১।।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভৌগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামার্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।।৩২।।
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।।৩৩।।

(হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে স্বজনদের বধ করে আমি তো কোন মঙ্গল দেখতে পাচ্ছি না। আমি যুদ্ধে জয়লাভ আকাঙ্ক্ষা করি না; রাজ্য বা সুখভোগও কামনা করি না। হে কৃষ্ণ, আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন অর্থাৎ রাজ্যলাভ করে আমাদের কি হবে, আর সুখভোগ বা জীবনধারণেই বা লাভ কি? যেহেতু, যাদের জন্য রাজ্যভোগ ও সুখাদি কামনা করি, সেই সব আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও স্বজনবৃন্দ সবাই নিজ নিজ প্রাণ ও ধনাদির আশা পরিত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন।)

অর্জুন বলছেন, হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে আপনজনদের বধ করে কি হবে, এতে আমি তো কোন মঙ্গল দেখছি না। এগুলোই ইমোশানাল ব্যাপার, আমরা এগুলোর উপর বেশী আলোচনায় যাচ্ছি না। কারণ আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি, আমরা যখন খুব বিপদে পড়ি বা নানা রকম ঝামেলায় যখন জড়িয়ে

পড়ি, সবাই কেমন হতাশ হয়ে যাই, তখন কিভাবে আমরা নানা রকম ভাবনা চিন্তায় ডুবে গিয়ে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি, এই অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর আমাদের সবারই আছে। এতদিন অর্জুন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আসছিলেন, আমি এই করব, সেই করব, হঠাৎ এখন অর্জুন বলতে শুরু করেছেন, হে কৃষ্ণ, আমি জয় চাই না, রাজ্য চাই না। রাজ্য, ভোগ এগুলো নিয়ে আমাদের কি হবে! কারণ মানুষ যে কারণে, যাদের জন্য সুখ চায়, সেটাই যদি চলে যায়, তাহলে সেই সুখ নিয়ে মানুষ কি করবে! কারণ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, মামা, ভাই, বন্ধু, এদের সবাইকে বলি দিয়ে আমাকে এখন রাজ্য পেতে হবে। এখনও আমাদের দেশে অনেক তান্ত্রিক আছে যারা বলে দেয়, তোমার ছেলে বা মেয়েকে যদি অমবস্যার রাতে মায়ের সামনে বলি দাও তাহলে তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে গিয়ে আমার কি লাভ হবে, নিজের সন্তানকেই আমি হারাতে যাচ্ছি। আমার সুখ তো সন্তানের সাথেই জড়িয়ে আছে। সেই সন্তানই যদি চলে যায়, তাহলে সব কিছু ঠিক হয়ে গেলে আমার কি থাকল! বিচার করলে দেখা যাবে, আমরা অনেক সময় অনেক কিছু করার সময় ভুলে যাই, যে জিনিসটা করতে যাচ্ছি, সেখানে যাদেরকে নিয়ে আনন্দ করার কথা, তারাই আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা অনেক সময় বুঝতেও পারি না, অনেক সময় চলে যাওয়ার পর আমাদের বোধদয় হয়। তখন আবার অনেক দেরী হয়ে যায়।

এটাই অর্জুন এখানে বলতে চাইছেন, *ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ*, যাদেরকে নিয়ে সুখভোগ করব, তারাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, প্রাণ দেওয়ার জন্য ও প্রাণ নেওয়ার জন্য। তারা কারা? আগে ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে যেটা বলেছিলেন, সেটাই এখানে আবার বলছেন। *আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহঃ*, আমার আচার্য, কাকা, জ্যাঠামশাই, সন্তান, দাদু। আর তার সাথে *মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা*, মামা, শ্বশুর, নাতি, শ্যালক, সম্বন্ধি এদের আমাকে বধ করতে হবে, নয়তো এরা আমাকে বধ করবে, এর জন্যই আমরা আজ এখানে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছি।

এতান্ন হন্তুমচ্ছামি ঘ্নতোহপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।।৩৪।।

(হে মধুসূদন, যদি এরা আমায় মেরেও ফেলে, তবু আমি এদের মারতে ইচ্ছে করি না এবং এই পৃথিবীর কথা কি, ত্রিলোক রাজ্যের জন্যও না।)

হে মধুসূদন, এদেরকে আমি কোন ভাবেই বধ করতে পারব না। যদি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল তিনটে লোকও আমাক দিয়ে দেওয়া হয়, তাতেও আমি আপনজনকে বধ করতে পারব না। আর সেখানে হস্তিনাপুরের এই ছোট্ট একটা রাজ্যের জন্য আমি সব আপনজনকে বধ করব? প্রশ্নই নেই।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।।৩৫।।

(হে জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করে আমাদের কি সুখ হবে? যদিও এরা আততায়ী তবুও এদের হত্যা করলে অবশ্যই আমাদের পাপ আশ্রয় করবে।)

এরা আততায়ী, এদেরকে মেরে আমাদের কি আনন্দ হবে, উল্টে আপনজনদের বধোজনিত পাপ লাগবে। এখানে আমাদের একটা জিনিস জেনে রাখা দরকার। হিন্দু শাস্ত্রে কাউকে বধ করা সর্বতো ভাবে নিষিদ্ধ। বৌদ্ধরা এটাকেই অহিংসা রূপে পালন করে, কিন্তু ওদের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে, শ্রীলঙ্কা, তিব্বত, চীন এমনকি জাপানেও হিংসায় ভর্তি। সবাই মারামারি কাটাকাটি করেছে। হিন্দুরা কখন হিংসা করত না, যদি করে সেটাও যজ্ঞের জন্য করত বা কোন দণ্ড দেওয়ার জন্য করত। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র হিংসাকে সম্পূর্ণ রূপে নিষেধ করে রেখেছে। আর লোভের জন্য, রাজ্য

বৃদ্ধি, সম্পদ আরোহণ, কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু শাস্ত্রই আবার বলে দিচ্ছেন, যদি সে আততায়ী হয় তবে তাকে বধ করা যেতে পারে। কাউকে আততায়ী বলার জন্য পাঁচটা শর্ত বলে দেওয়া হয়েছে। প্রথমটা হল কেউ যদি কারুর উপর বিষ প্রয়োগ করে থাকে। দ্বিতীয় কেউ যদি আগুন লাগিয়ে থাকে, তৃতীয় কেউ যদি হত্যার চেষ্টা করে থাকে, চতুর্থ কেউ যদি কারুর ধন-সম্পদ, জমি-জায়গা লুট করে নিয়ে থাকে আর পঞ্চম কারুর স্ত্রীকে যদি অপহরণ করে নেওয়া হয়। এই পাঁচটি শর্তের একট শর্ত যে পূরণ করবে তাকে আততায়ী বলা হবে। বিষ প্রয়োগ, অগ্নি সংযোগ ও হত্যা এই তিনটে হত্যার দিক থেকে; আর জমি, ধন, সম্পদ লুট করা এবং স্ত্রীকে এখানে বেশী সম্মান দেওয়া হয়, সেইজন্য কারুর স্ত্রী অপহরণ করাটা আততায়ীর সংজ্ঞায় চলে আসছে। আততায়ী যদি হয়, তাকে মেরে দেওয়া যেতে পারে, এতে কোন পাপ হবে না।

কিন্তু অর্জুন বলছেন, *পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্,* যদি এদের বধ করি তাহলেও আমার পাপ হবে। আমরা ধর্মক্ষেত্রের ব্যাখ্যা করার সময় ধর্মের কথা বলেছি। এই ধর্মকে যে সব শাস্ত্র পরিভাষিত করে তাদের বলা হয় ধর্মশাস্ত্র। মহাভারত আমাদের খুব নামকরা ধর্মশাস্ত্র। এছাড়া আমাদের আরও অনেক ধর্মশাস্ত্র আছে, মনুস্মৃতির মত যত স্মৃতি শাস্ত্র আছে, সব ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্রের একটু নীচে হল অর্থশাস্ত্র, এর নীচে আসে কামশাস্ত্র। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটেরই জন্য শাস্ত্র আছে। যারা আততায়ী তাদের বধ করা যায়, এটা আসলে আসছে অর্থশাস্ত্র থেকে বা নীতিশাস্ত্র থেকে। ধর্মশাস্ত্র সব সময় বলবে, অহিংসা পরমো ধর্ম। ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র দুটোই স্মৃতি প্রধান শাস্ত্র। ভারতে হিন্দুদের শাস্ত্র দুটো শ্রেনীর, একটা হল বেদ ও উপনিষদ, এটাকে বলা শ্রুতি, শ্রুতির বাইরে যত গ্রন্থ আছে সব কটাকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র। এনারা বিধান দিয়ে রেখেছেন, শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে যদি বিরোধ লাগে, সেখানে শ্রুতিকেই প্রামাণ্য রূপে নিতে হবে। কিন্তু স্মৃতির সাথে স্মৃতির যদি বিরোধ লাগে, তখন বলে তোমার নিজের বুদ্ধি লাগাও। যার জন্য ধর্ম বিবেচনায় বলা হয়, পরিশ্রুত বুদ্ধির বিরাট দাম। অর্জুন ধর্মশাস্ত্র আর অর্থশাস্ত্রের এই বিরোধটাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছেন। ধর্মশাস্ত্র বলছে অহিংসা পরমো ধর্ম, অর্থশাস্ত্র বলছে বধ কর। এই দুটো শাস্ত্রের যে লড়াই লেগেছে, এখানে অর্জুন এবার নিজের বুদ্ধিকে লাগাচ্ছে। বুদ্ধি লাগিয়ে অর্জুন বলছেন, আমাদের এটা করা ঠিক না। বলে দিলেই তো হবে না, এবার তাঁকে যুক্তি ও ন্যায় দিয়ে এর প্রতিপাদন করতে হবে।

তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।।৩৬।।

(সেইজন্য বান্ধবগণ সহ দুর্যোধনাদিগকে হত্যা করা আমাদের উচিত নয়। হে মাধব, স্বজনবর্গকে বধ করে আমাদের পক্ষে সুখী হওয়া কিভাবে সম্ভব?)

অর্জুন বলছেন, হে মাধব, যতই হোক দুর্যোধন এরা আমাদের আপনজন, আমাদের কুটুম্ব, এদের বধ করে আমরা কি করে সুখে থাকতে পারি?

যদ্যপেতে ন পশ্যন্তি লোভোহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রাদ্রোহে চ পাতকম্।।৩৭।।
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন।।৩৮।।

(যদিও এরা রাজ্যলোভে অভিভূত হয়ে কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ নিমিত্ত পাপ দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু হে জনার্দন, বংশনাশজনিত দোষ উপলব্ধি করেও আমরা এই পাপ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার উপায় জানব না কেন?)

অর্জুনের বক্তব্য হল, এই দুর্যোধনদের মন লোভে পড়ে কলুষিত হয়ে আছে বলে পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে আছে। এরা আততায়ী ঠিক। আততায়ী কেন বলছেন? কারণ এরা আততায়ীর সব কর্মই করেছে, বিষ প্রয়োগ করেছে, জতুগৃহে অগ্নি সংযোগ করে পাণ্ডবদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে, অনেক ভাবে হত্যার চেষ্টা করেছে। আমি মানছি, ওরা আততায়ী। কিন্তু এটা ভুলে যাবেন না, লোভে পড়ে এদের বুদ্ধিটা সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের মন তো কলুষিত নয়।

লোভে পড়ে কৌরবদের মাথাটা বিগড়ে গেছে, মনটা কলুষিত হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু এ-রকম নয়, আমাদের বুদ্ধি পরিষ্কার, আমরা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, আমরা কেন ধর্ম ছেড়ে এই প্রকার হিংসার কাজে লিপ্ত হতে যাব? এই ধরণের পরিস্থিতি আমাদের সবারই জীবনে আসে। আমরা যখন অবসন্ন হয়ে যাই, একটা ভুল পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি, কেউ এসে নিষেধ করছে আমাকে, এ-রকম করতে যেও না, আমরা গ্রাহ্য করি না। উল্টে যুক্তি দিতে থাকে, যে যুক্তিগুলো মনের স্বাভাবিক অবস্থায় কোন দিন সে নিত না। শ্রীমায়ের কাছে একজন ব্রহ্মচারী এসেছেন, কিছু দিন পরেই তাঁর সন্ন্যাস হতে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর আর এই মঠের জীবন ভাল লাগছে না, চলে যেতে চাইছেন। ব্রহ্মচারী মাকে জিজ্ঞেস করছেন, 'আচ্ছা মা, ঠাকুর তো গৃহস্থ আশ্রমে যেতে বারণ করেননি'। মা শুনে বলছেন, 'না বাবা ঠাকুর বারণ করেননি, তুমি অবশ্যই গৃহস্থ আশ্রমে যাও'। ব্রহ্মচারী চলে যাওয়ার পর একজন মাকে বলছেন, 'মা আপনি একি বললেন, সন্ন্যাসীর সাথে কি গৃহস্থ আশ্রমের তুলনা হয়'! শ্রীমা বলছেন, 'এত কথার মধ্যে ঠাকুরের অতটুকু কথাই ওর মাথার মধ্যে ঢুকেছে'! তার মানে ওকে বুঝিয়ে কোন লাভ নেই। শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে বিয়েথা করে সংসার সাজিয়ে বসে গেল। যখনই কেউ একটা বিচিত্র যুক্তি নিয়ে আসছে, তখন বুঝে নিতে হয়, এ কোন কথাই শুনবে না।

ইদানিং সবাই *বসুধৈব কুটুম্বকম্* যুক্তি আওড়াচ্ছে। তুমি একবার চিন্তা করে দেখ, তোমার ভাই বিদেশে থাকে। বিদেশ থেকে সে এসে গেলে তুমি তোমার বাড়িতে থাকতে দিতে পার, নাও থাকতে দিতে পার, তোমার খুশী। তোমার পাড়া প্রতিবেশীর কেউ যদি এসে থাকতে চায়, তুমিও তাকে থাকতে দিতে পার, নাও দিতে পার। কিন্তু তাই বলে *বসুধৈব কুটুম্বকম্*কে সামনে রেখে যদি বলে, তুমি ভাইয়ের উপরে পাড়া প্রতিবেশীদের বেশী দাম দাও, এটা কি যুক্তি সঙ্গত দেখাবে? কিন্তু ওর মাথায় ঢুকে গেছে, আর ওকে সরানো যাবে না। যখনই দেখা যাবে, কেউ যদি এমন একটা তর্ক নিয়ে আসে, যেটা সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অযৌক্তিক, সে যদি স্বাভাবিক থাকত সে কখনই এই যুক্তিটা নিত না, তখন বুঝে নিতে হবে একে আর বোঝান যাবে না; এর সাথে তর্ক করা বৃথা। এখন ওকে ছেড়ে রাখতে হবে, কিছু বছর পর যদি বোঝে বা কিছু জন্ম পরে যদি বোঝে। এই মুহূর্তে ওকে কেউ কোন ভাবেই বোঝাতে পারবে না। অর্জুনেরও এখন ঠিক এই অবস্থা, কারুর ক্ষমতা নেই ওকে বোঝানর। কিন্তু এখানে শ্রীকৃষ্ণ একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে বলতে শুরু করবেন, অর্জুন শুনে তো অবাক। অর্জুনকে তখন শ্রীকৃষ্ণ এটাই বলবেন, *প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*, তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ, কিন্তু যে কথাগুলো তোমার মুখ থেকে বেরোচ্ছে, সব মুর্খের কথা। মুর্খের মত কথা বলছে, মানে অর্জুনের কথার মধ্যে সহজাত contradictions আছে।

অর্জুন কিন্তু খুব logical কথা বলছে, প্রথমে বলছেন, এরা সম্বন্ধী, এদের মারতে পারি না; দ্বিতীয় যুক্তি আনছেন, এরা আততায়ী ঠিকই, কিন্তু এদের বুদ্ধি কলুষিত, আমাদের বুদ্ধি পরিষ্কার। এরা বদমাইশি করছে, তাই বলে আমরাও বদমাইশি করতে পারি না। যুদ্ধ করলে *কুলক্ষয়ং দোষং*, পুরো কুল নাশ হয়ে যাবে, কৌরবরা নাশ হয়ে যাবে, পাণ্ডবরাও শেষ হয়ে যাবে।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত।।৩৯।।

(কুলনাশে চিরাচরিত কুলধর্ম অনুষ্ঠাতার অভাবে নষ্ট হয় এবং কুলধর্ম লোপে সমগ্র কুল অনাচাররূপ অধর্মে অভিভূত হয়।)

হিন্দু বাদে অন্যান্য সব ধর্মে একটা করে গ্রন্থ থাকে, সেই ধর্মের লোকেরা ওই গ্রন্থকেই পালন করে, এবং তাদের ধর্ম ওখানেই শেষ। আমাদের এখানে যেমন বৈষ্ণবদের কাছে ভাগবতই সব, ভাগবত দিয়ে শুরু ভাগবত দিয়ে শেষ, খুব হলে গীতা পর্যন্ত যাবে, কিন্তু গীতার অদ্বৈত কথাগুলি তারা মানবে না। একটা গ্রন্থকে ধরে যারা ধর্ম পালন করে, এরা সব সময় গোঁড়া হয়ে যায়। হিন্দুরা কক্ষণ একটা বইকে ধরে থাকে না বা একটা প্রথাকে ধরে থাকে না। সেইজন্য অন্যান্য ধর্মের লোকেরা হিন্দু ধর্মকে বলে, হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই না। বাকি ধর্মগুলি হল হিন্দু ধর্মের একটা গোষ্ঠির মত। এখানে বৈষ্ণব ধর্ম যেমন হিন্দু ধর্মের একটা গোষ্ঠি, ঠিক তেমনি অন্যান্য ধর্মগুলি হল এখানকার ছোট ছোট একটা sects। আমাদের কাছে ভাগবত একটা চটি বই। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ সবটাই যদি নিয়ে নেওয়া হয়, তখন ভাগবত সেই মহাসমুদ্রে একট চটি বই। বৈষ্ণবদের কাছে ওটাই শেষ, পঞ্চম বেদ বলে চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি অন্যান্য ধর্মের ওই চটি একটা বই হিন্দু ধর্মের কোন গ্রন্থে গিয়ে মিশে যাবে বোঝাও যাবে না। হিন্দুরা এসব নিয়ে কোন উচ্চবাচ্চ করতে যায় না। এনাদের প্রথম ধর্ম শুরু হয় কুলধর্ম দিয়ে। কুলধর্মের ব্যাপারটা না বুঝতে পারলে, পরে গীতার অনেক কিছু বক্তব্য বুঝতে পারব না।

প্রথম হল কুলধর্ম, বাড়িতে যে প্রথা বংশ পরম্পরায় পালন করা হয়ে আসছে, এই প্রথাকে পুরো সম্মান দেওয়া হয়। সেইজন্য অনেকে বলে হিন্দু ধর্ম কোন ধর্মই না। কিন্তু তা না, হিন্দুরা বলে, আমরা আমাদের বংশের পরম্পরাতে চলি। বংশের পরম্পরা কোথা থেকে আসছে? গোত্র থেকে। প্রত্যেক হিন্দুর গোত্র আছে, হিন্দু মাত্রই তার একটা গোত্র থাকতে হবে। যাদের গোত্র থাকে না, নূতন আনা হয়েছে, তাদের কাশ্যপ গোত্র দিয়ে দেওয়া হয়। তা নাহলে, যে গুরুর কাছে দীক্ষা বা শিক্ষা পেয়েছে, সে গুরুর গোত্রটা নিয়ে নেয়। এরপর ওই গোত্রের যে পরম্পরা রয়েছে, সেটাকে তারা পালন করতে থাকে।

সেখান থেকে আরেকটা যে ধর্ম হয়, তা হল জাতিধর্ম। জাতি অনেক, কর্মকার রয়েছে, ছুতোর রয়েছে, স্বর্ণকার রয়েছে, এরা এক-একটা জাতি। এরা সবাই নিজের নিজের ধর্ম পালন করত। আগেকার ঋষিরা দেখলেন, সবাই নিজ নিজ জাতির ধর্ম, নিজ নিজ কুলধর্ম পালন করলে ধর্মের তো শেষ হবে না। কুলধর্ম, জাতিধর্ম থেকে পুরো ভারতবর্ষে হাজার হাজার ধর্ম হয়ে গেছে। এটা ঠিক যে, সব ধর্মই বেদের উপর আধারিত, বেদের বাইরে কেউ যেতে পারবে না। জাতিধর্ম গুলি বেদকে মানে, কুলধর্মগুলি গোত্র মানে, গোত্রকে মানে তাই বেদকে মানে, বেদের বাইরে কেউ যেতে পারবে না। কিন্তু সবাই বেদকে নিজের মত করে পালন করে। তখন সামাজিক ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ঋষিরা মিলে ধীরে ধীরে সব কটাকে চারটে বর্ণে নিয়ে এলেন – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বিভিন্ন জাতিধর্মকে ওনারা ঢুকিয়ে দিলেন এই চারটে বর্ণে। হিন্দুদের কাছে বর্ণাশ্রমটা গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল কুলধর্ম ও জাতিধর্মের। বর্ণাশ্রমটা খুব তরল, যার জন্য দেখা যায় বাংলায় একটা জাতি অমুক বর্ণে আছে, বিহারে গিয়ে অন্য বর্ণে চলে যায়, ইউপিতে গিয়ে আবার আর-একটা বর্ণে চলে যায়। আবার কোন বড় ঋষি, মহাত্মা আসার পর তিনি হঠাৎ একটা জাতিকে নিয়ে বলে দিলেন, আজ থেকে তোমরা ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে। শঙ্করাচার্য কেরলে অনেক জেলেদের ব্রাহ্মণ বানিয়ে দিলেন। নিম্নবর্ণের জাতিকে ক্ষত্রিয় বানানো হয়েছে, এরও প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।

এরপর মনুস্মৃতি এলো, মনুস্মৃতি অনেক পরের দিকের কাজ, ওরা তখন এই চারটে বর্ণধর্মকে চারটে ছাতার মত করে যতগুলো জাতি ছিল, সব জাতিকে এই চারটের কোন একটা ছাতার নীচে নিয়ে এলেন। অন্য দিকে কুলধর্মকে রেখে দেওয়া হল। জাতিধর্মে আস্তে আস্তে ওনারা

বিলোপ করে দিলেন। এখনও যেখানে একটু orthodox ভাবাপন্ন পরিবার আছে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারত বা বাংলায় কুলধর্ম আর বর্ণধর্ম, এই দুটো চলে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এসে সবটাই এখন নড়বড়ে হয়ে গেছে। এখন ধর্ম হল, যিনি যেখানে যে কর্মে নিযুক্ত আছেন, সঠিক ভাবে ও নিষ্ঠার সাথে সেই কর্ম করাটাই এখন ধর্ম। অর্জুন এখানে এই যুক্তিটা নিয়ে আসছেন, *কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ*, কুলধর্ম যদি নাশ হয়ে যায়, সব কিছুই নাশ হয়ে যাবে, কোন ধর্মই তখন আর থাকবে না।

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।।৪০।।

(হে কৃষ্ণ, অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে কুললক্ষ্মীগণ দুষ্টা হয়। হে বার্ষ্ণেয়, কুলস্ত্রীরা দুষ্টা হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়।)

হে কৃষ্ণ, কুলের ধর্ম নষ্ট হয়ে গেলে, এদের স্ত্রীরা সবাই ব্যভিচারিণী হয়ে যাবে। কারণ এত লোক যদি মারা যায় এই স্ত্রীরা সবাই কোথায় যাবে? তখন অসবর্ণ বিবাহ হবে, তার থেকেও বড় ব্যাপার হল, কুলটাই পাল্টে যাবে। যদি কুলই পাল্টে গেল, তখন কি হবে?

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।।৪১।।

(কুলের সংমিশ্রণ হলে কুলনাশকগণ নরকগামী হয় এবং শ্রাদ্ধতর্পণাদি লুপ্ত হওয়ার ফলে তাঁদের পিতৃপুরুষগণও নরকে পতিত হন।)

বর্ণসঙ্কর মানে, inter mixing। হিন্দু ধর্মের মূল ধর্ম আসে বেদের মীমাংসা থেকে, সেখানে বলা হয় মৃত্যুর পর জীবাত্মা দেহকে ছেড়ে যে রকম কর্ম করেছে, সেই অনুসারে বিভিন্ন লোকে যায়। মৃত ব্যক্তির জন্য শ্রাদ্ধ করা হয়, পিণ্ড দান করা হয়। বলা হয়, এই শ্রাদ্ধ বা পিণ্ড দান করলে এর যে সার, এই সার সেই পিতৃগণরা পান। শ্রাদ্ধাদি করার সময় পুরোহিত যজমানের কাছ থেকে সাত পুরুষ বা চোদ্দ পুরুষের পুরো নামের তালিকা চেয়ে নেন। এর পুরোটাই বংশকুল দিয়ে চলে। অর্জুন বলছেন, যদি বর্ণসঙ্কর হয়ে যায়, তাহলে পিতৃগণরা যে পিণ্ডোদক ক্রিয়া এতদিন পেয়ে আসছেন, সেটা আর পাবেন না। কারণ, তখন কে পিণ্ড দান করবে? বর্ণসঙ্কর হয়ে গেছে কিনা, কোন কুলই তো থাকল না। অর্জুন এখনও শ্রীকৃষ্ণকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের সবার ক্ষেত্রেই তাই হয়, আমরা যখন খুব depressed হয়ে যাই, তখন যিনি আমাদের উপদেশ দিতে আসেন, তাঁকেই আমরা উপদেশ দিতে থাকি। অর্জুন বলছেন, পিণ্ড দান, শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে, স্বর্গে আমাদের পূর্বপুরুষরা আছেন, তাদের সেখান থেকে পতন হয়ে যাবে।

দৌষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।।৪২।।

(এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষের দ্বারা কুলনাশকগণের সনাতন বর্ণধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমধর্ম উৎসন্ন হয়।)

হে কৃষ্ণ, এইসব কুলনাশকারীদের বর্ণসাঙ্কর্য দোষের জন্য সনাতন জাতিধর্ম, কুলধর্ম এবং আশ্রমধর্মাদিও নাশ হয়ে যাবে। এখনও দেখা যায় হিন্দু পরিবারে যাঁরা কুলদেবতাদির পূজা করেন, তাঁর সব সময় চান, আমাদের বংশে আমাদের কুল থেকেই যেন কোন নারীকে বধূ করে আনা হয়, যাতে আমাদের পরম্পরাটা বজায় থাকে। পরম্পরাটা মিটে গিলে কিছুই আর থাকবে না। এনারা বলে থাকেন, আমাদের পিতৃগণরা যাঁরা স্বর্গে আছেন, তাঁরা তাঁদের অংশটা পাবেন না।

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রম।।৪৩।।

(হে জনার্দন, যাদের কুলধর্ম উৎসন্ন হয়েছে তাদের নিরন্তর নরকে বাস করতে হয়, এই কথা আমরা শাস্ত্র ও আচার্যের মুখে অবগত আছি।)

অর্জুন বলে যাচ্ছেন, আমি গুরুজনদের কাছে এই রকম শুনেছি, যদি পিণ্ডোদক ক্রিয়া না করা হয়, তাহলে পিতৃগণরা নরকে বাস করেন। আমরা কি করে চাইব যে, আমার দোষের জন্য আমাদের বাবা, মা, দাদু, ঠাকুরমা, এনারা সবাই নরকে বাস করুন!

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।।৪৪।।

(আমরা কি মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, যেহেতু আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনগণকে হত্যা করতে উদ্যত।)

হায়, আমরা কী মহাপাপেই না প্রবৃত্ত হতে যাচ্ছি, একদিকে আমাদের পূর্বপুরুষদের নরকে পাঠাতে যাচ্ছি, আর অন্য দিকে একটু রাজ্যসুখ লাভের জন্য স্বজনদের বধ করতে উদ্যত হচ্ছি! এরপর অর্জুন তাঁর final decision নিয়ে বলছেন –

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তারাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।।৪৫।।

(প্রতিকাররহিত ও নিরস্ত্র আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ যুদ্ধে বধ করেন, তাতে আমার অধিকতর কল্যাণ হবে। আমার পক্ষে জীবনধারণ অপেক্ষা মরণই প্রিয়তর।)

আমি যুদ্ধ করব না, আমি অস্ত্র রেখে দিলাম। আমি বসে থাকব, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ঢাল তলোয়ার এনে আমার মুণ্ডু কেটে দিক, আমি নিজেকে রক্ষার কোন চেষ্টা করব না। কোন মতেই আমি আর যুদ্ধ করছি না, এটাই আমার শেষ কথা। অর্জুন লৌকিক কারণ এনে দেখাচ্ছেন, যাদেরকে নিয়ে সুখভোগ করব, তাদের মেরে আমি কি করব। আর পারলৌকিক কারণ এনে দেখাচ্ছেন, আমার পিতৃগণ, যাঁরা স্বর্গে আছেন, তাঁরা সবাই আমার কারণে স্বর্গ থেকে পতিত হয়ে নরকে যাবেন।

সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।।৪৬।।

(সঞ্জয় বললেন –এই কথা বলে অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগপূর্বক শোকাকুল চিত্তে রথের উপর উপবেশন করলেন।)

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, এই কথা বলে অর্জুন নিজের গাণ্ডীব রথের উপর রেখে দিলেন, যোদ্ধাদের দেখার জন্য অর্জুন যে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, বিষণ্নচিত্তে শোকাকুল হয়ে সেই দাঁড়ানো থেকে রথের উপর বসে পড়লেন। এখানে এসে প্রথম অধ্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ।।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখলাম, অর্জুন দেখলেন যুদ্ধে এক অপরকে মারার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, যুদ্ধে এরা সবাই মারা যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যে এত লোক মারা যেতে চলেছে আর সবাই আপনজন, এই দৃশ্য দেখেই অর্জুন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। মানুষ মৃত্যুকে নিতে পারে না। ক্ষত্রিয়রা, যাদের প্রবৃত্তিতেই যুদ্ধ রয়েছে, তারাও চেষ্টা করতেন যাতে কাউকে প্রাণে না মারতে হয়। খুব বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া কাউকে মারতেন না। যুদ্ধ ক্ষেত্রেও ক্ষত্রিয়রা চেষ্টা করে যাতে কাউকে না মেরে থাকা যায়। প্রথমে তারা বন্দি করে নেওয়ার চেষ্টা করে। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই গীতা ধীরে ধীরে তার মূল বিষয়ে প্রবেশ করবে। তবে প্রথম দশ বারোটি শ্লোক পর্যন্ত ভূমিকাই চলবে।

সঞ্জয় উবাচ
তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ।।১।।

(সঞ্জয় বললেন – অর্জুন এই প্রকার দয়ার্দ্র হয়ে শোক করতে লাগলেন, অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় তাঁর চক্ষুদ্বয় দর্শনে অসমর্থ হল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে এই কথা বললেন।)

সঞ্জয় এবার ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন, অর্জুনের চোখে জল, দৃশ্যগুলি ঝাপসা হয়ে গেছে, খুব করুণ অবস্থা। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব মুহূর্তে অর্জুন একেবারে ভেঙে পড়েছেন। শোকাতুর অর্জুনকে তখন শ্রীকৃষ্ণ বোঝাতে শুরু করছেন। আগের অধ্যায়ের নামের সাথে 'বিষাদ' শব্দ ছিল, আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে 'বিষাদ' শব্দটা পাল্টে গিয়ে এবার *কৃপয়া* শব্দটা এসেছে।

শুধু বিষাদেই না, যে কোন ইমোশান যদি মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তা যে কোন ইমোশান হোক না কেন, ভাল হোক, মন্দ হোক, হাসিখুশীর হোক, কান্নাকাটির হোক, ক্রোধের হোক, তখন আমরা সত্যকে দেখতে পাই না, সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়। ক্রিকেট খেলায় অনেক সময় দেখা যায়, একটা বল বাকি, আর জেতার জন্য দুই কি তিন রান বাকি, অনেক সময় ব্যাটসম্যান একটা চার কি ছয় মেরে বা খুচরো রান নিয়ে জিতে যায়। অনেক সময় পারে না। যাঁরা খুব বড় মাপের ব্যাটসম্যান, তাঁরা বলেন, আমি ওই সময় আমার মধ্যে কোন টেনশান আসতে দিই না। ওই একটা বল যে বাকি, ওটাকে আমি মাথায় আসতেই দিই না, অন্য বলের মতই ট্রিট করে খেলি। তার মানে তিনি মন থেকে সব ইমোশানকে সরিয়ে রেখে বলটা খেলতে যাচ্ছেন।

আমাদের একটা ধারণা যে, আমাদের যদি কোন motive না থাকে, ফল পাওয়ার ইচ্ছা যদি না থাকে, তাহলে মানুষ কি করে কাজ করবে? এটাকেই স্বামীজী বলছেন, unselfishness is more pain, only people do not have the patience to practice it। ইমোশানকে সরিয়ে একবার কাজ করে দেখুন, দেখবেন কাজ অনেক ভাল হবে। বাচ্চারা বাড়িতে সেই ভাবে ট্রেনিং পায় না, যার জন্য স্কুল, কলেজের এত গুরুত্ব। স্কুলে ড্রীল করাচ্ছে, শিক্ষকরা একটা কড়া অনুশাসনে রাখছে, এর একটাই উদ্দেশ্য, ওর ইমোশানসকে রেগুলেট করা।

আমরা সবাই ইমোশানসের মধ্যে ভাসছি, এই হাসছি, এই কাঁদছি, এই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছি, এর ফলস্বরূপ আমরা জিনিসটাকে সঠিক ভাবে দেখতে পাই না। আমাদের সবার জীবনের একেবারে শেষ ইমোশান হল আমার আমিত্ব। আমিত্ব আছে বলেই এত কিছু হচ্ছে। আর এই আমিত্ব আছে বলেই ঈশ্বর দর্শন হয় না, আত্মজ্ঞান হয় না। এই আমিত্বকে কিন্তু আমরা কেউই

ছাড়তে পারব না। তোতাপুরির তত্ত্বাবধানে ঠাকুরও অদ্বৈত সাধনার সময় আমিত্বকে ছাড়তে পারছেন না। দক্ষিণেশ্বরে নরেনকে যখন ঠাকুর একটু ছুঁয়ে দিলেন, তখন নরেন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে বলছেন, 'আপনি একি করলেন, আমার যে বাবা আছে, মা আছে'। এই আমিত্ব কিছুতেই যেতে চায় না। আমরা মনে করতে পারি ওনারা কত বিরাট মাপের লোক, আমরা তো অতি সাধারণ; কিন্তু সাধারণ আর অসাধারণ যাই হয়ে থাকুন, আমিত্ব সবারই থাকবে। শ্লোক যখন আসবে তখন এর উপর আমরা যে আলোচনা করব, সেটাও জানার জন্য, জ্ঞানলাভের জন্য। কিন্তু সাধারণ জিনিসগুলো যেগুলো দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সব সময় লাগছে, সেগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে। সেখানে আমিত্ব থেকে সব ইমোশানগুলি ছড়াতে থাকে।

পতঞ্জলি যোগসূত্রে পাঁচটা শব্দ বলছেন অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আর অভিনিবেশ। এই পাঁচটি মিলিয়েই সব কিছু হয়। অভিনিবেশ শব্দের অর্থ বেঁচে থাকার ইচ্ছা। আমাদের যাবতীয় কর্ম, উদ্যোগ, চেষ্টা, সবের পিছনে আছে বেঁচে থাকার ইচ্ছা। অর্থোপার্জন করছি, বেঁচে থাকার ইচ্ছা, ঘরবাড়ি করছি, গাড়ি করছি, বেঁচে থাকার ইচ্ছা। অভিনিবেশের উপরে আছে রাগ আর দ্বেষ, আমরা কিছু জিনিসকে পছন্দ করি, কিছু জিনিসকে অপছন্দ করি। তারও পিছনে রয়েছে অস্মিতা, এটাই আমিত্ব, যেখানে পুরুষ আর প্রকৃতির যোগ হয়। এই সব কিছুর পিছনে রয়েছে অবিদ্যা। অবিদ্যা মানে, আমি আমার স্বরূপ ভুলে গেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটা দুটো শ্লোক এই অবিদ্যাকে কেন্দ্র করেই চলবে।

স্বরূপ ভুলে যাওয়া মানেই, আমি তোমার সঙ্গে জুড়ে গেলাম। যখনই আমি তোমার সাথে জুড়ে গেলাম, তখন আমি নিজেকে ছোট করে নিলাম। পুরুষ অনন্ত, আর প্রকৃতি সীমিত। অনন্ত সীমিতের সাথে জুড়ে দেয়, তারপর তার সাথে থাকতে থাকতে এক অপরের ভাবকে আপন করে নেয়। কারুর সাথে গভীর বন্ধুত্ব হলে, যেমন স্বামী-স্ত্রীর হয়; লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কিছু দিন পর স্বামী যেভাবে কথা বলে, স্ত্রীও সেই ভাবে কথা বলতে শুরু করে। স্ত্রী যেভাবে হাঁটচলা করে, স্বামীর হাঁটাচলা সেই ভাবে হতে থাকে। ধীরে ধীরে দুজনের হাঁটাচলা, কথা বলা, হাত পা নাড়া, চোখের চাহনি, এক অপরের মত হতে শুরু করে।

পুরুষ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। দুজনের যখন মিলন হয়, তখন পুরুষ প্রকৃতির স্বভাব পেয়ে যায়, প্রকৃতি পুরুষের স্বভাব পেয়ে যায়। পুরুষ বলতে এখানে চৈতন্য, প্রকৃতি বলতে জড়। জড় নিজেকে চেতন মনে করে, বুদ্ধি নিজেকে চেতন মনে করে, আর আত্মা নিজেকে সীমিত মনে করে। আমার খুব প্রিয়জন যদি কারুর পাল্লায় পড়ে যায়, আর যদি দেখি আমার প্রিয়জনকে অপমানিত করতে শুরু করেছে, আমার আপনজন তখন ছোট হতে থাকে। তাকে আমরা কত বোঝাই, তুমি ওর পাল্লায় পড়ে আর নিজেকে কত ছোট করবে! ঠাকুর বলছেন, যারা চাকরি করে, তাদের ওখানে কাজ করতে করতে তাদের আত্মসম্মান হারিয়ে যায়। ছোট হতে হতে আমরা নিজের মানমর্যাদা সব হারিয়ে ফেলে আমার আসল সত্তাকেই ভুলে যাই, কারণ আমি যে তার সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছি। একবার শুধু বলে দেওয়া, সম্পর্কটা আমি কেটে দিলাম, তুমি এবার বিদায় হও। বলা যায় না, খুব কঠিন, তাকে ছেড়ে যেতে যে কষ্ট হবে। কিন্তু একবার কেটে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি আবার নিজের মত স্বাধীন হয়ে যাবে।

পুরুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক ঠিক এই রকম, প্রকৃতি সব সময় পুরুষকে ছোট করে দাবিয়ে রাখতে চাইবে। পুরুষ ছোট হতে হতে একটা সময় বলতে শুরু করে, কৃপা করুন আমাকে। সবার কাছে গিয়ে কৃপা ভিক্ষা করে, মহারাজ কৃপা করুন, জেলাশাসককে বলবে, কৃপা করুন, পুলিশকে গিয়ে বলবে কৃপা করুন। কৃপা করুন মানে, আমি ছোট আপনি বড়, আপনি আমার উপর কৃপা করুন। আমাদের একবারও কিন্তু মনে হয় না যে, তিনি যে পোস্টে আছেন, যেই হয়ে থাকুন,

রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকুন, আত্মা রূপে আমি তার থেকে অনেক বড়। কিন্তু আমি নিজেকে সাধারণ মনে করছি বলে আমি তাঁর কাছে সাধারণ। মাটির ইঁদুর আর মাটির হাতি, ইঁদুর রূপে সে হাতির কাছে কিছুই না। কিন্তু মাটি রূপে সে হাতি থেকে বিরাট। আপনি হয়ত বলতে পারেন, মাটি রূপে হাতিটাও তো বিরাট। ঠিক, কিন্তু তার কাছে তো আপনি হাতি রূপে যাচ্ছেন না, সমস্যা তো আপনিই তৈরী করছেন। তখনই আমরা আমাদের স্বভাববশতঃ বলি, কৃপা করুন। যে কাতর হয়ে কাকুতি মিনতি করছে, বুঝতে হবে সে তার স্বরূপ ভুল গেছে। স্বরূপ ভুলে যাওয়া মানে, আমি কে, আমার আসল পরিচয় কি, সেটাকে ভুলে যাওয়া। যতক্ষণ না তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে, তুমি কে, তোমার কত ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ তার দুঃখের আর শেষ নেই, ততদিন সে ছোট থেকে ছোট হয়েই সব জায়গায় ঘুরে বেড়াবে, ওখান থেকে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

সঞ্জয় বলছেন, *বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ*, অর্জুনের বিষন্নতা, চোখে জল দেখে শ্রীকৃষ্ণ অবাক হয়ে গেছেন। যদিও এখানে অবাক শব্দ নেই। অবাক হয়ে অর্জুনকে তখন শ্রীকৃষ্ণ বলতে শুরু করলেন।

মানুষ যেমন পকেটে ঠাকুর দেবতার ছবি রাখে, তেমনি এর পরের দুটো শ্লোককে একটা কাগজে লিখে বুক পকেটে, মনিব্যাগে আমাদের রেখে দিতে হবে, সাথে সাথে মুখস্ত করে রাখতে হবে। মুখস্ত হয়ে গেলেও কাগজে লিখে সঙ্গে রাখতে হবে, আর মাঝে মাঝে কাগজটা বার করে শ্লোক দুটি দেখতে হবে। যখনই কোন কারণে চোখে জল আসবে, যখনই মনে হবে ভেঙে পড়ছি, খুব কষ্ট পাচ্ছি, কাগজটা খুলে এই শ্লোক দুটো পড়বেন, এর অর্থটা একটু চিন্তা করতে হবে, দেখবেন ভিতরে একটা শক্তি এসে যাবে। এই দুটো শ্লোককে এই ভাবে মনন করুন, চিন্তন করুন; দেখবেন জীবনের সমস্ত রকম দুর্বলতা, কাপুরুষতা চিরদিনের মত চলে যাবে।

উত্তর ভারতে, বিশেষ করে হিন্দীভাষী এলাকায়, কোন ঝামেলায় পড়লে তারা হনুমান চালিশা পাঠ করে, তারা মনে করে এতে নাকি তাদের শক্তি এসে যায়। বেদান্তের শক্তি আসে এই দুটি শ্লোক থেকে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের তিন নম্বর শ্লোক, *ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ*... এই শ্লোকটা স্বামীজীর এত প্রিয় ছিল যে, তিনি অনেক জায়গায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে এই শ্লোকটার উল্লেখ করতেন। আমরাও মনে করি *ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ*, এটি গীতার সবচেয়ে শক্তিশালী শ্লোক।

শ্রীভগবানুবাচ
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন।।২।।
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যাক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।৩।।

(শ্রীভগবান বললেন – হে অর্জুন, এই সঙ্কটকালে আর্যগণের অযোগ্য, স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ও অযশস্কর এই মোহ তোমার মধ্যে কোথা থেকে এলো? হে অর্জুন, ক্লীবভাব আশ্রয় করো না, এই কাপুরুষতা তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধার্থে উঠে দাঁড়াও।)

এখানে প্রথম শ্লোকটা হল আমাদের দুরবস্থার বর্ণনা, দ্বিতীয় শ্লোক বলে দিচ্ছে এই দুরবস্থা থেকে কিভাবে আমরা বেরিয়ে আসব। *কুতস্ত্বা*, কোথা থেকে, ভগবান অবাক হয়ে গেছেন, তোমার মধ্যে কোত্থেকে এই দুর্বলতা এসেছে? *কশ্মলমিদং*, কশ্মল শব্দের অর্থ মলিন, অর্জুনের মত বীর, এক স্বচ্ছ চরিত্রের মধ্যে মলিনতা, ভাবাই যায় না! *বিষমে সমুপস্থিতম্*, এই সঙ্কট সময়ে কোথা থেকে তোমার মধ্যে এই মলিনতা এসেছে, অথচ এই রণভূমিতে তোমার শৌর্য দেখানোর কথা।

স্বামী-শিষ্য-সংবাদে স্বামীজী শিষ্যকে বলছেন, আগেকার দিনের লোকেরা চৌদ্দ পুরুষের নাম জানত, এখন সাত পুরুষের নামও জানে না। স্বামীজীকে তাঁর এক বন্ধু বললেন, পূর্বপুরুষদের নাম জেনে কি হবে? যদি পূর্বপুরুষদের নাম জানা থাকে, তখন নিজের ভিতরে একটা গর্ব হয়, আমি এই বংশের লোক। মন্দ কোন কাজ করার সময় তার একটা হুঁশ থাকে যে, আমি এই বংশের লোক, এই কাজ আমি করতে পারি না। সন্ন্যাসীদের যে গেরুয়া পরতে হয়, সেখানেও এই ভাবনাটাই কাজ করে। যদি কিছু গোলমাল করতে যাবে, তখন এই গেরুয়া যেন তোমাকে মনে করিয়ে দেয়, তুমি এ কাজ করতে পারো না।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে একটা ঘটনা আছে, তবে এই ঘটনা কতটা সত্য, কতটা সত্য না, আমাদের জানা নেই, একটা ম্যাগাজিনে এই লেখাটা আমি পড়েছিলাম। সত্য যদি নাও হয়, কিন্তু এই কাহিনীর আইডিয়াটা একশ ভাগ সত্য। বিদ্যাসাগর যখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হলেন, তখন তাঁর চিন্তা এলো, আমি একজন প্রিন্সিপ্যাল, একজন প্রিন্সিপ্যালকে কি ধরণের পোশাক পরে কলেজে যাওয়া যেতে পারে। আমরা সবাই জানি বিদ্যাসাগর সব সময় ধুতি আর ফতুয়া পরতেন। এতদিন এই পোশাকেই তিনি কলেজ যেতেন। প্রিন্সিপ্যালের কি এই পোশাকে যাওয়া ঠিক হবে?

এই চিন্তা নিয়ে তিনি একদিন তিনি আউটরাম ঘাটের গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটছেন। সেই সময় তিনি দেখছেন, ওনার আগে আগে এক ভদ্রলোক নবাবী চালে হেঁটে যাচ্ছেন। পরে তিনি জানতে পারেন ভদ্রলোক একজন নবাব বংশের লোক। হঠাৎ একজন লোক দৌড়ে এসে তাঁকে বলছে যে, 'হুজুর আপনার বাড়িতে আগুন লেগে গেছে'। শোনার পর যেমন উনি চলছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই ধীর মন্থর পদক্ষেপে চলছেন। বিদ্যাসাগর দেখে চমকে উঠলেন। তখন আর-একজন লোক দৌড়ে এসে বলছে, 'হুজুর আপনার বাড়িটা ছাই হয়ে যাবে'। তাও সে নিজের স্টাইলে ধীরে ধীরে পা ফেলে এগোচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে তৃতীয় আরেকজন লোক এসে যখন বলছে, 'একটু পা চালিয়ে আসুন'। তখন ভদ্রলোক বলছেন, 'তোমাদের কটা পুরনো কাঠ পুড়ে যাচ্ছে, তাই বলে আমার বাপ-ঠাকুর্দার দেওয়া নবাবী চালে হাঁটার স্টাইল কি আমি ছেড়ে দেব'? সেখানেই বিদ্যাসাগর ঠিক করে ফেললেন, আমি একটা চাকরিই তো করতে যাচ্ছি, তাই বলে বাপ-ঠাকুর্দার দেওয়া ধুতি-ফতুয়া পরা ছেড়ে দেব! কখনই তা হতে পারে না।

আজ আমাদের চারিদিকে আজ কত অশান্তি, শুধু উৎপাত আর উৎপাত; দেশ-বিদেশের লোকেরা বলছে, ভারত গোল্লায় যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সব সময় ভাবছি, এর উল্টোটাই হবে। ইদানিং একটা নূতন শব্দ এসেছে –সেকুলার। যারা বলছে, ভারত সেকুলার থেকে সরে যাচ্ছে, এদেরকে শুধু একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন, তোমরা তোমাদের পরম্পরাকে জানো? হিন্দু ধর্মের উপর তোমরা কোন বই কি পড়েছ? আমার কাছে একজন বড় ইউনিয়ন নেতা প্রায়ই দেখা করতে আসেন। একদিন এসে উনি বললেন, 'হিন্দুরা লিবারাল, সেকুলার'। বিরক্ত হয়ে তাঁকে বললাম, 'দেখুন শুধু হিন্দু ধর্মকে নিয়ে আমার তিন খানা বই আছে, আপনি এর একটি বই পড়ে দেখেছেন? পড়েননি, কিন্তু বলে যাচ্ছেন, হিন্দু ধর্ম লিবারাল, হিন্দু ধর্ম সেকুলার'। হিন্দু ধর্মের যে কোন একটি শাস্ত্র পড়ে কি তুমি হিন্দু ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করেছ? করোনি, ফলে কোথা থেকে তোমার মধ্যে শক্তি আসবে! পরম্পরাকে যদি তোমার না জানা থাকে তোমার গর্ব কোথা থেকে হবে।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি, এই ভাল বংশে কোথা থেকে একটা কুলাঙ্গার, একটা কুপুত্র জন্ম নিয়েছে; কিন্তু আমাদের কাছে এখন উল্টো হয়ে গেছে। আমাদের যত পূর্বজ আছেন, সবাই কুপূর্বজ; আমাদের পূর্বজরা কিছু জানতেন না, মুর্খের দল। এদের মন মলিন হবে না তো কার হবে! থেকে থেকেই তোমার মন মলিন হবে। মলিন হয়ে গিয়ে তুমি কি করছ, নিজেও বুঝতে পারছ না। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ এই কথাই বলছেন, *কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্*, এই সঙ্কটকালে

যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার এ কী অবস্থা হল! কোথা থেকে তোমার এই পতন হয়ে গেল? পরে ভগবান অর্জুনকে বলবেন, যাঁরা তোমাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁরাই তোমাকে দেখে হাসাহাসি করবে। তোমার এ কেমন পতন হয়ে যাচ্ছে, নিজেকে ধরে রাখার ক্ষমতা নেই?

দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম ও জীবনকে পরিভাষিত করছেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। *অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন*। যে কোন কাজ করার আগে তিনটে প্রশ্ন বা শর্তকে সামনে রেখে টিক মার্ক করতে হবে। প্রথম হল, *অনার্যজুষ্টম্*, যাঁরা আর্য পুরুষ, সুসংস্কৃতবান, যাঁরা শাস্ত্র জানতেন। সুসংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত থেকে আসে, সংস্কৃত শব্দের অর্থ হয়, বিশেষ ভাবে যাকে সংস্কার করা হয়েছে। কালচার শব্দটাও 'কৃ' ধাতু থেকেই আসে, যেমন চাষ করা, এগ্রিকালচার। কালচার বা সংস্কৃতির অর্থ হল, যে জিনিসটা স্থূল নয়। স্থূল নয় মানে, জিনিসটা সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য জিনিসটা দেশ ও কালকে অতিক্রম করে যায়। যে জিনিস যত সূক্ষ্ম হয়, সেই জিনিসটা তত বেশী দেশ ও কালকে ছাড়িয়ে যায়।

ওনারা এর খুব সুন্দর উদাহরণ দেন, ঈজিপ্টের পিরামিডের দিকে যদি তাকান, পিরামিড গুলো হল স্থূল, বিশাল বড়। কিন্তু বিশ্ব সভ্যতায় পিরামিডের প্রভাব কিছুই পড়েনি। আজকে যারা পিরামিড দেখতে যাচ্ছে, তারা দেখছে বালির উপর একটা বিরাট পিরামিড দাঁড়িয়ে আছে। পিরামিড থেকে আমাদের কোন টেকনলজির জ্ঞান আসছে কিনা, কোন শক্তি বা প্রেরণা আসছে কিনা; যদি হিসাব করা হয়, তাহলে দেখা যাবে কিছুই না। ঈজিপ্টের উপর পিরামিডের কি অবদান? শূন্য। কিন্তু পিরামিড একটা বিরাট জিনিস। দেখে আমরা শুধু অবাক হই। পিরামিড গুলো দেশ ও কালে বাঁধা। যদি এমন হত, ওই পিরামিড সারা বিশ্বে সবাই বানাচ্ছে কারণ পিরামিড থেকে এই এই সুবিধা পাওয়া যাবে, তখন বলা যাবে পিরামিড দেশ ও কালকে ছাড়িয়ে গেছে। এবার গায়ত্রী মন্ত্রের দিকে তাকান, গায়ত্রী মন্ত্র দেশ ও কালকে ছাড়িয়ে গেছে। কত সহস্র বছর আগে সুদূর বৈদিক কালে বিশ্বামিত্র এসেছিলেন, আমরা কেউ জানি না, কিন্তু ধ্যানের গভীরে তিনি কি একটা মন্ত্র পেলেন, আজও কোটি কোটি ভারতবাসী ওই মন্ত্র জপ করে যাচ্ছে।

এই হল আমাদের সংস্কৃতি, দেশ কালকে ছাড়িয়ে গেছে। যাঁরা এ-রকম সুসংস্কৃত, তাঁরা হলেন আর্য, তাঁরা নিজেদের আর্য বলতেন। যারা সুসংস্কৃত ছিল না, তাদেরকে বলা হত অনার্য। অনার্য মানে তার মধ্যে কোন কালচার নেই, খুব স্থূল, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ভোগসর্বস্ব জীবনটাই তাদের কাছে প্রধান। সংস্কৃত মানে, তার নিজের মন, ইন্দ্রিয়ের উপর একটা নিয়ন্ত্রণ আছে। এই নিয়ন্ত্রণকে তাঁরা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, বংশ পরম্পরায় তাঁরা এটাকে ধরে রেখেছেন। হে অর্জুন, তুমি যেটা করতে চাইছ এটা *অনার্যজুষ্টম্*, এটা অনার্যজোনিত কর্ম। তুমি যেটা করছ, এটা আর্যদের সাথে একেবারেই মিলছে না, কারণ আর্যরা এই কাজ কখনই করবেন না। এখনও রাস্থাঘাটে বা বাসে ট্রেনে কেউ আজেবাজে কিছু কথা বললে পাশের লোকেরা বলে, এটা কি কোন ভদ্রলোকের কথা হল, ভদ্রলোকের পোশাক পরে অভদ্রের মত আচরণ করছেন, ইত্যাদি।

এটাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, কিন্তু এখানে শব্দটা হল *আর্যজুষ্টম্*, হে অর্জুন, তুমি যা করছ এর সাথে আর্যরা যা করে এটা তা নয়। ঠিক তেমনি আমরা যখনই কিছু করতে যাব, তার আগে দেখতে হবে যাঁরা সুসংস্কৃতবান পুরুষ, সমাজ যাঁদের মহাপুরুষ বলছে, তাঁরা এই ধরণের কাজ করছেন কি করছেন না। এটা হল প্রথম চেকবক্স।

দ্বিতীয় চেকবক্স হল, *অস্বর্গম্*। এই কাজ কি আমার মধ্যে ধর্মের ভাব বৃদ্ধি করবে? এই কাজ কি আমাকে আরও ধর্মের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে? আমি যে স্বর্গে যাওয়ার প্রত্যাশী, এই কাজ কি আমাকে স্বর্গের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে? আরও সহজ ভাবে বিচার করে দেখতে গেলে বলা

যেতে পারে, এটা কি কোন পূণ্য কর্ম? এটা কি এমন কোন শুভ কর্ম, যে কর্ম আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে? কোন মহাপুরুষও এই কাজ করেননি, এই কর্ম আমাকে স্বর্গেও নিয়ে যাবে না। তাহলে এই কর্ম করা যাবে না।

তৃতীয় চেকবক্স হল, *অকীর্তিকরম্*। এবার জাগতিক উন্নতিকে নিয়ে বলছেন। এই কাজ করলে আমার কীর্তি কি বাড়বে? লোকেরা কি বলবে, আপনি কি সাংঘাতিক কাজ করেছেন? এমন অনেক কাজ আছে, যেটা পূণ্যকর্মের অতটা নাও হতে পারে, কিন্তু কীর্তি বর্দ্ধন করে। যেমন একটা খুব সুন্দর কবিতা লিখলেন, কবিতা লেখাটা পূণ্যের দিকে হয়ত তেমন কিছু না, মহাপুরুষরাও কবিতা লেখেন না, কখন সখন কদাচিৎ কোন মহাপুরুষ কবিতা লিখে থাকতে পারেন। কিন্তু আপনার তাতে কীর্তি বর্দ্ধন হয়। এই তিনটে যদি না থাকে, পারলে তিনটেই যদি ইয়েস থাকে, তবেই সেই কাজ তুমি করতে পার। তিনটেই যদি ইয়েস না হয়, অন্তত একটা যেন হয়। প্রথম আর্যরা এই কাজ করতেন, দ্বিতীয় ধর্ম বৃদ্ধি এবং তৃতীয় কীর্তি বৃদ্ধি। অর্থাৎ কোন কাজ করার সময়ে দেখতে হবে, এই কাজ কি আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে, এটা কি ধর্ম সম্মত, এবং শেষে এটাতে কি লোকেরা আমাকে সম্মান দেবে, আমার কীর্তি বাড়বে।

হে অর্জুন, তুমি যে ক্ষত্রিয় ধর্ম ছেড়ে ব্রাহ্মণদের মত ভিক্ষা করে জীবনধারণ করবে বলছ, আসলে তুমি বলতে চাইছ, আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব, বৈরাগী হয়ে যাব; অন্য সময় এই কথা বলে থাকলে না হয় তোমার অনেক সম্মান হত, কিন্তু এই মুহূর্তে এই কাজের জন্য সবাই তোমাকে বিদ্রুপ করবে। পরে তাই হল, সব শেষে অর্জুন যখন সব কিছু ছেড়ে বৈরাগীই হয়েছিল, তাতে তখন তাঁর মান বেড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ ভূমি থেকে পালিয়ে আমি বৈরাগী হব –এই কাজ আর্যরা কখন করবেন না, এই কাজ তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে না, আরও খারাপ হল, এতে তোমার কোন সম্মান তো বাড়বেই না, উপরন্তু লোকেরা তোমাকে বিদ্রুপ, তাচ্ছিল্য করবে। যে কোন decision making, একটা নূতন চাকরি নিতে যাচ্ছি, একটা কিছু করতে যাচ্ছি, আপনি আগে দেখুন এই তিনটে শর্ত পূরণ করছে কিনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে ভগবান অর্জুনের অবসাদকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললেন। তৃতীয় শ্লোকে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি বলছেন, এই অবসাদ থেকে বেরিয়ে এসো, উঠে দাঁড়াও। এই দুটো শ্লোক যদি মুখস্ত নাও করতে পারি, অন্তত তৃতীয় শ্লোকটিকে আমাদের অবশ্যই সবার মুখস্ত করে রাখা অত্যন্ত জরুরী। তৃতীয় শ্লোকের সাধারণ অর্থ হল, অর্জুন তুমি এভাবে কাপুরুষ হয়ে যেও না, তোমার মধ্যে এই কাপুরুষতা শোভা দেয় না। তোমার এই ক্লীব ভাবকে, হৃদয়ের দৌর্বল্য ভাবকে তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধের জন্য উঠে দাঁড়াও।

এখানে ভগবান যখন বলছেন, *ক্লৈব্যং মাস্ম*, তুমি এই ক্লীব ভাব ভিতরে আসতে দিও না, আমরাও যখন এক অপরকে বলি বা ছোটদের বলি তোমরা বড় হও, এখানে জিনিসটা ঠিক তা না, অর্জুনকে সেভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন না। কি ভাবে বলছেন? আমরা যখনই কোন কাজ করি, আমরা ওই কাজে একেবারে মজে যাই, তা যে কাজই হোক না কেন। ঝগড়া করছি, মজে যাচ্ছি। ভালবাসছি, মজে যাচ্ছি; সাধারণ ভাবে বাচ্চাদের মত আমরা মজে যাই। আমাদের হিতৈষীরা সতর্ক করার জন্য বোঝাবেন, তুমি এই রকমটি করো না। বোঝাতে এলে আমরা তাঁর কথা বুঝতে চাই না, অনেক সময় শুনতেও চাই না। এই ধরণের আচরণ যে আমরা বাচ্চা বয়সেই শুধু করতাম, তা না, এখনও যদি কেউ বোঝাতে আসে, তুমি এসব কি করছ? আমরা শুনতে চাই না। কিছুদিন যাওয়ার পর, অর্থাৎ দেশ ও কালে সরে আসার পর হঠাৎ পিছনের দিকে যখন আমাদের দৃষ্টি যাবে, তখন মনে হবে, সেদিন আমি সত্যিই ভুল করেছিলাম। দেশ ও কালে সরে আসার পর মনে হবে ওটা আমার ঠিক ছিল না। একটু উপরে উঠে আসার পর আরও ভালো বোঝা যাবে। যত উপরে উঠতে

থাকব, পুরো ছবিটা তত পরিষ্কার হতে থাকবে। আমাদের বয়স যত বাড়তে থাকে, অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে বুদ্ধিও আমাদের পরিপক্ক হতে থাকে। তবে কিছু মানুষ আছে, তারা যে বুদ্ধি নিয়ে জন্মায়, সেই বুদ্ধি নিয়েই মরে, এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে না। যত দেশ কাল আমার থেকে সরে যাবে তত আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিষ্কার হতে থাকবে। অনেক সময় আমাদের বলা হয়, কোন একটা পরিস্থিতিতে আমি আছি, যখন আমি কোন কিছুই সামলাতে পারছি না, তখন বলা হয়, একটু পিছিয়ে এসো।

অনেক আগে ফটোগ্রাফির উপর একটা লেখা বেরিয়েছিল, তাতে বলছে, তুমি ক্যামেরাতে কোন ফটো তুলতে যাচ্ছ, ছবিটা তোমার ফ্রেমে পুরোটাই চলে এসেছে, এবার শট নেওয়ার আগে তুমি এক পা পিছিয়ে আসবে। এতে perspectiveটা perfect আসে। ফটোগ্রাফির এটা একটা টেকনিক, এক পা পিছিয়ে যেতে হয়। সব কিছুতেই কিন্তু বলে, একটু সরে আসতে। জীবনের সব কিছুতেও বলা হয়, একটু সরে আসতে হয়। একটা সম্পর্কে জড়িয়ে আছি, সেই সম্পর্ক থেকে একটু সরে আসতে হয়, সম্পর্কের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো তখন পরিষ্কার বোঝা যায়। কিন্তু দেশ ও কালে যখন আমরা সরে গেলাম, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সরে গেছি। ছোটবেলা যে অঙ্কগুলি করতে আমাদের ঘাম বেরিয়ে যেত, এখন এই বয়সে এসে বুঝতে পারছি, জিনিসটা কত সহজ ব্যাপার ছিল। আমরা যেমন যেমন এগোব, যেমন যেমন উপরের দিকে উঠতে থাকব, তেমন তেমন আমার যে প্রকৃতি আমাকে ছোট করে রেখেছে, সেই প্রকৃতি থেকে বড় হয়ে গিয়ে পরিষ্কার দেখতে পারছি, আমি কোথায় কোথায় ভুল করছিলাম।

একটু আগে বলা হল, জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল যেটা আমরা সবাই করি, তা হল, আমিত্বের সঙ্গে জুড়ে থাকা। আমিত্বকে মানুষ ছাড়তে পারে না, তার কারণ, আমিত্বটাই হল মন এবং মনটাই হল দেশ ও কাল। দেশ-কাল আর মন একই জিনিস। আমিত্ব, দেশ, কাল, মন এগুলো সব একসাথে থাকে আর সব কটাই এক। মানুষ যখন সমাধিতে চলে যায়, যেটা যাওয়া প্রায় অসম্ভব, সমাধিতে চলে যাওয়া মানে তিনি মনের এলাকাকে ছাড়িয়ে গেলেন, সেখানে উপর-নীচ বলে কিছু নেই। কিন্তু এইবার যখন তিনি পিছনের দিকে তাকাচ্ছেন, তখন দেখছেন, আরে এ-সব কি হচ্ছিল এতক্ষণ! এতদিন কি করছিলাম আমরা? আমরা দুয়ের মধ্যে বাঁধা ছিলাম। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে বাঁধা, পাপ-পূণ্যের মধ্যে বাঁধা, ভাল-মন্দের মধ্যে বাঁধা, শীত-গ্রীষ্মের মধ্যে বাঁধা, সুখ-দুঃখের মধ্যে বাঁধা।

গীতা যেখানে ঠিক ঠিক শুরু হবে, সেখানে প্রথমে ভগবান এটা দিয়েই শুরু করবেন, মনের সাম্রাজ্য আর চৈতন্যের বাস্তবিকতা, এই দুটো জিনিস দিয়ে। আমরা মনের সাম্রাজ্যে বাঁধা বলে এগুলোকে বিরাট বলে মনে হয়। চৈতন্যের বাস্তবিকতায় গেলে মনে হবে, আরে আমরা এতদিন কি বোকামিই না করছিলাম। অন্য দিকে কি হয়, আমরা নিজেকে কখন বিচার করতে পারি না। আমরা প্রায়ই একে ওকে বলে থাকি, তুমি কি আমাকে আমার থেকে বেশী ভাল বোঝ! কিন্তু জিনিসটা পুরো উলটো, এই জগতে আমাকে আমার থেকে সবাই বেশী ভাল বোঝে, এটাই বাস্তব। নিউরোলজি বিজ্ঞানেও এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমরা অপরকে যেভাবে বিচার করি, ঠিক সেই ভাবে আমি নিজেকেও বিচার করি। প্রসেসটা পুরোপুরি এক, ফলে অপরে যখন আমাকে দেখছে, সে আমার চেহারা দেখতে পাচ্ছে, আমার চোখ, মুখের ভাষা দেখতে পাচ্ছে, আমি এর কোন কিছুই দেখতে পাই না। যার পরিণাম হল, আমার নিজের প্রতি আমি যে বিচার করি, সেটা সব সময় একশ ভাগ ভুল হতে বাধ্য। কেউ যদি বলে, আমি নিজেকে অনেক ভাল জানি, জানবেন সে শুধু বোকা না, মুর্খও নয়, মুর্খের শিরোমণি। কারণ কোন মানুষ নিজেকে ভাল জানে না।

কোন লেখক যদি কিছু লেখালেখি করেন, তা কোন আর্টিকেলই হোক, বা বই হোক, তিনি দশজন বন্ধুকে অবশ্যই লেখাটা পাঠাবেন। বন্ধুদের কাছ থেকে রচনাটার সম্বন্ধে মতামত পাওয়ার

পরই তিনি প্রকাশকের কাছে পাঠাবেন। কোন প্রকাশকের এরপর সাহস হবে না যে ওই রচনাতে হাত দেবে। কারণ লেখক যখন কোন কিছু লিখছেন, তখন তিনি ওই লেখার মধ্যে জড়িয়ে আছেন। যদিও রচনাটা লেখকের থেকে আলাদা, তিনি সেটা বিচার করতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজে ওই রচনার মধ্যে জড়িয়ে আছেন বলে ওই রচনার সঠিক মূল্যায়ন হবে না। অপরে বলতে পারবে, লেখাটা কেমন হয়েছে। সবাই নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে, সবাই নিজেকে বিরাট মনে করে, কিন্তু দেখতে হবে অপরে তার সম্বন্ধে কি মূল্যায়ন করছে। যেমন সমাধিতে গিয়ে নিজের ভুলগুলি বোঝা যায়, ঠিক তেমনি, যাঁরা আমার থেকে উপরে আছেন, তাঁরা আমার ভুলগুলি বুঝতে পারেন। শিক্ষক যেমন ছাত্রের ভুল বুঝতে পারেন, আচার্য শিষ্যের ভুল বুঝতে পারেন, কিন্তু সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারেন সমাধিবান পুরুষ। সমাধিবান পুরুষ আচার্য হতে পারেন, সমাধিবান পুরুষ অবতার হতে পারেন। তাঁরা জিনিসটা যেমন, সেটাকে ঠিক তেমন দেখেন।

'আমি' আসলে কি? এই 'আমি'কে একজন সমাধিবান পুরুষ বা একজন আচার্য যত ভাল বুঝবেন, অত ভাল অন্য কেউ বুঝবে না। Positive thinkingএর উপর ইদানিং অনেক লেখালেখি হচ্ছে, প্রচুর বই পাবলিশ হচ্ছে। এমনকি অনেক বক্তার নামে পরিচিতি দিয়ে বলা হয়, উনি একজন motivational speaker, কিন্তু তুমি কি করে অপরকে motivate করবে, তুমি তো আচার্য নও বাপু, দুটো পয়সা উপার্জন করার জন্য এই কাজ করছ। ঠিক ঠিক আচার্য হলেন অবতার; ঠিক ঠিক আচার্য হলেন শাস্ত্র। ঠিক ঠিক আচার্য তাঁর সামনের মানুষটিকে দেখলেই বুঝতে পারেন, এর মনের ভিতরে এই এই চলছে। ঠাকুরের কাছে যখনই কেউ আসত, ঠাকুর তাকে একবার দেখেই বলে দিতেন লোকটি কি স্বভাবের, ভিতরে ভক্তি আছে কি নেই ইত্যাদি। ঠাকুর বলছেন, কাঁচের আলমারির ভিতরে জিনিসগুলিকে যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, ঠিক তেমনি আমি মানুষের ভিতরটা দেখতে পাই। নরেনকে দেখেই বুঝে গেছেন, এর অখণ্ডের ঘর। অন্যান্য শিষ্যদের সম্বন্ধেও বলছেন এর এই ভাব, ওর এই অংশে জন্ম। কার কোথায় আটকাচ্ছে, সেটাও বুঝতে পারতেন; তার জন্য কি করতে হবে, সেটাও তাকে বলে দিচ্ছেন। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, ঠিক ঠিক আচার্য শিষ্যের সব কিছু বুঝতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতার, উপরন্তু অর্জুনকে অনেক আগে থেকেই জানেন, এতদিন তাঁকে দেখে আসছেন; তিনি বুঝেছেন অর্জুন বীরপুরুষ, কিন্তু নিজের স্বরূপকে ভুলে আছে।

এক সিংহী একদল ভেড়াকে আক্রমণ করতে গেলে তার প্রসব হয়ে যায়, সেখানেই তার মৃত্যু। ওই সিংহ শাবক পরে ভেড়ার দলে বড় হতে থাকল এবং নিজেকে ভেড়া মনে করছে, এই গল্প আমরা সবাই জানি। এই যে একটা এমন পরিস্থিতি এসে গেছে, যে পরিস্থিতির জন্য যে অর্জুন একজন সিংহ, বিষাদে ভেঙে পড়ে নিজেকে ভেড়া মনে করছে। ক্লীব মানে পৌরুষত্বহীন, এই পৌরুষের অভাবটা সরাসরি জড়িয়ে আছে মর্যাদের সাথে। যে কোন কাজ করার সময় আমাদের মর্যাদা, আত্মসম্মানের দিকটা সব সময় মনে রাখতে হয়। মাথা নত হবে শুধু আচার্যের সামনে। মনুস্মৃতিতেও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলে দেওয়া আছে, কোথায় কোথায় মাথা নত করতে হয়।

আমাদের সমস্যা হল, আমরা একটা জায়গায় বড়, কিন্তু ওই একটা জায়গার বড়কে আধার করে আমরা পাঁচটা জায়গা থেকে সম্মান পেতে চাই। যেমন অনেকে মনে করে আমি তোমার থেকে বয়সে বড়, আমি তোমার থেকে ভাল জানি। যার ফলে দেখা যায় সে ফিজিক্স নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে, ওষুধ নিয়ে বলতেই থাকবে, যেটার ব্যাপারে ওনার কোন জ্ঞান নেই, আর বাস্তবিক দেখা যায়। একজন শিক্ষিত হন বা অল্প শিক্ষিত হন, বয়স্ক মানুষের সাথে তর্ক করাটাও কখনই শোভনীয় না, সেইজন্য কোন কিছু আপত্তি না করে, ভদ্র ভাবে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। এক গ্রামের এক মহিলার দাদা খুব ভাল ইংরাজী জানত, মহিলাটি সম্পূর্ণ নিরক্ষর। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে বোনকে উদ্দেশ্য করে একজনের কাছে ইংলিশে চিঠি লিখে পাঠাতেন। মহিলাটা লোকটিকে বলত, 'তুমি আমাকে চিঠিটা পড়ে শোনাও ওতে কি লেখা আছে'। লোকটি বলল, 'ঠিক আছে আমি অনুবাদ করে

চিঠিটা পড়ে দিচ্ছি'। ভদ্রমহিলাটি বলল, 'অনুবাদ করতে হবে না, তুমি এমনিই পড়ে যাও, আমি সব বুঝতে পারব'। 'আপনি কি করে বুঝবেন'? 'আমি তোমার থেকে বয়সে বড় কিনা, ঠিক বুঝতে পারব'। বয়স দিয়ে বিদ্যা মাপা যায় না। বয়সে আপনি বড় হতে পারেন, আপনি সম্মানের পাত্র হতে পারেন, এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যে ব্যক্তি কোন দিন ইংলিশ পড়েনি, সে কি করে ইংরাজী বুঝবে!

যে জায়গাতে আমার শক্তি আছে, আমার ক্ষমতা আছে, ওই জায়গাটাই ঠিক ঠিক আত্মসম্মানের জায়গা। আমরা যেখানে সেখানে আত্মসম্মান পেতে চাইছি। আমরা ভগবানের ঘর থেকে কিছু সম্পদ বা কিছু গুণ নিয়ে এসেছি, এরপর ঐ গুণের খাতিরে জগৎ থেকে দাবি করতে থাকবে আমার এটা চাই, সেটা চাই। যেমন একজন রূপবতী নারী, ভগবানের ঘর থেকে রূপের ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছে, এরপর সে চাইছে, সারা জগৎ যেন আমার পায়ে এসে পড়ে। তোমার রূপটা তো তোমার নয়, কেন তোমাকে সবাই সম্মান করতে যাবে, আর তুমি সুন্দর বলে জগৎ কেন তোমার পায়ে পড়তে যাবে! একজনের একটা ডিগ্রী আছে, সে মনে করছে সবাই আমার সামনে নত হবে। আমার হাতে তলোয়ার আছে, সবাই আমার সামনে নত হবে। কেন নত হতে যাবে? আপনি বিরাট বড় জমিদার বাড়ির ছেলে, পৈতৃক সম্পর্কের সূত্রে আপনার অগাধ সম্পত্তি; এটা তো আপনার নয়, কেন এর জন্য অহঙ্কারে ফুলছেন? যদি আপনি সত্যিকারের খেটেখুটে কোন কিছু অর্জন করে থাকেন, তখন লোকে সত্যিই আপনাকে সম্মান করবে। এটাই আমাদের জীবনের দুর্ভাগ্য।

কোনটা মর্যাদার ব্যাপার, কোথায় আত্মসম্মান জড়িয়ে আছে, এই দুটো ভাল করে বুঝতে হয়। যেটাতে আমার অস্তিত্ব, বা যেটাতে আমিত্ব বেশী প্রকাশিত, আর সেই আমিত্বের পিছনে, মর্যাদার পিছনে সঠিক কারণ থাকা চাই, এলেমেলো কারণে হওয়া না, তখন সেই মর্যাদা ও আত্মসম্মানকে কক্ষণ যেন ছোট না করা হয়। এর একটা খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, আলেকজাণ্ডার পোরাসকে হারিয়ে দিল, পোরাস কিন্তু নিজের মর্যাদাকে ছাড়ল না। আলেকজাণ্ডার যখন পোরাসকে বলছে, 'বল তুমি আমার কাছ থেকে কি রকম ব্যবহার প্রত্যাশা করছ'। পোরাস তখন বলছে, 'এক রাজা যেমন অন্য রাজার সাথে ব্যবহার করে'। এটাই practical vedanta।

স্বামীজী বর্ণনা করছেন, একদিন আমেরিকায় ঘোড়ার গাড়ি করে যাচ্ছেন, হঠাৎ রাস্থায় দেখছেন দুটো ফুটফুটে সুন্দর বাচ্চা খুব ভাল পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান গাড়ি থেকে নেমে বাচ্চা দুটোকে আদর করল। স্বামীজী পরে জিজ্ঞেস করছেন, 'তুমি কি করে ওদের আদর করলে? ওর তো কোন বড়লোকের ছেলে বলেই মনে হল'। লোকটি বলল, 'না, ওরা আমারই ছেলে। আমরা আগে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলাম, অভাবে পরে আজকে আমি ঘোড়ার গাড়ির কোচম্যান হয়েছি। কিন্তু আমার বাচ্চাদের, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরা যেভাবে মানুষ হয়, ঠিক সেই ভাবে আমি ওদের পালন করছি'। স্বামীজী বলছেন, এটাই হল practical vedanta। নিজের আত্মসম্মানকে কখন নষ্ট হতে দিতে নেই। ঠাকুর বলছেন, মানুষ কে? যার মানে আছে হুঁশ। মান মানেই dignity, dignityকে, আত্মসম্মানকে কখনই ছোট করতে নেই।

একজন মহারাজের কাছে শোনা বার্মার একটা ঘটনা এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি। বার্মার এখন যিনি রাষ্ট্রপ্রধান সু কি, এনার বাবা এক সময় বার্মার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এক মিলিটারি ক্যুতে এনার বাবাকে এবং বার্মার অনেক মন্ত্রীকে মেরে ফেলা হয়। সেই দিনই রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ মিশনে একটা অনুষ্ঠান চলছিল, সু কির মা সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। ওই মহারাজ সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখছেন, সরকারের উচ্চ পদাধিকারীর একজন কেউ এসে রাষ্ট্রপতির স্ত্রীর কানে ফিস ফিস করে কিছু বললেন। উনি নাকি তখন শুধু বলছিলেন, Is he dead? যাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি উত্তর দিল বোঝা গেল না। উনি তখন কিছু বললেন না, শেষ পর্যন্ত

অনুষ্ঠানে ছিলেন। পরে জানা গেল, মিলিটারি ক্যু হয়ে গেছে, রাষ্ট্রপতিকে মেরে দেওয়া হয়েছে। সেই সময় ওই মহিলার, সু কির মায়ের খুব নামকরা কথা। এতদিন সু কিকে তারা জেলে রাখল, এমন করে দেওয়া হল যে সে কোন দিন সেই দেশের নেতা হতে পারবে না। তাতে কিছু আসে যায় না, ক্ষমতা কিভাবে আসে আমরা কেউ কিছু বলতে পারব না। আজ সু কি বার্মার রাষ্ট্রপ্রধান। তখন মিলিটারিরা রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সবাইকে মেরে দিয়েছিল। সেই সময় সব মহিলারা কান্নাকাটি করছেন, তখন সু কির মা বলছেন, 'তোমরা কেঁদো না, আমাদের সারা জীবন পড়ে আছে কান্নার জন্য, এখন কেঁদে আমাদের শত্রুদের আনন্দ বর্দ্ধন করো না। চুপ করে সব সহ্য করে শান্ত হয়ে ধৈর্যকে ধরে রাখো'। এই হল শক্তি, এটাই হল আত্মমর্যাদা। ক্লীব ভাব, আত্মমর্যাদার সাথে আপোষ, কখনই এই দুটোকে আশ্রয় করতে নেই।

এটাই ভগবান বলছেন, *নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে*, অর্জুন! তোমার মধ্যে এই ক্লীব ভাব শোভা দেয় না, কারণ এটা তোমার স্বভাব না। তুমি যদি কাপুরুষ হতে, তাহলেও এই জিনিস মানা যেত না, আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা যুদ্ধ করতে জানত না, যুদ্ধ হলে তারা পালিয়ে যেত। কিন্তু তোমার স্বভাবে এই জিনিস নেই, তুমি কাপুরুষ নও।

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং, হৃদয়ের মধ্যে দৌর্বল্যের ভাব। ফরাসি বিপ্লবের সময় নেপোলিয়ন ঈজিপ্টে পৌঁছালেন, সেখানে গিয়ে দেখছেন প্রতিপক্ষের বিরাট সৈন্যবাহিনী। সৈন্যের সংখ্যা এক আর তিন অনুপাতে। নেপোলিয়ন তখন খুব নামকরা কথা নিজের সৈন্যদের বলেছিলেন, 'চার হাজার বছরের ইতিহাস তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে'। ওখানে পিছনের দিকে পিরামিডগুলো ছিল কিনা, আর সামনে মুসলিম সেনারা সমবেত হয়ে আছে। বলছেন, 'তোমরা এমন কিছু করো না, যাতে ইতিহাস তোমার উপর হাসে'। এই এক আর তিন অনুপাত দেখে নেপোলিয়নের সৈন্যদের হৃদয়ের মধ্যে যে সাময়িক দৌর্বল্য ভাব এসেছিল, এই একটা কথাতে তারা উজ্জীবিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর নেপোলিয়নের সৈন্যরা সবাই মিলে শত্রুপক্ষের সব কটাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল। এই শক্তিটাকে বার করে আনা। আমাদের সমস্ত বেদ, উপনিষদ যদি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, এবং একটা শব্দ যদি রেখে দেওয়া হয়, *ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ*, তাহলেই আবার সব কিছু দাঁড়িয়ে যাবে।

সংস্কৃতে 'মা' মানে 'না', ক্লীব ভাব আসতে দিও না, তোমার পৌরুষ, তোমার যে শক্তি, এটাকে compromise করো না, হৃদয়ে দৌর্বল্যের ভাব আসতে দিও না। *ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ*, তোমার হৃদয়ের মধ্যে যে দৌর্ব্যলের ভাব এসে গেছে, এটাকে এবার ছেড়ে উঠে দাঁড়াও, যুদ্ধ কর।

ভগবান বলে দিলেন বলেই যে অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু বুঝে নিয়ে তেড়েফুড়ে উঠে যুদ্ধ করতে ঝাপিয়ে পড়বেন, অত সহজে তা হবে না। লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুর আর নরেনের কথা যেখানে আছে, সেখানে এটা খুব সুন্দর বোঝা যায়। ঠাকুর নরেনকে অনেক কিছু বলছেন। নরেনও শুনছেন, বুঝছেন, সাধনা করছেন; কিন্তু বার বার বলতে হচ্ছে। উচ্চস্তরের কথা একবার বলে দিলে হয় না। অর্জুনের মত আধার, সেও কিছু বুঝতে পারছে না, নরেনের মত সপ্তর্ষির ঋষি আর ঠাকুরের মত শিক্ষক, তাও একদিনেই কিছু নরেনের সব কিছু হয়ে যায়নি। আর আমরাও দু-তিন বছর শাস্ত্রকথা শুনেই সর্বশাস্ত্রবিদ হয়ে যাবো ভাবছি। আমরা এখানে জীবনে নামানোর কথা বলছি না, বোঝার কথা বলা হচ্ছে, সেটাও হয় না। আমরা এখন শাস্ত্রের যে আলোচনা শুনছি, শুনে মনে হচ্ছে সব স্পষ্টম্, কিন্তু আগামীদিনে শাস্ত্রের আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই আজকের আলোচনার কথাগুলো ভুলে যাব। তবে শুনতে শুনতে একটা সময়ে গিয়ে জিনিসগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করে, কিন্তু অনেক সময় লাগে। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথা মানতে পারলেন না, এখনও কাঁদছেন, বলছেন –

অর্জুন উবাচ
কথং ভীষ্মমহং সাংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন।।৪।।

(অর্জুন বললেন – হে শত্রুমর্দন, হে মধুসূদন, ভীষ্ম, দ্রোণ, এনারা আমাদের পূজনীয়। এনাদের সাথে বাণাদি অস্ত্র দ্বারা কি করে প্রতিযুদ্ধ করব?)

যুদ্ধক্ষেত্রে কৌরবদের পক্ষে পিতামহ ভীষ্ম আছেন, আচার্য দ্রোণ আছেন, মামা শল্য আছেন, আর কৃপাচার্য, অর্জুন যাঁর কাছে তলোয়ার চালানোর শিক্ষা পেয়েছিলেন, এই ধরণের অনেক গুরুজনরা সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। এনারা একদিকে আমার থেকে বয়সে কত বড়, আবার অন্য দিকে কেউ পিতামহ, কেউ আচার্য, সবাই আমার পূজনীয়; *ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি*, এদের প্রতি আমি কি করে বাণ নিক্ষেপের দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করব। যুদ্ধের তৃতীয় দিনের যুদ্ধে অর্জুন আর ভীষ্ম মুখোমুখি হলেন, অর্জুন সেখানে বাণ চালাতেই পারছেন না। এত গীতা শুনে, সব কিছু করার পরেও অর্জুনের এই অবস্থা। ভীষ্ম দুর্যোধনকে কথা দিয়েছেন, প্রত্যেক দিন আমি দশ হাজার পাণ্ডব সেনা বধ করব। সত্যিই তিনি মারতে থাকলেন। অর্জুন ভীষ্মের দিকে বাণ মারছেন ঠিকই, কিন্তু ভীষ্মের কবচ ভেদ করে শরীরে আঘাত করতে পারছে না। আসলে অর্জুনের বাণ মারার মধ্যে সেই রকম জোশ বা জোর তখন কোনটাই ছিল না। শেষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'তুমি এ কি করছে, তোমার দ্বারা হবে না, আমাকেই এবার নামতে হবে', বলেই নিজে যুদ্ধে ভীষ্মকে বধ করবার জন্য নেমে পড়লেন। অর্জুনের বাণের যে শক্তি নেই তা না, কিন্তু আবার তাঁর মধ্যে ইমোশান এসে গেছে। এই ইমোশানকে আবার শ্রীকৃষ্ণকে পরিষ্কার করতে হবে। যার জন্য আচার্য খুব সুন্দর বললেন, অর্জুনকে মাধ্যম করে মানুষের ভালর জন্য ভগবান গীতার উপদেশ দিলেন।

যদি ঠাকুরকে আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে ঠাকুরের সব কথাকেই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আমরা সেখানে ঠাকুরের এটা মানব, ওটা মানব না, কখনই বলতে পারি না। নিজের বুদ্ধিকে লাগানো যাবে না। পরে গীতায় ভগবান বলবেন, *তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে*, তুমি তোমার বুদ্ধিকে লাগাতে পারবে না, হয় শাস্ত্রের পুরোটা মানো, তা নাহলে তুমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাও। দক্ষিণেশ্বরে নরেনের দ্বিতীয় দিনে ঠাকুর নরেনের সামনে হাতজোড় করে বলছেন, আমি আপনাকে চিনেছি, আপনি সেই নরঋষি। মহাভারতে নরনারায়ণ ঋষির বর্ণনা আছে, এনারা দুজন সব সময় একসাথে আসেন মানব কল্যাণের জন্য। অর্জুন সেই নরঋষি, আর ভগবান হলেন নারায়ণ ঋষি। আগেকার দিনে অবতারের ধারণা ছিল না, ওনারা এটাকে ঋষি রূপে নিতেন, এটাই সেমেটিক ধর্মে প্রফেটের ধারণা রূপে এসেছে।

নরেন হলেন নরঋষি আর ঠাকুর হলেন নারায়ণ ঋষি। নরঋষিকে মাধ্যম করে নারায়ণ ঋষি যা বলার বলে দিচ্ছেন। এখানে নরেনের উত্থানের কিছু নেই, জগতের কল্যাণের জন্য একটা পাত্র দরকার, নরেন সেই পাত্র। যেমন অনেক সময় দেখা যায় অনেক উঁচু থেকে যখন কেউ লাফ মারে, তখন নীচে স্প্রিংএর মত কিছু একটা লাগিয়ে দেয়, যাতে পড়লে ওই স্প্রিং এর উপরে পড়তে পারে, যাতে হাত পা ভেঙে কোন অঘটন না ঘটে। সবাই ঝাঁপ দিতে পারবে না। আমাদের ব্রেণের ফিউজ উড়ে যাবে। ঠাকুর যেমনি হৃদয়রামকে একটা দিব্য কিছু দিলেন, হৃদয়রামের ফিউজ উড়ে গেল। অর্জুন হলেন নরঋষি, নরেনও হলেন এই যুগের সেই নরঋষি। যার জন্য গীতা আজও চলছে, স্বামীজীর কথা আজও চলছে। যেমন step down transformer থাকে, ওখানে এসে কারেন্টটা নামে, তারপর ওর ভোল্টেজ কমিয়ে domestic কাজে লাগান হয়। সাধারণ লোকের কাছে গীতার কথা, স্বামীজীর কথা গেলে ফিউজ উড়ে যাবে। গীতা আমি রোজ আবৃত্তি করে যেতে পারি, সারা জীবন আবৃত্তি করে যেতে পারি, কিছু হবে না। এর জন্য প্রস্তুতি লাগে। শয়ে শয়ে মানুষকে ভগবান

দিয়ে থাকলে কিছুই হত না। মানুষের দিক থেকে যদি দেখা হয়, অর্জুনও এটা নিতে পারছেন না। না নিতে পারারই কথা, সবে যুদ্ধের চতুর্থ দিন। সেইজন্য অর্জুন বলছেন, *কথং ভীষ্মমহং সাংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন*, কি করে আমি আমার গুরুজনদের প্রতি বাণ মারব! উচ্চ চিন্তন একবার করলে হয় না, বারবার, অনেকবার, অনেক দিন ধরে করতে হয়।

অর্জুন আরও বলছেন, *ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন*, যাঁদের চরণযুগলের পূজা সারা জীবন করে এসেছি, শৈশবে ধুলাবালি মেখে যে পিতামহের বুকে দাপাদাপি করতাম, তাঁর বক্ষে আমি বাণ চালাব কি করে। শেষ যুদ্ধে যখন শিখণ্ডিকে সামনে রেখে অর্জুন ভীষ্মকে বাণ মারছিলেন, ওই দৃশ্যের বর্ণনা পড়লে আমাদেরও গায়ে কাঁটা দেয়, আমাদেরও চোখে জল চলে আসে। এই ভীষ্ম সারাটা জীবন নানা ভাবে পাণ্ডবদের রক্ষা করে এসেছেন, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন, হস্তিনাপুরের রাজ্যকে তিনি রক্ষা করবেন, তা সে যে রাজাই হোক, তিনি রক্ষা করবেন। সেই ভীষ্মকে অর্জুন একের পর এক বাণ মেরে যাচ্ছেন। একদিকে যেমন এটা একটা depressed words, অন্য দিকে আবার logically correct। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে গীতা মহাভারতের অংশ, আর মহাভারত হল ধর্মশাস্ত্র। ধর্মশাস্ত্র দুই প্রকার হয়, এক প্রকার হল, সত্যকে সত্য রূপে বলে ছেড়ে দেওয়া। যেমন, উপনিষদ বা বাইবেল। কিন্তু সেটা দিয়ে জীবন চলে না। জীবন চালাবার জন্য সত্যের যে অনেকগুলি আবরণ, সেটাকে নিয়ে আসতে হয়। চব্বিশ ক্যারেটের সোনা দিয়ে গহনা হয় না, গহনা বানানোর জন্য সোনাতে খাদ মেশাতে হয়। আমাদের ঠিক ঠিক ধর্মশাস্ত্র হল মহাভারত আর রামায়ণ, যেখানে এটাও ঠিক ওটাও ঠিক।

কোনটা করা যাবে, কোনটা করা যাবে না, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, বাচ্চা বয়স থেকে আমরা সবাই মোটামুটি জানি। সত্যি কথা বলতে হয়, চুরি করতে নেই, এগুলো আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। তাহলে এত শাস্ত্র কেন? কারণ জীবন শুধু সত্য আর মিথ্যার লড়াইকে নিয়ে চলে না। আমরা মনে করি জীবন হল ধর্ম আর অধর্মের লড়াই, কখনই তা নয়। জীবনের লড়াই সব সময় ধর্ম আর ধর্মকে নিয়েই হয়ে থাকে, সেখানে এটাও ঠিক, ওটাও ঠিক।

শ্রীরামচন্দ্রকে কৌশল্যা বলছেন, 'আমি তোমার মা, আমি তোমাকে বলছি, তুমি জঙ্গলে যাবে না'। কিন্তু দশরথের আদেশ, রামকে জঙ্গলে যেতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র এখন কোনটা করবেন? কৌশল্যা বলছেন, মায়ের স্থান সবার উপর। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন, রাম দুই রকম কথা বলে না। আগে বাবাকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে, জঙ্গলেই সে যাবে। বালিবধের ক্ষেত্রেও একই জিনিস, ধর্মের সাথে ধর্মের সংঘাত। একদিকে লুকিয়ে কাউকে বধ করতে নেই। অন্য দিকে বালি রামের সাথে যুদ্ধই করবে না, কেন যুদ্ধ করবে সে! রামের সাথে তো আমার কোন শত্রুতা নেই। অন্য দিকে বন্ধু সুগ্রীবকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে, আমি বালিকে বধ করে দেব। শ্রীরামচন্দ্র এখন কোনটা করবেন? রাজা হয়ে তিনি কথা দিয়েছেন, তিনি প্রজা ও রাজ্যের ভাল করবেন। অন্য দিকে তিনি সীতার সমস্ত ভার গ্রহণ করেছে। কাকে রাখবেন আর কাকে ফেলবেন? হয় তাঁকে রাজ্য ছাড়তে হবে, নয়তো সীতাকে ছাড়তে হবে। এই হল ধর্ম ও ধর্মের সংঘাত। আমাদের জীবন এভাবেই চলে।

জীবন কখন ধর্ম ও অধর্মের লড়াইয়ে চলে না। ধর্ম ও অধর্মে পরিষ্কার বোঝা যায়, এ চুরি করেছে, একে দণ্ড দিয়ে দাও; এ মিথ্যা কথা বলেছে, একে শাস্তি দিয়ে দাও। কিন্তু জীবনে এমন এমন কঠিন পরিস্থিতি আমাদের জীবনে এসে উপস্থিত হয় তখন কোনটা করা উচিৎ, আর কোনটা করা উচিৎ নয়, এটাকে ঠিক করতে গিয়ে আমাদের হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। আমি জানি ঘুষ দেওয়া অপরাধ, আমি ঘুষ দিতে চাই না। কিন্তু আমার বাবা-মা আমার অত্যন্ত প্রিয়জন। তাঁদের কারুর চিকিৎসার প্রয়োজন, কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি করানো যাচ্ছে না, একটা মোটা টাকা ঘুষ দিলে কাজ হয়ে যাবে। আমি তখন কি করব? আমি কি ঘুষ দেব না? বিনা চিকিৎসায় আমার চোখের

সামনে বাবা কিংবা মাকে মরে যেতে দেব? এভাবে আমরা কাউকেই মরে যেতে দিতে পারি না, একটা জায়গায় গিয়ে আমাদের আপোষ করে নিতে হয়। আসলে ধর্ম আর ধর্মের লড়াই এভাবেই চলে। আমরা তখন বিভিন্ন রকমের যুক্তিতর্ক দিয়ে জিনিসটাকে বোঝাতে চাই। যাই হোক, গুরু স্থানীয়কে হত্যা না করার অনেক যুক্তি অর্জুন এখ তুলে আনছেন –

গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে
হত্বার্থকামাংস্তু গুরুনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্।।৫।।

(মহানুভব গুরুজনদের বধ না করে ইহজগতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করলেও আমার কল্যাণ হবে। কিন্তু এনাদের বধ করলে ইহলোকেই শোণিতসিক্ত-ধনসম্পদ ও কাম্যবস্তুরূপ ভোগ্য বিষয় সমূহ ভোগ করতে হবে।)

অর্জুন বলছেন, মহাপ্রভাব পিতামহ ভীষ্ম, আমার আচার্য দ্রোণ, এনাদের মত গুরুদের বধ করে রাজ্যসুখ ভোগ করার চাইতে ভিক্ষান্ন ভোজন করে জীবনধারণ করা অনেক শ্রেয়স্কর। কেননা গুরুজনদের বধ করলে এনাদের রক্তে মাটি সিক্ত হয়ে যাবে, রুধিরলিপ্ত মাটি ভোগ করা যায় না।

কিন্তু তুমি বারো বছর ধরে জঙ্গলে রোজ কি প্ল্যান করছিলে? কিসের জন্য তুমি স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের কাছ থেকে সব দিব্যাস্ত্রগুলি নিয়ে এলে? শিবের তপস্যা করে পাশুপত অস্ত্র কিসের জন্য নিয়ে এলে? অজ্ঞাতবাসে তোমার সবাই মিলে গোপনে গোপনে যে প্রস্তুতি নিলে, এত প্ল্যান, নিজেদের মধ্যে এত গভীর আলোচনা, এত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ তুমি কিসের জন্য করেছিলে? এখন শেষ মুহূর্তে এসে তোমার মনে পড়ল এনারা আমার গুরুজন? বনবাসের সময় যুধিষ্ঠির ভীমকে বলছেন, 'তুমি বুঝছ না, যুদ্ধ করা যাবে না, কারণ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ যুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য, তুমি ভেবে দেখ, কি করে আমরা এনাদের সাথে যুদ্ধ করে পেরে উঠব'! দু দিক থেকেই বলা যেতে পারে, ক্ষমতার দিকে থেকেও, ভালবাসার দিক থেকেও। তা সত্ত্বেও পাণ্ডবরা এত দিন ধরে সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। জীবনে ঠিক এটাই হয়, আমরা অনেক সময় অনেক কিছু প্রস্তুতি নিয়ে থাকি, কিন্তু আসল সময়ে আমাদের স্নায়ু এমন দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে যায় যে, অবসন্ন হয়ে আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে পড়ি।

এতক্ষণ অর্জুন অবসাদের দরুণ নিজের কথাগুলোই শুধু বলে যাচ্ছিলেন। এবার কিন্তু অর্জুন ধীরে ধীরে শরণাপন্ন হওয়ার দিকে এগোচ্ছেন। প্রথম অধ্যায় হল অর্জুনবিষাদযোগ, বিষাদে কিন্তু কখন আমাদের ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে না। সংসার থেকে অবসাদগ্রস্ত হয়ে বিষন্ন হয়ে পড়লেই যে ঈশ্বর লাভ বা ধর্ম লাভ হবে, তা কিন্তু হয় না। 'চলবে না', 'চলবে না' করে যারা সব কিছুর বিরুদ্ধে গলা ফাটিয়ে যাচ্ছে, যারা দিনরাত সমাজ ও সমাজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গলাবাজি করে যাচ্ছে, আর যারা ভিখারী, তারা কি সবাই আধ্যাত্মিক? একেবারেই না। কিন্তু বলা হয়, ওই অবস্থায় যখন তুমি সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ ভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে গেছ, নিজেকে যখন একেবারে অসহায় মনে করছ, তখন তুমি যদি কোন গুরুর কাছে গিয়ে পড়ে এবং গুরু যদি কৃপা করে তোমাকে আপন করে শিক্ষা দেন, তবেই ধর্ম লাভ বা ঈশ্বর লাভ হয়। কেবল অবসাদ, অসন্তুষ্টির ভাব এলেই হবে না। আমি অসহায়, আমার আর কোন উপায় নেই, আমি শেষ; প্রভু তুমি আমাকে রক্ষা কর, তাতেও হবে না, তখন প্রভু যদি দয়া করে কৃপা করেন, তবেই কিছু হবে।

একজন বড় সাধুর মুখে আমরা একটা গল্প শুনেছিলাম, কুকুরের কোন ঘা হলে ওরা চেটে চেটেই সারিয়ে নেয়। কিন্তু কখন সখন কুকুরের মাথায় ঘা হয়ে যায়। মাথার ঘা চেটে সারানো যাবে না। মাথায় ঘা হলে সমস্যা হল, ঘায়ে পোকা হয়ে যায়। অন্ধকারে থাকলে ঘায়ের পোকাগুলো

কুটকুট করে কামড়ায়। তখন কুকুরটা দৌড়ে বাইরে রোদে চলে আসে। রোদে পোকাগুলো আর কামড়ায় না, তখন মাছিগুলো ঘায়ের উপর বসে কামড়ায়। কুকুরটাও কিছুক্ষণ ঘাড় নাড়িয়ে মাছি তাড়াতে থাকে, কিন্তু পরে বিরক্ত হয়ে আবার ছায়ায় চলে যায়। একবার ছায়ায়, একবার রোদে। ছায়ায় গেলে ভিতরের পোকাগুলো কুট কুট করে কামড়ায়; রোদে এলে বাইরের মাছিগুলো জ্বালাতন করতে থাকে। এই করে করে কুকুরটা আস্তে আস্তে পাগল হয়ে মারা যায়।

সাধারণ মানুষদের এই দুরবস্থা। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিহীন জীবন মানেই মাথায় ঘা। মাছি সব সময় ভন্ ভন্ করে যাচ্ছে। তখন বলে, আর পারছি না, সব ছেড়ে আমাকে কোথাও গিয়ে একা একা থাকতে হবে। সব কিছু ছেড়ে আমি হিমালয় চললাম। ওখানে যাওয়ার পর এবার ভিতরের পোকাগুলো কুট কুট করতে শুরু করে দেবে। তখন বলবে, ওরে বাবা, ওখানেই ভাল ছিলাম। দৌড়ে আবার নিজের স্বস্থানে চলে এলো। এখানে আসার পর বাইরের মাছিগুলো আবার ভন্ ভন্ করতে শুরু করে দেয়। সন্ন্যাসীদের নিয়ে এই কাহিনী বলা হয়। কাজকর্মে কর্তৃপক্ষের সাথে মনোমালিন্য হল, বলল, আমি হিমালয় চললাম। কর্তারাও ছেড়ে দেন, যাও বাপু, কিছু দিন বাইরে ঘুরে এসো। ওখানে গিয়ে মাথার পোকাগুলো জেগে ওঠে, তখন বলে আশ্রমে কাজকর্মে ভালই ছিলাম। ফিরে এসে আবার কাজে নামল, আবার খটাখটি লাগল, আবার চলল হিমালয়। এই করে করে শেষে পাগল হয়ে মারা যায়। কখন কোন মহাপুরুষের নজরে যদি পড়ে যায়, তিনি দেখেই বুঝতে পারেন, আরে এর তো মাথায় ঘা হয়েছে। তখন তিনি কুকুরটাকে কায়দা করে ধরে মাথায় ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিতে থাকেন, ধীরে ধীরে একদিন সেরে ওঠে। তার মানে, মাথায় ঘা হলে, কোন মহাপুরুষ যদি কৃপা করে তাকে ধরে বেঁধে চিকিৎসা করেন, তবেই ঘা সারবে।

অর্জুনের মাথায় ঘা হয়েছে। মাথায় ঘা আমার আপনার সবারই আছে। প্রথম কথা হল, আমরা এখনও শেষ পর্যায়ে যাইনি। তবে চিন্তা নেই, যাবো, সবাই আমরা ঐ পাগলামির দিকেই এগোচ্ছি, যদি না গুরুর শরণাপন্ন হই। এই আলোচনার বিষয় এটাই, যখন মন অবসাদে একেবারে ভেঙে পড়ে, বর্তমান অবস্থার উপর সম্পূর্ণ অসন্তুষ্টি এসে গেছে, তখন আমাদের শরণাগত হতে হয়। ওই শরণাগতি নেওয়ার পর গুরু যদি কৃপা করেন, তিনি যদি চিকিৎসা করেন, তবেই বাঁচার উপায়, এ-ছাড়া কোন উপায় নেই।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ।।৬।।

(আমরা জয়ী হই অথবা এঁরা আমাদের জয় করে, এ-দুটির মধ্যে কোনটি আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর, তা বুঝতে পারছি না। যাঁদের বধ করে আমরা বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণই আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন।)

এতক্ষণ অর্জুন নিজের কথা বলে যাচ্ছিলেন, এটা ঠিক নয়, ওটা ঠিক না, ইত্যাদি, এবার গলার স্বরটা একটু নরম হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, এটা ঠিক, না ওটা ঠিক। একদিকে ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানরা আর তার সাথে তাদের সৈন্যবাহিনী, এরা যদি জয়ী হয় সেটা ভাল, না আমরা জয়ী হলে সেটা ভাল। কারণ ওরা জয়ী হতে গেলে ওদের আমাদেরকে মারতে হবে, আমরা যদি জয়ী হই তাহলেও তো এদেরকে মেরেই আমাদের জয়ী হতে হবে। তাহলে এই রক্তাক্ত ভূমি, রক্তমাখা রাজ্য, ধন, সম্পদ, এগুলো কি আমরা ভোগ করতে পারব? চিন্তা করুন, আপনার মা আইসিসিইউতে ভেন্টিলেশানে পড়ে আছেন। মেশিনের সাহায্যে তাঁর হার্টের স্পন্দন চলছে। যদি আপনি সুইচ অফ্ করতে বলেন, এই মুহূর্তে আপনার এক লাখ টাকা বেঁচে যাবে, কিন্তু মায়ের

জীবনের স্পন্দন থেমে যাবে। কেউ এটা করতে পারবে? আরও হিংসাত্মক, যদি বলা হয় আপনার মাকে গলা টিপে মেরে ফেলুন, আপনাকে এক কোটি টাকা দেওয়া হবে? পারবেন আপনি করতে? কখনই পারবেন না। অর্জুনের ঠিক এই অবস্থা, আপনজনকে গলা টিপে মেরে রাজ্য আদায় করতে হবে। আমরা পারব না ঠিকই, কিন্তু অর্জুন ক্ষত্রিয়, তাঁর এটাই করার কথা, কারণ এটা ধর্মযুদ্ধ।

যত যাই হোক, দুর্যোধনরা আমার ভাই, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, শল্য এনারা আমার গুরুজন। যাঁদের জন্য মানুষ জীবনধারণ করে, যাদের জন্য মানুষ সব কিছু অর্জন করে, তাঁরাই আজকে যুদ্ধভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে, যাঁদেরকে আমায় বধ করতে হবে। ইদানিং কালে মানুষ অর্থোপার্জনের জন্য দৌড়ে যাচ্ছে, বাবা সকালে উঠে একদিকে দৌড়াচ্ছে, মা আরেকদিকে দৌড়াচ্ছে, বাড়িতে তাদের ছেলেটা কেমন একা একা পড়ে থাকে। কিছু হলেই তারা সন্তানকে বোঝাতে যাবে, 'বাবা, তোমার জন্যই তো আমরা এগুলো করছি'। আমেরিকাতে একবার একটা বাচ্চা তার বাবা-মার সাথে ট্রেনে করে একটা পিকনিকে যাচ্ছে। সবারই খুব আনন্দ, বাবাও হাসছে, ছেলেও হাসছে। তখন ছেলেটির বাবা, যে কিনা অর্থোপার্জনের জন্য কাজেকর্মে সারাদিন ব্যস্ত থাকে, তার হঠাৎ মনে হল, আমি যে এত দৌড়াদৌড়ি করছি, আমার স্ত্রীও যে এত দৌড়ঝাপ করছে, আমরা ভাবছি, আমাদের ছেলের জীবন যাতে ভাল হয়। কিন্তু ছেলের যে আসল জীবন তৈরী হবে সেটা তো হবে তাকে আমাদের সঙ্গ দিয়ে। সেটাই এখন হারিয়ে যাচ্ছে। আজকে যে আমেরিকার দুরবস্থা, অল্প বয়সে হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছে, কেন? কারণ যেটা আসল দরকার, সেটাই নেই। বাবা বলছে, আমি যা কিছু করছি সব তোমার জন্যই তো করছি বাবা। কিন্তু যেটা আসল প্রয়োজন, তোমাকে ছেলের সঙ্গ দেওয়া, সেটারই চূড়ান্ত অভাব।

অর্জুন এটাই বলতে চাইছেন, যাদের জন্য সব কিছু অর্জন করা হয়, তাদের মেরে আমার লাভটা কি? ছেলের যেটাতে মঙ্গল, যেটা তাকে খুশীতে রাখবে, সেটাকে বলি দিয়ে বলছে, আমি তো বাবা তোমার জন্যই এত কিছু করলাম, এটা কি ধরণের লজিক? যদি বলত, আমি আমার ক্যারিয়ারের জন্য এসব করছি, আমার ক্যারিয়ারের জন্য তোমাকে sacrifice করলাম, এখানে তাও আপনি একটা অন্তত সত্য কথা বলছেন। কিন্তু যদি বলেন, আসলে কি জানো, আমি তোমার জন্যই সব করছি, এটা কোন যুক্তি তো নয়ই, উপরন্তু আপনি নিজের সন্তানের সামনে একটা মুখোশ ধারণ করে আছেন। অর্জুন এখানে এটাই বলতে চাইছেন। যাদের জন্য রাজ্য পাওয়া, যাদেরকে নিয়ে ভোগ করা, তাদের সবাইকে মেরে দিয়ে কি করে সুখ ভোগ করব? এতক্ষণ অর্জুন সরাসরি সব কথা বলছিলেন, এবার তাঁর মনে কোথাও একটা দোনমোনা ভাব এসেছে। এখান থেকেই অর্জুনের মধ্যে একটা পূর্ণ শরণাগতির ভাব আসছে, যেটা পরের শ্লোকে তাঁকে পরিষ্কার করে বলতে দেখা যাচ্ছে –

কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।৭।।

(এঁদের বধ করে কিভাবে বেঁচে থাকব এরূপ দুশ্চিন্তাপ্রসূত চিত্তের দীনতায় আমি অভিভূত হয়েছি; এবং আমার প্রকৃত ধর্ম কি, সে সম্বন্ধেও আমার চিত্ত বিমূঢ় হয়ে গেছে। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আমার পক্ষে যা মঙ্গলকর, তা নিশ্চয়পূর্বক বলুন। আমি আপনার শিষ্য, আমি আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন।)

এই শ্লোকের শেষ লাইনটা আমাদের প্রত্যেককে মুখস্ত করে একেবারে মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে হবে, দরকার হলে লিখে রাখতে হবে, ***শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্***। প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একজন কি দুজন ব্যক্তি অবশ্যই থাকা দরকার, যাঁর কাছে গিয়ে সে মাথা

নত করতে পারে। তিনি যদি মাথায় পদাঘাত করেন, পিঠে যদি লাঠি মারেন, তাও তাঁকে বলতে হবে আমি আপনার দাস। তিন নম্বর শ্লোকের ক্লীব ভাবটাই এখন অন্য রূপে এসেছে, এখানে শব্দটা বলছেন *কার্পণ্য*। *কার্পণ্য* মানে কৃপণ, কৃপণের অর্থ সঙ্কীর্ণ, ছোট। ঠাকুর বলছেন, এমন কৃপণ যে, দু পয়সার সন্দেশ আনতে বললে চুষতে চুষতে নিয়ে আসবে। আসলে দুষ্ট স্বভাব, বদমাইশ। আমরা স্বভাবে অনন্ত, সেই অনন্ত এখানে সীমিত হয়ে গেছে। সীমিত হতে হতে একেবারে ছোট হয়ে যায়। আমরা বলি অমুক খুব কিপ্টে, কিপ্টে মানেই কৃপণ, হৃদয়টা তার সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে, ইংলিশে বলে mean-minded, নীচমনা। অর্জুন এতক্ষণ ভগবানের সাথে আছেন, আস্তে আস্তে মনটা তাঁর শান্ত হচ্ছে। বুঝতে পারছেন তাঁর মনের মধ্যে যে ভাব এসেছে, এই ভাব একেবারেই ভাল না। সেইজন্য বলছেন, *কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ*, আমার মনের মধ্যে কেমন একটা কৃপণ ভাব উদয় হয়েছে, মনটা ছোট হয়ে গেছে, যার জন্য আমি নিজেকে বিচার করতে পারছি না।

বেশীর ভাগ লোকেরাই, যারা এসে বলে, বলুন তো আমি কি করব, এদের আগে থেকেই ঠিক করা আছে কি করবে। আপনার কাছে আসছে, যাতে আপনি ওর reasonকে yes করে দেন, আর পরে গোলমাল হলে আপনার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলতে পারে, আপনিই তো বলেছিলেন করতে। এখানে অর্জুনের ক্ষেত্রে এসব কিছু নেই, পরিষ্কার বলছেন, আমার মনের এখন যা অবস্থা, আমি পুরোপুরি সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে গেছি। আমার প্রকৃত স্বভাবটা সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে।

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ, *ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ*, প্রকৃত ধর্মের ব্যাপারে আমার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিটা বিমূঢ় হয়ে গেছে। এখানে ধর্ম মানে, way of life, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এই ব্যাপারে আমি পুরোপুরি বিমূঢ় হয়ে গেছি। অর্জুনের কাছে প্রশ্ন হল, যুদ্ধ করাটি আমার পক্ষে ঠিক, নাকি যুদ্ধ থেকে সরে আসাটা ঠিক। ভগবান আগে একবার বলেছিলেন, তুমি যুদ্ধ কর, কিন্তু এরপর আর অর্জুনকে বলবেন না যে, তুমি যুদ্ধ কর। যেটা আগে আমরা বলেছি, তিনি অর্জুনের সামনে জীবনদর্শনটা বলতে থাকবেন।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে, হে কৃষ্ণ, আমার জন্য যেটা মঙ্গল আপনি বলে দিন। *শিষ্যেস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্*, আমি আপনার শিষ্য, আপনার চরণে এই আমার মস্তক রাখলাম, আপনার শরণাগত হলাম, আমাকে উপদেশ দিন। *শিষ্যেস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্*, এটা পুরো একটা সাধনা। আগে ভেবে দেখ, তোমার জীবনে এমন কেউ কি আছেন, যার পায়ে তুমি পুরোপুরি মাথা নত করে আছ। বেশীর ভাগ লোক বলবে, কেন আমার বাবা-মা, এনাদের পায়ে আমি মাথা নত করে রেখেছি। বাবা-মার কথা যদি শুনতে আজ তাহলে তোমার এই দুরবস্থা হত না। সাধারণ ভাবে এটাই তো দেখা যায়। এই কথা সবার জন্য বলা হচ্ছে না। বাবা-মার বাইরে কে আছেন বলো? আসলে কেউই নেই, এরা সবই হল selective Guru, গুরু করে নেয়, তারপর গুরু যে কথাগুলো মন মত হবে সেগুলো নেবে, যেগুলো মন মত নয় সেগুলোকে ছেড়ে দেবে। Philosophy of convenience যেমন হয়, যেটা আমার সুবিধা সেটাকে নিলাম, যেটা সুবিধার নয় সেটাকে বাদ দিয়ে দিলাম। গুরুজনদের কথাতেও আমরা এইভাবে selective, কিছু নিলাম, কিছু নিলাম না। আধ্যাত্মিক জগৎ এভাবে চলে না। আসলে স্থূল জগৎও চলে না। ঠাকুর বলছেন, ভাল লোককে অছি করলে সে কখন কোন মন্দ হতে দেবে না। অছি করা মানেই, আমি আপনার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করলাম। অর্জুন এখানে নিজেকে একজনের কাছে পুরোপুরি ছেড়ে দিচ্ছেন, আমি আপনার দাস, আমাকে উপদেশ দিন, বলুন, আমার জন্য কোনটা মঙ্গল। এই অবস্থায় বলা হয়, যিনি বলছেন, এবার তাঁর দায়ীত্ব হয়ে যায়।

আমরা যে শরণাগতির কথা শুনে থাকি, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাত নম্বর শ্লোক হল শরণাগতির শর্ত। প্রথম শর্ত জীবনে তার একটা বিষম পরিস্থিতি হতে হবে, দ্বিতীয় সেখানে তার চিত্ত সম্পূর্ণ

বিমূঢ় হয়ে যেতে হবে, তৃতীয় ও শেষ শর্ত যাঁকে আচার্য মনে করছে, যাঁকে ইষ্ট মনে করছে, তাঁর চরণে গিয়ে পূর্ণ সমর্পণ। আমি তোমার মুরগি, তুমি আমাকে সামনে দিয়ে কাটো, পিছন দিয়ে কাটো, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। ঠাকুর এই কথা সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে বলছেন, সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে থাকবে, তালগাছ থেকে পড়লে হাত-পা পর্যন্ত নাড়বে না। শরণাগতি কি এত সহজ! তবে শরণাগতির এটা শেষ অবস্থা, যেখানে তালগাছ থেকে পড়লে হাত-পা পর্যন্ত নাড়বে না। ওই অবস্থায় হয়ত আমরা কখনই পৌঁছাতে পারব না, তবে আদর্শটাকে মাথায় রাখতে হয়। প্রথম অবস্থায় মাথা নত করা, আপনি যা করতে বলবেন আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। এই কথা বলার পর অর্জুন তাঁর বক্তব্যের ইতি টানছেন। আদালতে সওয়াল চলার পর একটা যেমন concluding argument থাকে, এখানেও অর্জুন তাঁর শেষ বক্তব্য পেশ করছেন।

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্।।৮।।

(পৃথিবীতে নিষ্কন্টক সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পেলেও আমার ইন্দ্রিয়গণের সন্তাপক শোক নির্বাপিত হতে পারে, এমন কোন উপায় তো দেখছি না।)

অর্জুন বলছেন, এনাদের বধ করতে হবে ভেবে আমার ইন্দ্রিয়ের যে শোক উৎপন্ন হয়েছে, আমার তো মনে হয় না, পৃথিবীতে নিষ্কন্টক রাজ্য পেয়ে এবং সুরলোকের আধিপত্য পেলেও আমার যে এই শোকাগ্নি নির্বাপিত হবে এবং আমি সুখী হব। আমরা আগে যেটা বর্ণনা করলাম, আমার কোন প্রিয়জন যদি বলে ওকে তুমি মারো, তাহলে তুমি এত টাকা পাবে। এ-রকম লোক যে হয় না, তা না, এই রকম লোকও হয়। একজন মহারাজ বলতেন, 'নরাধম কারা হয় জানো'? এই বলে তিনি একটা কাহিনী বললেন, একজনের লম্বা দাড়িতে আগুন লেগে গেছে, লোকটা চিৎকার করে বলছে, আমার আগুনটা কেউ নিভিয়ে দাও। একজন লোক এসে বলছে, আমি নিভিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমার বিড়িটা একটু ধরিয়ে নিই। এই ধরণের লোক তো যে কোন সময় যে কাউকে মাটিতে ফেলে ফায়দা তুলে নেবে। কিন্তু সে যদি সত্যিকারের মানুষ হয়, কখনই সে এই ধরণের কোন কর্ম করতে পারবে না।

কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে একটা মুসলিম ছেলের বাড়িত আমেরিকা থেকে তার কয়েকজন অমুসলিম বন্ধু এসেছিল। ঠিক ওখানেই ইসলামের সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করেছে। সেই ছেলেটি সন্ত্রাসবাদীদের বলে দিল, তোমাদের কাউকে আমার বন্ধুদের মারতে দেব না। ছেলেটি ওদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল, গুলিতে ওই ছেলেটিই প্রথমে মারা গেল। ছেলেটি সহজেই নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারত, ওরা এসেছিল বিদেশীদের মারতে। কিন্তু সে রুখে দাঁড়িয়ে গেল, এরা আমার বন্ধু, এদেরকে আমি মারতে দিতে পারি না। অনেক সময় আমরা বলি, এই অপরাধ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারব না, তার থেকে বরং তুমি আমাকে মেরে দাও।

জার্মানীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার একটা ঘটনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা খুব এলেমেলো ব্যাপার ছিল, পুরো ইতিহাসটা ঠিক ঠিক আমাদের জানা নেই। যাই হোক আমেরিকা যখন জার্মানের অনেক কিছু দখল করে নিয়েছিল, সেই সময় আমেরিকা অনেক রকম উল্টোপাল্টা গোলমেলে কাজ করেছিল। অনেক ধরণের ট্রায়াল, যেগুলোকে বলা হচ্ছিল এগুলো সব ফেক ট্রায়াল। তার মধ্যে একজন বড় যে কমাণ্ডার ছিলেন, ওরা তঁকে বলল তোমার ফাঁসি হবে। আসলে তিনি কিন্তু দোষী ছিলেন না। সেই ভদ্রলোক ওদের হাতে পায়ে ধরে বলছেন, 'আপনারা এটা আমার সঙ্গে করবেন না। আমি একজন সোলজার, বংশপরম্পরায় আমরা সোলজার, আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে মারুন,

সিভিলিয়ানদের মত আমাকে ফাঁসি দেবেন না'। কিন্তু আমেরিকার সরকার তাঁর কথা শুনল না, ফাঁসিতেই তাঁকে ঝুলিয়ে দিল। তিনি বলে যাচ্ছিলেন, এটা আমার জন্য অত্যন্ত অসম্মানজনক মৃত্যু। কিন্তু আমেরিকা চাইছিল, এদের শিক্ষা দিতে, যত ভাবে এদের অপমান করা যায় করতে হবে।

অর্জুন বলছেন, এই পরিস্থিতিতে নিষ্কন্টক রাজ্য তো কিছুই না, পুরো স্বর্গরাজ্যের অধিকার পেলেও এই পরিস্থিতিতে আমার ইন্দ্রিয়ের শোক নিবারিত হবে না। এখানেই অর্জুনের বিলাপ শেষ। এরপর দুটি শ্লোকে সঞ্জয় বলছেন।

সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীং বভূব হ।।৯।।
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ।।১০।।

(সঞ্জয় বললেন – শত্রুতাপন অর্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে এরূপ বলার পর 'আমি যুদ্ধ করব না' – একথা বলে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন। হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে মৃদু হেসে যেন উপহাসের ছলে একথা বললেন।)

এইসব বলে অর্জুন বলছেন, আপনি যাই বলুন, যুদ্ধ আমি করতে পারব না। এই কথা বলে অর্জুন রথের উপর চুপ মেরে বসে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের চোখেমুখে সেই জগদ্বিখ্যাত হাসি ফুটে উঠল। এই হাসিটা কি রকম যদি বলতে হয়, তাহলে এর ভাল দৃষ্টান্ত হবে, একটা ছ-সাত বছরের বাচ্চা সে যদি মাকে বলে, 'মা, আমি ঠিক করে নিয়েছি, আমি আর কোন দিন স্কুল যাব না'। মা কি করবে? ছেলেকে একটি চড় মারবে। আর দাদুকে যদি বলে? দাদু একটু মিষ্টি হাসি দিয়ে বলবে, 'হ্যাঁ বাবা, যেও না'। যেটাই বলবেন, হেসে বলবেন। কারণ তিনি জগতকে দেখে নিয়েছেন।

আমরা এর আগে আলোচনা করেছিলাম, একটা জিনিসকে যদি ঠিক ঠিক বুঝতে হয়, তাহলে দেশ ও কাল থেকে সরে আসতে হয়। আচার্য বা অবতার পুরুষরা চিরকালের জন্য দেশ ও কালের বাইরে চলে গেছেন। যেমন, ঠাকুর, তিনি দেশ ও কালের এমন উপরে চলে গেছেন বলে তিনি সবাইকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। ফলে হর্ষ ও শোক কোনটাই তাঁর হয় না। ওনার খুশীও হয় না, দুঃখ বা শোকও হয় না। কারণ, তিনি জিনিসটা যেমন, ঠিক তেমনটা দেখতে পান। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখছেন, অর্জুনের ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ তিনটেই পরিষ্কার ভাবে জানেন। তিনি জানেন অর্জুন একজন বড় যোদ্ধা, তিনি দেখছেন অর্জুন এখন শোকাতুর, তিনি এটাও জানেন যে, ভবিষ্যতে সে যুদ্ধই করবে। শ্রীকৃষ্ণ শেষের দিকে অর্জুনকে বলবেন, *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*, তোমার স্বভাবই তোমাকে দিয়ে যুদ্ধ করাবে। এখন তুমি সরে যাবে বলছ, কিন্তু দুদিন পরেই তুমি নিজে থেকে যুদ্ধ করতে শুরু করবে।

আমাদের স্বভাব স্প্রিংএর মত, স্বভাবকে যতই আমরা চেপে রাখি, হাত সরালেই, বুম্ করে স্প্রিং ঠেলে আমাকে আমার স্বভাবানুযায়ী কাজ করিয়ে নেবে। কোন মানুষেরই স্বভাব চলে যায় না। তাহলে আমাদের স্বভাব পাল্টাবো কি করে? সেইজন্য বলা হয়, লেগে থাকো; লেগে থাকতে হয়। একদিনে কারুর স্বভাব পাল্টে যাবে না, একটু একটু করে স্বভাব পাল্টাতে হয়। অর্জুন যদি এই কথা যুধিষ্ঠিরকে বলত, যুধিষ্ঠির কি বলতেন? তাহলে বাপু তুমি ছেড়ে দাও, আমরা তাহলে চলো আবার বনবাসে চলে যাই, কারণ তোমাকে ছাড়া তো আমরা যুদ্ধই করতে পারব না। দ্রুপদ বলতেন, কোন কাপুরুষের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিলাম! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হলেন আচার্য, তিনি অবতার, তাঁর কাছে সবটাই পরিষ্কার, তিনি জানেন অর্জুনের এটা সাময়িক একটা মতিভ্রম।

প্রহসন্নিব ভারত সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ, উভয় পক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে হাসিমুখে এবার তিনি বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে উত্তর দিতে শুরু করলেন। কারণ ওখানে অর্জুনের প্রশ্ন আছে, আপনি বলুন আমার জন্য কোনটা ঠিক। প্রশ্ন যখন করা হয়েছে, অবতার এখন ছাড়বেন না, পুরো উপদেশ দিয়ে ছাড়বেন। অর্জুনের হাসপাতালে নাম লেখানো হয়ে গেছে, পুরো রোগমুক্ত, এখানে সংশয়াচ্ছন্ন মনের সংশয় মেঘ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অর্জুনের আচার্য তাঁকে ছাড়বেন না। যাই হোক, অর্জুনের ওই একটি প্রশ্নের উত্তরে এই লম্বা গীতা দাঁড়িয়ে গেল।

ঠিক ঠিক গীতা এই এগারো নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হয়। এতক্ষণ যা কিছু হচ্ছিল, আসলে এটা হল গীতার ভূমিকা। আমাদের আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছিল, আচার্য শঙ্কর দু-বার গীতার ভূমিকা লিখেছেন। আগে উপোদ্‌ঘাৎ বা সম্বন্ধ ভাষ্য নামে একটা ভূমিকা বললেন, যেখানে অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের কথা বলা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল, ভগবান যখন সৃষ্টি করলেন, সেখানে তিনি ধর্ম রক্ষার জন্য কি কি করলেন। তখন এটাও বলা হয়েছিল যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন এগারো নম্বর শ্লোক আসবে, তার আগে তিনি গীতার কি ভাব, এবং গীতা কেন, এটাকে নিয়ে আর-একবার খুব গভীর ভাবে আলোচনা করবেন। প্রথমটা ছিল সাধারণ ধর্মকে নিয়ে, এবার পুরোপুরি গীতাকে নিয়ে। এখানে তিনি অনেক মতবাদকে খণ্ডন করছেন। ওই মতবাদগুলি এখন চিরদিনের মত খণ্ডন করা হয়ে গেছে। তাছাড়া এগুলো খুব technical, ইংলিশে বলা হয় dialectic। ওর মধ্যে আমাদের যাওয়ার কোন দরকার নেই, গীতার মূল কথার মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

আচার্যের ভাষা খুব মধুর ও সহজ। অনুবাদ সহ একটু পড়ার চেষ্টা করলে আমরা সবটাই বুঝতে পারব আচার্য কি বলতে চাইছেন। বারোশ তেরোশ বছর আগে লেখা, এমনিতেই যে কোন ভাষা বারোশ বছর হয়ে গেলে বোঝা যায় না, কিন্তু আচার্যের ভাষা এত প্রাঞ্জল, এখনও পরিষ্কার বোঝা যায়। একদিকে ভাষার যেমন বাঁধন, অন্য দিকে তীক্ষ্ণ ও ক্ষুরধার যুক্তি, যুক্তিতে কোথাও কোন ফাঁক পাওয়া যাবে না। আচার্যের প্রত্যেকটা কথা পুরোপুরি logical, একটা শব্দও এদিক ওদিক যাবে না। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথম গীতা অনুবাদ করেন স্বামীজীর শিষ্য স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামীজী সেই অনুবাদ দেখে দিয়েছিলেন। সেখানে স্বামীজী পরিষ্কার বলছেন, আচার্য শঙ্করের মত আমাদের মত, উনি যেমনটি বলে গেছেন, তেমনটি আমরাও মানি।

আচার্য শঙ্কর দ্বিতীয় অধ্যায়ের আগে একটা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিচ্ছেন। এর ভিতরে ঢুকে আলোচনা করতে গেলে আমরা হারিয়ে যাব। তবে আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব, আচার্য কি বলতে চাইছেন। ভগবান বুদ্ধ যখন শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, তখন তিনি এই দিয়ে শুরু করলেন– *চত্বারি আর্যসত্যানি*, চারটে আর্যসত্য। বৌদ্ধ ধর্ম যারা পালন করছে, তাদের জন্য চারটি সত্য। খুব নামকরা বুদ্ধের শিক্ষা, এটার উপরেই বৌদ্ধ ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম আর্যসত্য হল –সংসারে দুঃখ আছে। জগতে কোন এমন মানুষ দেখা যাবে না যার দুঃখ নেই। সেখান থেকে তিনি বলছেন, দুঃখসমুদয়, সমুদয় বাংলা অর্থে নিলে হবে না, সমুদয় শব্দের অর্থ হয়, এর একটা উৎস আছে। কোথাও না কোথা থেকে দুঃখের জন্ম হয়েছে। কোথা থেকে? কাম, ক্লেশ এই জিনিসগুলি থেকে জন্মেছে। সেখান থেকে বলছেন, দুঃখ নিরোধ। যেটা জন্ম নিয়েছে, তাকে আটকানো যায়। আর শেষে বলছেন, দুঃখনিরোধ মার্গ। দুঃখকে নিরোধ করার উপায়ও আছে, শুধু আছে তা না; যেমন অনেক সময় বলা হয়, এই জিনিসটা কি বিক্রীর জন্য আছে? হ্যাঁ বিক্রীর জন্য আছে। প্রথমে জিনিস আছে, তারপরে বিক্রীর জন্য আছে। তারপরে বলছে, তোমাকে তো দেওয়া হবে না, কারণ এটা আগেই বিক্রী হয়ে গেছে। আর্ট এ্যগজিবিশানে যে মডার্ন আর্টের প্রদর্শনি হয়, সেই ছবি আমরা কিছুই বুঝতে পারব না। কিন্তু যেমনি দাম জিজ্ঞেস করতে যাবে, বলে দেবে বিক্রী হয়ে গেছে। ভগবান বুদ্ধ তা বলছেন না, উপায় আছে, তার পথও আছে, তখন অষ্টাঙ্গমার্গের কথা বললেন।

আচার্য শঙ্করও গীতার পুরো আঠারোটি অধ্যায়কে এক জায়গায় এনে এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাতে চারটি কথা বলছেন। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ ও আচার্যের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। প্রথমেই শঙ্কর বলছেন, সংসার কি? উনি বলছেন, শোক আর মোহ, এটাই সংসার। আচার্য দুঃখ নিচ্ছেন না, ভগবান বুদ্ধ যেভাবে দুঃখ বলছেন, আচার্য সেভাবে না বলে শোক আর মোহ বলছেন। শোক হল মনের সন্তাপ আর মোহ হল বিবেকের অভাব। দ্বিতীয় বলছেন সংসার কারণ। এই শোক আর মোহের কারণ কি? ভগবান বুদ্ধ যেমন সমুদায় বলছেন। আচার্য কারণ বলছেন, অজ্ঞান। আমরা আমাদের নিজেদের স্বরূপকে ভুলে গেছি, সেইজন্য আমাদের এই দুরবস্থা। তৃতীয় বলছেন, *সংসার উপরাম*, সংসারের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই বলছেন আত্মজ্ঞান।

এই তৃতীয় পয়েন্টটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, পুরো গীতার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল আত্মজ্ঞান, এটাকে কেন্দ্র করেই গীতার পুরো আলোচনা চলতে থাকবে। আচার্য দেখাবেন, আত্মজ্ঞান ছাড়া সংসারের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কোন ভাবেই হবে না, অর্থাৎ আমাদের শোক আর মোহের নাশ কোন মতেই হবে না। ঠাকুরও বলছেন, জ্ঞানী ভয়তরাসে। সেখানে ঠাকুর জ্ঞানী আর বিজ্ঞানীকে আলাদা করছেন। যতক্ষণ আত্মজ্ঞান না হবে, ততক্ষণ তোমার ভয় যাবে না, তোমাকে আবার শোক মোহ গ্রাস করে নেবে।

শেষে চতুর্থ বলছেন, উপায়। উপায়কে ভগবান বুদ্ধ অষ্টাঙ্গমার্গ বলছেন, কিন্তু আচার্য এখানে বলছেন, গীতা দুটো উপায় নিয়ে আসছে। প্রথমটাকে তিনি বলছেন সাংখ্যযোগ, সাংখ্যযোগ মানে আত্মার ব্যাপারে ঠিক ঠিক জ্ঞান, তার আগে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হওয়ার আগের অবস্থাকে বলছেন জ্ঞাননিষ্ঠা। জ্ঞাননিষ্ঠা মানে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, গুরুর মুখে শাস্ত্রের আলোচনা শুনেছেন, চিন্তন মনন করেছেন, এই করে করে শাস্ত্র বাক্যের প্রতি একটা প্রীতি জন্মে গেছে, এই জ্ঞানের কথা তাঁর কাছে সত্য বলে বোধ হচ্ছে এবং শেষে বলছেন, আমার এটাই লাগবে –এটাকে বলছেন জ্ঞাননিষ্ঠা।

দ্বিতীয় উপায় হল, যারা এটা পারবেন না, যে বলছে, আমার দেহের প্রতি আসক্তি আছে, সংসারের প্রতি প্রীতি আছে। একজন বলছেন, আমার ইচ্ছা সারাদিন জপধ্যান নিয়ে থাকি, কিন্তু আমার এক ছোট নাতি আছে, তার প্রতি আমার স্নেহ মমতা আছে। ওনার পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভব না। কারণ সে নাতিকে ভালবাসে, নাতিকে ভালবাসতে গেলে তার মেয়েকে ভালবাসতে হবে, মেয়েকে ভালবাসতে গেলে তার মাকে ভালবাসতে হবে, এটা হল কলমির দল। একটাকে যদি ধরেছ, বা একটা কিছু যদি তোমাকে ধরে, পুরো সংসারটা চলে আসবে। আগেকার দিনে বলত, ভারতে দুজনের মধ্যে বিয়ে না হয়ে পুরো দুটো গ্রামের মধ্যে বিয়ে হয়। যখন বিয়ে হত, তখন পুরো গ্রাম উৎসব করত। ঠিক তেমনি, একটাকে ধরা মানে পুরোটাই চলে আসা, কিছু করার নেই। এদের জন্য বলছেন, কর্মযোগ বা যোগবুদ্ধি, এটাই দ্বিতীয় উপায়। এই দুটো উপায় – সাংখ্যবুদ্ধি আর যোগবুদ্ধি। যাঁরা যোগবুদ্ধিতে আছেন, তাঁদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা থাকতে হবে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই দুটো জিনিসকে পরপর বলতে থাকবেন, তার সাথে জ্ঞানের কথা ঘুরে ঘুরে আসবে। সংসারের উপর আলোচনা কম করবেন, গীতার বৈশিষ্ট্যই হল জ্ঞান। জ্ঞান আর সেই জ্ঞানে পৌঁছানর উপায়, এই দুটোকে নিয়েই বেশী বলতে থাকবেন। প্রথমে সাংখ্যযোগ নিয়ে বলবেন, তারপর বলবেন কর্মযোগ, এই দুটোকে জ্ঞাননিষ্ঠা আর কর্মনিষ্ঠাও বলছেন। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকেই এই আলোচনা শুরু হয়ে যায়, আর এটাই ঘুরে ঘুরে চলতে থাকবে।

অনেকে আছেন, যাঁরা বলতে চান, গীতা মূলতঃ হল কর্মযোগ। কিন্তু আমাদের ভাল করে জেনে রাখা উচিৎ, গীতা কর্মযোগ নয়। কর্মযোগ হল একটা পথ, যে পথে বলা হয়, তুমি কাজ কর, কাজ করতে করতে মন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তারপর কাজকে কর্তব্যবোধ রূপে করতে থাক, সেখান

থেকে নিষ্কাম কর্ম করতে করতে শেষে হবে কর্মত্যাগ। ঈশোপনিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে একই কথা বলা হয়েছে। প্রথম মন্ত্রে বলা হয়েছে জ্ঞাননিষ্ঠার কথা, সেখানে বলছেন, তুমি ত্যাগের দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্মনিষ্ঠার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, তুমি কর্ম কর কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর, কর্মে তুমি আসক্ত হয়ো না। এটাই হিন্দুদের ভাব –জ্ঞাননিষ্ঠা আর কর্মনিষ্ঠা।

এই যে আমরা চারটে পয়েন্ট বললাম, সংসার কি, এর কারণ কি, কারণের নিবৃত্তি কিভাবে হবে এবং এর উপায় কি, আচার্য তাঁর এই ভাষ্যে এই চারটে পয়েন্টকে নিয়ে বলছেন। আচার্য বলছেন, অর্জুনকে মাধ্যম করে ভগবান বলতে চাইছেন, *ইতি এতদন্তঃ প্রাণিনাং শোকমোহাদি-সংসারবীজভূতদোষ*। সংসার কি বলতে গিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে সংসারের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, ঠাকুরও সংসার কেন বলছেন, রাজযোগেও আলোচনা হয় সংসার কি। কিন্তু সংসার কি বলতে গিয়ে আচার্য বলছেন, শোক আর মোহ এটাই সংসার, শোক আর মোহই সংসারের বীজ। শোক হল মনের সন্তাপ, একটা জিনিস আমার কাছে ছিল, সেটা চলে গেছে। যে জিনিসটা চলে গেছে সেটার জন্য মনে সন্তাপ এসেছে। আর মোহ হল, বিবেক অভাব। কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল এই বিচার করার জন্য যে শক্তির দরকার, সেটার অভাব হয়ে যায়, এটাই বিবেক অভাব।

এই শোক আর মোহ কেন আসে? প্রাণি মাত্রই শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। নিত্য, তুমি সনাতন, তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তোমার কোন পাপও নেই, পূণ্যও নেই। আর তুমি কোন সময়েই মুর্খ ছিলে না, কারণ তুমি চৈতন্যস্বরূপ; মা সরস্বতী তোমারই একটা ছোট্ট রূপ। এই কথা শুনলে আমাদের আতঙ্ক লাগে। তার সাথে তুমি চিরমুক্ত, কিসের বন্ধন তোমার। তুমি নিজেকে বদ্ধ মনে করছ বলেই তোমার এই বন্ধন। বাস্তবে কি তাই? পুরোটাই উল্টো ছবি সর্বত্র দেখছি –আমরা অনিত্য, সব সময় জন্মাচ্ছি আর মরছি; আমাদের দেহ, মন সব অশুদ্ধ; অজ্ঞানের আমরা খনি। আর বন্ধন! যদি কেউ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চায়, আমরা দৌড়ে গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরি বলি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না, আমি তোমাকে ছাড়া মরে যাব। শুধু যে আমরা বন্ধনে পড়ে আছি তা না, যদি কেউ আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলে, যাও আমি তোমাকে ছাড়লাম, তুমি আমার জীবন থেকে সরে যাও, তখন কি অবস্থা হয় আমরা ভাল করেই জানি। একশ বছরের বৃদ্ধা দিদিমা মরতে চলেছে, তখনও চোখে জল নিয়ে নাতনী বলবে, আমাদের ছেড়ে যেও না। আরে সে তোমাকে মুক্তি দিচ্ছে তুমি বুঝতে পারছ না?

অনেক আগেকার কথা, বেলুড় মঠে একজন নাপিত ছিল, ইউপি থেকে প্রথম আসার পর দেখছে, একজন সাধু মারা গেছে। তাকে বলা হল ভাল করে মাথা কামিয়ে দেওয়ার জন্য। তারপর দেখছে সাধুরা কাঁধে নিয়ে খোল করতাল নিয়ে গান করতে করতে আনন্দের সাথে দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছে। এতদিন গ্রামে দেখে এসেছে, 'রামনাম সৎ হ্যায়' বলতে বলতে নিয়ে যাওয়া হয়, আর তার পিছনে সবাই কাঁদতে কাঁদতে যায়। আর এখানে সাধুরা আনন্দে গান গাইতে গাইতে সাধুর মৃতদেহ দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছে। সাধুদের ওই কাণ্ড দেখে ওখানেই খুর-কাঁচি সব গঙ্গায় ফেলে পালিয়ে গেল, বলছে আমি এই অসুরদের মধ্যে থাকত পারব না। যাই হোক পরে তাকে আবার নিয়ে আসা হয়, সেই থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেলুড় মঠেই কাটিয়ে গেছে।

সব কিছুতেই আমরা বন্ধনে পড়ে আছি, ঠাকুর বলছেন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা, তার উপর আবার স্ক্রুপ মারা। কোন উপায় নেই যে, বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসবে। যে ছেড়ে দিতে চাইছে, তাকে জড়িয়ে ধরে বলবে, তুমি আমাকে বাঁধ, আমাকে ছেড়ে দিও না, আমি মরে যাব। কেন বন্ধন? আচার্য বলছেন, শুধু যে আচার্যই বলছেন তা না, এটা শাস্ত্রেরই কথা, আসলে তুমি তোমার স্বরূপ ভুলে গেছ। এটাই জগৎ। কজন আর মুক্তির দিকে এগোয়, সবাই বন্ধনে পড়ে আছে। বন্ধনে পড়ে থাকতে থাকতে কাপুরুষ হয়ে যায়, সেটাতেই তার আনন্দ।

বন্ধনের মূল কারণ তিনটে – অবিদা-কাম-কর্ম। অবিদ্যা মানে, আমি আমার স্বরূপ ভুলে গেছি, আমি নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত, এটাই আমার স্বরূপ। এই স্বরূপকে ভুলে গেলে এর ঠিক বিপরীত হয়ে যায়। স্বরূপ ভুলে যাওয়ার পরে মানুষের মধ্যে অভাব বোধ এসে যায়, আর সে কখনই অভাবে থাকতে চাইবে না। যে অনিত্য সে চাইছে আমি নিত্য হব। তার মানে আমি বেঁচে থাকতে চাই। কিভাবে বেঁচে থাকব? হয় ব্রহ্ম রূপে বেঁচে থাকব, তা নাহলে ব্রহ্মা রূপে বেঁচে থাকব। ব্রহ্ম রূপে বাঁচা মানে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। আত্মজ্ঞান লাভ না হলে ব্রহ্মা রূপে বেঁচে থাকবে, সৃষ্টি করতে থাকবে, সন্তান, সন্ততির মাধ্যমে আমি বেঁচে থাকব। সেইজন্য সবাই নিজের সন্তানকে ভালবাসে, জেনেটিক্যালি ভালবাসে। ঠিক তেমনি, আমরা অশুদ্ধ বলে শুদ্ধি লাভের চেষ্টা করি। আমি জানি আমি অজ্ঞান, তাই জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে যাই। আর বন্ধন, আমরা বলছি বটে যে আমরা বন্ধন ভালবাসি, কিন্তু স্বামীজী তাঁর অনেক জায়গার লেকচারে বলছেন, এই বন্ধনই আমাদের মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। আমরা যে বন্ধনে ফেঁসে আছে, তার মানে এখনও আমাদের জগতের রূপ-রস-গন্ধাদির আস্বাদ অপূর্ণ। এরপর জগৎ থেকে যখন প্রচুর আঘাত পেতে শুরু করবে, প্রচণ্ড মার খেতে শুরু করবে, তখন সে আস্তে আস্তে মুক্তির দিকে এগোতে শুরু করবে। তারপর একদিন সে ওই বন্ধনকে কেটে বেরিয়ে যাবে।

অবিদ্যা থেকে আসে কামনা। কামনা মানেই শোক আর মোহ। মোহ মানে ভবিষ্যতে কোন কিছু আমি পেতে চাইছি। শোক, যে জিনিসটা চলে গেছে, সেটার জন্য সন্তাপ করা। শোক আর মোহ দুটোই একই, আলাদা কিছু নয়। একটাতে কোন জিনিস পেতে চাইছি, আর-একটাতে কোন জিনিস চলে গেছে। একজন মা, তার সন্তান মারা গেছে, তার শোক হবে, কোন দিন মা সন্তানের কথা ভুলতে পারবে না। একজন বন্ধ্যা নারী, তার সন্তান নেই, সে সন্তান প্রাপ্তির মোহে পড়ে আছে। দুটো কিন্তু আসলে এক, কোন তফাৎ নেই।

ট্রেনের জানলা বা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখছি একটা সিগন্যালের পোস্ট এগিয়ে আসছে। সিগন্যাল এগিয়ে আসছে না, আমি এগিয়ে যাচ্ছি। দেখছি দূর থেকে সিগন্যালটা আমার কাছে এলো, এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের জন্য আমার কাছে এলো, আবার পিছনের দিকে চলে গেল। আমি তাকিয়েই আছি, সিগন্যালটা চলে যাচ্ছে। মনের এই যে বিরাট সাম্রাজ্য, যেখানে আমি আছি, সেখানে বস্তু, প্রাণী, সব কিছু নিজের মত স্থির হয়ে আছে, আমি ছুটে দৌড়ে চলে যাচ্ছি। কিংবা আমি স্থির হয়ে আছি, তারা ছুটে দৌড়ে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। যদি আমি নিজেকে স্থির মনে করি, তারা দৌড়াচ্ছে। আর তাদেরকে যদি স্থির মনে করি, যদি জড় বস্তু রূপে দেখি, যদি মনে করি যাবতীয় যা কিছু আছে সব প্রকৃতির খেলা, প্রকৃতি মানেই জড়, তার মানে তারা সবাই স্থির, দৌড়াচ্ছি আমি।

ওই জায়গাতে, যে জিনিসটা আমার দূরে আছে, আমার মন এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওটার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নিচ্ছে। যখন চলে গেল, মন তখন পিছন পিছন গিয়ে ওটাকে জড়িয়ে ফেলছে। যে জায়গাতে মন থাকার কথা, সেখানে মন থাকছে না, মনের এটাই স্বভাব। মন সব সময় গতিশীল, মন নিজের জায়গায় কখন স্থির থাকে না, মন দৌড়াতে থাকে। কখন ভবিষ্যতে দৌড়ে চলে যাচ্ছে, কখন ভূতকালে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। মন যখন ভবিষ্যতে বিচরণ করে তখন সে জিনিসগুলিলে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, এখনও তার শরীরটা কিন্তু সেখানে পৌঁছায়নি।

মনের সাথে আমাদের সম্পর্কটা ঠিক কুকুর আর মনিবের মত। রাস্থায় পোষা কুকুরকে নিয়ে বেড়াতে গেলে, কুকুর সব সময় তার মনিবের থেকে এগিয়ে এগিয়ে যাবে। ও জানে যে, আমার প্রভু এই রাস্থা দিয়ে যায়। কিন্তু কোন কারণে মনিব ঠিক করল অন্য রাস্থা দিয়ে যাবে, অন্য রাস্থা দিয়ে

যাওয়ার সময় কুকুরটা খুব মনমরা হয়ে আস্তে আস্তে তার পিছন পিছন চলে। আমাদের মনেরও ঠিক এই স্বভাব, মন এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা জিনিসকে ধরে নেয় –এটা আমার, এটা আমার। কিন্তু বাস্তব হল, সেটা আমার নয়। ফলে যখন পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তখন ভেঙে পড়ে –এটা তো আমার হল না। শাস্ত্রকাররা এটাকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেন, বলেন, *অহংতা* ও *মমতা* বা আমিত্ব ও মমত্ব। সোজা বাংলায় বলা যায়, আমি ও আমার। *অহংতা*, আমির সাথে জুড়ে যাচ্ছে আর মমতার ক্ষেত্রে জিনিসগুলো বাইরে আছে কিন্তু আমি সেগুলোর সাথে জুড়ে আছি। সব ক্ষেত্রেই আমাদের মন এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে নিয়ে বলে এটা আমার, বাস্তবে যা কোন পরিস্থিতিতেই আমার নয়। জীবাত্মা যখন নিজের মত চলতে থাকে বা সময়ের প্রভাবে জিনিসটা যখন নাগালের বাইরে চলে গেল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মন খারাপ হয়। যতই আঁকড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করুক, কোন দিন ধরে রাখতে পারবে না, কারণ ওটা তো তার নয়। বাস্তব হল, জগতের কোন কিছুই আমার না।

এই জিনিসটাই অর্জুনের হল। আচার্য বলছেন, *তথা হি অর্জুনেন রাজ্যগুরুপুত্রমিত্রসুহৃৎস্বজন-সম্বন্ধিবান্ধবেষু 'অহম্ এষাং মম এতে'*। এখানে সবাই এক অপরের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে, কিন্তু তাদের দেখে অর্জুন কি মনে করলেন? এরা আমার আমি এদের। এই জগতে কেউ কারুর নয়। ঠাকুরের গল্প, একজন পাহাড়ের উপর একটা বাড়ি করেছে। একদিন খুব ঝড় উঠেছে, ঝড়ে বাড়ি নড়বড় করছে, যায় যায় অবস্থা। লোকটি তখন ভাবল, পবন দেবতার পুত্র হনুমান, তখন চিৎকার করে বলতে লাগল 'এটা হনুমানের বাড়ি'। তাও ঝড় থামছে না, তখন বলতে শুরু করল 'এটা রামের বাড়ি'। সেখান থেকে বলতে লাগল, 'এটা সীতার বাড়ি, লক্ষ্মণের বাড়ি'। ইতিমধ্যে ঝড়ে বাড়িটা হুড়মুর করে ভেঙে পড়ল। তখন সে বেরিয়ে এসে বলে, 'শালার বাড়ি'। আমাদের জীবনেও একই জিনিস হয়ে চলেছে, তুমি যে আমার, আমি যে তোমার; যখন সব কিছু বেরিয়ে গেল, তখন বলবে, 'ধুর শালা! এই জগতে কে কার'।

অর্জুনেরও 'কে বা কার' হতে যাচ্ছে, কিন্তু তার আগে অর্জুনের কান্নাকাটিটা শুরু হয়ে গেছে। এটাকে আচার্য এখানে খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তলছেন, *ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্তস্নেহবিচ্ছেদাদি নিমিত্তৌ আত্মনঃ শোকমোহৌ প্রদর্শিতৌ*। বলছেন, *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*, প্রত্যয় মানে জ্ঞান। এই জায়গাতে *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*, পুরো জগৎটাই *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*। এখান থেকেই বেদান্তের শুরু।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই জিনিসগুলো ধারণা করা আমাদের কাছে সত্যিই খুব কঠিন, কারণ সবটাই আমাদের কাছে নূতন। ঠাকুর বলছেন, একসের ঘটিতে তিন সের দুধ ধরে না। তাহলে উপায় কি? উপায় হল যত আমাদের জ্ঞানের উন্মোচন হবে, অধ্যয়ন, আচার্যের সঙ্গ এবং উপদেশ, জীবনকে দেখা, এগুলো হল জ্ঞানোন্মোচন এবং অজ্ঞান নাশের পথ। এগুলো হল হাতুড়ির মত। একসের ঘটির পাত্রকে হাতুড়ি দিয়ে মারা হচ্ছে, মারতে মারতে তার পাত্রতটা বাড়তে থাকে। পাত্র তো ভেঙে যেতেও পারে। না, ভাঙবে না, কারণ এখানে মনকে পাত্র রূপে বলা হচ্ছে, আমার যে মন আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে মন, দুটো এক। সৃষ্টি মানেই বিশ্বমন, মন ছাড়া সৃষ্টিতে কিছু নেই। তাই, ঈশ্বরের পরেই যেটা সব থেকে বড়, সেটা হল মন। আমি, আপনি সবাই হলাম সেই বিশ্বমনের এক একটা ছোট ছোট অংশ, কিন্তু আমরা সবাই সেই মন। যদি আমরা ঠিক ঠিক exposure দিতে থাকি, তাহলে কিন্তু আমাদের মনটা আস্তে আস্তে বড় হতে হতে বিরাট বড় হয়ে যাবে।

রাজযোগের সাধনা এটাই; রাজযোগের যে পুরো সাধনা, সেখানে আস্তে আস্তে মনটাকে বিস্তার করা হচ্ছে। বিস্তার করতে করতে একটা জায়গায় গিয়ে মন সব কিছু ভেঙে বেরিয়ে যায়। এই যে কথাগুলো আমরা এখন শুনছি, বা বই যখন পড়ছি, তখন আমরা কিছুই বুঝতে পারব না, না বোঝারই কথা। কিন্তু এই কথাগুলো আমাদের মনে হাতুড়ির ঘা হয়ে পড়ছে, ওই হাতুড়ি যখন

পড়ছে, সেখান থেকে আস্তে আস্তে মনের বিস্তার হতে থাকে। এক্ষুণি হাতেনাতে এটা বোঝা যাবে না, অনেক দিন ধরে শুনে যাচ্ছে, আলোচনা করছে, জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে, অনুভূতি হচ্ছে, এতে তার মনের অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, তারপর একদিন দুম্ করে পুরোটাই পরিষ্কার হয়ে খুলে যাবে, ও তাই, এই ব্যাপার।

অর্জুনের *ভ্রান্তিপ্রত্যয়* হয়েছে, ঠিক ঠিক প্রত্যয় হল *আত্মপ্রত্যয়*, *আত্মপ্রত্যয়* মানে আত্মার জ্ঞান। *ভ্রান্তিপ্রত্যয়* মানে, যখন আত্মা ব্যতিরেকে বাকি সব কিছুতে প্রত্যয়। এখানে *ভ্রান্তিপ্রত্যয়* কি? গুরু, পিতা, ভ্রাতৃ যাদের কথা অর্জুন বলছেন, এরা কেউ অর্জুনের নয়, কিন্তু সেখানে জুড়ে গিয়ে বলছেন, *অহম্ এষাং মম এতে*, আমি এদের, এরা আমার। এই কারণে অর্জুনের মধ্যে শোক মোহ এসে গেছে। *ভ্রান্তিপ্রত্যয়* কি? শোক আর মোহটাই *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*। মানুষের বাবা মারা যায়, স্ত্রী মারা যায়, স্বামী মারা যায়, সন্তান মারা যায়, মারা যাওয়ার পর বলে আমার জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে গেল, আমার জীবনে আর হাসি আসবে না। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই স্ত্রী আবার সাজগোজ করে, স্বামী আনন্দ করে, বা আর-একজনকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। সব কিছুই ধীরে ধীরে আগের মত স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে। কারণ, আসলে এটাই *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*। বিয়ে করছে, ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে, আবার বিয়ে করছে, আবার ডিভোর্স দিচ্ছে, কেন? *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*। মানুষ যখন সাধনার পথে নামে, সাধনা করে করে আরও গভীরে যখন যাবে, একটু চিন্তন মনন করে মন যখন সূক্ষ্ম হবে, তখন বুঝতে পারে সমস্ত রকম জ্ঞান, বিশেষ করে শোক আর মোহ হল *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*।

বেলুড় মঠে একজন খুব উচ্চমানের মহারাজ ছিলেন, তিনি সব সময় সন্ন্যাসীদের বলতেন, 'কারুর নামে নেগেটিভ কিছু বলো না, থার্ড পারসনকে নিয়ে কক্ষণ আলোচনা করবে না। যদি আলোচনা করতে হয়, তার ভাল দিকগুলো নিয়ে বলবে'। আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব হয়ে উঠবে না, তার কারণ এই *ভ্রান্তিপ্রত্যয়*। *ভ্রান্তিপ্রত্যয়* সমস্ত সমস্যার মূলে। যদি *ভ্রান্তিপ্রত্যয়কে* নিয়েই চলতে হয়, যেমন বলা হয় ধর্ম হল সম্মোহনকারক, যদি নিজেকে আমি হিপনোটাইজ নাই ভাবতে চাই তাহলে, আমাকে ভাবতে হবে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। এই বোধ যদি আমাদের রাখতে হয় তাহলে, শোক মোহে না থেকে বরঞ্চ অন্য প্রত্যয় নিয়ে আসা অনেক ভাল।

আচার্য বলছেন, শোক আর মোহ অর্জুনের মনে এমন ভাবে চেপে গেছে যে, তাঁর যে আসল ধর্ম, ক্ষত্রিয় ধর্ম, যে ধর্মযুদ্ধ করার জন্য অর্জুন প্রস্তুত হয়ে এসেছে, সেই ধর্মটাই শোক আর মোহে চাপা পড়ে গেছে। ভাল ইমোশান হোক আর মন্দ ইমোশান হোক, ইমোশান মাত্রই আমাদের ক্ষতি করবে। শোক মোহের ইমোশান, ভালবাসার ইমোশান, আনন্দের ইমোশান, সব ইমোশান আমাদের প্রকৃত স্বভাবকে আবৃত করে দেয়। পরে হর্ষ ও অমর্ষ নিয়ে বলবেন, অমর্ষ মানে যেখানে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, দুটোই মারাত্মক বিপজ্জনক। আমাদের পজিটিভ থিঙ্কিং আর নেগেটিভ থিঙ্কং দুটোই বন্ধ করতে হবে, তুমি নিজের স্বরূপে অবস্থিত হও, দেখবে সব কিছু আপনা থেকেই বেরিয়ে আসবে। পজিটিভ থিঙ্কিং, নেগেটিভ থিঙ্কিং এই জিনিসগুলো বিদেশীরা নিয়ে এসে সারা জগতকে উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে, আর আমরাও ওদের তালে তাল দিয়ে এগুলোকে নিয়ে লাফালাফি করছি। যেটাতে আমরা আনন্দে মত্ত হয়ে যাই, সেটা শোক মোহের মতই ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক, কারণ এতে আমাদের স্বভাব, আমাদের আসল স্বরূপ চাপা পড়ে যায়।

শোক আর মোহের কারণে অর্জুনের আসল স্বভাব এমন চাপা পড়ে গেছে যে, বলছেন, আমি আমার ধর্ম ছাড়লাম, পরধর্ম নিলাম। পরধর্ম মানে ভিক্ষুকের ধর্ম, আমি বৈরাগী হব, ভিক্ষা করে জীবনধারণ করব। প্রত্যেক ইমোশানই মারাত্মক বিপজ্জনক, ইমোশান কখন পজিটিভও হয় না, নেগেটিভও হয় না; যে কোন ইমোশান, তা ভালবাসার ইমোশান হোক, শত্রুতার ইমোশান হোক, আনন্দের ইমোশান হোক, প্রত্যেকটা ইমোশান হল eternal enemy of wisdom। Wisdom

কি? আমার স্বরূপ, আমি বাস্তবিক যা। প্রথমে অবিদ্যা এসে আমাকে ঢেকে ফেলেছে, ওতেই আমি বরবাদ হয়ে গেছি, কারণ আমি কে, এটাই ভুলে গেছি। এই অবিদ্যার উপর আবার আসছে সমস্ত ধরণের ইমোশানগুলি। এই হল সেই ঠাকুরের বিখ্যাত কথা –আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তার উপর আবার স্ক্রুপটাও মেরে রেখেছে। অর্জুনের ক্ষেত্রে হল, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধ করার জন্য, রাজা, মিত্র, গুরু, সুহৃদ, এদের সাথে যে *অহম্ এষাং মম এতে*, আমি এদের, এরা আমার, এই ভাবটা অর্জুনের মনকে গ্রাস করে নিয়েছে।

এরপর আবার আচার্য বলছেন, *তথা চ সর্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবত এব স্বধর্মপরিত্যাগঃ প্রতিসিদ্ধসেবা চ সাৎ*। আচার্যের ভাষার এত মাধুর্য আর একটা কথাতে অনেক কিছুকে পরিষ্কার করে বলে দেন যে, অবাক লাগার কথা। আচার্য এখন অর্জুন থেকে সরে এসে সব প্রাণীর উপর চলে এসেছেন; বলছেন, প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যখনই তাদের মধ্যে শোক আর মোহের বৃদ্ধি হয়, তখন *স্বধর্মপরিত্যাগঃ প্রতিসিদ্ধসেবা*, নিজের ধর্মকে ছেড়ে দেয় আর তার সাথে যেটা নিজের নয় সেটাকে গ্রহণ করে, যেটা নিজের সেটাকে ছেড়ে দেয়। মহাভারত পুরোটাই স্বধর্মকে নিয়ে চলে। তৃতীয় অধ্যায়ে যখন স্বধর্মের প্রসঙ্গ আসবে, বিশেষ করে যখন, *স্বধর্মে নিধনং শ্রেষঃ*, আসবে, তখন আমরা স্বধর্মের উপর বিস্তারে আলোচনা করব। স্বধর্মই হিন্দুদের মূল ধর্ম।

যে কোন ধর্মের code of conduct খুব সহজ ও সাধারণ, যেমন জুহুদিদের টেন কমাণ্ডমেন্টস্, তার সাথে আছে তাদের সাথে ভগবানের যে চুক্তি হয়েছে, এই চুক্তি আর টেন কমাণ্ডমেন্টস্ এই দুটোকে নিয়ে জুহুদিদের ধর্ম। এরপর আসে খ্রীশ্চান ধর্ম, বিশ্বে যত খ্রীশ্চান আছে, তা আমেরিকার খ্রীশ্চান হোক, ভারতের খ্রীশ্চান হোক আর ইংল্যাণ্ডের খ্রীশ্চান হোক, সবারই ধর্ম মোটামুটি সমান। ঠিক তেমনি বিশ্বের সব মুসলমানদের একটা common practice আছে, পাঁচবার নমাজ পড়বে, জীবনে একবার হজে যাবে ইত্যাদি। হিন্দু ধর্ম তা নয়, হিন্দ ধর্মের যে মূল সিদ্ধান্তগুলি রয়েছে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলি অনুশীলনে নেই, এটা যে করতেই হবে, এমন নয়। হিন্দু ধর্ম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অনেক মুক্ত ধর্ম। বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি common praticeএর মধ্যে বাঁধা।

আমরা এই দুটো শব্দ প্রায়শই ব্যবহার করি, তা হল equality and freedom। যেখানে equality আছে সেখানে freedom থাকবে না, আর যেখানে freedom আছে সেখানে equality হয় না। লোকেরা এটা বুঝতে পারে না। আমরা এই শব্দগুলি যেখানে সেখানে খুব ব্যবহার করে থাকি – justice, freedom, equality ইত্যাদি, মনে করি শব্দগুলি বুঝি inter-changeable। কিন্তু একবারও খেয়াল করি না যে, যেখানেই equality সেখানে freedom হবে না। বিশ্বে যে কটি সমাজতান্ত্রিক সরকার আছে, যেখানে তারা যে equalityর কথা বলছে, সেখানে প্রথমেই এরা বলে দেয় freedomটাকে শেষ করে দাও। আর যেখানে freedom থাকবে, সেখানে equality থাকবে না। যে কোন ধর্মে যদি equal practiceএর কথা বলে, পুরুষদের জন্য এটা, মেয়েদের জন্য এটা, বড়দের জন্য এটা, ছোটদের জন্য এটা, বুঝে নিতে হবে সেই ধর্মে freedom নেই। মিলিটারিতে যেমন, মিলিটারির সমস্ত প্র্যাক্টিস সবার জন্য একই রকম।

বিশ্বের ধর্মগুলো মনে হয় যেন এক একটা মিলিটারি শাসনব্যবস্থা। হিন্দুদের ক্ষেত্রে একেবারেই তা নয়। হিন্দুদের সিদ্ধান্তগুলি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত হল মুক্তি – মুক্তি মানে সমস্ত রকমের মুক্তি, দেহের মুক্তি, মনের মুক্তি, ইমোশান থেকে মুক্তি, সমস্ত কিছুর থেকে মুক্তি। হিন্দুরা equalityর দিকে যায় না। হিন্দু ধর্ম একমাত্র ধর্ম যে মুক্তির কথা বলে। অন্যান্য যত ধর্ম আছে, তারা যদি মুক্তির কথা বলে, বুঝে নিতে হবে তারা মিথ্যা কথা বলছে। মুক্তির কথা হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বলতে পারবে না, কারণ তারা equalityকে নিয়ে চলে। আর equality

in practice কখনই হয় না। বিশ্বের সমগ্র ইতিহাস ঘাটলে এবং তার সাথে বর্তমান বিশ্বকেও যদি দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে equality কোথাও হয় না। যে কোন সমাজে, যে কোন দেশে, যেখানেই equalityর কথা বলতে শুরু করে, তখন বুঝতে হবে এরা মানুষকে বোকা বানাবার জন্য, লোক ঠকানোর একটা নূতন মেশিন বার করেছে।

ফরাসী বিপ্লব খুব নামকরা ঘটনা, পুরো বিপ্লবটাই হল equalityর নামে। আর কিছু দিন পরেই নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে দিলেন। যারাই equality নিয়ে বেশী কথা বলে, ওদের মধ্যে অবশ্যই প্রচুর inequality পাওয়া যাবে। হিন্দু ধর্ম এই ধাপ্পাবাজিতে কোন দিনই ছিল না, হিন্দু ধর্ম পরিষ্কার বলে দেয়, জগৎ মাত্রই inequality, যদি equality চাও তবে একমাত্র আধ্যাত্মিক স্তরে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে equality হবে। যখন তুমি সমাধিতে যাবে, যখন তোমার আত্মজ্ঞান হবে, একমাত্র তখনই তোমার equality হবে, বাকি সব সময়, সব কিছুতেই inequality। আমরা স্লোগানে, আন্দোলনে সমান অধিকার, সবার জন্য সমান মর্যাদ বলে চেঁচাতে পারি, কিন্তু জীবনে একবার নামাও তো সমানতা ব্যাপারটা, কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো ব্যবস্থাটাই collapse করে যাবে।

হিন্দুরা প্রথম থেকে ভাল করে জানে, A man is born inequal, he lives ineually and he dies inequally। হিন্দুরা পরিষ্কার জানে, আমি তোমার সমান কোন দিন হব না, তুমিও আমার সমান কোন দিন হবে না। এটাকে নিয়ে হিন্দুরা কখন কোন সময় ধাপ্পাবাজি করেনি, করবেও না। কেউ হয়ত বলতে পারে, কেন এখন তো সব দেশ equality of opportunityর কথা বলছে। কোথায় equality of opportunity আছে? আমেরিকা এত equalityর কথা বলে, কিন্তু একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন না কেন, ওখানে কোটিপতির সন্তান যে সুযোগ পায়, সাধারণ লোকের সন্তান কি সেই সুযোগ পায়? রাশিয়া, চীনের ওপরওয়ালা রাষ্ট্রপ্রধান কমরেডদের ছেলেমেয়েরা যে সুযোগ পায়, নীচের তলার কমরেডের ছেলেমেয়েরা কি তাই পায়? সবাই ধাপ্পা মেরে যাচ্ছে। হিন্দুরা এই জিনিসটা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, সেইজন্য বললেন তোমার ধর্ম আমার ধর্ম কক্ষণ সমান না। ওনারা সেইজন্য নিয়ে এলেন বর্ণাশ্রম ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্মে তুমি যে বর্ণে আছ, যে অবস্থায় আছ আর তার সাতটি আলাদা শর্ত আছে। *স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়* যখন আলোচনা করা হবে তখন এর উপর আমরা আরও বিস্তারে আলোচনা করব।

ফলস্বরূপ দুজন মানুষের ধর্ম কখন সমান হবে না। যেমন ক্ষত্রিয়, একজন ক্ষত্রিয় রাজা, আরেকজন ক্ষত্রিয় মন্ত্রী, দুজনের ধর্ম সমান হবে না, তফাৎ একটু থাকবেই। ক্ষত্রিয় রাজা, তারই সন্তান রাজকুমার, দুজনের ধর্ম সমান হবে না। ক্ষত্রিয় যে রাজা, ক্ষত্রিয় যে রানী, দুজনের ধর্ম কক্ষণ সমান হবে না। কারণ ক্ষত্রিয় রাজা রাজার ধর্ম পালন করবে, অন্য দিকে তাকে স্বামীর ধর্ম পালন করতে হবে। ক্ষত্রিয় যে রানী, সে রানীর ধর্ম পালন করবে, আবার স্ত্রী রূপে স্ত্রীর ধর্ম পালন করবে। এখানেই ধর্ম কত ভাবে আলাদা হয়ে গেল। আসলে যত মানুষ তত ধর্ম দাঁড়িয়ে যাবে। সেটাকেই বলছেন স্বধর্ম।

মানুষের মধ্যে যখনই শোক মোহ আসে, বুঝতে হবে সে এখন যে জায়গাতে আছে সেখানে তাকে তার যে স্বধর্ম পালন করতে হবে, সেটা করতে গিয়ে সে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে দেখে, শোক মোহের কারণে তার সব কিছু কেমন যেন এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে, একটা ঝড় এসে যেন সব উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। তখন এই প্রতিক্রিয়াটাই হয় –আমি আমার ধর্ম ছাড়লাম। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে নিজের ধর্মকে বিসর্জন দেওয়াটা সব থেকে বেশী দেখা যায়। কেউ যখন আত্মহত্যা করতে যায়, বুঝতে হবে সে স্বধর্ম ছেড়ে দিয়েছে। কারণ প্রত্যেক মানুষের ধর্মই হল বেঁচে থাকা, ধর্মই হল বেঁচে থেকে একটা আদর্শ জীবনযাপন করা। মা তিরস্কার করে কিছু কথা বলেছে, সন্তান আত্মহত্যা করে নিচ্ছে; বাবা

মোবাইল ফোন দেয়নি বলে ছেলে আত্মহত্যা করে নিল। ছেলে মানে সে এখন ছাত্র, ছাত্রের ধর্মই হল *ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ*, অধ্যয়ন করাটাই তার ধর্ম। সে এখন মোবাইল ফোন চাইছে, মোবাইল ফোন হল বিনোদন শিল্প, বিনোদন হল গৃহস্থের জন্য, গৃহস্থরা কিছুক্ষণ বিনোদন জন্য সময় ব্যয় করবে, এটা কোন দোষের না।

ইদানিং বয়স্ক মানুষদের দেখা যায়, জীবনের শেষের দিন গুনতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও মোবাইল ফোন খুলে সারাক্ষণ হোয়াটসাপ, ফেসবুকে চ্যাট করে যাচ্ছে, আলতু ফালতু জিনিস করে যাচ্ছে অমূল্য সময় নষ্ট করছে। তার মানে আপনি আপনার স্বধর্ম ছেড়ে দিয়েছেন। ছেড়েছেন, কারণ আপনার মধ্যে শোক আর মোহ আছে। মোহ কেন? আপনি বাড়ির সবার কাছ থেকে একটু মিষ্টি ব্যবহার, একটু মিষ্টি কথা প্রত্যাশা করছেন, একটু ভালবাসা চাইছেন, কমফর্ট লেভেলটা ঠিকঠাক রাখতে চাইছেন। বাচ্চা বয়স থেকে আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, বয়স্ক মানুষ মানে একটা রোগ-শোক-জরার আখরা। তাও তো কোন মানুষ আগে থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে না যে, একটা বয়স থেকে আমার এই এই সমস্যা আসবে। দ্বিতীয় হল, যেমনি আপনি গৃহস্থ ধর্ম পার করে বাণপ্রস্থে গেলেন, তার মানে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন, এবার আপনি ভগবানের দিকে মন দিচ্ছেন না কেন? আপনি রোজ সকালে উঠে গীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ, কথামৃত পাঠ করছেন না কেন? আপনার পূর্বজরা তো এটাই করতেন, তাঁরা সারা জীবন শান্তিতে ছিলেন। ওনাদের তো কোন অশান্তি ছিল না, আপনার কোথা থেকে এত অশান্তি আসছে? ইদানিং বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের জীবন খুব মসৃণ হয়ে গেছে, তাও আপনার মধ্যে এত জটিলতা কেন? একটাই কারণ, স্বধর্ম পালন করেননি। বৃদ্ধ বয়সে সবাই বলেন, আমার কষ্টের শেষ নেই। কেন কষ্ট হয়? স্বধর্ম পালন করেননি, সেইজন্য শোক আর মোহ আপনাকে বেঁধে ফেলেছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মোহ বেঁধে ফেলে।

বলা হয়, বৃদ্ধদের মত বোকা আর কেউ হয় না। অথচ বিদেশে বলে, life begins at sixty। বিদেশে ষাট বছর হয়ে গেল, টাকা-পয়সা ভাল জমে গেছে, কারুর সাথে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীতা নেই, এবার সে জগৎ ঘুরতে শুরু করে। তার সাথে যত ইয়ং মেয়েদের জোগাড় করতে থাকে। তারপর এক-একটা দিন যেতে থাকে, আজ একটা দাঁত পড়ে গেল, কাল চোখে ছানি পড়ছে, পরশু হাঁটুতে বাত ধরেছে, হাঁটতে পারছে না। অন্য দিকে তরুণী মেয়ে এই বুড়োকে কি করে সামলাবে! সামলাতে গিয়ে এদিকে গোলমাল, সেদিকে গোলমাল হতে শুরু করে। যদি মনে করেন আপনার একটাই জীবন, তখন তো আপনি কাঁদবেন, আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ভারতবর্ষে ইদানিং যে লেখাগুলো পত্রপত্রিকাতে বেরোচ্ছে, পড়ে আঁৎকে উঠতে হয়, মনে হয় এরাও এই সিস্টেমকে মেনে নিয়েছে – কি সিস্টেম? তোমার এই একটাই জীবন, যত পারো ভোগ করে নাও। তাহলে যখন কষ্ট পাও তখন তোমার চোখে কেন জল আসছে, কাঁদছ কেন? বলে ওটাও নাকি আনন্দের।

ভগবান বুদ্ধ যখন সিদ্ধার্থ ছিলেন, একদিন দেখছেন ওনার এক দাসী কাঁদছে। সিদ্ধার্থ জানেই না কান্না কাকে বলে। কান্না দেখে অন্য দাসীদের জিজ্ঞেস করছেন, 'এটা কি কোন নূতন ধরণের খেলা? আগে তো আমি এই খেলা দেখিনি? আমাকে খেলাটা শিখিয়ে দাও না কেন'। কোন কিছুর কারণে চোখে জল বেরোচ্ছে, সেটাও সিদ্ধার্থের মনে হচ্ছে খেলা। এরা বলবে, জগৎকে ভোগ করতে গিয়ে যে চোখের জল বেরোচ্ছে, এটাও নাকি একটা আনন্দ। শূকরের মত নোংরার মধ্যে ঘঁৎ ঘঁৎ করে আনন্দ পাও, তাই পাও। আমরা তোমাকে এই আনন্দ পেতে নিষেধ করছি না। কিন্তু যেদিন জগৎ থেকে মার খাওয়া শুরু হবে, মার খেয়ে যখন দুঃখ, বেদনায় চোখে জল আসবে, সেই সময় যদি আমাদের কাছে আসো, তখন একটা কথাই তোমাকে বলা হবে। স্বধর্ম পালন করোনি কেন? যা হওয়ার হয়ে গেছে, এবার থেকে স্বধর্ম পালন কর।

এটাই আচার্য এখানে বলছেন। শোক মোহ সবারই হয়, কিন্তু যদি বেশী হয়ে যায়, তখন তা স্বধর্মকে চেপে দেয়। স্বধর্ম চাপা পড়ে গেলে প্রথম কাজ হবে *প্রতিষিদ্ধ্য*, অর্থাৎ যেটা তোমার ধর্ম নয় সেটা করার ইচ্ছা। যার বয়স হয়ে গেছে, যার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, সে বলছে আমি আর বাঁচতে চাই না, আমি মরে যেতে চাই। আমাদের হিন্দু ধর্মে, হিন্দু সমাজে কোথাও আত্মহত্যার অনুমতি দেওয়া হয় না। কেন আত্মহত্যা করতে চাইছে? কারণ সে স্বধর্ম পালন করেনি, যে বয়সে যে স্বধর্ম পালন করার কথা সেটা করেনি। অন্য দিকে আবার দেখা যায়, স্বধর্ম পালন করছে, শরীর, মন, বাণী দিয়ে কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু কাজের ফলের প্রতি একটা তীব্র আসক্তি জন্মায়। যারাই রাজনীতিতে নামে, তারা সবাই চাইছে, আমি রাজা হব, আমাকে মন্ত্রী হতে হবে, এমএলএ হতে হবে। রাজনীতিতে নেমেছে, খুব ভাল, এটাই কর, কিন্তু মাথায় খালি ঘুরছে, কিভাবে এমপি হব, কিভাবে এমএলএ হব, কিভাবে মন্ত্রী হব, কিভাবে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া যায়। এগুলো হওয়ার জন্য কাকে ফাঁসাতে হবে, কাকে তুলতে হবে, এসব নিয়ে সর্বদা অঙ্ক কষে যাচ্ছে আর চিৎকার চেঁচামেচি করে যাচ্ছে। সারা দেশে, সব রাজ্যে, এ তাকে গালাগাল দিচ্ছে, সে ওকে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছ। লোকসভা, বিধানসভা এসবের জন্য নয়, এটা হল সমস্ত দেশের, রাজ্যের জনগণের কল্যাণের জন্য। একদিকে স্বধর্ম ছেড়ে চলে যায় পরধর্মে, অন্য দিকে স্বধর্ম করছে ঠিকই, কিন্তু কামনা-বাসনা এত বেশী যে, কোথাও কারুর শান্তি নেই। ফলে পূণ্য ও পাপ দুটোই বাড়তে থাকে। যখনই আমরা কোন কাজ করি, সব কাজেই ভাল মন্দ মিশে থাকে। ভাল কিছু কর্ম করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে, খারাপ কর্ম করলে খারাপ ফল হবে।

এতক্ষণ আমরা অবিদ্যা, কাম ও কর্ম নিয়ে বললাম। কাম থাকলে কর্ম করতে হবে। মানুষ যখন নিজেকে ভুলে যায়, তখন হয় –আমি অপূর্ণকাম, আমাকে পূর্ণ হতে হবে। আমার টাকা নেই, টাকা হলে আমি পূর্ণ হব। নেমে গেলাম একটা চাকরিতে। আমার স্ত্রী নেই, স্ত্রী হলে আমি সুখী হব। ঠাকুর বলছেন, বাবা-মা ভাবে ছেলের বিয়ে দিলে একটা ছায়া হবে, জিরুতে পারবে। কিন্তু স্ত্রী তো এমনি হবে না, তার জন্য তাকে খাটতে হবে। তাকে এবার কাজ করার জন্য নামতে হবে। কাজ করা মানেই তার ভাল মন্দ ফল হবে। ভালমন্দ ফল হওয়া মানে, অবিদ্যা অজ্ঞান তার আরও বাড়বে। অবিদ্যা-কাম-কর্ম, এটা একটা cycle। একটা সার্কেলের মধ্যে এই তিনটে ঘুরতে ফিরতে থাকে। যত অবিদ্যা বাড়বে, তত নিজের স্বরূপকে ভুলে যাবে, যত নিজের স্বরূপকে ভুলে যাবে তত কামনা বাড়বে, কামনা যত বাড়বে তত কাজ বাড়বে। যত কাজ বাড়বে তত তার পাপপূণ্য ভালমন্দের ফল হবে। যত ভালমন্দের ফল হবে তত তার অজ্ঞান বাড়বে। এই সাইকেলের মধ্যেই সমস্ত মানুষ ঘুর ঘুর করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

এর জন্য আরও যেটা হয়, সেটা হল ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি, স্বর্গনরক প্রাপ্তি। এই স্বর্গে যাচ্ছে, এই নরকে যাচ্ছে, একবার উপরে একবার নীচে ওঠানামা করতে থাকে, ফলে কি হয়, সংসারের নিবৃত্তি কখনই হয় না। ফলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র, ওঠা-নামার চক্র চলতেই থাকবে। অনেকে এসে মহারাজদের বোকার মত প্রশ্ন করে, আচ্ছা মহারাজ, পুনর্জন্ম হয় ঠিক আছে, কিন্তু জনসংখ্যা কেন বেড়ে যাচ্ছে? এই প্রশ্ন নিয়ে কম্যুনিস্ট, লিবারাল, বুদ্ধিজীবিরা প্রায়ই হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করে। এদের কাছে ভগবান যেন সীমিত, দশটা আত্মাকে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তো নূতন কোথা থেকে আসছে? ভগবান অনন্ত, তাঁর সৃষ্টি অনন্ত, তাঁর আত্মা অনন্ত, জীব অনন্ত। কত মানুষ হবে? অনন্ত মানুষ হবে। এরা প্রশ্ন করছে অনন্তকে, আর কোথা দিয়ে প্রশ্ন করছে? সীমিত দিয়ে। বিচিত্র বিচিত্র রকম প্রশ্ন, জনসংখ্যা কি করে বাড়ছে? একদিকে আপনি পুনর্জন্মের কথা বলছেন, আক্রমণ করা হচ্ছে অনন্তকে, কিন্তু যুক্তিকে নিয়ে আসছে সীমিত জিনিসের মাধ্যমে।

আচার্য বলছেন, সংসার নিবৃত্তি কিছুতেই হবে না, কারণ শোক মোহ থেকে মানুষ বেরোতে পারে না। একটাই উপায়, এই যে অবিদ্যা-কাম-কর্ম, অবিদ্যার যদি নাশ হয়। কর্মের নাশ হবে না,

কারণ কর্মের যদি নাশ কেউ করে, তাহলে কাম তো ভিতরে থেকে যাবে। কামেরও নাশ হবে না, কারণ কামের বীজ হল অবিদ্যা, তাই অবিদ্যাকে পোড়াতে হবে। অবিদ্যাকে কিভাবে পোড়াবে? বিদ্যা দিয়ে। অজ্ঞানকে কিভাবে পোড়াবে? জ্ঞান দিয়ে। অন্ধকারকে কিভাবে নাশ করবে? আলো দিয়ে। আচার্য এখানে বলতে চাইছেন, আত্মজ্ঞান ছাড়া কোন পথ নেই এই অবিদ্যা নাশের।

এটাই আচার্য খুব সুন্দর করে বলছেন, *তয়োঃ চ সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বকাদ্ আত্মজ্ঞানাদ্ ন অন্যত্রো নিবৃত্তিঃ ইতি*। অন্য কোন উপায় নেই, আত্মজ্ঞান যদি না হয়, তা আপনি সংসারে থেকে আত্মজ্ঞান করুন, বন্দুক চালিয়ে আত্মজ্ঞান করুন, সন্ন্যাসী হয়ে আত্মজ্ঞান করুন, তাতে কোন অসুবিধা নেই। তুমি কে? যদি এটা না জানো, তুমি সংসার-চক্রে ঘুরতে থাকবে। তুমি কালী দর্শন কর, তুমি বিষ্ণু দর্শন কর, তুমি অনন্ত স্বর্গে যাও, কোনটাতেই তোমার মুক্তি নেই।

আগেকার দিনে কিছু লোক ছিলেন, তাঁরা বলতেন কর্ম করা দরকার, বিশেষ করে বেদের বৈদিক কর্মগুলির অনুষ্ঠান করা খুব দরকার। আচার্য যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন, আত্মজ্ঞানীর কখনই কর্ম থাকতে পারে না। তিনি তাঁর বক্তব্যকে সিদ্ধ করার জন্য বেদ থেকে অনেক উদ্ধৃতি আনছেন, গীতা ও উপনিষদ থেকেও অনেক কোটেশান আনছেন। এখানে বলছেন, যিনি আত্মজ্ঞানী, তাঁর আর কোন কর্তব্য থাকে না। বর্তমান কালে এই যুক্তিগুলি আর দরকার পড়ে না। কিন্তু তখনকার দিনে বেদের ধর্মকে সবাইকে পালন করতে হত। আচার্য শঙ্কর বার বার বলছেন, যাঁর জ্ঞাননিষ্ঠা হয়ে গেছেন, যিনি বুঝে গেছেন ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, ঠাকুর যেমন বলতেন ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অসত্য, তখন তাঁর জন্য এখন একটাই পথ, তা হল ঈশ্বরের দিকে যাওয়া, তাঁর আর ধর্মের দরকার পড়ে না।

এই কথা বলার পর আচার্য বলছেন, এই আত্মজ্ঞান ঠিক ঠিক যেটা দিয়ে হয়, সেটাকে বলে সাংখ্যবুদ্ধি। সাংখ্য মানে যেটা দিয়ে জিনিসটাকে ঠিক ঠিক বোঝা যায়। যাদের মধ্যে সাংখ্যবুদ্ধির উদয় হয়ে গেছে, তাদের জন্য হল ত্যাগের পথ। যাদের সাংখ্যবুদ্ধি হয়নি, তাদের জন্য কর্ম, সংসারের সব কর্ম যতটা পারা যায় অনাসক্ত হয়ে করা। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা মানে, কোন প্রকার কামনা-বাসনা থাকবে না, স্বার্থশূন্য হয়ে সব কাজ করা। সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ, এই দুটি পথ গীতাতে আগাগোড়া পরিষ্কার ভাবে চলতে দেখা যায়। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, এই দুটো ধর্মের আলোচনা করার সময় বলা হয়েছিল যে, আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার করে এই দুটো ধর্মের কথা বলছেন ঠিকই, কিন্তু যদি গভীর ভাবে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেকটা প্রবৃত্তির পিছনে কোন না কোন ভাবে নিবৃত্তি লেগে থাকে। স্বামীজীও বলছেন, প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিই নিবৃত্তি। আমরা এর বেশী আর যাচ্ছি না, গীতায় যেমনটি আছে তেমনটি আলোচনা করে যাব।

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা কত স্কুল, কত হাসপাতাল চালাচ্ছেন, রিলিফের কাজ করছেন, এসব দেখে অনেকে সম্মান দিয়ে বলেন, আপনারা হলেন কর্মযোগী। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের কোন সন্ন্যাসীই কর্মযোগী নন। এখানকার সমস্ত সন্ন্যাসী সাংখ্যযোগী। কর্মের মাধ্যমে কেউ মুক্তি চাইছেন না, তাঁদের কাছে জ্ঞাননিষ্ঠা পরিষ্কার। ঠাকুর নিত্য, এটা তাঁদের কাছে পরিষ্কার। সন্ন্যাসীরা যে জপধ্যান করছেন, সেটা ভক্তির জন্যই করেন। কর্মযোগী হলেন তাঁরা, যাঁরা মনে করছেন আমার এখন সুখভোগ বাকী আছে, আমি আরেকটু সুখ পেতে চাই। কিন্তু কোন সন্ন্যাসীই সুখ পেতে চান না। যাঁরা আমাদের শাস্ত্রগুলি ঠিক ঠিক বুঝেছেন, জপধ্যান করছেন, চিন্তন মনন করছেন, এনারা সবাই সাংখ্যযোগী। এনাদের সবারই মন কিন্তু একটা স্তরকে অতিক্রম করে উপরের দিকে উঠে গেছে। কিন্তু পরিস্থিতি বা অন্য কোন কারণের হয়ত সংসারে পড়ে আছেন, সেখানে সংসার ধর্মটা পালন করছেন। উদ্দেশ্য হল, যত তাড়াতাড়ি সংসার থেকে মুক্তি পাওয়া। কথামৃতেও ঠাকুর বারবার এই কথাগুলো বলছেন। আসলে এনারা সবাই সাংখ্যযোগী, অর্থাৎ এনাদের জ্ঞাননিষ্ঠা হয়ে গেছে। কিন্তু ওই জ্ঞানটাকে ধরে রাখতে পারছেন না।

একটা জায়গায় আচার্য বলবেন, যাঁদের কাছে এগুলো সত্য বলে বোধ হয়ে গেছে, এই পথে যাঁরা পা রেখেছেন, তাঁরাও কিন্তু জ্ঞানী। কিন্তু যারা বলছে, আমার স্ত্রী-সুখ দরকার, আমি সন্তান-সুখ চাই, আমার বাড়ি-গাড়ি চাই, এদের যোগবুদ্ধির আশ্রয় করতে হবে। আবার যারা বলছে, অনেক হয়েছে আমার আর সংসারের কোন সুখ লাগবে না। কিন্তু তারপরেও হঠাৎ কোন প্রলোভন এসে গেল বা কোন বিপর্যয় হয়ে গেল, সে কি করবে? বলছেন, প্রত্যেক পদে পদে তো আপনি খাদে পড়ছেন, আপনি আবার নিজেকে সাংখ্যযোগী বলছেন? আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, সাংখ্যযোগীরা যখন কোন ফাঁদে পড়ে, এরা তখন এই ভেবে খুব কষ্ট পায়, আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের এমন কর্ম জমে আছে যে, এখনও আমি বারবার ভুল পথে, লোভের পথে চলে যাচ্ছি; হে ঠাকুর আমাকে রক্ষা কর, আমি যেন এগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারি।

কিন্তু যারা যোগবুদ্ধিতে আছে, যারা ঠিক ঠিক প্রবৃত্তিলক্ষণে আছে, লোভের কিছু পেলে তারা খুব আনন্দ পায়। একবার এক মহারাজ অন্য একজন মহারাজকে বাচ্চার মত বলছেন, 'মহারাজ আমাকে একটা কেক খেতে হবে, এমন কেক যেটা খুব দামী হবে, আর এমন কেক আমাদের এখানে কেউ কোন দিন খায়নি'। যে মহারাজকে বলছিলেন, শুনে তাঁর খুব হাসি পেয়ে গেছে। সন্ন্যাসীদের বাচ্চার মত বুদ্ধি, যেমনি কিছু মাথায় উঠেছে, ওটা এখন মাথায় ঘুরঘুর করতে থাকবে। সেই মহারাজ একজনকে বলে একটা নামকরা হোটেলে অর্ডার দিয়ে একটা স্পেশাল কেক ওনার জন্য নিয়ে এলেন। ওটা পেয়ে উনি খুব খুশী হয়ে গেলেন। কিন্তু তারপর ওই কেকের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহই থাকল না, ওখানেই সব শেষ। কিন্তু তাঁর যদি যোগবুদ্ধি থাকত, তাহলে বলতেন, ওই যে কেক খেয়েছি, আবার যখন কেক খাওয়ার ইচ্ছা হবে, ওই কেকই খাবো, তার মানে মনটা ওই কেকের উপর পড়ে আছে। এই হল সাংখ্যবুদ্ধি আর যোগবুদ্ধির তফাৎ।

একটা ইচ্ছা হয়েছিল, বা কোথাও শুনেছেন ভাল কেক বলে কিছু একটা হয়, একটু টেস্ট করতে ইচ্ছে হল, করে নিলেন, চ্যাপ্টার ওখানেই ক্লোজড্, ভোগ করে ত্যাগ। গৃহস্থরা একটু ত্যাগ করে যাতে আরও ভোগ করতে পারে, এই তফাৎ। সন্ন্যাসীরা কাজ করেন ঠিকই, আর যদি জ্ঞানী হয়ে যান, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, এনারা অনেক সময় লোকসংগ্রহের জন্য অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করেন। সেইজন্য কর্ম কখনই শেষ পথ হতে পারে না। ঠাকুরও বলছেন, কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড। প্রথমের দিকে সবাইকে কর্ম করতে হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে কর্ম থেকে সরে আসতেও হবে।

যাঁরা এই যোগ করবেন, তাঁরা কিভাবে করবেন? আচার্য বলছেন, *তত্ত্ববিৎ তু ন অহং করোমি ইতি মন্যতে। ন চ তৎফলং অভিসন্ধতে*। যাঁরা আত্মজ্ঞানী, তাঁদের কর্মের প্রতিও আসক্তি নেই, কর্মফলের প্রতিও আসক্তি নেই। শ্রীশ্রীমা একদিন বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গেছেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণকে একটা ফল দান করে বলছেন, 'এই ফল তোমার, এর ফলটাও তোমার'। মায়ের এত সুন্দর কথা, সেই ব্রাহ্মণ আদৌ বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানা নেই। একটা ফল দান করা হল, যাকে দান করা হল ফলটা তার, আর এই দানের যে একটা পূণ্য ফল, এটাও তোমার। এই কাজ আমাকে করতেই হবে, এই ভাব কোন সন্ন্যাসীর মধ্যে থাকে না। জগতের কল্যাণ করাটাও সন্ন্যাসীদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। ইদানিং দূর্গাপূজা বা যে কোন বড় বারোয়ারী পূজায় ক্লাবের লোকেরা গরীবদের মধ্যে কম্বল বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ করে। সেই কবে স্বামীজী শুরু করেছিলেন, জগতের মঙ্গলের জন্য তোমরা কিছু করো। এটা এখন পাড়ায় পাড়ায় লোকেরা করছে। *যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ*, শ্রেষ্ঠ মানুষরা যা করেন, সাধারণ মানুষরা তাই অনুকরণ করে। শ্রেষ্ঠ মানুষরা এইজন্যই কাজ করেন, যাতে সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখে শেখে। মা-বাবাকে দেখে যেমন বাচ্চারা শেখে, ঠিক তেমনি শ্রেষ্ঠ পুরুষকে দেখে সমাজ শেখে। এইসব বলে আচার্য এই

বিষয়টা এখানে শেষ করতে গিয়ে বলছেন, গীতা শাস্ত্রের শেষ কথা হল তত্ত্ব জ্ঞান থেকেই মুক্তি হয়, অন্য কোন কিছু থেকে মুক্তি হয় না।

সেইজন্য বলছেন, *তত্র এবং ধর্মসংমূঢ়চেতসো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নস্য অর্জুনস্য অন্যত্র আত্মজ্ঞানাদ্ উদ্ধরণম্ অপশ্যন্ ভগবান্ বাসুদেবঃ ততঃ অর্জুনম্ উদ্দিধারয়িষুঃ আত্মজ্ঞানায় অবতারয়ন্,* ভগবান দেখছেন অর্জুন শোকমোহের সাগরে এমন ডুবে আছে যে, একে আর উদ্ধার করা যাবে না। এখন একমাত্র উপায় হল আত্মজ্ঞান দিয়ে এই শোকমোহের সাগর থেকে তুলে আনতে হবে। কোন সমস্যা হলে আমরা সবাই তার সমাধান খুঁজি। যাঁর কাছেই সমাধান চাইতে যাই, তিনি নিজেও কিন্তু আমার মতই। উপনিষদে বলছেন *অন্ধেনৈব নিয়মানা যথান্ধাঃ,* অন্ধ অন্ধকে পথ দেখায়। যে সমস্যাতে আমি আছি, সেই স্তর থেকে একটু ডানদিক বামদিক করে আমাকে সমাধান দিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি যে স্তরে আছি, সেই স্তর থেকেই সমাধান আসে। যত পজিটিভ পাওয়ারের বই আছ, সব বই এই রকমই। কিন্তু যেখানে জীবনের কঠিন সমস্যা, সেখানে এভাবে কখনই সমাধান হয় না। সমস্যার সমাধান সব সময় হয় উপর থেকে। যে সমস্যায় আমি আছি, ওখানে থেকে ওই সমস্যার সমাধান কখনই হবে না। সমস্যাকে যদি ভাঙতে হয়, তাহলে ওর সার্কেল থেকে বাইরে এসে একটা হায়ার লেভেলে গিয়ে সমাধান দিতে হয়।

একজন টাকার জন্য কাঙাল। আর সত্যিই দুটো টাকা হলে ওর ভাল হয়। টাকা ওকে আয় করতে হবে। কিন্তু টাকা আয় করার পরেও ওর টাকার জন্য কাঙালিপনাটা দূর হচ্ছে না, আরও চাই, আরও চাই করে যাচ্ছে। এখন পরিস্থিতিটা দাঁড়িয়েছে, টাকাটা ওর প্রয়োজনীয় নয়, টাকার চাহিদাটা ওর একটা ব্যাধি হয়ে গেছে। অর্জুনের কাছে শোক মোহটাও একটা ব্যাধি হয়ে গেছে। চাহিদার সমুদ্রে যদি একবার কেউ ডুবে যায়, ওকে আর কেউ ওখান থেকে বার করতে পারবে না। একজন সমুদ্রে ডুবে আছে, আরেকজন যে সমুদ্রে ডুবে আছে, সে যদি এখন তাকে উদ্ধার করতে যায়, কোন দিন উদ্ধার করতে পারবে না। সমুদ্রের বাইরে যে আছে, সেই পারবে ওখান থেকে তাকে তুলে আনতে। সমস্যার মধ্যে কেউ পড়ে আছে, কেউ যদি তাকে সমাধান দিতে চায়, তাহলে তাকে ও বর্তমান যে পরিস্থিতিতে আছে সেই পরিস্থিতির বাইরে গিয়ে তার সমাধান দিতে হয়। এই জিনিসটাকে মাথায় রেখে ভগবান অর্জুনকে আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন। তুমি এখন যে দুরবস্থায় আছ, আত্মজ্ঞানের শিক্ষা ছাড়া কোন অবস্থায় তুমি এই অবস্থা থেকে বেরোতে পারবে না।

স্বামীজী ভারতবর্ষের জন্য ঠিক এই ব্যবস্থাটাই অনুসরণ করলেন। ভারতবর্ষ দীন হীন কাঙালীর মত শোক মোহে ডুবে ছিল। বর্তমান ভারতবর্ষ থেকে স্বামীজীর সময়ের ভারতের দুরবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। স্বামীজী ভারতের এই দুরবস্থা ঘোচাবার জন্য সব চেষ্টাই করলেন। তিনি রাজাদের কাছে গেলেন, বৃটিশদের দেখলেন, কিন্তু দেখছেন কোথাও কিছু সুরাহা হচ্ছে না। তিনি তখন ভারতের যুবকদের মধ্যে আত্মার উপদেশ দিতে শুরু করলেন –তোমার ভিতরেই অনন্ত শক্তি, তোমার ভিতরেই অনন্ত জ্ঞান, তুমি সিংহ, তোমার অতীত গৌরবের কথা স্মরণ কর। এইভাবে বেশ কিছু দিন প্রচার করতে করতে কয়েকজনের মধ্যে এই ভাবটা জেগে উঠল, এবং কয়েকজন সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করল। এইভাবে ভারতের কুলকুণ্ডলী জেগে উঠল। সেই থেকে ভারত উঠে দাঁড়াতে শুরু করল, মাথা উঁচু করতে শিখল। তবে এখনও পুরোপুরি কুণ্ডলীনি জাগেনি, সময় লাগবে। এরপর ভারতকে কেউ আটকাতে পারবে না। অর্জুনকে যেমন কেউ আটকাতে পারল না।

উপমা সব সময় একদেশীয় হয়, একটা জিনিসকে দিয়ে আরেকটা জিনিসকে সংযোগ করে দেওয়া যায় না। কিন্তু অর্জুনের যে সমস্যা ছিল, সমষ্টি রূপে সেই সমস্যা দেশেরও ছিল। অর্জুনকে ভগবান যে সমাধান দিলেন, সেই সমাধান স্বামীজী দিলেন পুরো দেশের জন্য। ভগবান অর্জুনের মাধ্যমে মানবজাতিকে উপদেশ দিলেন, স্বামীজী নিজের কয়েকজন গুরুভাই, কয়েকজন শিষ্য আর

ভারতের সেই সময়ের নামকরা কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকদের উপলক্ষ করে ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য সমস্ত ভারতবাসীকে উপদেশ দিলেন আর সেখান থেকে মানবজাতির জন্য সমাধান দিলেন, কিসে তোমাদের সবার ভাল হয়। এই হল আচার্যের ভাষ্য। এরপর গীতা যেখান থেকে শুরু হবে, সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত এই দুটোর মধ্যে ঘুর ঘুর করবে –আত্মজ্ঞান ও কর্মযোগ। কর্মযোগ মানে পুরোদমে কাজ কর। কিন্তু ধীরে ধীরে ফলাকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা থেকে মনকে সরিয়ে আনো। এরপর মন ধীরে ধীরে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেলে তুমি আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যাও। ভগবান অর্জুনকে বলছেন–

শ্রীভগবানুবাচ
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।।১১।।

(শ্রীভগবন্ বললেন – যাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তাঁদের জন্য শোক করছ; অথচ প্রাজ্ঞের মত কথা বলছ। পণ্ডিতরা মৃত বা জীবিত কারও জন্য শোক করেন না।)

অর্জুন এতক্ষণ যত কথা বলে গেলেন, সব ধর্মের কথাই বলে গেলেন। কুলধর্ম নাশ হয়ে যাবে, বর্ণধর্ম ভেঙে যাবে, অহিংসা পরমো ধর্ম, আমরা অহিংসা থেকে সরে যাব, ইত্যাদি যত কথা বললেন সব কিন্তু ধর্মের কথাই বলে গেছেন। অর্জুনের যুক্তিতর্ক শুনে ভগবান হতবাক হয়ে গেছেন। তখন ভগবান বলছেন, তুমি জ্ঞানীদের মত কথা বলছ, ধর্মের কথা বলছ ঠিকই; কিন্তু তুমি মূল ব্যাপারটাই ভুলে যাচ্ছ। যাঁরা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার অধিকার যাঁদের আছে, তাঁরা সবাই *গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ*, পণ্ডিতরা যেটা চলে গেছে সেটাকে নিয়েও তাঁরা শোক করেন না, আর যেটা আসছে না, সেটাকে নিয়েও শোক করেন না, জীবিত বা মৃত কারুর জন্য শোক করেন না। তুমি একদিকে জ্ঞানী, পণ্ডিতদের মত কথা বলছ, অথচ অন্য দিকে তুমি শোক করছ। পণ্ডিতদের মত কথা বলে যাচ্ছ, কিন্তু পণ্ডিতদের মত যে তুমি আচরণ করবে, সেটা তোমার মধ্যে নেই। তোমার কথাগুলো পণ্ডিতের মত, কার্যগুলো পণ্ডিতের মত না। এই রকম কারা করে? উন্মত্ত যারা, যারা পাগল। তুমি এখন পণ্ডিতও না, ক্ষত্রিয়ও না, তুমি একটা উন্মত্ত।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্রাকারে রাখা হয়েছে, অর্থাৎ খুব সংক্ষেপে কয়েকটা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। এগুলোকেই পরে তৃতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভগবান বিস্তার করে গেছেন। প্রথম ভাব হল, অবসাদ, যেটা প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হয় আত্মার স্বরূপ। কয়েকটা শ্লোকে আত্মার স্বরূপ সূত্রাকারে বলে শুরু করবেন স্বধর্ম, কর্মযোগ, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ; গীতা এইভাবে চলতে থাকবে।

এগারো নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যা করার আগে কয়েকটা কথা আমাদের মনের মধ্যে বসিয়ে রাখলে খুব ভাল হয়। প্রথম কথা হল, আমাদের জ্ঞান কিভাবে হয়? কিভাবে আমাদের উপলব্ধি হয়? উপনিষদের ঋষিরা একটা খুব সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতেন, তা হল বিদ্যা। আমরা এখন বিদ্যা বলতে যা বুঝি, এই বিদ্যা তা নয়। উপনিষদের বিদ্যা একটা টেকনিক্যাল টার্ম। আমরা সব কিছুতে বিদ্যা শব্দ জুড়ে দিয়ে বলি, আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা আবার শস্ত্রবিদ্যাটাও একটা বিদ্যা। উপনিষদে এর বাইরে আরও বিদ্যা আছে, যেমন দহরবিদ্যা, শাণ্ডিল্য বিদ্যা, ইত্যাদি। কিন্তু ঈশ্বরবিদ্যা, ভক্তিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা নেই। বিদ্যার অর্থ, একটা জিনিসকে নিয়ে যখন কালচার করা শুরু হয়।

আমাদের সমগ্র জীবনটাই যেন একটা ট্রেনিং। ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে যখন একটা জায়গায় চলে এলো, তখন হঠাৎ একটা কিছু, যেখানে তার উপলব্ধি হয়ে যায়। উদাহরণ দিলে জিনিসটা বোঝা যাবে, ভারতে শেষ বড় যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৭১ সালে, যদিও কিছু দিন আগে কার্গিল যুদ্ধ হয়েছিল, তবে এই যুদ্ধ অত ব্যাপক ভাবে হয়নি। কিন্তু ১৯৭১ সালের আগেও এবং ১৯৭১ সালের পরেও

মিলিটারিতে আগা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরো ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে একেবারে তৈরী করে রাখা হয়েছে। হঠাৎ কিছু একটা হয়ে গেলে, বা এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে গেলে, তখন এতদিনের যে ট্রেনিং, তার সাথে প্রস্তুতি, সবটাই পল্লবিত হয়ে ওঠে। জীবনে আমরা যা কিছু করছি, সবটাই যেন এক বিদ্যার সাধনা। জীবনের সব কিছু যদি বিদ্যার সাধনা না হয়ে থাকে, তাহলে পুরো জীবনটাই যেন বৃথা হয়ে যায়।

এক একটা বিদ্যার সাধনা যেন এক এক ধরণের ক্ষেতের চাষ। ধান চাষের জন্য মাটি, সার, জল এক রকম দরকার, আবার আলু চাষের জন্য অন্য ধরণের মাটি, সার, জল দরকার। ঈশ্বর বীজ ছড়াতে থাকেন। কার ক্ষেত কেমন প্রস্তুত, সেই অনুসারে তিনি বীজগুলি ছড়িয়ে দেন, সেখান থেকে আমরা ফসল পেয়ে যাই। যিনি ব্রহ্মোপসনা করছেন, ব্রহ্মবিদ্যাকে নিয়ে সাধনা করে যাচ্ছেন, করতে করতে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের প্রস্তুতি হয়ে গেছে। অন্য কিছু ওখান থেকে আর ফল হয়ে বেরোবে না, ফলবে ওই একটাই জিনিস। তিনি অন্য কিছু যদি হতে যান, যদি একজন বড় লেখক হতে চান, তা তিনি আর হতে পারবেন না। যিনি কবি বা সাহিত্যিক হতে চান, তাঁকে ওই বিদ্যারই উপাসনা করতে হবে, যেটাকে আমরা বলে থাকি, সাহিত্যের সাধনা, কবিতার সাধনা। কিন্তু এখানে আমরা ঠিক সাধনা জিনিসটাকে নিয়ে বলছি না, বলছি বিদ্যাকে নিয়ে নিজের একটা প্রস্তুতি। ওই প্রস্তুতি হয়ে গেলে, ভগবান সেখানে একটা বীজ ফেলে দেন। কখন তিনি ফেলেন আমরা বুঝতেও পারি না। যতক্ষণ না তিনি বীজ ফেলছেন, ততক্ষণ তার ফসল হবে না। আর ক্ষেত যদি তৈরী না থাকে তাহলে কিন্তু বীজ কোন দিন আসবে না। অনেক সময় ভগবান ধ্যানের গভীরে একটা কিছু দিয়ে দেন। সবাইকে তিনি এভাবেই দেন। যখন দেন, তখন কেউ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত একজন বড় কবি হয়ে যান, কেউ নিউটন বা আইনস্টাইনের মত একজন বড় বিজ্ঞানী হয়ে যান।

অন্য আরেকটা হয়, যেমন অর্জুনকে তিনি দিয়ে দিলেন, সেখান থেকে তাঁর শক্তি এসে গেল। এই যে এতদিন ধরে অর্জুনের একটা দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল, পরে যেমন ভগবান বলবেন, *সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্*, সারা জীবন ব্যাপী তোমার ক্ষত্রিয় ধর্মের প্রশিক্ষণ হয়েছে, এখন তার ফসল কাটার সময় হয়েছে, এখন তোমার আর কোন ভাবেই পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। ঠাকুরও যখন তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈত সাধনা করতে গেলেন, তিনিও পিছিয়ে যাচ্ছেন, তোতাপুরী ঠাকুরকে ঠেলে এগিয়ে দিলেন। সেই কথাগুলিই পরে সাধনার উপায় হয়ে যায়, যে কোন একটা উপায়ে আমাদের মনকে চাষ করানো নিয়ে কথা। আর অনেক সময় ওই কথাগুলিই আমাদের ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের এটাই বৈশিষ্ট্য।

এই অধ্যায়ে অনেক বিদ্যার কথা বলা হয়েছে, বিদ্যা শব্দটা যদিও নেই, প্রত্যেকটি শ্লোকের আলাদা করে একটা বিশেষ দাম আছে। যদিও প্রত্যেকটি শ্লোকের সাথে প্রত্যেক শ্লোকের যোগসূত্র আছে, কিন্তু সবটাই সূত্রাকারে আছে। এই সূত্রগুলির কিছু তৃতীয় অধ্যায়ে, কিছু চতুর্থ অধ্যায়ে, কিছু পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তার করে বলবেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথাগুলি সূত্রাকারে রয়েছে। এর যে কোন একটা শ্লোকের ভাবকে আধার করে কেউ যদি ধীরে ধীরে নিজের জীবনকে সেই ভাবানুযায়ী গড়তে শুরু করে, সেটাই তখন হয়ে যাবে বিদ্যার সাধনা। এই বিদ্যার সাধনা করতে করতে একটা সময় আসবে, যখন তিনি কৃপা করে তাকে আসল বীজটা দিয়ে দেবেন, তখন ওই ভাবটা পুরো খুলে যাবে। এই ভাব নিয়ে আমরা এগারো নম্বর থেকে বাহাত্তর নম্বর পর্যন্ত যাব। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, এর যে কোন একটা ভাবকে নিয়ে আমাকে কোথাও না কোথাও গিয়ে সাধনা করতে হবে। আমার মন যেন একটা বিশাল ক্ষেত্র, সেখানে আমি চাষ করছি।

এই এগারো নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হয় আত্মবিদ্যা, আত্মা কি, আত্মার বৈশিষ্ট্য কি, এই জিনিসগুলোকে নিয়েই এখন বলতে শুরু করবেন। এগারো থেকে তিরিশ নম্বর শ্লোকগুলি খুব সূক্ষ্ম,

সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য আমাদের ধারণা করতে কঠিণ হবে। খুব সংক্ষেপে মূল চাবিকাঠিটাকে (master key) যদি বলে দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের সবটা বুঝতে সুবিধা হবে। বিশ্বের সব ধর্মকে এক জায়গায় নিয়ে এসে বোঝার চেষ্টা করতে হয়, কিভাবে ধর্মগুলি এসেছে, আর ওদের জীবনদর্শন এবং আধ্যাত্মদর্শন কি, এগুলোকে ভাল করে বুঝতে হয়।

একটা কথা আমরা বিভিন্ন সময় আলোচনা করেছি, যে কোন দর্শন, এবং যারা বস্তুবাদী, যারা বিজ্ঞানবাদী, তাদের সবাইকে তিনটে জিনিসের ব্যাখ্যা করতে হবে – জীব, জগৎ এবং ঈশ্বর। দর্শন মানেই, তাঁকে এই তিনটে জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে হবে –আমি কে, জগৎ কি এবং ঈশ্বর কি। যেমন বস্তুবাদীরা বলবে, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, দ্বিতীয় বলবে জীবের জন্ম জগৎ থেকে, মৃত্যুর পর এই জগতেই জীব আবার মিশে যাবে। বিভিন্ন ধর্মে আবার ঈশ্বরের অবধারণা পাল্টে যায়, যেমন যেমন পাল্টায় তেমন তেমন জীব ও জগতের অবধারণা পাল্টাতে থাকে। মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার ধর্মের এই জিনিসগুলিকে বিভিন্ন পণ্ডিতরা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। অতি প্রাচীন ধর্মগুলি, যে ধর্মগুলি এখন প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে, তাঁরা সেগুলোকেও নিয়ে আসেন। এখানে ইতিহাসের আলোচনা করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে এগুলো জানা থাকলে আমাদের অনেক কিছু বুঝতে সুবিধা হবে।

জুহুদি, খ্রীশ্চান ও ইসলাম এই তিনটে ধর্ম ইজরাইল, আরব আর ইরানের মাটিতে জন্ম নিয়েছে। পার্সি ধর্ম বা জরাথ্রুয়ান ধর্ম সরাসরি হিন্দু ধর্মের সাথে যুক্ত, কারণ এই দুটো ধর্মের শব্দগুলির মধ্যে, ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলিতে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। পণ্ডিতরা বলেন জরুথ্রিয়ান ধর্ম স্বাধীন ধর্ম, নিজের মত হয়েছে। কিন্তু চারটে ধর্ম একই এলাকার। বাকি তিনটে ধর্মকে নিয়ে এনারা খুব মজার ব্যাপার বলেন, এই তিনটে ধর্মের মূল সূত্র আসে ব্যবিলন থেকে। পণ্ডিতরা যেটা বলেন সেটা আমাদের মেনে নিতে হয়, তর্ক করার কিছু নেই। পণ্ডিতরা বলেন যে, ব্যবিলিয়ান ধর্মের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই বৈশিষ্ট্য আজকে আমরা ইসলাম ধর্মে পুরোদমে পাই। তখনকার দিনে অন্যান্য যে ধর্মগুলি ছিল, যেমন গ্রীক, রোমান; এদের নানা রকম দেবী-দেবতা ছিল, যাদেরকে তাঁরা পুজা করতেন। এক এক দেবী-দেবতার জন্য এক একটা মন্দির ছিল, আমরা যেমন বলি কাশীর মন্দির হল শিবের মন্দির, বৃন্দাবন কৃষ্ণের স্থান। গ্রীক, রোমানদের দেবী দেবতারা যেন এক একটা স্থানে জেঁকে বসেছিল, সেই স্থানে সেই দেবতাদের মন্দির থাকত, সেখানে সবাই আহুতি দিত, পুজা আদি করত।

ব্যবিলিয়ান ধর্ম পুরো আলাদা। ব্যবিলিয়া ধর্মে যে জিনিসগুলি পূজারীরা করেন, অর্থাৎ ধর্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষরা যা করেন, সেটাই সাধারণ মানুষরাই করতে শুরু করে দিল। মনুস্মৃতিতে মনুও পরিষ্কার ঠিক এটাই বলছেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা যা করেন, সেটা সবারই করা দরকার, এইভাবে করতে করতে যারা নীচে পড়ে আছে, যেমন শূদ্রাদি জাতি, তারাও ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসবে। এই সংস্কৃতি ভারতে ছিল। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক বা প্রাচীন রোম সংস্কৃতিতে এই জিনিসটা ছিল না। ব্যবিলিয়ানরা অনেক রকম শুদ্ধিকরণ, শুদ্ধাচার করত, ধীরে ধীরে এই জিনিসগুলি সবাই করতে শুরু করল। ভারতে যেমন পুরোহিতরা রোজ সকালে স্নান করবে, পূজা অর্চনাদি করবে, যদিও এটা যে শুধু পুরোহিতদেরই করা উচিৎ, তা নয়, প্রত্যেক হিন্দুরই এগুলোই করার কথা, এটাই তাদের কর্তব্য।

সেখান থেকে ওনারা ঈশ্বরের অবধারণাকে নিয়ে গেলেন এই জগতের বাইরে, তিনি উপরে কোথাও আছেন। যেটা আজকে আমরা জুদাইজিম, ইসলাম ও খ্রীশ্চান তিনটে ধর্মেই পাই। তার থেকে আরও যেটা বড় কাজ করলেন, সেটা হল, মন্দিরগুলোকে মূর্তিমুক্ত করে দিলেন, মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। ভগবান যিনি এতদিন মাটিতে গেঁড়ে বসেছিলেন, তিনি এবার উপরে চলে গেলেন। ইতিহাসবিদদের মতে, এই ভাবগুলি ধীরে ধীরে এই তিনটে ধর্মেই ছড়িয়ে গেল। ফলে একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব, যেটা মূর্তির বাইরে চলে গেল, ভগবান উপরে transcendent, আমাদের বাইরে, কিন্তু তিনি হলেন সব কিছুর নিয়ন্তা। এতদিন যে দেবী দেবতারা জগতের বিভিন্ন জিনিসগুলি

সামলাতেন, এখন থেকে ভগবান একাই সব কিছু সামলাতে শুরু করলেন। এ্যব্রাহামকে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে, তবে এগুলো কাহিনী না আখ্যায়িকা, আমাদের জানা নেই। এই কাহিনীগুলিকে দিয়ে একটাই জিনিস বোঝান হয় যে, এক ঈশ্বরই আছেন। মধ্যপ্রাচ্যের চারটে ধর্মই, জুহুদি, খ্রীশ্চান, ইসলাম ও পার্সি, এক ঈশ্বরকে অর্থাৎ একেশ্বরবাদকে নিয়ে চলে। গীতা বুঝতে গেলে এই জিনিসগুলি আমাদের অনেক সাহায্য করবে।

এটাই ভারতভূমিতে এসে চারটে বড় ধর্মের জন্ম –হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ। ভারতে এসে কি হল, যদি আমরা গভীরে গিয়ে দেখি তখন দেখা যাবে, এই চারটে ধর্মে ভগবান আছেন অথচ নেই। কিন্তু একেশ্বরবাদ এই চারটে ধর্মের কোনটাই নেয়নি। একেশ্বরের বদলে আসছে, ঈশ্বর থাকুন, নাই থাকুন, ঈশ্বর সর্বভূতে থাকুন, সর্বব্যাপী থাকুন, অনন্ত থাকুন, সীমিত থাকুন, স্বর্গে থাকুন, স্বর্গের বাইরে থাকুন, ঘুরে ফিরে হল আমিই সেই আত্মা, এই দেহটা আমার নশ্বর এবং আত্মা অবিনশ্বর। সুতরাং দেহের কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল আত্মার, চারটে ধর্মই এই একটি কথাই বলবে। এরপর বলবেন, কোন ভাবে আমি এই শরীরের মধ্যে ফেঁসে আছি, এখান থেকে আমি বেরোতে পারব না, জন্মজন্মান্তর ধরে এই অবস্থা চলতে থাকবে, যতক্ষণ না আমার মুক্তি হয়ে যাচ্ছে।

চারটে ধর্মে কয়েকটা সাধারণ জিনিস আছে, তার মধ্যে প্রথম হল এই দেহটা শেষ কথা না। দ্বিতীয় সাধারণ ভূমিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, মৃত্যুতে আমাদের কারুরই মুক্তি হবে না, চারটে ধর্মেই এই ধারণা আছে। ঈশ্বরের যে ধারণা আর জীব, জীবাত্মা যিনি ভিতরে আছেন, তার ধারণা একটু আলাদা। মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার যে চারটে ধর্ম, তাঁদের কাছেও শরীর সব কথা না এবং মৃত্যুই শেষ নয়। কিন্তু এই দেহটা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যা কিছু করছে, সেটাই হল শেষ কথা। কারণ তার কর্ম দিয়েই তারা বিচার করে দেখবে, মৃত্যুর পর তার কি হবে, কাহিনী এখানেই শেষ। এক কথায় এর অর্থ হল, আমরা পুনর্জন্ম মানি না। ফলে এই চারটে ধর্ম সব দিক দিয়ে আলাদা হয়ে যায়, গুণগত ভাবে আলাদা হয়ে যায়, তার জীবনদর্শন আলাদা হয়ে যায়। পুনর্জন্ম না মানাটা পতনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে এই জায়গায় নিয়ে আসে, যেখানে তারা বলা শুরু করে, জীবন একটাই, মরে গেলে সব শেষ, সেইজন্য যত দিন বাঁচব লুটেপেটে নাও, পুলিশ ধরতে না পারলেই হল। আজকে সারা বিশ্ব যে বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছ, শুধু এই ভাবের জন্য।

হিন্দুদের পুনর্জন্মবাদের দোষ হল, এই জন্মে পাপ করে নাও, পরের জন্মে না হয় প্রায়শ্চিত্ত করে নেওয়া যাবে। এই নয় যে এটা ভাল, ওটা খারাপ, দুটোতেই দোষ পাওয়া যাবে। কিন্তু এই আটটি মূল ধর্মের একটা সাধারণ পয়েন্ট হল, মৃত্যুই শেষ নয়। মৃত্যু হল অন্য জীবন শুরু করার দরজা। কোন ধর্ম কক্ষণ ধর্মই হবে না, যদি না সেই ধর্ম মৃত্যুর পরের জীবনকে বিশ্বাস করে। আমি যদি বলি মৃত্যুর পর কিছু থাকে না, অন্য দিকে বলছি আমি ধর্ম মানি, সেই ধর্ম কোন ভাবেই ধর্ম হবে না। ধর্ম মানে, মৃত্যুর পরেও তুমি কোন না কোন ভাবে থাকবে। কিভাবে তুমি থাকবে সেটা অন্য প্রশ্ন। মধ্যপ্রাচ্যের ধর্ম বলবে, তুমি এই জন্মে ভাল মন্দ যা করেছ, সেই অনুসারে তোমার সব হবে। হিন্দুরা বলবে এটা তোমার চলতে থাকবে। এটা একটা অন্য বিষয়, এই বিষয় যখন আসবে তখন আমরা আরও বিস্তারে আলোচনা করব, কেন হিন্দুরা পুনর্জন্ম মানে।

এখন জীবাত্মাকে মানলে, অর্থাৎ শরীরের পিছনে একটা কিছু আছে, তখন তিনটে সিদ্ধান্ত এসে যাবে। এই তিনটে সিদ্ধান্তকে আমাদের ভাল করে বুঝে নিতে হবে, নাহলে আমরা এগারো থেকে তিরিশ নম্বর শ্লোক বুঝতে পারব না। কারণ গীতাতেই এক জায়গায় এক রকম বলবেন, অন্য জায়গায় অন্য রকম বলবেন, ফলে আমাদের সংশয় আসতে পারে। প্রথমটা হল দেহাত্মা, দেহই আত্মা। তার মানে দাঁড়ায়, শরীর ভিতর চৈতন্য রূপে যিনি আছেন, তিনি থাকলেও মৃত্যুর পর দেহের সাথে disintegrate করে শেষ হয়ে যান। এটা হল প্রথম একটা সিদ্ধান্ত, দেহটাই আত্মা। দ্বিতীয়টা

হয় জীবাত্মা, জীবাত্মা হিন্দুদের খুব সাধারণ বিশ্বাস। আমার ভিতরে এক চৈতন্য সত্তা আছেন, মৃত্যুর পর এই জীবাত্মাই স্বর্গে যায়, নরকে যায় বা পাতালে যায়, বিভিন্ন জন্মান্তরে যায়। এই দুই নম্বর সিদ্ধান্ত জীবাত্মা, জীবাত্মার ধারণা হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য। তিন নম্বর সিদ্ধান্তও খুব গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আত্মা। দেহাত্মা, জীবাত্মা আর শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধাত্মার একটাই পরিভাষা – তিনি অনন্ত।

ভগবান এগারো নম্বর থেকে যখন বলতে শুরু করবেন, তখন তিনি একবার জীবাত্মা, আর-একবার শুদ্ধাত্মা, এই দুটোর মধ্যে বাচ খেলতে থাকবেন। একটা দুটো ক্ষেত্রে দেহাত্মা নিয়ে আসবেন শুধু অর্জুনকে বোঝানর জন্য যে, যদি তুমি এটাকেও মানো তাও তোমার যুদ্ধ করা দরকার, কিন্তু ততটা গুরুত্ব নয়। প্রথম ধারণা দেহাত্মা, এটা হল লৌকিক লোকেদের জন্য। চতুর্থ আরেকটা ধারণা পাওয়া যায়, যে ধারণা সেমেটিক ধর্মগুলিতে রীতিমত আছে। তাদের কাছে এটা দেহাত্মাও নয়, জীবাত্মাও নয়, এটা একটা সোল্, এই সোল্ মানে হিন্দু বা ইণ্ডিক ধর্মের আত্মা নয়। সোল কিছুটা আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের সাথে মেলে। জীবাত্মা যিনি আমাদের শরীরের সূক্ষ্ম জিনিসের সাথে জড়িয়ে রাখেন, এটাই ওদের সোল। সেমেটিক ধর্ম বলে, এই সোল শরীর ধারণ করে ঠিকই, কিন্তু একবারই সে শরীর ধারণ করবে। হিন্দু ধর্মের সাথে আরও যে তিনটে ইণ্ডিক ধর্ম আছে, এই চারটে ধর্ম একেবারেই এই মতকে মানে না।

আমরা এইভাবে মোট চারটে মত পেয়ে যাচ্ছি। দেহাত্মা, জীবাত্মা, জীবাত্মা থেকে আরেকটা মত হল সোল, সোল শুধু একবারই দেহ ধারণ করতে পারে, আর শেষে হল শুদ্ধাত্মা। হিন্দুরা জীবাত্মা একবারই শরীর ধারণ করে, পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই, এই ধারণাকে অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে করে। আমি মন্দ কাজ করি, ভাল কাজ করি, তার ফল আমি পাব। এখন সীমিত কাজ করে অসীম ফলভোগ এটা একেবারেই অযৌক্তিক। এই দেহে যে একশ বছর বেঁচে থেকে মারা গেল, তার তাও একশ বছর ভাল মন্দ কাজের ফল ভোগ করল; কিন্তু যে কুড়ি বছরে মারা গেল, প্রথম ছয় বছর তার ভালমন্দের কোন জ্ঞানই হয়নি, ষোল বছরের ভাল-মন্দ কাজের জন্য অনন্ত ফল ভোগ, একেবারেই অযৌক্তিক। অন্য দিকে চোদ্দ বছরে কোন একটা ভাল কাজ করল, আর তার জন্য তাকে অনন্ত সুখ দেবে, এটাও যুক্তিতে দাঁড়ায় না। আবার চোদ্দ বছরে কোন ভুল করেছে, যার জন্য তাকে অনন্ত কালের জন্য নরকে যেতে হবে, এটাও কোন ভাবেই যুক্তিতে দাঁড়ায় না।

জীবাত্মার ধর্ম হল, সে কেবল শরীর ধারণ করতে থাকে। যেমন কর্ম করবে, যেমন চিন্তা-ভাবনা করবে, মৃত্যুর পর সেই অনুযায়ী সে শরীর ধারণ করবে। সেখানে গিয়ে সে আবার নূতন কর্ম করবে, সেই কর্মের জন্য তার আবার পাপ-পূণ্য হবে। ওই পাপ-পূণ্য অনুসারে তার মনে ভোগ-বাসনা আদি উৎপন্ন হবে। সেখান থেকে সে মৃত্যুর পর আবার নূতন দেহে যাবে। মৃত্যুটাও মন্দ কিছু না, এটা একটা running stage, যেমন আমরা ঘুমোই। ঘুম ভাঙার পর আমাদের জীবনটা যেমন আগের মতই চলতে থাকে, ঠিক তেমনি মৃত্যুর পরে জীবনটা চলতে থাকে। ঘুমনোটা খুব অল্প সময়ের জন্য হওয়াতে আমরা সব কিছু মনে রাখতে পারি, মৃত্যুর সময়টা বিরাট লম্বা, সেইজন্য মনে রাখা যায় না। এখন পুনর্জন্ম মানা ঠিক, নাকি মানা ঠিক নয়, এই যুক্তিতর্কের মধ্যে আমরা যাচ্ছি না। পুনর্জন্মের পক্ষে সব রকম প্রমাণই আছে, যুক্তিগত প্রমাণ আছে, লোকেরা যারা দেখেছেন, তার প্রমাণ আছে, গীতাও বলবেন ঋষি, যাঁরা শুদ্ধ মনের অধিকারী তাঁরাই পুনর্জন্ম দেখতে পান।

এগারো নম্বর শ্লোকের খুব সহজ অর্থ হল, অর্জুন, তোমার কথাগুলো এলেমেলো কারণ যাদের জন্য শোক করা যায় না, তাদের জন্য তুমি শোক করছ, অথচ তোমার কথাগুলো পণ্ডিতের মত। যাঁরা ঠিক ঠিক পণ্ডিত, তাঁরা, *গতাসূনগতাসূংশ্চ*, যেটা চলে গেছে তার জন্যও শোক করেন না, যেটা আসছে না, তার জন্যও শোক করেন না, অথচ তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ। এই হল এই শ্লোকের সহজ অর্থ। কিন্তু আরও গভীরে গেলে কিছু জিনিস পরিষ্কার হয়। যেমন বলছেন ভীষ্ম

দ্রোণের মত গুরুজনরা শোকের যোগ্য নন। তা কি কখন হতে পারে? এই গুরুজনরা মারা যাবেন, এতে কি শোক হবে না? এই জীবনের কি কোন দাম নেই? নিশ্চয়ই জীবনের দাম আছে।

আচার্য শঙ্কর এখানে একটি শব্দে পুরো জীবনদর্শনকে দাঁড় করিয়ে দিলেন, বলছেন, *সদ্‌বৃত্তত্বাৎ*, তিনি সারাটা জীবন সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে এসেছেন, সেইজন্য তাঁকে নিয়ে শোক করা যাবে না। এই হল জীবনদর্শন। আমরা বারবার একটা কথাই সব সময় বলে থাকি, জীবনের দিকে তাকাবেন না, জীবনদর্শনের দিকে তাকান। যদি জীবনের দিকে আদপে তাকাতে হয়, শুধু একটা জিনিস দেখতে হবে সদ্‌বৃত্তি আছে কিনা। তুমি জন্ম নিলে, জন্ম নেওয়ার একটা ধারাতে এসে গেলে, এখন দেখতে হবে তুমি সদাচারী কিনা, আচার ঠিক মত করছ কিনা। কারণ এই সদ্‌বৃত্তিই তোমাকে উপরের দিকে নিয়ে যাবে। আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম আত্মার তিনটে রূপ –একটা দেহাত্মা, এর কোন দাম আমাদের কাছে নেই। সেইজন্য দেহাত্মা নিয়ে বেশী কিছু বলবেন না, কিন্তু জীবাত্মাকে নিয়ে ভগবান প্রথমের দিকে কিছু কিছু বলবেন, তারপর থেকে জীবাত্মা আর শুদ্ধাত্মার মধ্যে বাচ খেলবেন।

আমরা যদি নিজের জীবনের দিকে তাকাই, প্রথমে আমি একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম, সেখান থেকে মিডল স্কুল, তারপর হাইস্কুল। হয়ত অনেকে একই স্কুলে পড়েছেন, অনেক বিভিন্ন স্কুলে পড়েছেন। যাঁরা বিভিন্ন স্কুলে পড়েছেন, তিনি যখন একটা স্কুল ছেড়ে আরেকটা স্কুলে যাচ্ছেন, স্কুল ছাড়ার সময় অনেকেরই চোখে জল আসে। কারণ প্রিয় বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে চলে আসতে হচ্ছে, চোখে জল আসছে। বিয়ের পর বাপের বাড়ি ছেড়ে শ্বশুড় বাড়ি যাচ্ছে, মেয়ের চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসছে। কিন্তু এর মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা হল অনিবার্যতা, এই রকমই হবে, এটাই করতে হবে। দ্বিতীয় হল, যা কিছু হচ্ছে এটা মন্দ কিছু হচ্ছে না, কিন্তু তুমি আরও বড় হচ্ছ। প্রাইমারী স্কুল থেকে মিডল স্কুল যাচ্ছে, তাতে খারাপ কিছু হচ্ছেন, evolve করছে। মৃত্যু কখনই শোকের কারণ হতে পারে না, কারণ মৃত্যুও মানে সে evolve করছে। নিজের পরিজন মারা গেলে চোখে জল আসাটা স্বাভাবিক, এতদিন এই মানুষটার সাথে ছিলাম, আর কোন দিনও তার সাথে দেখা হবে না, কোন কথাও বলা যাবে না। এটা আলাদা জিনিস।

ইংরাজীতে দু রকমের expression হয় –একটা হয়, I am sorry, আরেকটা হল I feel sorry, দুটো আলাদা expression। একজন খুব কষ্টে পড়েছে, আমি তাকে বলছি, I am sorry, তার মানে, তোমার এই কষ্টের জন্য আমারও খারাপ লাগছে। আর যখন বলছি, I feel sorry তার মানে, আমি তোমার উপর করুণা করছি। দ্বিতীয়টাতে তুমি গোল্লায় গেছ, তুমি করুণার পাত্র, কৃপার পাত্র, আমি তোমাকে করুণা করছি। শোক করে কখন? যখন আপনজন ওই দুরবস্থায় পড়ে যায়। শত্রুর যদি ওই রকম দুরবস্থা হয়, তখন মুখে যাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে একটা আনন্দ হয়। আর যার প্রতি কোন সম্পর্ক নেই, তার এ-রকম কিছু হলে, তার প্রতি করুণা বোধ হয়। হিন্দু জীবনদর্শন কিন্তু কখনই আমাদের অনুমতি দেবে না যে, পরিস্থিতির উপর নিজের জন্য কেউ দয়ার পাত্র বা করুণার পাত্র হবে। কেউ মারা যাচ্ছে, বা কোন দুর্ঘটনা হয়েছে, সে কখনই দয়ার পাত্র না, আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু তাকে সাহায্য করতে পারি, এর বেশী কিছু না। আদৌ শোক যদি কারুর জন্য করতে হয়, তাহলে তার জন্যই শোক করা যেতে পারে, যে সদ্‌বৃত্তি ছেড়ে অসদ্‌বৃত্তিকে অবলম্বন করেছে, যে সদাচারী থেকে দুরাচারী হয়ে গেছে। ঠাকুর এগুলোকে কোন কোন জায়গায় খুব বাজে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছেন, যেমন এক জায়গায় বলছেন, সাবির দিন ফিরেছে। সাবিত্রী একজন বিধবা ব্রাহ্মণী, সে একজনকে উপপতি করেছে, এখন তার অনেক টাকা-পয়সা, শাড়ি গয়না হয়েছে। এর জন্য শোক করা যায়, কারণ তার সদ্‌বৃত্তি চলে গেছে।

এখানেই অবাক হয়ে ভাবতে হয়, ভগবানের রচনায় আর মানুষের রচনায় কত তফাৎ হয়। এই জায়গাতে যদি আমাদের বলা হত একটা শব্দ দিতে, যাতে একটা শব্দে পুরো জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে যাবে, আমাদের মাসের পর মাস ভাবতে হত। কিন্তু আচার্য শঙ্কর গড়গড় করে লিখে চলে যাচ্ছেন। একেবারে ঠিক জায়গায় ঠিক ভাবটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সঠিক একটা শব্দকে বেছে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যদি একটা কবিতা লিখতে বলা হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ কবিতার চারটে লাইন লিখে দেবেন। পরে দেখা যাবে, ওর একটা শব্দকেও পাল্টানো যাবে না। এই হল প্রতিভা। আচার্য শঙ্করকে ঠাকুর অবতার বলছেন। যে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের কত শব্দ, কত সময় লাগাতে হচ্ছে, আর উনি একটা শব্দ 'সদ্বৃত্তি' দিয়ে সবটাকে স্পষ্ট করে রেখে দিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ এনারা সদ্বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের অসৎ বৃত্তি ছিল না, কোন দিন কোন অন্যায় কাজ করেননি, এনাদের জন্য কখনই শোক করা যায় না। এনাদের জন্য তুমি শোক করতে পারতে, যদি এনারা যদি কখন সদ্বৃত্তি ছেড়ে অসৎ বৃত্তি অবলম্বন করে থাকতেন।

এতক্ষণ ভগবান জাগতিক দৃষ্টিতে বললেন। কিন্তু এবার পারমার্থিক দৃষ্টিতে বলছেন। যদি তুমি পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখ, এবং তাতে তুমি দেহাত্মা রূপেও যদি নিয়ে থাক, তাহলে দেখ তাঁর সদ্বৃত্তি ছিল কিনা। পরে অর্জুনকে ভগবান বলবেন, *স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য*, নিজের স্বধর্মের দিকে যদি তাকাও তাহলে দেখবে এখানে শোকের কোন ব্যাপার নেই, কারণ ভীষ্ম, দ্রোণ এনারা সবাই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আজ যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা জীবন থেকে কি চাই, কখন কি ভেবে দেখেছি? কিছু একটা তো জীবন থেকে তুমি চাইবে। কথামৃত পড়ে তুমি হয়ত বলবে, ঈশ্বর দর্শন। যদিও না বুঝেই বলে থাকে, তবুও কিছু তো একটা বলছে। ওখান থেকে আরেকটু ব্যবহারিক জীবনে নামুন, তখন বলবেন, স্বর্গে যেতে চাই। আরও ব্যবহারিক জগতে নামুন, বলবেন, আমি জীবনে সুখ পেতে চাই। খুব ভাল কথা, জীবনে সুখ চাই।

সুখ সবাই চাইছে, টাকা-পয়সা সবাই চাইছে, কিন্তু সুখ আসবে কিভাবে? আমি টাকা পেলে সুখী হব। কত লোক আছে কোটি কোটি টাকা পেয়েও একেবারেই সুখী নয়। এতে প্রমান হয় যে টাকা কখনই সুখ দিতে পারে না। ঋষিরা তাই শাস্ত্রে আমাদের অনেক আগেই বলে গেছেন, ধর্ম যাঁরা পালন করেন, একমাত্র তাঁরাই সুখে থাকেন। ধর্ম যে পালন করে, তারও রোগ-ব্যাধি হয়, তারও জীবনে দারিদ্রতা আসে, তারও মৃত্যু হয়, কিন্তু তাদের মনে কখন অশান্তির ছায়া পড়ে না। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে, যেখানে ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলবেন, সেখানে তিনি বলবেন, শান্তি কার জীবনে আসে। জীবনের সত্য যদি হয় মৃত্যুর পর সব শেষ; জীবনের উদ্দেশ্য যদি সুখপ্রাপ্তি হয়, তাহলে ভাই তোমাকে সদ্বৃত্তি অবলম্বন করতে হবে। সুখপ্রাপ্তি একমাত্র সদ্বৃত্তিতেই হয়, অন্য কিছু দিয়ে হয় না। সদ্বৃত্তি হল আচার আচরণ ঠিক ভাবে পালন করা, আচার মানে তোমার ধর্ম তোমাকে যা যা করতে বলছে, আর যা যা করতে নিষেধ করছে, ইংলিশে বলছে code of conduct। বিশ্বের সব ধর্মেই তাদের নিজস্ব আচারের কথা বলা আছে। খ্রীশ্চানদের আলাদা code of conduct আছে, ইসলামের আছে, হিন্দুদের আছে। যদি বলেন, আমি কি করে অত জানব হিন্দু ধর্মে কি কি করতে হবে? ঠাকুরের কথা বলতে গেলে বলা যায়, যেটা করলে মন খুঁত খুঁত করে, কখনই সেটা করবে না, শুধু এটুকু পালন কর।

পারমার্থিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দুটো আসবে, হয় জীবাত্মা রূপে আসবে, নয়তো শুদ্ধাত্মা রূপে আসবে। জীবাত্মা রূপে যদি দেখ, ভীষ্ম দ্রোণ মৃত্যুর পরেও থাকবেন। জীবাত্মা রূপে নিলে, তাঁদের মৃত্যু মানে, এই ঘর আর সেই ঘর মাত্র। দেহাত্মা রূপে যদি নেওয়া হয়, তাঁরা তো সদ্বৃত্তিতে ছিলেন, এনারা সবাই সৎপুরুষ। তার জন্য শোক করার কিছু নেই। আর শুদ্ধাত্মা রূপে যদি নাও, ভীষ্ম দ্রোণের কখন মৃত্যু হতেই পারে না। তবে তার যদি পতন হয়ে যেত, কোন কলঙ্ক যদি হয়ে যেত, সবার কাছে যদি হাসির পাত্র হয়ে যেতেন, তবে তার জন্য অবশ্যই শোক করবে – আমার এত

আপনজন, তার এই রকম পতন হয়ে গেল! *অশোচ্যান্ অন্যশোচঃ*, তুমি ভাবছ মৃত্যুতেই যেন সব শেষ হয়ে যাবে, আমিই তাদের মারতে যাচ্ছি, এই কথাগুলো যে তুমি বলছ, এগুলো একেবারেই মুর্খের মত কথা। কিন্তু কথাগুলো বলছ একেবারে পণ্ডিতদের মত।

প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন বলছিলেন কিনা, কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, জাতিধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, বর্ণসঙ্কর হয়ে যাবে, পিণ্ডোদক ক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। এত কথা বলার পরেও অর্জুন যখন দেখলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিছু হল না, অর্জুনের কথাগুলোর প্রশংসা তো করলেনই না, উল্টে বলছেন; এই সঙ্কটকালে আর্যদের অযোগ্য, স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক, অযশস্কর এই মোহ তোমার মধ্যে কোথা থেকে এলো? তখন অর্জুন আবার বলতে শুরু করলেন, আমি গুরুজনদের প্রতি কি করে তীর চালাব? তখন ভগবান খুব সুন্দর একটা মিষ্টি হেসে বললেন, তুমি একেবারে পণ্ডিতদের মত লম্বা লম্বা কথা বলছ, *প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে*।

এই এগারো নম্বর শ্লোকটা দেখলেই বর্তমান কালের হিন্দুরা যারা ফেসবুক, হোয়াটস্আপে ঘুর ঘুর করে, তাদের কথা মনে পড়ে যায়, একটা কি দুটো বই পড়েছে কি পড়েনি, তাতেই সবাই নিজেকে হিন্দু ধর্মের বিরাট পণ্ডিত মনে করতে শুরু করে।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন তোমার কথাগুলো পরস্পর বিরোধী কথা। তুমি নিজেকে দেখাচ্ছ যেন তুমি একজন বিরাট পণ্ডিত, তোমার কথগুলোও সেই রকম, কিন্তু অন্য দিকে তোমার যে ব্যবহার তার সাথে তোমার কথাগুলো এক বিন্দুও মিলছে না। এই ধরণের অবস্থা কাদের হয়? যারা উন্মত্ত প্রমত্ত তাদেরই এই রকম অবস্থা হয়। কারণ *গতাসূন্*, যেটা চলে গেছে, *অগতাসূন্*, যেটা আসেনি, এই দুটোর কোনটাকে নিয়েই প্রজ্ঞাবানরা শোক করেন না। আমাদের খুব প্রচলিত একটা স্বভাব হল, আমরা ভেবে ভেবেই মরি। সব সময় আমরা ভেবে ভেবেই মরে যাচ্ছি, যদি এই রকম হয়ে যায় তাহলে আমার কি হবে, এই রকম যদি করে আমি কি করব, যদি পাস না করতে পারি, সারাক্ষণ আমরা ভেবেই যাচ্ছি। প্রজ্ঞাবানরা অতীতে যেটা চলে গেছে সেটাকে নিয়েও কোন হা হুতাশ করেন না, আবার কল্পনার জগতে গিয়ে ভবিষ্যতে কি হবে, কি হবে না, এই ভেবেও অস্থির হয়ে পড়েন না। আমরা এখন থেকেই এই ভেবে কাঁদতে বসে পড়ি –আমার বাবা যদি মরে যায়, আমার স্ত্রী/স্বামী যদি মরে যায়, আমার গাড়িটা যদি এ্যাক্সিডেন্ট করে। যখন হবে তখন দেখা যাবে, তার জন্য এখন থেকেই ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে কি লাভ!

নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ, আচার্য আবার এখানে একটা শব্দে পণ্ডিতের ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন, *আত্মজ্ঞাঃ*। বলছেন, পণ্ডিত কে? *পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ*, পণ্ডিতে কে? আত্মার ব্যাপারে যাঁর ঠিক ঠিক জ্ঞান আছে, তিনিই পণ্ডিত। আত্মবিষয়ক বুদ্ধিকে বলা হয় পণ্ডা, যাঁর ভিতরে এই বুদ্ধি থাকে তাঁকে বলা হয় পণ্ডিত। আচার্য বলছেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, তখন দেখা যাবে ভীষ্ম, দ্রোণ এনারা নিত্য, আর এনারা *অশোচ্যান্*, ভীষ্ম, দ্রোণ এনাদের নিয়ে শোক করা যায় না। তাই তুমি হলে মূঢ়, কারণ পণ্ডিতরা, যাঁদের আত্মবিষয়ক বুদ্ধি আছে, তাঁরা কোনটাতেই শোক করেন না। তাহলে কেউ মারা গেলে কি আমি শোক করব না? ভগবান স্পষ্ট বলে দিলেন, না, শোক করবে না। পারমার্থিক দৃষ্টি দিয়ে একটা ছোট্ট কথা দিয়ে বলে দিলেন, *সদ্বত্তাত্ত্বাৎ*। গীতা যেহেতু ধর্মশাস্ত্র, এবার তাই ভগবান পারমার্থিক দৃষ্টিতে বলতে শুরু করছেন।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব না ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্।।১২।।

(পূর্বে আমি কখনও ছিলাম না এমন নয়, তুমি কখনও ছিলে না তাও নয় বা এই নৃপতিরাও ছিলেন না – এটা সত্য নয়। এই দেহধারণের পূর্বে আমরা সকলেই নিত্য আত্মরূপে বিদ্যমান ছিলাম। এই দেহত্যাগের

পরেও যে আমরা কেউ থাকব না, তাও না। বর্তমানে দেহ সত্ত্বেও আমরা নিত্য আত্মস্বরূপে বিদ্যমান আছি এবং দেহান্তে ভবিষ্যতেও নিত্য আত্মরূপে বিরাজমান থাকব।)

চতুর্থ অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান পরে আবার বলবেন, তুমিও আগে ছিলে, আমিও আগে ছিলাম, আমার সব কিছু মনে আছে, তোমার কিছু মনে নেই। ভগবান গীতায় যা যা বলছেন, আমাদের মনে রাখতে হবে হিন্দুদের এটাই মূল দর্শন। এই শ্লোকে বলছেন, *ন ত্বেবাহং জাতু নাসং*, এমন কোন সময় ছিল না, যখন আমি ছিলাম না বা *ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ*, তুমি ছিলে না, বা এই যে রাজারা এখানে যুদ্ধ করার জন্য একত্র হয়েছেন, এনারা ছিলেন না। *ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্*, এমন কোন দিন হবে না যে, আমরা দুজনের কেউ থাকব না, এমন কোন দিন হবে না, যেদিন এই রাজারা থাকবে না।

আমরা অনেক সময় এই শ্লোকের গভীরে না গিয়ে এর অর্থ বলে দিই। অনেকে আবার প্রশ্ন করবেন, আমিও আছি, তুমিও আছ, রাজারাও আছেন, কিন্তু মুক্তি হয়ে গেলে তখন কি করে থাকবে? কিছু পরে আবার এই অধ্যায়েই ভগবান বলবেন, *জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ*, যে জন্মেছে সে একদিন মরবে। উপর উপর দেখলে মনে হবে এই কথাগুলোর মধ্যে যেন বিরোধ আছে। কিন্তু কোথাও কোন বিরোধ নেই। সবটাই একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে, অবশ্য যদি আমরা গভীরে যাই। এখানে প্রথমে যখন বলছেন তখন বলছেন, আমি (শ্রীকৃষ্ণ), তুমি (অর্জুন) এবং এরা (রাজারা), এই তিনজনের কথা বলছেন। এটা কিন্তু উপাচার মাত্র, নামের জন্য বলতে গিয়ে আমি, তুমি এবং এরা, এইভাবে বলছেন; কিন্তু আসলে বলছেন পারমার্থিক দৃষ্টিতে, *সর্বে বয়মতঃপরম্*, এখানে সবাইকে ভগবান আত্মা রূপে বলছেন। দেহ রূপে সবারই নাশ হবে, এমনকি জীবাত্মা রূপেও নাশ হবে। আমরা যে তিন ধরণের আত্মার কথা বললাম – দেহাত্মা, জীবাত্মা এবং শুদ্ধাত্মা, এটাকে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, ভুলে গেলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। দেহ রূপে তোমার নাশ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। দেহ রূপে যদি তোমার নাশ হয়, তাতে তোমার কি এলো গেলো, কারণ তুমি *সদ্বত্তত্বাৎ*, সদ্বৃত্তে আছ, সেইজন্য দেহ নাশের ব্যাপারটা কিছু না।

থাকল এবার জীবাত্মা আর শুদ্ধাত্মা; জীবাত্মা রূপে যদিও চলে যাবে কিন্তু শুদ্ধাত্মা রূপে কোন দিন যাবে না। এই জিনিসটাকে ধারণা করার জন্য স্বামীজী সমুদ্র আর তার ঢেউএর উপমাটা অনেক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। আমরা যদি একটা বড় ঢেউএর কল্পনা করি –বিরাট একটা ঢেউ, সেই ঢেউএর মধ্যে আবার অনেকগুলো ছোট ছোট ঢেউ ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা ওই এক একটা ঢেউএর মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি। একটা সমুদ্রে এই রকম কত ঢেউ আছে কে জানে। এক একটা ঢেউ যেন এক একটা ব্রহ্মাণ্ড, একটা সৃষ্টি। ওর একটার মধ্যে আমরা সবাই আছি, আবার অন্য দিকে স্বামিজী বলছেন, আলাদা ভাবে যদি দেখা হয়, তাহলে যীশু, বুদ্ধ, এনারা যেন একটা বড় ঢেউ, আমরা যেন ছোট ঢেউ। স্বামী বিবেকানন্দের যে দেহ, এর নাশ হয়ে যেতে পারে, স্বামী বিবেকানন্দ যে জীবাত্মা রূপে আছেন, এর নাশ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। কিন্তু আত্মা রূপে স্বামী বিবেকানন্দের কোন দিন নাশ হবে না। ঢেউ রূপে নাশ হয়ে যাবে, কিন্তু সমুদ্র রূপে কোন দিন নাশ হবে না।

অনেক সময় বলা হয়, জীবাত্মা রূপে নাশ হবে না, কারণ যাঁরা মহাপুরুষ হন তাঁরা সূক্ষ্ম শরীরটাকে ধরে রাখেন এবং জীবের কল্যাণের জন্য স্থূল একটা শরীর ধারণ করে আসতে থাকেন। কিন্তু সাধারণ জীবের আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে, তাদের জীবাত্মা ওখানেই নাশ হয়ে যায়। কিন্তু সব জীবাত্মা যে জ্ঞান হলেই নাশ হয়ে যাবে, তা নয়। ঈশ্বরের যাঁরা নিত্যসঙ্গী, ঠাকুর যাঁদের বলছেন, নিত্যমুক্ত বা ঈশ্বরকোটি, তাঁদের জীবাত্মার নাশ হতে পারে, নাও হতে পারে। অবতাররাও যখন আসেন, তখন ওই রকম একটা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে আসেন, এবং ততদিন তিনি ওই সূক্ষ্ম শরীরে

অবস্থান করে থাকেন, যত দিন না নূতন একজন অবতার আসছেন। পারমার্থিক রূপে, সমুদ্রের কোন দিন নাশ হবে না, ঢেউএর নাশ হবে। বলছেন, পারমার্থিক রূপে নিত্য আত্মা তোমার বাস্তব স্বরূপ, ওই নিত্যাত্মার দিকে যদি দৃষ্টি দাও, তোমার কোন দিন নাশ হবে না। সেইজন্য তুমি যে ভাবছ, ভীষ্ম, দ্রোণ, তুমি, আমি, রাজারা সবারই এই যুদ্ধে নাশ হবে, এই ভাবনাটা তোমার একেবারেই অমূলক, ভ্রান্ত।

একটা গ্লাশে আমি জল ঢালছি, চাইছি গ্লাশটা জলে পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ুক। গ্লাশে জল ঢালতে থাকলাম, ঢালতে ঢালতে গ্লাশটা একেবারে কানায় কানায় জলে ভরে গেছে, জল উপচে পড়ছে না। এরপর একটি মাত্র ফোঁটা গ্লাশে ঢাললে জল পড়ে যাবে, এটাকে tipping point বলে। জীবনটাও তাই, এই যে কথাগুলো যাচ্ছে, পাত্রে পড়ছে, এরপর একটা সময় আসবে তখন পুরোটা বেরিয়ে আসবে। আমরা আগে যে আলোচনা করেছি, সেগুলো মাঝে মাঝে আমাদের দরকার পড়বে।

অর্জুন বলে দিলেন আমি যুদ্ধ করব না, আর ভগবান হঠাৎ আত্মা নিয়ে বলতে শুরু করে দিলেন কেন? আগে আমরা এর আলোচনা করেছি। ওর মধ্যে দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল – জীবনের দিকে বেশী জোর দেবেন না, জীবনদর্শনের দিকে সব সময় বেশী জোর দিতে হবে। জীবনে যখনই কারুর কোন সমস্যা আসে, তখন তার সামনে সব সময় জীবনদর্শনটা রাখতে হবে। স্বামীজীর জীবনে একটা ঘটনা আছে। স্বামীজী হিমালয়ের পথে চলেছেন, যেতে যেতে দেখছেন একজন মহিলা আর চলতে পারছেন না। স্বামীজী সেই মহিলাকে বলছেন, পিছনের দিকে একটু ফিরে তাকাও, দেখ কত দূর তুমি চলে এসেছ। উৎসাহ পেয়ে আবার মহিলা চলতে শুরু করলেন। আমাদের মুশকিল হল, আমরা কিছু বোকা বোকা কথা শিখে রেখেছি, কারুকে কিছু কথা বলতে গিয়ে আমরা ওই বোকা বোকা কথগুলি বলে ফেলি। কিন্তু তা না, দেখতে হবে ওই জীবনদর্শনটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা, আর ওটাতে আমার নিজের পুরো বিশ্বাস আছে কিনা। যার সন্তান মারা গেছে, সে যদি আমার কাছে আসে, তার কাছে আমি কখনই গীতার এই শ্লোকগুলি বলে তার শোক নিবারণ করার চেষ্টা করতে যাব না। ঠাকুরও কখনই বলতেন না। সন্তানহারা পিতা চোখের জল ফেলছেন, ঠাকুরও তার সাথে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলতেন, দুঃখী হয়ে তার সমব্যাথী হতেন। ওর কথাগুলো শুনতেন, তারপর হঠাৎ একটা গান শুরু করে দিতেন। এইভাবে তিনি আস্তে করে ওর মনটাকে উপরে তুলে আনতেন।

বয়ম্ বলছেন, সংস্কৃতে এগুলো বহুবচন, আমি, তুমি, তারা, বহুবচনে যে বলছেন, এটা দেহ ভেদে বলছেন। পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখলে, আত্মার দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, কোন তফাৎ নেই।

অর্জুনকে ভগবান কেন এইভাবে উত্তর দিলেন? কারণ অর্জুন প্রথমেই ধর্মের কথা দিয়ে শুরু করেছিলেন। তাই ভগবান বলছেন এই নাও তোমাকে আমি তোমার ধর্মের কথা দিয়েই উত্তর দিচ্ছি। আর দ্বিতীয় কথা, যখনই কারুর শোক দুঃখ হয় তখন তাকে বোঝাতে গেলে উচ্চ তত্ত্বের কথা দিয়েই শুরু করতে হয়। যখন ধুম্ জ্বর হয় প্রথমে আগে ডাক্তাররা বলে জ্বরটা আগে কমাতে হবে, জ্বর কমলে তারপর আসল চিকিৎসা শুরু হবে। ভগবানও ঠিক তাই করছেন, প্রথমেই অর্জুনের সামনে সব থেকে উচ্চ দর্শনের তত্ত্বকে রাখছেন। ঠিক এই রকমই আরেকটি খুব উচ্চ দর্শনের কথা পরের শ্লোকে বলছেন –

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।১৩।।

(যেমন দেহীর (আত্মার) এই দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা ক্রমে উপস্থিত হয়, তাতে দেহীর কোনও পরিবর্তন হয় না, সেই রকম দেহান্তরপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ মৃত্যুতে দেহী অবিকৃত থাকেন। মৃত্যু দৈহিক বিকারমাত্র। এইজন্য দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞানিরা মোহগ্রস্ত হন না।)

এখানে ভগবান দ্বিতীয় জীবনদর্শনকে, দেহাভিমানী আত্মাকে, যাঁকে জীবাত্মা বলা হয়েছে, তাঁকে নিয়ে আসছেন। আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য, কিন্তু কেন, কিভাবে সৃষ্টি হয় কারুর কাছে এর কোন উত্তর নেই, এমনকি বেদান্তের কাছেও উত্তর নেই। এক এখন বহু রূপে দেখাচ্ছেন। কেউ বলেন তাঁর ইচ্ছা, কেউ বলেন এটাই তাঁর শক্তি, কেউ বলেন এটাই তাঁর মায়া। একটা খুব বিশাল পাওয়ারের আলো জ্বলছে, তার সামনে একটা পর্দা দিয়ে দেওয়া হল। এবার পর্দার মধ্যে ছোট ছোট ফুটো করে দেওয়া হল। যত ফুটো করা হবে তত আলোর উৎস হবে, ওই ফুটো দিয়ে আলো আসতে থাকবে। তাহলে এই জগতে কত জীব আছে? যত ফুটো করা হবে, তত জীব হবে।

তাহলে সংখ্যা কোথায় বাড়ছে, কিছুই তো বাড়ছে না। লোকেরা অনেক সময় মুর্খের মত প্রশ্ন করে, জন্মান্তর যদি সত্য হয় তাহলে জনসংখ্যা বাড়ছে কি করে? এদেরকে তখন বলতে হয়, এই সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক মরছে কিনা, মরে সব মানুষ হয়ে জন্মাচ্ছে। মানুষের ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায় এরা কোথা থেকে এসেছে। এগুলো হল খ্রীশ্চান, মুসলমানদের সমস্যা, ওদের বিশ্বাস হল ভগবান একবার সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ওর মধ্যেই সব ঘুর ঘুর করছে। হিন্দুদের কাছে এটা কোন সমস্যাই না। ঈশ্বর ইচ্ছা করলেই অসংখ্য জীবাত্মা এসে যাবে। কিভাবে? যেমন পর্দার ফুটো দিয়ে আলো আসছে, আমি আরও চারটে ফুটো করে দিলাম। তাহলে কি আলোর পাওয়ারটা আরও বাড়াতে হবে, কিছুই বাড়াতে হবে না, যা ছিল তাই থাকবে।

শুদ্ধ চৈতন্যের আলোর উপর যে মুহুর্তে ওই পর্দারূপ আবরণ এসে গেল, সেখান থেকে শুরু হয়ে গেল সৃষ্টি। সৃষ্টি শুরু হতেই জড় আর চৈতন্য যেন দুটো আলাদা সত্তা পেয়ে যায়। ওই পর্দাটা হল সত্ত্ব, রজো ও তমো –তিনটে বিশুদ্ধ গুণ। গীতাতে এই তিনটে গুণের জন্য একটা আলাদা অধ্যায় আছে, সেখানে এর যেমন আলোচনা হবে, তার বাইরেও অনেকবার তিন গুণের আলোচনা আসবে। সত্ত্ব, রজো আর তমো, এটাই হল জড়। এই জড়ের সাথে চৈতন্য যে জুড়ে নিচ্ছে, এটাকে বলে দেহাভিমানী। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, সমষ্টি যিনি, তিনি যখন সত্ত্ব, রজো আর তমোর সাথে নিজেকে জুড়ে নেন বা মনে করেন আমি এর সাথে জুড়ে আছি, সেটাকেই বলে ঈশ্বর। ব্যাষ্টি হল, ক্ষুদ্রের সাথে ক্ষুদ্র যে নিজেকে জুড়ে নেয়, এটাই জীবাত্মা বা জীব।

জীব আর ঈশ্বরের সাথে কি তফাৎ? কোন তফাৎ নেই। যদি অনন্ত সমুদ্রের কল্পনা করি আর সেখানে একটা অনন্ত পর্দা আছে। সেই অনন্ত পর্দা থেকে পর্দার এপারে যেন সৃষ্টির খেলা চলছে। এক-একটা উপমাকে এক-একটা জিনিসকে বোঝানর জন্য নিতে হবে। ওই পর্দাটা হল যেন sum total of energy। ওই sum total of energy হল জড়, এনার্জি মাত্রই জড়। ওই sum total of energyর সাথে চেতনা যখন জুড়ে যায়, এটাই তখন সৃষ্টি। শুধু জড় থাকলে সৃষ্টি হবে না, শুধু চেতনা থাকলেও সৃষ্টি হবে না। সৃষ্টি হতে গেলে শুদ্ধ চৈতন্য আর জড়ের সংযোগ হতে হবে, এটাকেই বলে চিজ্জড়গ্রন্থি। সমষ্টি জড়ের সাথে যিনি জুড়ে আছেন, তাঁকে আমরা বলছি ঈশ্বর। আমরা কল্পনা করছি, একটা বিরাট ঢেউ, ওই বড় ঢেউএর মধ্যে আবার অনেকগুলো ছোট ছোট ঢেউ ওঠানামা করছে –ওই বিরাট ঢেউটা যেন ঈশ্বর আর মাঝখানে যে ঢেউগুলো উঠছে নামছে, এরা হল যেন জীব। একটা হাজার ওয়াটের বালবকে একটা কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কালো কাগজটার উপর কয়েকটা ফুটো করে দেওয়া হল। এবার দেখছি ফুটোগুলো দিয়ে আলো আসছে। এই আলো, আর বালবের যে আলো, এই দুটো আলোর মধ্যে কি কোন তফাৎ আছে? কোন তফাৎ নেই, তফাৎটা হল ওই কালো কাগজের আবরণের জন্য। আবরণ সরিয়ে দিলে কোথাও কিছু নেই, বালবের আলোই আছে। তাহলে আলাদা একটা আলো এলো কোথা থেকে? কোন দিনই আসেনি, তুমি আবরণটা দিয়েছ বলে আলাদা দেখছ, আসলে তো কিছুই নেই। এই ভাবে যিনি নিজেকে জুড়ে নেন, তিনি হয়ে যান দেহী, একটার নাম দেহী, আরেকটার নাম জীবাত্মা।

আমরা এটুকু সব সময় বুঝতে পারছি যে, একটা কিছু আমাদের ভিতরে আছে, যে আমাকে এই বোধটা দিয়ে যাচ্ছে যে আমি আছি। যেদিন প্রথম আমার আমিত্ব বোধ এসেছিল তখন আমি নেহাতই এক শিশু ছিলাম। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত, তোমার কত বয়স হয়েছে? আমি বলতাম, আমার এখন দশ বছর বয়স। সেখান থেকে আমি যৌবনে পদার্পণ করলাম। বাবা, তুমি কোন কলেজে পড়ো? আমি অমুক কলেজে পড়ি। কলেজ পাশ করে আমি চাকরি করতে শুরু করলাম। তুমি কোথায় চাকরি করছ? আমি সরকারি অফিসে চাকরি করি। 'আমি'টা কিন্তু সব সময় থাকছে। আমার সব কিছুই পাল্টে গেছে, আমার হাঁটাচলা, কথাবার্তা পালটে গেছে, আমার রুচি পাল্টে গেছে, ছোটবেলার বন্ধুরা চলে গিয়ে এখন নূতন নূতন বন্ধু হয়েছে, সব পাল্টে গেল, কিন্তু একটা জিনিসই পাল্টালো না, সেটা হল 'আমি'। তারপর বিয়ে করে সংসারী হলাম, আমিত্বটা সমান ভাবে থাকল, কিন্তু জীবনের সব পাল্টে গেল। বৃদ্ধাবস্থায় এ্যলবাম খুলে পুরনো দিনের ছবির দিকে তাকাচ্ছি আর অবাক হয়ে ভাবছি, এটা কি আমি, আমি এই রকম ছিলাম? তখন কত দৌড়ঝাপ করতাম, কিন্তু আজ লাঠি ছাড়া এক পা চলতে পারি না। কিন্তু ওই বোধ 'আমি' সমান ভাবে চলেছে। পরিবর্তন তো হয়েই যাচ্ছে, শিশু, শৈশব, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধাবস্থা; ঠিক সেইভাবে মৃত্যুটাও একটা অবস্থার পরিবর্তন। ভগবান এটাই বলছেন, *দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা*। শৈশব থেকে কৌমার অবস্থায় চলে গেলাম, তার মানে এই নয় যে আমি নাশ হয়ে গেলাম, আমি সেই আমিই থাকছি।

সমস্যাটা হচ্ছে মৃত্যুর পর তাকে তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি না। যে অন্ধ সেও তো জগতের কিছু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না, তাই বলে কি জগৎ নেই, জগৎ কি চলছে না। আমরা বলতে পারি সে চোখে দেখতে পায়না কিন্তু শুনতে পারছে, স্পর্শ করতে পারছে। অন্ধ একটা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগৎকে অনুভব করতে পারছে না কিন্তু আমি পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়েই জগতের সব কিছু অনুভব করতে পারছি। গীতাতে সাধারণ মানুষের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে এক উচ্চ তত্ত্ব ও উচ্চ আদর্শকে মানবজাতির সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। যাঁরা মৃত্যুর পরও দেখতে পারেন যে এই জগৎ একই ভাবে চলেছে, তাঁদের কাছে মৃত্যু একটা রূপান্তর মাত্র। কারা এটাকে দেখতে পান? জ্ঞানীরাই দেখতে পান, তাঁরা দেখছেন আত্মার উপর কোন কিছুই হয় না। কিন্তু এগুলো কার উপর হচ্ছে? দেহাভিমানী আত্মার উপর। যিনি নিজেকে দেহের সাথে এক করে রেখেছেন, তিনিই দেখছেন আত্মা জন্ম নিল, আত্মার যৌবন এল, আত্মা জরাগ্রস্ত অবস্থায় চলে গেল। চতুর্থ অবস্থাটা জ্ঞানীরাই দেখতে পান, অজ্ঞানীরা দেখতে পায়না। এই যে তিনটে অবস্থার কথা বলা হল এটাই হচ্ছে মূল কথা।

সেইজন্য ভগবান বলছেন, *ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*, যাঁরা ধীর পুরুষ তাঁরা এই অবস্থান্তর প্রাপ্তির জন্য মোহগ্রস্ত হন না। ধীর পুরুষ কে? আচার্য এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, ধীমান, যাঁর ধী আছে। সহজ বাংলায় ধীমান হল, বোঝার ক্ষমতা যাঁর আছে, যাঁর বুদ্ধি পরিষ্কার। এই যে একের পর এক বিভিন্ন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, ধীমান পুরুষরা জানেন এগুলো কিছুই না, এটাই স্বাভাবিক। ঠিক তেমনি মৃত্যু, এটাও স্বাভাবিক একটা পরিবর্তন। সুতরাং তুমি যে পণ্ডিতের মত এত কথা বলছ, এগুলো সব ভুল। কারণ ঠিক ঠিক তোমার যদি পাণ্ডিত্য থাকত, তাহলে এই জিনিসগুলো তোমার কাছে পরিষ্কার থাকত। যারা মরবে, যারা মারবে, কোনটারই গুরুত্ব নেই। ভগবান অর্জুনকে এখানে একটা জীবনদর্শন দিচ্ছেন, আসল সত্য হল এটা। তুমি নিজের ধর্ম থেকে কেন সরে যেতে চাইছ?

আচ্ছা, না হয় মানলাম তিনি মরবেন না, না হয় তার জন্য শোক করব না, কিন্তু বিয়োগ হওয়ার দুঃখ তো আমার আছে। পিতামহ মারা যাবেন, গুরু মারা যাবেন, মামা মারা যাবেন, ভাই-বন্ধুরা মারা যাবেন, এদের যে বিয়োগ হয়ে যাবে, সেই দুঃখটা তো আমার হবে? অবশ্যই হবে, কিন্তু কতক্ষণ দুঃখ করবে, সেটাই পরের শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে বলবেন।

এই যে বলছেন *ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ*, তুমিও এর পরে থাকবে আমিও এর পরে থাকব, এর আগে তুমিও ছিলে আমিও ছিলাম, এই রাজারাও ছিল। পরে চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান আবার যখন বলবেন তখন তিনি দেহাভিমানী রূপে বলবেন, এখানে যেটা তিনি বলছেন শুদ্ধাত্মা, সর্বব্যাপী আত্মা রূপে বলছেন। এখানেই একজন সাধারণ পুরুষ আর একজন জ্ঞানী পুরুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ধরা পড়ে। অজ্ঞানী মনে করে মৃত্যুই হচ্ছে সব কিছুর পরিসমাপ্তি, জ্ঞানী দেখেন মৃত্যু হচ্ছে একটা অবস্থার রূপান্তর মাত্র। যিনি সন্ন্যাসী তাঁর জীবনের প্রতিও কোন মোহ থাকে না আবার মৃত্যুর প্রতিও কোন আসক্তি থাকবে না, জীবন-মৃত্যুর পারে তারা চলে যান। বিভিন্ন ধর্মে এইগুলোকেই বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়।

হিন্দু ধর্মে এই কারণে আত্মহত্যাকে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়। কারণ মৃত্যুই যদি সব কিছুর শেষ হত তাহলে আত্মহত্যা করাটা কিছু অন্যায় হত না। কিন্তু আমরা মৃত্যুকে এভাবে দেখি না, আমরা দেখি মৃত্যু হচ্ছে একটা অবস্থার রূপান্তর মাত্র। মৃত্যুর পর আবার একটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করে তার জীবন চলতে থাকে, তাই আত্মহত্যা করার কোন অর্থই হয় না, এই কারণে আমাদের শাস্ত্রে আত্মহত্যাকে পাপ বলা হয়। আত্মহত্যার ব্যাপারে অন্যান ধর্মে বলে ভগবান এই শরীর দিয়েছেন এই শরীরকে এভাবে শেষ করে দিতে নেই।

এতক্ষণ তো অনেক উচ্চ আদর্শের কথা বলা হল, কিন্তু আদর্শের অনুশীলন করে লক্ষ্যে পৌঁছাবে কি করে? তখন ভগবান এক এক করে বলতে থাকবেন। এখানে শুধু খুব সারতত্ত্বটাকে বলে দেওয়া হল। আসলে গীতা হচ্ছে পুরোটাই condensed milk যতই জল ঢালা হবে ততই দুধ তৈরী হতে থাকবে, তাই গীতারও কোন শেষ নেই। বাল্মীকি রামায়ণে যত ধর্মের কথা বলা হয়েছে গীতাতে সেই সব কথা গুলোকে কয়েকটা শ্লোকের মধ্যেই বলা হয়ে গেছে। এখন লক্ষ্যে পৌঁছাবে কি করে? প্রথম কথা আত্মা ছাড়া কিছু নেই, এক দিকে সংসার হচ্ছে দুই, অন্য দিকে অধ্যাত্ম হচ্ছে অদ্বৈত, মানে দুইয়ের অভাব। অদ্বৈতের 'অ' মানে এক নয়, দ্বৈতের অভাব, সংসার হচ্ছে দ্বৈত। দ্বৈত মানে দুই, তাহলে অদ্বৈত মানে দুই নয়। দুই যদি না হয় তাহলে কত হবে? দুই না হলে কি হবে, সেটা আবার মুখে বলা যায় না।

অদ্বৈত আর একেশ্বরবাদ দুটো পুরো আলাদা। একেশ্বরবাদ মানে এক ঈশ্বর আছেন, এরা অদ্বৈতের অর্থ করেন যে সেই এক ঈশ্বর অদ্বৈতম্। কিন্তু তা নয়, অদ্বৈতের অর্থ হচ্ছে দুই নেই। দুই নেই তো তাহলে আছেটা কি? আমি বলব দুই নেই তাহলে এক আছে। কিন্তু এক বললে তো দুইও আসবে। যেখানে এক থাকবে সেখানে দুইও থাকবে, যেখানে শূন্য থাকবে সেখানেও দুই আসবে। ঠাকুর বারবার বলছেন – যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞান আছে। এগুলো খুব গভীর তত্ত্বের কথা, দু-চারটে কথাতে এগুলো কারুকে বুঝিয়ে দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার। প্রথমে শুনে যেতে হয়, তারপর অনেক বছর সাধন-ভজন করতে করতে হঠাৎ করে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। অদ্বৈত হচ্ছে এক দুইয়ের পার, আধ্যাত্মিক জিনিস হচ্ছে এক দুইয়ের পার।

অধ্যাত্ম রামায়ণে বলছে রাম চলেনও না রাম কিছু করেনও না। যেমন সূর্যে অন্ধকারের কল্পনাই করা যায় না। অন্ধকারের কল্পনা যখন করা যায় না, তখন সূর্যে দিনও নেই রাতও নেই। ঠিক তেমনি অদ্বৈতে একও নেই দুইও নেই। দ্বৈত হচ্ছে একটা মতাদর্শের নাম, যারা এর অনুগামী তাদেরকে বলা হয় দ্বৈতবাদী। অদ্বৈত হচ্ছে জগতের, সাংসারিক যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তার বাইরে। সংসারটা কি? দ্বৈত, duality, এর আর-একটা অর্থ হল দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব মানে যেটা আছে তার একটা বিপরীত থাকবে, গরম থাকলে ঠাণ্ডা থাকবে, সুখ থাকলে দুঃখ থাকবে, কথায় বলে যার আছে সুখ তার আছে দুঃখ, যার আছে জন্ম তার হবে মৃত্যু, সংসার মানেই এই দ্বন্দ্ব। যেখানে দুই নেই, এক

দুইয়ের পার সেইটাই অধ্যাত্ম। অধ্যাত্ম মানে আত্মা, আত্মা মানে সংসারের পার, সংসারের পার মানে দ্বন্দ্বাতীত, দুই নেই।

পরের শ্লোকে এইটাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন – আমাদের যা কিছু দ্বন্দ্ব আছে ইন্দ্রিয় দিয়ে মাপা হয়। কিভাবে মাপা হয় –

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।১৪।।

(হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংযোগহেতু শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখাদি দ্বন্দ্ব অনুভূত হয়। কিন্তু এ সবই দ্বন্দ্ব উৎপত্তিবিনাশশীল; অতএব অনিত্য। হে ভারত, হর্ষ ও বিষাদশূন্য হয়ে অপ্রতিকারপূর্বক এ-সকল সহ্য কর।)

আমরা এই কথাটা খুব শুনে থাকি – প্রহারেণ ধনঞ্জয়, যদিও মন বানানো কথা, কোথাও নেই, কিন্তু *তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত*, শ্লোকের এই শেষ অংশটুকু আমাদের দাগ দিয়ে রাখতে হবে, খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিতিক্ষা মানে সহ্য কর। প্রথমে বলছেন *মাত্রাস্পর্শাঃ তু কৌন্তেয়*, গীতা যদি আমরা নাও বুঝতে পারি, কিন্তু শুধু গীতার ভাবগুলির দিকে যদি একটু তাকাতে চেষ্টা করি, আর তার সাথে যদি ভাবা হয়, গীতা আজ থেকে তিন-সাড়ে তিন হাজার বছর আগের রচনা, তখন শুধু অবাক হয়ে ভাবতে হয় যে, আমাদের পূর্বজরা কি এক অমূল্য সম্পদ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। বলছেন *মাত্রা*, আমরা প্রায়ই বলে থাকি, আজ ঠাণ্ডার মাত্রাটা একটু কম আছে বা রান্নায় ঝালটা একটু বেশী মাত্রায় দিয়েছে; মাত্রা মানে পরিমাণ, যেটাকে মেপে নেওয়া যায়। এই জগতের সব কিছুকেই মেপে নেওয়া যায়।

জগতে এমন কোন জিনিস নেই, যেটাকে মাপা যায় না, সেইজন্য জগতের সমস্ত বস্তুকে বলছেন মাত্রা। কে মাপে? ইন্দ্রিয় মাপে। আমি যখন কিছু দেখছি, তখন আমার চোখ থেকে চেতনা বেরিয়ে এসে জিনিসটাকে মেপে নিয়ে আমার বুদ্ধিকে খবর দেয়, সেখান থেকে ওই জিনিসটার ব্যাপারে আমার বোধ হয়। দুদিন আগেও ঠাণ্ডা ছিল, আজকে অল্প অল্প একটু গরম লাগছে। এই যে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা কি করে বুঝতে পারছি? আমাদের শরীরটা চামড়া বা ত্বক দিয়ে আচ্ছাদিতে, এই ত্বক ইন্দ্রিয় স্পর্শ দ্বারা বুঝে নিচ্ছে আজ গরম, আজ ঠাণ্ডা। বুঝে নিয়ে বলছে, আজ ঠাণ্ডা কম, গরম জামা খুলে ফেল। খাওয়ার সময়, কোন খাবারে নুন বেশী হয়েছে, কোন খাবারে ঝাল বেশী লাগছে, কোন খাবারে মিষ্টি কম হয়েছে, চাটনিটা আরেকটু টক হলে ভাল হত, এখানেও আমাদের জিহ্বা ইন্দ্রিয় এই খাবারগুলিকে মেপে নিচ্ছে। আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় জগতের পাঁচ রকম বস্তুকে মেপে নিচ্ছে। তার মানে, এই জগৎ চলছে মাত্র দুটো জিনিস দিয়ে, মাত্রা আর স্পর্শ দিয়ে। ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি ভিতরে টেনে নিয়ে আসা হয়, তখন বাইরে জিনিস থাকলেও কিছু হবে না, কোন কিছুতেই আকর্ষণ হবে না। ছোটবেলায় মিষ্টির দোকান দেখলেই জিবে জল চলে আসত। এখন বয়স হয়ে গেছে, আর জিবে জল আসে না। আর ডায়বেটিসের রুগী হলে বলবে, মিষ্টির দোকানের শোকেসে শুধু বিষগুলি সাজিয়ে রাখে।

আমাদের সবারই জীবনে একটা সময় আসে, একটা জিনিসকে দেখে আমরা দৌড়াতে থাকি, মুখ থেকে লালা পড়ে। আবার ওটার পিছনে ছোটার জন্য জীবনে অনেক চড়-থাপ্পড় খেলে বলবে, থাক, আমার লাগবে না। জগতে যা কিছু আছে তার উল্টোটাও আছে, যা কিছুই দ্বন্দ্বাত্মক তারই জন্ম হবে আবার মৃত্যুও হবে, একটা সময় তার আগমন হবে আরেকটা সময় তার প্রস্থান হবে। শাস্ত্র আমাদের বারবার বলছে, যে জিনিসটা স্থায়ী নয়, আসছে আবার চলে যাচ্ছে, সেই জিনিসের দিকে মন দিও না। যেমন জন্ম মৃত্যু, যার জন্ম হল তার মৃত্যু অবধারিত, তাই মৃত্যুতে

বিচলিত হয়ে মন খারাপ করো না। বিয়ে হচ্ছে ডিভোর্সও হতে পারে, ডিভোর্স যদি হয়ে যায় তাহলে মন খারাপ করো না। তুমি চাকরি পেয়েছে, এই চাকরিকেও একদিন তোমাকে বিদায় জানাতে হবে, তখন কিন্তু তুমি মন খারাপ করো না। সব কিছুতেই যদি তোমার মনে ক্রিয়া-বিক্রীয়া হতেই থাকে তাহলে কি হবে? কিছুই না, এই দ্বন্দ্বাত্মক জগতের মধ্যেই পড়ে থাকবে। কারণ সব জিনিসই হল মেপে নেওয়ার জিনিস, আর সেখানে পাঁচটা ইন্দ্রিয় গিয়ে পাঁচ রকমের স্পর্শ নিয়ে নিচ্ছে। বাচ্চাদের আধো আধো কথা কত মিষ্টি লাগে, কানে যেন মধু ঢেলে দিচ্ছে। এখানেও তাই, কর্ণেন্দ্রিয় গিয়ে ওই শব্দগুলিকে মেপে নিচ্ছে।

এভাবেই সব রকমের অনুভূতি হচ্ছে, *শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ*, শীত আর উষ্ণ দিয়ে আমাদের যত রকম অনুভূতি হতে পারে আর *সুখদুঃখদাঃ* হল আমাদের প্রতিক্রিয়া। শীত আর উষ্ণ আমাকে আঘাত দিচ্ছে, ভালমন্দ সবটাই আমাকে এসে আঘাত করছে, সুখ আর দুঃখ হল ওই আঘাতের প্রতিক্রিয়া। মানুষের যত প্রতিক্রিয়া সুখ আর দুঃখ দিয়েই হয়। যেমন শীত, কখন ভাল লাগে, আবার কখন খারাপ লাগে। গরমের সময় এসি ঘরে থাকতে কত আরাম লাগে, আবার শীতকালে ঠাণ্ডা বেশী পড়লে বিরক্তি লাগে। শীত একটা নিরপেক্ষ বস্তু, নিজের মধ্যে সে খারাপও না, ভালও না, কিন্তু ওর প্রতি আমার প্রতিক্রিয়াটা কখন ভাল, কখন খারাপ। ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ যখনই হবে, তখন আমাদের মনে একটা ছাপ দেবে, সেই ছাপের জন্য মন আবার একটা প্রতিক্রিয়া করে। কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে? সুখ আর দুঃখ রূপে, আমার এটা ভাল লাগছে, আমার এটা খারাপ লাগছে।

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত, সন্ধি ভাঙলে হবে – *আগম-অপায়িনঃ অনিত্যাঃ তান্ তিতিক্ষস্ব*, এই জিনিসগুলো আসছে যাচ্ছে, এই আছে, এই চলে গেল, এগুলোর উৎপত্তি আছে আবার বিনাশও আছে, তাই অনিত্য। তাহলে কি করবে? *তিতিক্ষস্ব ভারত*, তুমি সহ্য কর। ধৈর্য ধরে রাখ, জানবে যেটা এসেছে, আবার সেটা চলে যাবে, কিছুই স্থায়ী না। কিছু কিছু থিয়োরী আছে, যেখানে বলে, this too shall pass, এটাও একদিন চলে যাবে, এই থিয়োরীটা ইদানিং খুব পপুলার হয়ে গেছে, অনেককেই এই কথা বলতে শোনা যায়। তার সাথে বলে, বেদান্তে আপনারা তো এটাই বলছেন? না, বেদান্তে আমরা তা বলছি না। আমরা বলছি, আপনি গঙ্গার তীরে বসে গঙ্গার শোভা দেখছেন। গঙ্গার জলে অনেক কিছু ভেসে যাচ্ছে, কখন কচুরিপানা ভেসে যাচ্ছে, কখন মরা কুকুর আবার কখন ফুল, ফুলের মালা ভেসে যাচ্ছে; আমরা বলি যাই ভেসে যাক, ওই দিকে কখন দৃষ্টিপাত করবেন না। কারণ কোন জিনিসই এই জগতে স্থায়ী না।

সংক্ষেপে এটাই বলা যেতে পারে, যখনই জগতের কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ পায়, তখনই শীতোষ্ণাদি রূপে অনুভূতি হয়; ঠাণ্ডা বা গরম শরীরের ত্বকে লাগার পর আমরা শীত বা উষ্ণ অনুভব করি। তেমনি বিভিন্ন রকম বস্তু থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের অনুভূতি আমাদের মনে যায়। মন সব সময় প্রতিক্রিয়া রূপে ওটাকে সুখ আর দুঃখ রূপে দেখে, রাগ ও দ্বেষ রূপে মনে করে। কিন্তু সবটাই অনিত্য, অস্থায়ী; ধৈর্য ধরে সব সহ্য কর। শরীর, মন, ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভূতি হচ্ছে সেটার দিকে কখন মন দিও না। যদি এইসব দ্বন্দ্বের দিকে মন দাও তাহলে তুমি সংসারের জাঁতাকলে পড়ে পিষে যাবে। তোমাকে অভ্যাস করতে হবে এইসব দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসা। তারপরের শ্লোকে ভগবান বলছেন, কে অমৃত লাভ করতে পারে, অমৃত লাভের অধিকারী কে?

এবারে ভগবানের যুক্তিগুলি পর পর দেখা যাক। প্রথমে বললেন, তোমার কথাগুলো বোকা বোকা, পরে বলছেন, ভীষ্ম, দ্রোণ এনারা আত্মা রূপে নিত্য। এরপর আর-একটা যুক্তি নিয়ে আসছেন জীবাত্মাকে নিয়ে, জীবাত্মা এই দেহ থেকে অন্য দেহে যাতায়াত করতে থাকে, সব সময় পাল্টে যাচ্ছে। এই দুটো যুক্তির পর নিয়ে আসছেন লৌকিক দৃষ্টি দিয়ে। সবারই জীবনে এই কষ্টগুলি আসে, সুখ যেমন আসে, দুঃখও তেমন আসে। কিন্তু এগুলো তোমার আসল স্বভাব না, সুখ-দুঃখ সব

মাত্রা আর স্পর্শ থেকে আসছে। ফিজিক্সের দিক দিয়ে দেখলে আমরা দেখছি এই কলমটা আছে, কলমের উপর আলো পড়ল, সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে পড়ল, আর আমরা দেখলাম এটা কলম। রাজযোগে পতঞ্জলি বলছেন, তত্ত্বের দৃষ্টিতে এটা কিন্তু দৃষ্টি হয় না। কারণ আমাদের চোখটা ক্যামেরা না, ক্যামেরার কোন বোধ হয় না, কিন্তু আমাদের বোধ হয়। কিভাবে বোধ হয়?

স্বামীজী রাজযোগে এটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোন বস্তুর অনুভূতি যখন আমাদের মনে যায়, তখন মন একটা প্রতিক্রিয়া ছুড়ে দেয়, এই প্রতিক্রিয়াটাই জ্ঞান। ট্রেনে বাসে করে যাওয়ার সময় জানালা দিয়ে বাইরে আমরা কত রকম দৃশ্য দেখতে থাকি, কিন্তু সব কিছু চোখে পড়ে না। কারণ আমাদের মস্তিষ্ক সব দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে না। প্রতিক্রিয়া যখন ছুঁড়ছে, তখনই জ্ঞান হয়। ওই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে যায় রাগ ও দ্বেষ, জ্ঞানের সাথে এই দুটো জুড়ে থাকে। ভগবান অর্জুনকে বলছে, ভীষ্ম দ্রোণ থেকে যে তুমি আলাদা হয়ে যাচ্ছ, তাতে দুঃখ হতেই পারে, কিন্তু হে অর্জুন, তুমি ধৈর্য ধরো। তিনটে যুক্তি ভগবান দিচ্ছেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভীষ্ম দ্রোণের কোন দিন মৃত্যু হবে না। ধর্মের দৃষ্টিতে বা জীবাত্মার দৃষ্টিতে পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন হচ্ছে। এই দুটো যদি না মানতে চাও, তাহলে একেবারে জাগতিক দৃষ্টিতে দেখো, মাত্রা আর স্পর্শ থেকে সুখ ও দুঃখ রূপ যে প্রতিক্রিয়া, সবটাই *আগমাপায়িনঃ*, আসছে যাচ্ছে, অনিত্য; তাই সব ধৈর্য ধরে সহ্য কর। পরে অবশ্য ভগবান অন্য যুক্তিও নিয়ে আসবেন।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।।১৫।।

(হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সুখে দুঃখে অবিচলিত যে জ্ঞানী ব্যক্তিকে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব বিচলিতে করতে পারে না, অর্থাৎ আত্মার নিত্যত্ব-জ্ঞান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, তিনি অমৃতত্ব লাভের প্রকৃত অধিকারী।)

যিনি এই সুখ ও দুঃখকে সমান ভাবে গ্রহণ করে নেন, কোনটাতেই তিনি হর্ষিত বা ব্যাথিত হন না, এনারাই ঠিক ঠিক বুদ্ধিমান পুরুষ, ধীর পুরুষ। ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, একটা হাতি যদি ডোবাতে নামে, তখন ডোবাতে তোলপাড় হয়ে যায়, কিন্তু দীঘিতে নামলে বোঝাই যায় না, আর সমুদ্রে নামলে কোন প্রশ্নই নেই, কোথায় হাতি, কোথায় কি। আমরা হলাম ছোট্ট ডোবা, হাতি দূরে থাক, একটা ছাগলও যদি নামে জল তোলপাড় করতে শুরু করবে। সমুদ্রের মত হয়ে গেলে, হাজারটা হাতি নামলেও কিছু বোঝা যাবে না। ভগবান পর পর যত যুক্তি অর্জুনকে দিচ্ছেন, এগুলো কোনটাই ইমোশানাল কিছু না, একেবারে শুদ্ধ দর্শন নিয়ে বলছেন। বারো, তেরো আর চোদ্দ, তিনটে শ্লোকে ভগবান তিনটে স্তর থেকে বললেন। আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা দেহাভিমানী, আত্মা দেহ, তিনটে স্তর থেকে এনে দেখাচ্ছেন, কোনটাতেই তোমার শোক করা চলে না। তুমি যদি শোক মোহে অবসাদগ্রস্ত হও, আর যাই হোক, তুমি ধীর পুরুষ নও, তুমি বুদ্ধিমান পুরুষ নও। নিজেকে যদি তুমি বুদ্ধিমান মনে কর, ধীর মনে কর, শোক করা থেকে বিরত হও।

ভগবান এখানে এটাই বলতে চাইছেন যে, সুখে আর দুঃখে যাঁর সমান দৃষ্টি, শীত আর উষ্ণতায় কখনই বিচলিত হন না, এই ধরণের পুরুষরাই অমৃততত্ত্ব লাভ করতে পারেন। যিনি মহাপুরুষ, যিনি ঋষি তাঁরও কষ্ট হয়, কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক, আবার আনন্দের জিনিসকে যে তিনি ভোগ করেন না তা নয়, খুবই উপভোগ করেন। তাঁকেও যদি ভালো খাবার দেওয়া হয়, ভালো কাপড় দেওয়া হয়, ভালো সুখ স্বাছন্দ্য দেওয়া হয়, তাঁরও সেটা ভালো লাগবে, তাঁকে যদি কটূ কথা কেউ বলে, তাঁরও খারাপ লাগবে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের যে মূল কেন্দ্রে তিনি অবস্থান করে আছেন সেখান থেকে তাঁকে কখন টলান যাবেন না, সুখ দুঃখ যেটাই আসুক, তিনি জানেন ওটা আসবে আবার ক্ষণিকের মধ্যে চলে যাবে। একটু নড়ে উঠবেন, কিন্তু বিচলিত হয়ে যাবেন না। সুখ এলে তিনি কখনই চেষ্টা করবেন না কিভাবে এই সুখকে ধরে রাখা যায়। আবার খারাপ কিছু হয়ে গেল,

তখনও তিনি বাবাগো মাগো বলে অস্থির হয়ে পড়বেন না, ও এসেছে আবার চলে যাবে, এই ভাব নিয়ে ঐদিকে মন দেবেন না, একটু কষ্ট হবে ব্যস্ ঐটুকুই। এনারা মনটাকে কখন এগুলোতে ফেলে রাখেন না, মনটা তাঁর সব সময় অমৃততত্ত্বে দিয়ে রাখেন, আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে মন আর কোথাও যাবে না। এরপর ষোল নম্বর শ্লোক, এই শ্লোকটি দর্শনের দিক থেকে অত্যন্ত উচ্চমানের।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।১৬।।

(প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর হলেও শীতোষ্ণাদি উৎপত্তি-বিনাশশীল বলে অসৎ। এদের পারমার্থিক অস্তিত্ব নেই। কিন্তু আত্মার পারমার্থিক সত্তা আছে। আত্মা অজ্ঞদের অবিজ্ঞাত হলেও আত্মার কখনও অনস্তিত্ব হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎ উভয়ের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন।)

ভগবান এর আগে তিনটে দর্শনকে এনে অর্জুনকে দেখালেন, কেন তোমার শোক করা উচিৎ নয়। প্রথম দর্শন, আত্মা সর্বব্যাপী; দ্বিতীয় দর্শন, জীবাত্মা দেহ থেকে দেহে যাচ্ছে; তৃতীয় দর্শনে বলছেন, যদি মনে কর দেহটাই আত্মা, তাতেও তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই। কারণ এগুলো সবই *মাত্রাস্পর্শাস্তু*, ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুর সংযোগে এই রকম হয়েছে, এতে মন খারাপের কিছু নেই। এগারো নম্বর শ্লোকে বললেন, যেটাকে নিয়ে শোক করার নয়, সেটাকে নিয়ে তুমি শোক করছ, তারপরেও তুমি নিজেকে একজন পণ্ডিত মনে করছ। এই পুরো জিনিসটাকে এবার ভগবান একটা দার্শনিক ভিত্তি দিচ্ছেন। একটা দার্শনিক ভিত্তিকে আমরা ব্যাখ্যা করলাম, আত্মাকে যদি সর্বব্যাপী রূপে দেখা হয়, তাহলে শোক করার কিছু নেই, কারণ সর্বব্যাপী হলে মারা যাওয়ার কোন প্রশ্নই হতে পারে না, সুতরাং যুদ্ধে কেউ মারা যাচ্ছে না। আর যদি আত্মাকে এইভাবে তুমি দেখ, আত্মা দেহ থেকে দেহে যাচ্ছেন, তাহলেও মৃত্যুতে শোক করার কিছু নেই, কারণ সে তো কোন না কোন দেহে আছেই। আর যদি মনে কর দেহটাই শেষ কথা, মরে গেলেই সব শেষ, তাতেও তোমার শোক করার কিছু নেই, কারণ শেষে দেখা যায় এগুলো সব ইন্দ্রিয় আর বস্তুর সংযোগ। এগুলো আমরা আগে ব্যাখ্যা করে নিয়েছি।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই ষোল নম্বর শ্লোক বেদান্তকে প্রতিষ্ঠিত করে। সেইজন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, শ্লোকের মর্মার্থ বুঝতে হয়ত আমাদের খুবই কঠিন মনে হবে, কিন্তু শুনে রাখা খুব দরকার। কারণ এই শ্লোক দেখিয়ে দিচ্ছে, আমাদের পূর্বজ ঋষিরা কত উচ্চস্তরে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। ওনারা সত্যকে কিভাবে দেখেছিলেন, এগুলোকে আমাদের সবারই জেনে রাখা দরকার।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ, খুব সহজ কথা। যেটা অসৎ বস্তু, সেটার কোন ভাব হয় না, অর্থাৎ উৎপন্ন হয় না, কখন তার অস্তিত্ব হয় না। আর যেটা সৎ বস্তু সেটার কখন অভাব হয় না, অভাবে মানে নাশ হয় না। আমার জীবন থেকে কেউ চলে গেল, জীবন থেকে কিছু চলে গেল, তখন প্রায়ই অনেককে এই কথা বলতে শোনা যায় –ও যদি তোমার থাকত, তাহলে তোমার কাছেই থাকত। কোন জিনিস চুরি হয়ে গেলে বলবে, ওটা যদি তোমার জিনিস হত, তোমার কাছেই থাকত; তোমার নয়, let go। কিন্তু এর পিছনে একটা গভীর তত্ত্ব রয়েছে। বলছেন, অসৎ বস্তুর কখন অস্তিত্ব হয় না, এখানে অস্তিত্ব না বলে বলছেন ভাব হয় না। ভাব মানে হওয়া, সৎ বস্তুর কখন অভাব হয় না, তার মানে কখন নাশ হয় না। যেটা আছে সেটা সব সময় থাকবে, যেটা নেই সেটা কখনই থাকবে না। এর উলটো, যদি কোন জিনিস চলে যায়, তার মানে ওটা আদপেই ছিল না। আর যদি মনে করি কোন জিনিস আছে, ওটা কোন দিন যাবে না। এই কথা এমনি শুনলে মনে হবে, বাঃ কি সুন্দর কথা। একটা জিনিস, যেটা নাশ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে ওটার অস্তিত্ব কখন ছিলই না। আর যদি মনে করি, এই জিনিসটা আছে, তার মানে এর কোন দিন নাশ হবে না। ঘুরিয়ে একটাই কথা আসে, নাশবান বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই, আর যার অস্তিত্ব আছে তার কখন নাশ

হয় না। অত্যন্ত সাধারণ কথা, না বোঝার কিছু নেই। আমার পকেটে এই কলমটা আছে, এই কলম যদি নাশবান হয়, তার মানে এই কলমটা কখনই ছিল না। আমাদের কাছে এটা কি যুক্তিতে দাঁড়াবে? আমরা জানি কলমটা একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। বেদান্ত বলবে, না, কলমটা কখন ছিলই না। কারণ এই কলমের জন্ম হয়েছে, একদিন এর বিনাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য আসলে এর অস্তিত্ব কখন ছিল না।

এখন আমার হাতে যেটা দেখছি এটাকে নিয়ে আপনি আলোচনা করুন। এখন তুমি যেটা হাতে দেখছ, এটা তোমার বুদ্ধিবৃত্তি; তোমার মনের একটা বৃত্তির বাইরে আর কিছু না। এই জায়গাতে এসে জিনিসটা বুঝতে বা ধারণা করতে কঠিন লাগবে, লাগাটাই স্বাভাবিক। সহজেই যদি গীতা বুঝতে হয়, তাহলে আমাদের তো এক কথায় বলেই দেওয়া হল। কি বলে দেওয়া হল? যে জিনিসটা আছে, ওটার কখনই নাশ হয় না। যদি জিনিসটা চলে গিয়ে থাকে, তাহলে ওটার কোন কালেই অস্তিত্ব ছিল না। এই জায়গাতে আচার্য খুব ছোট্ট একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বেদান্ত দর্শন এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

খুব সংক্ষেপে আমাদের আগে বুঝতে হবে হঠাৎ এই শ্লোকটাকে কেন আনা হয়েছে। তার সাথে মনে রাখতে হবে হিন্দুদের দর্শন, ধর্ম দর্শন না, হিন্দুদের পুরো দর্শন এই শ্লোকের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেইজন্য বলা হয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল নম্বর শ্লোক গীতার প্রাণ। হিন্দুদের যত উচ্চ চিন্তন আছে, এই শ্লোক তার প্রাণ। কোন কিছুকে জানার প্রক্রিয়াকে বলা হয় দর্শন, দর্শন মানেই তাই, জিনিসটাকে জানা।

পাশ্চাত্য দর্শনের বৈশিষ্ট্য হল, যখনই পাশ্চাত্যের কোন দর্শনের কথা বলা হয় তখন ওনারা সেই দর্শনের আগে একটা নাম নিয়ে আসেন, তারপর বলা হবে অমুকের দর্শন, যেমন বলা হয়, philosophy of Hegel, philosophy of Kant, philosophy of Plato ইত্যাদি। যাঁরা ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে পড়েছেন, বা যাঁরা ফিলজফি একটু জানেন, তাঁরা এই জিনিসটা অবশ্যই জেনে থাকবেন। হিন্দুরা বলেন, যখনই কোন নাম লাগিয়ে দেওয়া হল, তার মানে এটা তাঁর বুদ্ধির কথা। প্লেটো, এ্যারিস্টটল, কান্ট, হেগেল যত বড় মেধাবীই হন, যত বড় পণ্ডিত হয়ে থাকুন, এই ফিলজফি তাঁর বুদ্ধি থেকেই আসছে। বুদ্ধি সব সময় দূষিত হতে বাধ্য। যিনি যত উচ্চ চিন্তনই দিয়ে থাকুন, তিনি কান্টই দিয়ে থাকুন আর হেগেলই দিয়ে থাকুন, যাঁরাই বুদ্ধিকে মাধ্যম করে কিছু দিয়ে যাচ্ছেন, হিন্দুরা কখনই তাঁদের কথাকে শেষ কথা বলে মনে করবে না। হিন্দুরা যখনই জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন, তখন তাঁরা জ্ঞানের দুটো অঙ্গ একেবারে স্পষ্ট করে দেন, একটা হল শেষ কথা, আরেকটা সাধারণ চলিত কথা। সাধারণ চলিত কথা নিয়ে আমরা যত খুশী মারামারি করতে পারি, এতে ওনাদের কোন আপত্তি নেই। শেষ কথাকে নিয়ে তাঁরা বলবেন, তোমার বুদ্ধিকে আমি ভরসা করতে পারব না। কারণ আজ তোমার এক রকম বুদ্ধি, আগামীকাল তোমার বুদ্ধি আর-এক রকম থাকবে। আর আজকে তোমার যা বুদ্ধি আছে, আগামীকাল তোমার থেকে আরও ভালো বুদ্ধি নিয়ে আর-একজন আসবে, সে তোমার বুদ্ধিকে কেটে উড়িয়ে দেবে। তুমি কি সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছ? যদি সত্যকে প্রত্যক্ষ করে না থাক, তাহলে তোমার কথার কোন দাম নেই।

এখন কেউ এসে যদি দাবী করে বলে, আমি সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছি; কি করে বুঝব যে তিনি আদৌ সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন কিনা, নাকি মিথ্যা বলছেন? হিন্দুরা এখানে স্পষ্ট করে বলে দেন কিভাবে আমি বুঝব যে, তিনি সত্যকে আদৌ প্রত্যক্ষ করেছেন, নাকি করেননি। বেদে যত মন্ত্র আছে, হিন্দুরা বেদের সব মন্ত্রকে সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করেন, কারণ ঋষিরা ওই মন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষ করেছেন। আমরা যেমন কথামৃতকে সত্য বলে গ্রহণ করি, কারণ আমরা জানি ঠাকুর এগুলোকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যারা ঠাকুরের ভাবকে মানে না, তারা বলবে, ঠাকুরের কথাগুলো ভাল, কিন্তু শেষ

সত্য বলে আমরা মানি না। তেমনি বেদকেও সবাই সত্য বলে মনে করে না। বেদকে যারা সত্য বলে মনে করে না, তারা অহিন্দু। যেমন ভগবান বুদ্ধ, তিনি বেদকে শেষ সত্য বলে মানলেন না, তিনি আলাদা হয়ে গেলেন। জৈনরা বেদকে মানল না, আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মের ব্যাপারে বেদ হল শেষ কথা। হিন্দুদের যাবতীয় যত শাস্ত্র বা গ্রন্থ আছে, হিন্দুদের যত ঋষি, সাধু, মহাত্মা হয়েছেন, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ, এমনকি স্বামী বিবেকানন্দ, এনাদের সবারই শব্দগুলি বেদকে আধার করে।

বেদ হল এক বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার। এখন প্রশ্ন, এই বিশাল বেদ কি বলতে চাইছেন? বেদের মূল বক্তব্য কি? কারণ বেদ যে জিনিসগুলি অপরোক্ষ, সেই জিনিসগুলিকে নিয়ে বর্ণনা করছেন। ঈশ্বরকে নিয়ে বলছেন, স্বর্গ নিয়ে বলছেন, জন্মমৃত্যুকে নিয়ে বলছেন, কিন্তু কোথাও কোথাও আমরা যেন বুঝতে পারি না। তখনকার দিনে যে বড় বড় ঋষিরা ছিলেন, সত্যিকারের বড় ঋষি, আমরা যাতে বেদ বুঝতে পারি তাঁরা সেভাবেই বেদকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন, তাঁরা বলে দিলেন, আমরা বেদকে এই ভাবে বুঝলাম। সেটাকে তাঁরা নাম দিলেন দর্শন। তার মানে বেদের দর্শন বলে কিছু হয় না, উপনিষদেরও কোন দর্শন হয় না। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা, যাঁরা বেদ, উপনিষদকে নিয়ে গ্রন্থাদি লিখেছেন, তাঁরা সেখানে বলছেন, Philosophy of Veda, Philosophy of Upanishad, কিন্তু এভাবে কখন হয় না। কারণ বেদ উপনিষদের কথাগুলো হল সত্য। আগামীকাল যদি কেউ বলে Philosophy of Sri Ramakrishna, এই জিনিস কখনই হবে না। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের সবটাই প্রত্যক্ষ। কিন্তু যিনি উপনিষদের মন্ত্রের, ঠাকুরের কথার ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছেন, তখন ওই ব্যাখ্যাটা হয়ে যাবে ফিলজফি। এরপর তাঁকে প্রশ্ন করা হবে, আপনি কিসের উপর আধার করে এই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন? উনি বলবেন, আমার আধার বেদ। আমি বলতে পারি, আমি বেদ মানি না। তখন ওনারা এটাই করবেন, যে অংশগুলি বেদের বাইরে, সেটাকে নিয়েই একটু আলোচনা করে দেখিয়ে দেবেন আপনি কিভাবে ভুল।

বেদকে আধার করে ভারতে ছয়টি দর্শন হয়েছে, একত্রে বলা হয় ষড়দর্শন। এর মধ্যে নামকরা দর্শন হল বেদান্ত। কিন্তু ছটি দর্শনেরই নিজস্ব দাম আছে। সাংখ্য আর যোগ এই দুটি দর্শন হল খুব প্রাচীন দর্শন। ন্যায় ও বৈশাষিক এই দুটি আর মীমাংসা ও বেদান্ত, সব মিলে এই ছটি দর্শন। ছটি দর্শনেরই দাম আছে। যোগ সম্বন্ধীয় আমরা যা কিছু শুনে থাকি, সেগুলো এসেছে যোগদর্শন থেকে। ইদানিং ব্যাঙের ছাতার মত সংস্থা গজিয়ে উঠেছে, যেখানে নাক বন্ধ করে কিভাবে নিঃশ্বাস নিতে হবে, হাত উপরে কর, পা মাথার উপরে নিয়ে যাও, বিভিন্ন রকমের যোগাভ্যাসের শিক্ষা দিচ্ছে। মূলতঃ এগুলো সব হঠযোগ, এদের আমরা কাউন্টিংএ নিই না।

রাজযোগ হল পুরোপুরি মনকে নিয়ে। সত্য কি, অবিদ্যা-বিদ্যা কি ইত্যাদি রাজযোগের যে তত্ত্বকথা, এগুলো ওনারা বেদ থেকে নেন, সাংখ্য দর্শনও তাই করে। ন্যায় দর্শন পুরো লজিক দিয়ে চলে, আর বৈশাষিক লজিককে আরও নিজের মত রিফাইন করে। কিন্তু বৈশাষিক, ধীরে ধীরে তার গ্রহণযোগ্যতা কমে গেল, থেকে গেল ন্যায়। সাংখ্য দর্শন সব দর্শনের জনক। কিন্তু পরে সাংখ্য দর্শনও ধীরে ধীরে তার জনপ্রিয়তাটা হারিয়ে ফেলে, যদিও সাংখ্য দর্শনের অনেক কিছু পরে যোগ আর বেদান্ত নিয়ে নেওয়ার ফলে, সাংখ্যের জিনিসগুলো থেকে গেল। মীমাংসা বেশী জোর দেয় বেদের কর্মকাণ্ডের উপর, তার সাথে স্বর্গ, দেবতা; পরে হিন্দুদের যত আচার উপাচার পালন করা হয়, এগুলো সব মীমাংসা থেকে এসেছে।

কিন্তু হিন্দুদের মূল দর্শন বেদান্ত থেকে আসে। আচার্য শঙ্কর বা রামানুজরা যখন বেদ, উপনিষদের ভাষ্য রচনা করলেন, এনারা সবাই ওই ছয়টি দর্শন থেকে কিছু কিছু কথা নিয়েছেন। তার মানে, তাঁরা এই ষড়দর্শনকে মানছেন। আবার অনেক জায়গায় আক্রমণও করেছেন, এটা

দেখানোর জন্য যে, তোমার দর্শনে ত্রুটি আছে। ত্রুটি থাকা মানে, এটা শেষ কথা হতে পারে না। কয়েকবার আমরা এই কথা বলেছি, সমস্ত দর্শনের কাজ হল, জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এই তিনটেকে পরিভাষিত করা। এই ছটি দর্শনই জীব, জগৎ আর ঈশ্বরকে নিজের মত পরিভাষিত করেন। আর এখনও যাঁরা দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাঁদের ছটা দর্শনই পড়তে হয়।

আমরা আলোচনা করছি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল নম্বর শ্লোক, যেখানে বলছেন, অসতের জন্ম হয় না, সৎএর নাশ হয় না। তার মানে আপনি সৃষ্টি আর নাশের কথা বলছেন, সৃষ্টি আর নাশের কথা বলা মানেই হল জীব আর জগতের ব্যাপারে বলা, ঈশ্বরের তো সৃষ্টিও হতে পারে না, নাশও হতে পারে না। সৃষ্টি আর নাশ জীব আর জগতেরই হবে, খুব হলে জগতের হবে। তার মানে এখানে জগৎকে ব্যাখ্যা করছেন। সৎ ও অসৎকে নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব, তার আগে আমরা এর দর্শনটা দেখে নিচ্ছি।

হিন্দুদের সৃষ্টিতত্ত্বে একটা নামকরা ফিলজফি হল, বিবর্তবাদ। বিবর্তবাদ আবার বেদান্তের মত। এর ঠিক ভাই হল পরিণামবাদ। আর এই দুটোরই মা হল সৎকার্যবাদ। শুরু হয় সৎকার্যবাদ থেকে, পরে দুটোই বিভক্ত হয়ে যায় বিবর্তনবাদ আর পরিণামবাদে। সৎকার্য বাদ হল, আমরা যে কোন বস্তু দেখছি, সেই বস্তুর কার্য আগে থেকেই কারণের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা যে ঘট দেখছি, ঘট আগে থেকেই মাটিতে আছে, এটাকে বলে সৎকার্যবাদ। বিভিন্ন দর্শন সৃষ্টিতত্ত্বকে বিভিন্ন ভাবে বলেন, কিন্তু আমাদের এখানে সৎকার্যবাদ থেকেই সৃষ্টিতত্ত্ব শুরু হয়। সৎকার্যবাদে আবার দুটো দর্শন এসে যায়, একটা বিবর্তনবাদ আরেকটা পরিণামবাদ।

পরিণামবাদে বলেন, যে পরিবর্তনগুলি হয় সেটা বাস্তবিক। আমরা যেমন জানি এবং দেখছিও, দুধ থেকে দই হল, এটা বাস্তবিক হচ্ছে। দই আর কোন দিন দুধ হতে পারবে না। বেদান্ত এটাকে পরিণামবাদ না বলে বলছেন বিবর্তবাদ। বিবর্তবাদ বলছে, এই পরিবর্তনটা বাস্তবিক পরিবর্তন নয়, এই পরিবর্তনটা উপরে উপরে। কেন এই রকম বলছেন, এটা না বুঝলে ষোল নম্বর শ্লোকটা বোঝা যাবে না।

আমরা জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের কথা বললাম। প্রথমে এনারা ধরবেন, ঈশ্বর যদি সত্য হন এবং তার সাথে এনার্জি যদি সত্য হয়, অর্থাৎ এনার্জি একটা আলাদা সত্তা, আর এটাই সাংখ্য দর্শনের বলিষ্ঠ মত। সাংখ্য ছাড়া আরও অনেকে মনে করে দুটো সত্তা আছে, এটাকেই বলে দ্বৈতবাদ। দুটো যদি সত্য হয়, যেমন সাংখ্য আর যোগ বলছে, যেখানেই এই প্রসঙ্গ আসবে সেখানে বলবে পুরুষ আর প্রকৃতি দুটোই স্বাধীন। আমরা ফিলজফিকে ছেড়ে দিয়ে ধরে নিচ্ছি এই জগৎ আছে আর ঈশ্বর আছেন। আমাদের মোটা বুদ্ধিতে যেমন মনে করি, ভগবান বিষ্ণু আছেন বা শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন আর এই জগৎ আছে। এই জগৎ কি ঠাকুর থেকে আলাদা? এই জগতের কি বাস্তবিক অস্তিত্ব রয়েছে?

ইদানিং কালে একটা নূতন শব্দ এসেছে, বলছেন স্পেস। কোন পুরুষ একজন নারীকে ভালবাসে, বা বিয়ে করেছে, করার পর পুরুষ নারীকে বলবে, তুমি আমাকে স্পেস দাও না। স্পেস না দেওয়া মানে, তুমি আলাদা আমি আলাদা, দুটো পৃথক স্বাধীন সত্তা। আবার অনেকে আছে যারা বলছে, আমি আর তুমি মিলে এক হয়ে গেছি। ঈশ্বর আর জগৎ যদি দুটো আলাদা স্বাধীন সত্তা হয়, তাহলে জগৎ নিজের স্পেস চাইবে, তার মানে ঈশ্বর অসীম ক্ষমতাবান নয়। কারণ তাঁর স্পেস দরকার। দুটো আলাদা সত্তা হয়ে গেল। কারণ সে নিজের স্পেস চাইছে, সে বলছে, আমি স্বাধীন সত্তা, আমি আমার মত চলব, ঈশ্বরের ইচ্ছা মত চলব না। যেমনি আমরা স্বাধীন সত্তা শব্দ নিয়ে আসছি, তার মানে সে স্বাধীন, তেমনি সে নিজের মত চলবে। যদি সে নিজের মত চলে, তার মানে

তার উপর ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণ নেই। আর ঈশ্বরের যদি তার উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে, সেই ঈশ্বর আবার কিসের ঈশ্বর!

বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তেরই একটা মত, রামানুজ যার প্রবক্তা, তাতে বলছেন এই জগৎ ঈশ্বরেরই একটা অংশ। বেদের পুরুষসূক্তমেও এই রকম বলছেন, ভগবান নিজের শরীর থেকেই এই সৃষ্টি করেছেন, উপনিষদেও এই রকম আসে। কিন্তু সেখানে আচার্যের শঙ্করের ব্যাখ্যাতে পরিষ্কার আছে, জগৎ যদি ঈশ্বরেরই একটা অংশ হয়ে থাকে, যেমন আমরা জানি এই কলমটা একটা জড় বস্তু, এতে কোন সন্দেহ নেই। জগৎটা জানি জড়, তাহলে এই দাঁড়ায় যে, ভগবান কিছুটা হলেন চৈতন্য আর কিছুটা জড়। এটা কি ধরণের ভগবান! আবার অন্য দিকে, জড় আর চৈতন্যের ঝামেলাটা মেটানোর জন্য যদি বলা হয়, পুরো সৃষ্টিটাই যদি ঈশ্বর হন, তাহলে ঈশ্বর বলে কেউ আর থাকবেন না, যেটা জড়বাদী, ভৌতিকবাদীরা বলেন। ফিজিক্সে যেমন বলা হয়, জগৎই শেষ কথা, জগৎই আছে, জগতের বাইরে কিছু নেই; এরপর ঈশ্বরের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে বেদ, বেদের দর্শন, বেদের ঋষি বলে কিছুই থাকল না। তাহলে বেদান্ত যুক্তিতে কিভাবে এটাকে দাঁড় করাল? এরপর আমরা এটাই দেখব।

আচার্য দেখাবেন দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত সব অদ্বৈত বেদান্তের মধ্যে রয়েছে; দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত বেদান্তেরই ছোট অংশ। অদ্বৈত বেদান্ত প্রথমে দেখালো, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশাষিক, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, তোমাদের এই মতগুলো হল সীমিত। এটা যুক্তিতে দাঁড়ায় না। এরপর আচার্য বাকিদের ধরবেন, নাস্তিকদের ধরবেন, চার্বাকদের ধরবেন, বৌদ্ধদের ধরবেন, সবাইকে ধরে ধরে দেখাবেন তোমাদের মত কেন ভুল। যার জন্য আজ ভারতবর্ষের সবচেয়ে উচ্চমানের দর্শন হল বেদান্ত। আচার্য সৃষ্টি কিভাবে হয় বোঝনর জন্য, এক এক করে যুক্তি দিচ্ছেন।

একটু আগে আমরা যে দই আর দুধের কথা বললাম, দই আর দুধটা কোন ব্যাপার নয়, যেটা পরে আমরা দেখব, কারণ আমরা দুধ আর দই নিয়ে কথা বলছি না, বলছি শেষ কথা নিয়ে। বলছেন, যার অস্তিত্ব নেই, যাকে অসৎ বলছি, যদি বলি একটা জিনিস নেই, আসলেই নেই; অসৎ থেকে যদি কিছু বেরিয়ে আসতে পারত, তাহলে আমি আপনি পাথর, বালি থেকেও বেরিয়ে আসতে পারতাম। বালি থেকে তেল পাওয়া যায় না, তেল আসে সরষে, তিসি ইত্যাদির বীজ থেকে। তার মানে তেল আগে থেকেই সরষেতে রয়েছে, সেইজন্য সরষে থেকে তেল আসছে। এনারা সাধারণ স্তর থেকে কথা বলছেন না, খুব উচ্চস্তর থেকে বলছেন।

প্রথম যুক্তি আনছেন, অস্তিত্ববিহীন কোন বস্তুর যদি সত্তা এসে যায়, তার মানে তার অস্তিত্ব যদি এসে যায়, তাহলে কিন্তু আমরা যে কোন বস্তু থেকে যে কোন বস্তু বার করে দিতে পারব। জাদুকর জাদু দেখাতে গিয়ে একটা রুমাল থেকে কত রকম জিনিস বার করে দেয়। আমরাও তো জীবনে এই ভাবে অনেক কিছু বার করতে চাই, কিন্তু কিছুতেই বার হয় না। তাহলে প্রথম কথা হল, কিছু জিনিস থেকে কিছু বিশেষ জিনিস বেরোবে। দই যদি বার করতে হয় তাহলে দুধ থেকেই বার করতে হবে, জল থেকে বার করা যাবে না। তার মানে কোন না কোন ভাবে দই আগে থেকেই দুধে আছে বলেই দই বের হচ্ছে, অত্যন্ত সহজ যুক্তি। কিভাবে আগে থেকেই আছে আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু যে কোন জিনিস যেখান থেকে খুশী বেরিয়ে আসতে পারত, তাহলে জল থেকেও দই বেরিয়ে আসত। একটু গভীরে গিয়ে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাওয়া যায় যে, কিছু পরিবর্তন বাদে কার্য ও কারণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যেমন মাটি ও পাত্র, যখন মাটি থেকে পাত্র তৈরী করা হয়, তখন আসলে দুটোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ কার্য যেটা হবে বা হচ্ছে, সেটা কারণের মধ্যে আগে থেকেই ঢুকে আছে; যেমন বলা হল, ঘট মাটি থেকে বেরিয়ে আসছে। সাংখ্যবাদীরা এই জায়গাতে বলবেন, কুম্ভকার নিজের দক্ষতা, কুশলতা ওর মধ্যে লাগাচ্ছে,

পরিশ্রম করছে বলেই মাটি থেকে ঘট বেরিয়ে আসছে। এনারা বলবেন, সেটাই যদি সত্য হত, তাহলে পাথর থেকেও ঘট বেরিয়ে আসত। ঘট মাটির মধ্যে আগে থেকে আছে বলেই, ঘট বেরোতে পেরেছে। সেখান থেকে পরিণামবাদ আর বিবর্তবাদ আলাদা হতে শুরু করল। সাংখ্যের যে পরিণামবাদ, মাটি ঘটে পরিবর্তন হল, বেদান্তীরা বলছেন, এটা সম্ভব না। কারণ ঘট যদি মাটিতে আগে থেকেই না থাকত, ওটা মাটিই যদি না থাকত, তাহলে ঘটগুলো পাথর থেকেও বেরিয়ে চলে আসতে পারত।

তাহলে দুধ থেকে যে দই হচ্ছে, এই দই জিনিসটা কি? বলছেন, যে কোন রূপ আমরা যেটা দেখি, যেমন একটা পাত্র দেখছি, এটা হচ্ছে একটা বস্তু, এটা হল তার একটা অবস্থার পরিবর্তন। কেমেস্ট্রিতে বলা হয়, physical change and chemical change। যেমন জল, কখন বরফ হয়ে যাচ্ছে, কখন বাষ্প হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওর chemical property সব সময় থাকবে H_2O। এনারা কিন্তু আরেক ধাপ এগিয়ে যান, এনারা বলেন দুধ যখন দই হয়ে যায়, যদিও এটা chemical change, কিন্তু এনারা বলবেন chemical change বটে কিন্তু substanceএ পালটায় না, আসল বস্তুটা পালটায় না, ঠিক তেমনি এই পরিবর্তনে আসল বস্তুটা পালটায় না। আসল বস্তু আগে থেকেই ছিল, আর যখন ছিল তখন মিলে মিশে এক হয়ে ছিল। সেইজন্য কার্য ও কারণ কোন পরিস্থিতিতেই আলাদা কিছু হতে পারে না। বলছেন, যদি আলাদা থাকত, দুধ আর দই আসলে যদি আলাদা থাকত, আলাদা হওয়ার জন্য এই দুটোর সংযোগ করতে হলে একজন ঘটক লাগবে, যার জন্য একটা তৃতীয় জিনিসকে নিয়ে আসতে হবে।

যদি স্বভাবে আলাদা হত, যেমন বালি আর তেল স্বভাবে আলাদা, দুটোর সংযোগ হয় না। আমরা যদি বলি, সরষে আর তেল যদি সত্যিকারের আলাদা থাকত, তাহলে এই যে সরষের মধ্যে তেলকে ঢুকিয়ে রেখেছে, যেখানে আমরা তেলকে দেখতে পাচ্ছি না, সরষেকে দেখছি; তাহলে তৃতীয় কিছু লেগেছে দুটোকে জোড়ার জন্য। আমরা যে আঠা ব্যবহার করি, দুটো আলাদা জিনিসকে জোড়ার জন্য আঠা লাগাতে হচ্ছে। তার মানে তৃতীয় একটা শক্তি লাগছে। এই তৃতীয় শক্তি যেটা আসবে, সেটাকে এই দুটোর সমান হতে হবে; তার সাথে কিছু তফাৎ থাকতে হবে, নাহলে দুটো এক হয়ে যাবে। ঐটাকে করার জন্য একটা চতুর্থ জিনিস লাগবে। ওটাকে জোড়ার জন্য আরেকটা পঞ্চম জিনিস লাগবে, যুক্তিতে এটাকে বলে অনবস্থাদোষ। অনবস্থাদোষ মানে, একটা থেকে আরেকটা, সেটা থেকে আরেকটা, এইভাবে চলছে তো চলছেই, কোথাও শেষ হবে না। যুক্তিতে এই ধরণের অবস্থাকে মানা হয় না।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটা খুব সুন্দর ঘটনা আছে, বাচ্চারা কাহিনী শুনে শুনে জগতের ব্যাপারে একটা ধারণা করে নেয়। এই জিনিস অনেক বড় বড় নেতাদের মধ্যেও দেখা যায়, হঠাৎ দুম্ করে একটা কথা বলে দিল, গরুকে নিয়ে, গরুর দুধকে নিয়ে, গোবরকে নিয়ে, গোমুত্রকে নিয়ে; বাচ্চা বয়সে কিছু শুনেছে সেটা আজও তার কাছে সত্য হয়ে আছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল, এক জায়গায় একটা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর বয়স কম। একজন বৃদ্ধা মহিলা সামনের সারিতে বসে খুব মন দিয়ে শুনে যাচ্ছেন। রাসেল সৃষ্টি, জগৎ, কসমস এই জিনিসগুলোকে নিয়ে বলছিলেন। বক্তৃতার শেষে ওই বৃদ্ধা মহিলা উঠে বলছেন, 'ইয়ং ম্যান তুমি খুব ভাল বলো, কিন্তু তুমি যা কিছু বলেছ সব বকওয়াস। এই পৃথিবীটা আসলে একটা কচ্ছপের উপরে স্থির হয়ে আছে'। বার্ট্রাণ্ড রাসেল সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই কচ্ছপটা কোথায় আছে'? মহিলা তখন হেসে বলছেন, 'আমি বুঝতে পারছি, তুমি খুব ইন্টেলিজেন্ট। ওই কচ্ছপটা আরেকটা কচ্ছপের পিঠে আছে, সেই কচ্ছপটা আরেকটা কচ্ছপের উপর আছে, ওই কচ্ছপটা আরেকটা কচ্ছপের উপরে'। 'কতদূর পর্যন্ত'? 'যত দূর তুমি যাবে tortoise is all the way'। পুরাণে আছে, খুঁজতে খুঁজতে পাতাল লোকে গিয়ে দেখছেন সেখানে হাতিগুলো পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। সেই হাতিগুলো কোথায় আছে? এগুলো হল বাচ্চাদের কাহিনী,

বোঝানর জন্য বলা হয়, সেটাকে একটা ধর্মীয় ভাবের দিকে মোর ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যখন যুক্তিতে যাবে, তখন পুরোটাই যুক্তিতে চলবে।

দুধ আর দই যদি পুরোপুরি আলাদা হয়, তাহলে দুটোকে জুড়ে দেবার জন্য তৃতীয় একটা জিনিস লাগবে। আমরা বলতে পারি ব্যাক্টেরিয়া জুড়ছে। না, ব্যাক্টেরিয়া জোড়ে না, এটা হল আসল substanceটা যদি পুরোপুরি আলাদা থাকে, qualitatively যদি ভিতর থেকে আলাদা থাকে। আমাদের সমস্যা হল, আমরা মনে করি হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আলাদা। ইলেক্ট্রিসিটি পাস করলে জল হয়ে যায়, আসলে আলাদা নয়। আজ থেকে দুশো বছর আগে লোকেরা হয়ত মনেও করতে পারত, কিন্তু যখন পিরিয়ডিক টেবিল এসে গেল, আর তার উপর যখন structure of atom এসে গেল, তখন দেখলেন আসলে সবটাই হল ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন যখন হয়, তখন ওদের ইলেক্ট্রন প্রোটন এক অপরকে ছাড়ে, এক অপরের সাথে জুড়ে যায় বলে ওটা জুড়ে যাচ্ছে। তার মানে দুটোর মধ্যে কমন জিনিস রয়েছে, তা হল ইলেক্ট্রন প্রোটন। তা নাহলে এটা কখনই সম্ভব হত না।

একটা তৃতীয় জিনিস যদি নিয়ে আসা হয়, তাহলে আরেকটা চতুর্থ জিনিস লাগবে, ওই জিনিসটাকে জোড়ার জন্য আরেকটা পঞ্চম জিনিস লাগবে, এভাবে চলতেই থাকবে, কোথাও গিয়ে সমাধান হবে না। এটাকে বলে অনবস্থাদোষ। বেশীর ভাগ সময় আমরা তর্কবিতর্ক করার সময় অনবস্থাদোষে পড়ে যাই।

আচার্য বলছেন, একটা বস্তুর যেটা বাস্তব, ওই বাস্তব যে জিনিসটা, সেটাকে কোন ভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন সোনাকে আমরা কখনই পাল্টে দিতে পারি না, সোনা সব সময় সোনাই থাকবে। যদি পাল্টে দেওয়া হয় তাহলে ওটা আর সোনা থাকবে না, আসলে ওর মধ্যে আদপে সোনার ভাব কখনই ছিল না। অর্থ হল, অবস্থার পরিবর্তন হয়, কিন্তু তার ভিতরে যে জিনিসটা আছে, সেটার কখন পরিবর্তন হয় না। অবস্থার পরিবর্তনকে এনারা পুরোপুরি মানেন। আমরা চারিদিকে দেখছি শুধু পরিবর্তন আর পরিবর্তন। কিন্তু আসল জিনিসটা যেমন থাকার তেমন থাকে। খুব সহজ উপমা হল, সমুদ্র আর ঢেউ, সমুদ্র হল মূল, ঢেউ হল পরিবর্তন। পরিবর্তন সব সময় পাল্টাচ্ছে। দুধ দই হয়ে যাচ্ছে, এটা একটা পরিবর্তন, কিন্তু বস্তুর কোন পরিবর্তন হয় না।

আমরা তাহলে আসলে কি দেখছি? আমরা কোন কিছু যখন দেখি, তখন দুটো জিনিস দেখি। আমি এই কলমকে দেখছি, বেদান্ত বলবে, আমি দুটো জিনিস দেখছি, কিন্তু আমরা বলব একটা জিনিস দেখছি। একটা জিনিস হল কলম। আমি দেখছি কলম। বেদান্ত বলবে, তুমি শুধু কলম দেখছ না, দুটো জিনিস দেখছ –কলম আর কলমের অস্তিত্ব, মানে কলম আছে। আমরাও মুখে অত বলি না, কিন্তু মনে মনে কিন্তু ভাবছি কলমটা আছে। তার মানে আমার বুদ্ধি একই সাথে দুটো জিনিস দেখে, কলম আর কলমের অস্তিত্ব। আবার অনেক সময় অভাব দেখে। যেমন আমরা এখানে সবাই বসে আছি, এখানে হাতি নেই। যেমনি একজন কেউ বলে দিল, 'হাতি আছে', তখন আমরা দুটো জিনিসকে এক সঙ্গে বোধ করছি, হাতি আর হাতির অভাব। সেইজন্য অভাব যে দেখছি, এটাও আমার বোধের বস্তু। বোধ যখন হয় তখন দুটো জিনিস একসাথে হয়, হাতি আর হাতির অভাব, কলম আর কলমের অস্তিত্ব।

এখন কলমটাকে যদি খাপ থেকে আলাদা করে দিই, বা কলমটা আমার পকেটে চলে গেল। তখন বলছি কলমটা কোথায় গেল, বা খাপটা আছে, কলমটা নেই। এখন কলমটা নেই, কিন্তু আছে বোধটা থেকে যাচ্ছে। কোথায় থাকছে? এই খাপে। জগতের সব কলমকে যদি নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলেও কিন্তু খাপগুলো থেকে যাবে। আর খাপগুলোকেও যদি নষ্ট করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ সমস্ত

কলমকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেওয়া হয়, তখন অন্য বস্তুগুলো থাকবে। অন্য বস্তুগুলো যখন আছে, সেখানে 'আছে' এই বোধটা কিন্তু থেকেই যাবে; 'আছে' বোধটা কখনই যাবে না।

অস্তি বোধ আর বস্তু বোধ, এই দুটি বোধ সব সময় এক সঙ্গে চলে। মনে করা যাক একটা পদ্ম, যেটা ওনাদের খুব মনের মত উদাহরণ। একটা লাল পদ্ম নিলাম, লাল পদ্মে তিনটে বোধ একসাথে চলে, একটা চলে লাল, একটা পদ্ম, আরেকটা চলে অস্তি। ঠিক এই রকমই যে দুটো আসছে তা নয়, কারণ সেখানে লাল হল তার বিশেষণ বা গুণ। বস্তুর যে বোধ, লাল আর পদ্ম, দুটোরই বোধ আসে, তার সাথে অস্তি বোধটা রয়েছে। এবার যদি আমরা আস্তে আস্তে পিছনের দিকে যেতে শুরু করি, তখন দেখছি এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবটাকে এ্যটমসে ফেলে দেওয়া যায়। আর একটা অতি সাধারণ জ্ঞান হল, যা কিছু আমাদের এখানে আছে সবটাকে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, যেটা সূর্যের মূল জিনিস, সেখান থেকে আসছে। ওখান থেকেও ধীরে ধীরে নেমে এলে ইলেক্ট্রন প্রোটনে চলে যাচ্ছে, আর সেখান থেকে এখন ফিজিক্স বলছে, সব কিছু কোয়ার্ক। একটা একটা করে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বেসিক জিনিসে চলে যাচ্ছে। তার মানে দুধ হোক আর দই হোক, সোনা হোক আর গয়না হোক, সবটাই হল ইলেক্ট্রন আর প্রোটন, তাছাড়া কিছু না। যখন শুনলাম দুধ আর দই বাস্তবে এক, শোনার পর আঁৎকে উঠলাম। কিন্তু এবার দেখছি সবটাই হল এ্যটম, কি ইলেক্ট্রন প্রোটন। এবার দেখতে পাচ্ছি সব সমান হয়ে গেল। গভীরে যেতে হলে ঠিক ঠিক গভীরে যেতে হবে। এমনি যখন বলছি, দুধও যা দইও তাই, শুনে লোকেরা বলবে, লোকটা পাগল। কিন্তু যখন সব কিছু বিশ্লেষণ করে ভিতরে ঢুকছি, তখন দেখছি, তাই তো আসলে তো তাই। যত মূলে যাচ্ছি, তত দেখছি সব কিছু এক হয়ে যাচ্ছে।

মনে করা যাক, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কিছু নেই শুধু আমি আছি, তখন আমার কি বোধ থাকবে? আমার অস্তিত্ব আছে, এই বোধটা থাকবে। তখন দুটো জিনিস থাকবে, আমি ও আমার অস্তিত্ব। ধ্যানের গভীরে গিয়ে যখন আমিটাও উড়ে যায়, তখন ওই জায়গাতে এসে যায় শুধু অস্তি মাত্রম্। কথামৃতে ঠাকুর এই কথা বারবার বলছেন – সত্তা মাত্রম্। ধ্যানের গভীরে এটাই শেষ অবস্থায় দেখে –যাবতীয় যা কিছু আছে, শুধু সত্তা মাত্রম্।

এই সৎ জিনিসটাকে বলা হয় ব্রহ্ম। ঠিক তেমনি যে কোন জিনিস যখন ভাবছি, যা কিছু দেখছি, সবটাতে আমরা অস্তি ভাব দেখি; জিনিসটা আছে, এই 'আছে' ভাব সব কিছুর মধ্যে সাধারণ; তুমি আছ, সে আছে, এটা আছে। মানুষ, বস্তু সব পাল্টে যাচ্ছে, কিন্তু 'আছে' এই জিনিসটা থেকে যাচ্ছে। এই 'আছে' ভাব, অস্তি ভাব সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছে। এখন যা কিছু আমরা চিন্তা করছি, যা কিছু আমরা দেখছি, যা কিছু অনুভব করছি, সব কিছুর মধ্যে ওই একটি জিনিস থেকে যাচ্ছে, সত্তা মাত্রম্। এই বোধটা যদি কোন সময় নাশ হয়ে যায়, তারপর আবার যদি ফিরে আসে, যেমন গভীর ঘুমে আমাদের কোন বোধ থাকে না। ঘুম ভাঙার পর যখন জাগ্রত অবস্থায় ফিরে আসি, তখনও আমাদের ওই বোধটা থাকে। গভীর নিদ্রার পর ঘুম ভাঙলে আমরা বলি, এমন গভীর ঘুমে ছিলাম যে আমার কিছু মনে নেই। তখনও বলছি, আমি ঘুমিয়েছিলাম, তার মানে সেখানেও একটা সত্তার বোধ থেকে যায়। যোগীরা নির্বিকল্প সমাধিতে গিয়ে আবার যখন সেখান থেকে ফিরে আসেন, তখনও সমাধির অবস্থায় কি হয়েছিল মুখে বলতে পারেন না ঠিকই, কিন্তু ওই বোধ, সত্তা আছে, এটা থেকে গেল। এই সৎ জিনিসটা কখনই নাশ হবে না।

কিন্তু যে জিনিসগুলিকে আমরা দেখছি, অনুভব করছি, এটা হল appearance, এটা নাশ হয়ে যাবে। নাশ হয়ে যাবে বুঝলাম, তাহলে আগে কি কখন ছিল? কি করে থাকবে, সবটাই তো আমাদের মনের একটা অবস্থা। যেমন বলা হল, সোনা থেকে গয়না হচ্ছে, গয়নার উপর আরও কারিকুরি করলে তার দাম বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে বস্তুতঃ ওটা কিছুতেই কিছু পাল্টাচ্ছে না। আর

দর্শনের দিক থেকে যখন গভীরে যাচ্ছি, তখন দেখছি সত্তা মাত্রম্, এর বাইরে আর কিছু থাকছে না। কিন্তু সত্তাকে আমরা সব সময় দেখতে পাচ্ছি না, বস্তুকে দেখতে পাচ্ছি। ঠিকই বলছেন, দেখতে পারা যায় না, কারণ সেখানে বাধা রয়েছে। সেখানে আমাদের ইন্দ্রিয়, আমাদের মন বাধা তৈরী করে রেখেছে। ঠিক তেমনি দই আর দুধ, দইএর যে নাম আর রূপ, এটা তাকে বাধা রূপে আটকে দিচ্ছে, দুধ রূপে দেখতে দেয় না। এই জগৎও নাম-রূপ দিয়ে আটকে দিচ্ছে, আসল ব্রহ্মকে জানতে দেয় না। এই যে আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, জপধ্যান করছি, তপস্যা করছি, এত কিছু করার উদ্দেশ্য যেটা নেই সেটাকে নিয়ে আসা না, যেটা সব সময় আছে, আর সেটার উপর যত বাধা চাপা পড়ে আছে, সেই বাধাকে সরিয়ে দেওয়া। এই পয়েন্টটার জন্যই আমাদের এই এত দীর্ঘ আলোচনা।

ঈশ্বর দর্শন হওয়া, ঠাকুরের দর্শন হওয়া, আমাদের মনে হয় যেন একটা অপ্রাপ্য বস্তুকে দাঁড় করালাম। যেমন আমরা কাহিনীতে শুনে থাকি, যোগীরা বালি থেকেও তেল বার করে দিলেন। যে জিনিসটা হতে পারে না, সেটা করে দেখালেন। বেদান্ত এটা মানে না, বেদান্ত সব সময় বলবে, যে বস্তুটা সব সময় রয়েছে, তুমি শুধু সেটাকেই জানতে পারবে। যদি বস্তুটা না থাকে, তুমি কোন দিন জানতে পারবে না। কিন্তু আমি তো ঈশ্বরকে দেখতে পাচ্ছি না, জানতে পারছি না। ঈশ্বরকে দেখতে না পাওয়া বা জানতে না পাওয়ারই তো কথা, ঈশ্বর কি তোমার থেকে দূরে কোথাও, ঈশ্বর কি বাইরে কোথাও? কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছ না কারণ বাধা রয়েছে। একটা লণ্ঠনের আলো, তার কাঁচের বাইরেটা তুমি মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখেছ, তুমি আলো দেখবে কি করে! সাধনা কেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন কেন? শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, শাস্ত্রের মর্মার্থ মনন করা, জপধ্যান করা, তপস্যা করা, এগুলো করা হয় শুধু ওই বাধা বা আবরণটাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। এটা শুধু বেদান্তের মত না, যোগদর্শনও তাই বলে, পতঞ্জলি যোগসূত্রে *ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ* সূত্র আছে, সেখানেও জীবের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির বাধাগুলির অপসারণের কথা বলা হয়েছে।

ঠাকুর খুব সুন্দর করে সহজ ভাষায় বলছেন, তাঁর কৃপা বাতাস সব সময় বইছে, পাল তুলে দাও। এটা যেমন বলছেন, ঠিক তেমনি বাইরে মিষ্টি মিষ্টি শীতল হাওয়া বইছে, কিন্তু ঘরের জানালা দরজাগুলো সব বন্ধ। আমাজন নদীর এত জল আর এত বেগ যে, সমুদ্রের মোহনায় এসে আশি থেকে একশ কিলোমিটার নদীটা সমুদ্রের ভিতরে ঢুকে যায়। একবার একদল অভিযাত্রী আমাজন অভিযানে যাচ্ছিল, যেতে যেতে ওদের পানীয় জল শেষ হয়ে গেছে। সবাই তৃষ্ণায় ছটফট করছে, মিষ্টি জল দরকার। কিছুক্ষণ পর ওরা দেখে একটা লঞ্চ যাচ্ছে। ওরা ওদের নৌকা থেকে চিৎকার করে লঞ্চের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, আমাদের একটু খাবার জলে দেবেন। লঞ্চের নাবিকরা অবাক হয়ে বলছে, 'তোমরা তো মিষ্টি জলের উপরেই দাঁড়িয়ে আছ'। ওরা জানে এই জায়গাটা মিষ্টি জলের এলাকা। যিনি এই ঘটনাটা লিখছিলেন, তিনি বলছেন, তখন আমার মনে হল, আমাদের সব জানা, এত ট্রেনিং নিয়েছি, আমাজন নদী তার এত বেগ যে, একশ কিলোমিটার সে মিষ্টি জল নিয়ে সমুদ্রের ভিতর ঢুকে যায়। আমরা মিষ্টি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, সমুদ্র কিন্তু নদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমরা তৃষ্ণায় মিষ্টি জলের জন্য ছটফট করছি। তাহলে বাধা কোথায় ছিল, জল কেন পাচ্ছিল না, সবটাই এই মস্তিষ্কে। ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাই না কেন, কারণ বাধা তো আমাদের মস্তিষ্কে, মনে, অন্য কোথাও কোন বাধা নেই। বাধা তো আমার নিজের সৃষ্টি করা, তাই দেখছি না।

আমাদের মস্তিষ্কেই যদি সব বাধা হয়ে থাকে, কিন্তু আমরাই তো আবার অনেক সময় মরীচিকা দেখছি। তখন বলছেন, ঠিকই, শুধু মরীচিকা না, ওই জলের উপর পুরো শহরের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু মরুভূমির যত ভিতরে যেতে থাকি, মরীচিকা তত দূরে সরে যেতে থাকে, যেতে যেতে দেখছি কোথাও কিছু নেই, না আছে জল, না আছে শহর। ঠিকই, মরীচিকা দেখা যায়, কিন্তু ওই মরীচিকা দেখার জন একটা আধার চাই। জগৎকে যদি আমরা মরীচিকা রূপেও দেখি, তখনও একটা আধার দরকার, এই আধারই হলেন ঈশ্বর। যদি এটাকে পরিবর্তন রূপে দেখা হয়, তাহলেও

আসলে ঈশ্বরই রয়েছেন। যদি এটাকে আমরা মরীচিকা রূপেও দেখি, তাহলেও কিন্তু ঈশ্বরই রয়েছেন। এই গোলমালটা কোথায়? বলছেন, আবরণ আর বিক্ষেপ। আবরণ মানে ঢেকে দেওয়া, বিক্ষেপ মানে নূতন করে দেখানো। জাদুকর যেমন একটা জিনিসকে ঢেকে দিয়ে আরেকটা জিনিসকে সামনে নিয়ে আসে।

তাহলে আমরা জগৎ যেটা সামনে দেখছি, এটা কি? এনারা তখন তিনটে সত্তার কথা বলেন –প্রথমটা হল পারমার্থিক সত্তা, কোন পরিস্থিতিতে যাঁর নাশ হবে না, যেমনটা ছিল তেমনটাই থাকবেন। ব্রহ্ম বলুন, আত্মা বলুন, ঈশ্বর বলুন, তিনি সব সময় সব অবস্থাতেই আছেন। দ্বিতীয় হয় প্রাতিভাসিক, যেমন মরীচিকা, illusion, বেদান্তে এর কোন দাম নেই। বৌদ্ধরা এই দ্বিতীয় সত্তাকে নিয়ে খুব গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন। তৃতীয় হয় ব্যবহারিক, ব্যবহারিক সত্তাটাই পুরো বেদান্তের দর্শন। আমরা যে সৎ অসৎ আলোচনা করছি, এটা সত্তাকে নিয়ে। বেশীর ভাগ লোকে মনে করে, বেদান্ত শুধু মায়াকে নিয়েই চলে। কিন্তু না, বেদান্তে মায়া মানে ব্যবহারিক সত্য। এর খুব সহজ উপমা হল, আমার কাছে একটা পাঁচ হাজার টাকার নোট আছে। আসলে এটা কি? একটা কাগজ বই তো কিছু না। কিন্তু ওটার দাম কত? পাঁচ হাজার টাকা। এবার ওটাকে ছেপে দু হাজার করে দেওয়া হলে কাগজটার দাম হয়ে গেল দু হাজার টাকা। আসলে কিন্তু কাগজ। ওর আসল সত্তা হল কাগজের, কিন্তু ব্যবহার কালে হয়ে যায় দু হাজার টাকা। পুরো এই জগৎটা হল ব্যবহারিক সত্তা। আসলে একটা কাগজ কিন্তু ওর দাম বেড়ে যাচ্ছে, যেমন যেমন ছাপ মেরে দেওয়া হল, তেমন তেমন ওর দাম বেড়ে গেল। এই ছাপ জিনিসটাই এক জিনিস থেকে অপরকে আলাদা করে দেয়।

এই হল সংক্ষেপে বেদান্ত কিভাবে জিনিসটাকে দেখে। এবার এখান থেকে *নাসতো বিদ্যতে ভাবো* এই শ্লোকের অর্থে গেলে এবার কিছুটা বোঝা যাবে। আমাদের শাস্ত্রে সৎ আর অসৎ এই দুটো শব্দের প্রচুর ব্যবহার হয়। আমাদের এই লম্বা আলোচনার উদ্দেশ্য হল, এই পুরো জিনিসটার পিছনে দর্শনটা কি জানা। সৎ আর অসৎ এই দুটো শব্দের সাথে আরেকটা শব্দও আসে, তা হল অলীক। অলীক হল, যেটা একটু আগে বলা হল, প্রাতিভাসিক। অলীক হল সেই শব্দ, যেটা শুধু শব্দের খেলা, কিন্তু বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই। যেমন যদি বলা হয় বন্ধ্যাপুত্র, বন্ধ্যপুত্র বলে কিছু হয় না। বন্ধ্যা হলে পুত্র হবে না, পুত্র হলে বন্ধ্যা হবে না। তেমনি আকাশকুসুম, সোনার পাথর বাটি, এগুলো অলীক, শব্দ দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এই ধরণের কোন বস্তু হয় না।

সৎ শব্দকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে নেওয়া হয়। সৎ এর প্রথম অর্থ কখন কখন হয় পারমার্থিক সত্য বা পরম সত্তা। সৎ এর দ্বিতীয় অর্থ হয়, প্রকৃতি, কারণ প্রকৃতিকেই একমাত্র দেখা যায়। আর সৎ এর তৃতীয় অর্থ হল, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেটা জানা যায় সেটাই সৎ, যার অস্তিত্ব আছে। সৎ এই তিনটে অর্থেই হয়। গীতার কোন কোন শ্লোকে, উপনিষদের কোন কোন মন্ত্রে সৎ বা অসৎ কি অর্থে ব্যবহার হয়েছে, ভাষ্য ছাড়া বোঝা যায় না। সেইসব শ্লোক বা মন্ত্রের অর্থকে শঙ্করাচার্য এক রকম ব্যাখ্যা করেন, রামানুজ আর-এক রকম ব্যাখ্যা করেন, ফলে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। গীতার এই শ্লোকে শঙ্করাচার্য অর্থ করছেন, দেশ, কাল ও বস্তুতে যেটা পরিচ্ছিন্ন নয় বা আবদ্ধ নয়, সেটাই সৎ। যেটাই আবদ্ধ সেটাই অসৎ। এমনকি সংস্কৃতে অসৎকে পরিভাষিত করেছেন, *যৎ কালতোদেশতোবস্তুতোপরিচ্ছিন্নম্*, দেশ, কাল ও বস্তুতে যেটা পরিচ্ছিন্ন আছে, সেটাই অসৎ; এর বাইরে যা কিছু আছে সেটাই সৎ।

অন্য দিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের কথা যে বলা হল, এটাকে বলা হয় সৎ; আর ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা বোঝা যায় না, সেটাকে বলে অসৎ। তবে অলীক অর্থেও অসৎ শব্দ ব্যবহার করা হয়। সৎ আর অসৎ এই দুটো জিনিসকেই মন দিয়ে গ্রহণ করা হয়। সেইজন্য অনেক জায়গায়, বিশেষ করে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আসবে, সেখানে বলবে *ন সত্তন্নাসদুচ্যতে*, ব্রহ্ম সৎও না অসৎও না, কারণ ব্রহ্ম

বুদ্ধির বাইরে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য শ্লোকে সৎএর অর্থ ব্রহ্ম। এইভাবে সৎএর অর্থ কোথাও হয় ব্রহ্ম, কোথাও হয় প্রকৃতি আবার কোথাও হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। অসৎএর অর্থ কোথাও হয় অলীক, কোথাও হয় যার কোন অস্তিত্ব নেই। বস্তুরও শেষ অস্তিত্ব থাকে না, প্রকৃতিরও শেষ অস্তিত্ব থাকে না, এই অর্থে সেইজন্য এরা অসৎ।

এবার আচার্য পুরো জিনিসটাকে যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন কিভাবে সৎ বলতে অস্তি বোধ, যার ঠিক ঠিক অস্তি বোধ আছে, সেটার কোন দিন নাশ হবে না। তোমার বুদ্ধির নাশ হয়ে যাবে কিন্তু, এই অস্তির নাশ হবে না। দেশ, কাল ও বস্তু এই তিনটেতে যেটা পরিচ্ছিন্ন, সেটা অসৎ। অসৎ মানেই হয়, এর কখনো সত্তা হয়নি, অর্থাৎ অস্তিত্বেই কখন আসেনি। তাহলে কি হয়েছে? এর শুধু অবস্থার একটা পরিবর্তন হয়েছে। যেমন সোনা থেকে গয়না হয়েছে, সোনাই আছে, কিন্তু তার উপর একটা নাম আর রূপ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গয়নাকে নিয়ে মেয়েদের কত আনন্দ হয়, কত নাচানাচি করে, আসলে কিন্তু ওটা সোনা। দোলের সময় চিনির মঠ দেওয়া হয়, চিনির হাতি, চিনির ঘোড়া, বাঘ, টিকটিকি, ইঁদুর সব রকম থাকত। ছোটবেলায় আমরা সবাই এই নিয়ে ঝগড়াও করতাম, আমাকে কেন কুকুর দেওয়া হল, ওকে কেন সিংহ দেওয়া হল। কিন্তু একটু বড় হতেই যখন বুঝে গেল, সবটাই চিনির ড্যালা, দুধের মধ্যে হাতি ফেল, ইঁদুর ফেল, যেটাই ফেল মিষ্টি ছাড়া আর কিছু লাগবে না। আমরাও যখন বালবুদ্ধিকে আশ্রয় করে চলি, তখন আমাদের কাছে সব কিছুরই দাম থাকে। আবার যখন আমাদের আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা হয়, তখন বুঝে যাই, যে জিনিসটা সত্যিই আছে, ওটার কোন দিন নাশ হবে না। যে জিনিসটার নাশ হয়ে যাচ্ছে, আসলে ওটা কোন দিন ছিল না। সেইজন্য যা কিছু পরিবর্তনশীল দেখছ, সেই বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিও না।

অর্জুনকে এর আগে ভগবান বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ মারা যাবেন বলে তুমি যে এত কান্নাকাটি করছ, এই কান্নাকাটি করার কোন অর্থই নেই। কারণ তুমি যদি মনে করে থাক, ভীষ্ম দ্রোণ মারা যাবেন, তাহলে মনে রেখো, এনাদের কোন কালেই অস্তিত্ব ছিল না। আর যদি মনে করো, এনাদের অস্তিত্ব ছিল, তবে জেনে রাখো ভীষ্ম দ্রোণের কোন দিন নাশ হবে না, হতে পারে না। আপাত ভাবে শুনে মনে হবে এটা খুব উচ্চ দর্শন, ঠিকই, উচ্চ দর্শনতো বটেই, কিন্তু এটাই সত্য। হিন্দুরা প্রথম থেকেই মৃত্যুকে নিয়ে বেশী মাতামাতি করতেন না। পাশ্চাত্য দুনিয়া, বিশেষ করে আমেরিকা তো উঠে পড়ে লেগেছে, আর সেখান থেকে ভারতের সংবাদ মাধ্যম, পত্রপত্রিকার লেখালেখিতে সবাই দেখাচ্ছেন, আমাদের কয়েক বছর আয়ু বাড়িয়ে দিতে পারলে যেন কি করে নিল। কিন্তু এই কয়েক বছরে যে যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেটাকে নিয়ে কেউ কিছু বলছেন না। মৃত্যকে নিয়ে, বেঁচে থাকা নিয়ে এত ভাবাভাবি হিন্দু দর্শন অনুমতি দেয় না। এনাদের বক্তব্য হল, আসলে আমরা যা কিছু দেখছি, এটা হল বিশেষণ মাত্র। যেমন পদ্ম ফুলের একটা বিশেষণ হল লাল পদ্ম বা নীল পদ্ম, ঠিক তেমনি আসল যে সৎ, আসল যে ব্রহ্ম বা আসল যে আত্মা, এর উপর বিশেষণ হল জীব, জগৎ। জীব জগতের এই বিশেষণের উপর আবার বিশেষণ হল, ইনি অমুক, আমি অমুক, আমি অধ্যাপক, আমি বুদ্ধিমান, সে বোকা, আমি বড়লোক, ওরা গরীব ইত্যাদি। এনারা বলছেন, তুমি বিশেষণকে নিয়ে মাথা খারাপ করো না, তার আসল জিনিসটার দিকে দৃষ্টিপাত কর।

যেখানেই চোখে জল, যেখানেই শোক, যেখানেই উল্লাস, যেখানেই মোহ, যেখানেই হর্ষ, যেখানেই বেদনা, সেখানেই শুধু কষ্ট আর কষ্ট। সব কিছুর মূলে ওই একটাই জিনিস, কিন্তু সেটাকে ভুলে যেটা পরিবর্তনশীল, যেটা ক্ষণস্থায়ী সেটাকে নিয়েই আমাদের মাতামাতি, সেটাকে নিয়েই আমরা পড়ে আছি। ভগবান বলছেন *অনয়োঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ*, তত্ত্ব শব্দ তৎ শব্দ থেকে আসে, তত্ত্ব এটাকে বলে সর্বনাম, যাবতীয় যা কিছু আছে সব তৎএ এসে যায়, যেমন ওঁ তৎ সৎ তৎ, তৎ ব্রহ্মের একটি নাম। বলছেন, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী, যাঁরা তত্ত্বদর্শি অর্থাৎ যাঁরা ঠিক ঠিক এই জিনিসটাকে বোঝেন, তাঁরা কখনই সেই জিনিসের দিকে দৃষ্টি দেন না যে জিনিসগুলোর পরিণাম হয়ে যাচ্ছে, একমাত্র ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি

দেন। যদি ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি না দেন, অন্য দিকে ভাবছেন সব কিছুরই নাশ হয়ে যাবে, তাহলে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। আর তা নাহলে, জীবন একবারই পাওয়া গেছে, চল লুটেপুটে খাই, এক নৃশংস পুরুষ হয়ে যাবেন। বৌদ্ধরা শূন্যবাদের কথা বলেন, কিন্তু সেখানেও তাঁরা বলেন, ওই অবস্থায় তোমাকে পৌঁছাতে হবে, যেখানে তুমি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক দৃষ্টিতে দেখতে পারবে। যতক্ষণ ওই দৃষ্টি না আসছে, ততক্ষণ তোমার অশান্তির শেষ নেই। পরে পরে আচার্য অবশ্য বলবেন, যদি এটাকে তাত্ত্বিক ভাবেও বুঝে নেওয়া যায়, মাঝে মাঝেও যদি জীবনে প্রয়োগ করা যায়, তাতেই বিরাট কিছু হয়ে যাবে।

এই ভাবে বলে বলে শেষে বলছেন, শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ এদিকে বেশী দৃষ্টি দিও না। কোন জিনিস? অনেক আগে শীতকালে বেলুড় মঠে খাওয়ার পঙ্কতিতে বসে একজন অল্প বয়সী মহারাজ বলছেন, 'উঃ আজ বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, ঠাণ্ডায় আর পারা যায় না'। পাশে একজন বরিষ্ঠ মহারাজ বসে ছিলেন, তিনি শুনে বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'আপনার যদি শীত করে, আপনি গায়ে একটু গরম জামা চাপান, মনে এই ভাবটা আনবেন না, আর দয়া করে মুখে বলতে যাবেন না'। মনকে কোন পরিস্থিতিতে সেই যে সত্য, সেখান থেকে সরতে দেবেন না। বাঁচার জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী কি করতে হবে করুন, যদি না পারেন তাহলে এটাকে মেনে নিন। পরে ভগবান বলবেন *তস্মাদহপরির্যার্থে*, এটা অপরিহার্য।

ইংলিশে একটা কোটেশান আছে, If a problem has a solution, it is not a problem, it is a situation and face it। একটা সমস্যার সমাধান যদি না থাকে, তাহলে ওটা সমস্যাই না, ওটা একটা পরিস্থিতি; পরিস্থিতির কখন সমাধান হয় না, পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। বাইরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে, একটা সমস্যা; বেরোবার প্রয়োজন থাকলে ছাতা মাথায় দিয়ে যান। বাড়িতে ছাদ দিয়ে জল লিক করছে, ছাদকে সারিয়ে নিন। কিন্তু আপনার ছেলে মারা গেছে, এখন কি করবেন আপনি? এটা পরিস্থিতি, ছেলে তো আর ফিরে আসবে না, শান্ত হন। অর্থ হল মনকে কোন পরিস্থিতিতে কক্ষণ চঞ্চল হতে দেওয়া চলবে না। কারণ, এখানে মূল যুক্তি হল, যে কোন জিনিস তা যাই হোক, সব কিছু ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী যদি হয়, তাহলে জানবে এর অস্তিত্ব কখনই ছিল না। কারণ এর অস্তিত্ব যদি থাকত, তাহলে সব সময়ই থাকত। একজন কেউ যদি আপনার উপর একবারও রেগে যায়, তখন এটা বুঝবেন যে, শান্ত থাকাটা তার স্বভাব না, রাগান্বিত হওয়ার স্বভাটাই তার সত্য। আজকে রেগেছে, আবার রাগবে, আজ হোক কাল হোক আবার তার রাগ আসবে। কোন লোক যদি একবার বাজে কাজ করে থাকে, বা চুরি করে, আর-একবার সে চুরি করবে। এই হল গীতার ষোল নম্বরের ব্যাখ্যা, এটাকে যদি একবার বুঝে নেওয়া যায় যে, সৎ বস্তুর কখন অভাব হয় না, আর যেটা অসৎ বস্তু তার কখন অস্তিত্ব হয় না। গীতার এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্লোক, মুখস্ত করে এর অর্থ ও ভাবকে যদি একবার খুব ভাল করে মনে বসিয়ে নেওয়া যায়, জীবনে আমরা অনেক অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাব। এটা কোন উৎসাহ দেওয়ার জন্য বা পজিটিভ থিঙ্কিং নিয়ে যে ধরণের আকর্ষণীয় লেখাগুলো ছাপা হয়, এটা সে ধরণের কিছু না, এটা একটা সনাতন সত্য।

কোন বিষম পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলে আমরা সব সময় ওই পরিস্থতি থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। একটা খুব interesting ঘটনা আছে, গান্ধীজী ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করেন, তখন তিনি এটাই বলছেন, in the name of God you leave, leave us to anarchy। আমাদের এখানে নৈরাজ্য হোক, আগে তুমি ভারত ছাড়ো। ইংরেজ সরকার পরে সবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দিল। পরে যখন এটা নিয়ে ঝামেলা শুরু হল, তখনও তিনি এই কথাই বলছেন, আমার এখানে নৈরাজ্য হোক আর যাই হোক, দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাক, তোমরা ভারত ছাড়ো। কারণ তোমরা একটা বিষধর সাপের মত আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে রেখেছ, কোন

কিছুর দায়ীত্ব নিচ্ছ না, শুধু লুটপাট করে যাচ্ছ। কিন্তু সেই সময়, কোন নেতারই এই আইডিয়াটা ছিল না যে, আমরা কি রকম একটা দেশ চাই। গান্ধীজী, নেহরুজী, বল্লভভাই প্যাটেল কারুরই মনে কোন আইডিয়া ছিল না। যার জন্য জিন্না যখন বললেন, দেশ আলাদা হোক, নিরুপায় হয়ে দেশকে দু টুকরো করতে হল।

এরপর দেশ আমাদের কেমন হবে, এই চিন্তা করে করে প্রায় আড়াই বছর লাগিয়ে দিল ভারতের একটা সংবিধান তৈরী করতে। তারপর ইন্দিরা গান্ধী এসে সংবিধানের মূল জিনিসে কিছু জিনিস ঢোকালেন। ভারত কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। কিছু জিনিসকে ঠিক করার জন্য নেতারা পার্লামেন্টে বলতে লাগলেন যে, আমাদের যাঁরা founding fathers ছিলেন তাঁরা এই ভুল করে গেছেন, আমরা সেটাকে ঠিক করতে চাইছি। যেমনি ঠিক করতে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রতিবাদ করতে রাস্থায় নেমে যাচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টে চলে যাচ্ছে, বলছে, এই সংশোধনটা ঠিক হচ্ছে না। আপনি কি চাইছেন? আপনার principleটা কি? মনুস্মৃতির নিন্দা করতে গিয়ে লোকেরা ভুলে যাচ্ছে যে, মনুস্মৃতি পরিষ্কার বলছেন, দেশ কালের পরিস্থিতি যখন পাল্টাবে তখন এই বিধানগুলিকেও পাল্টাতে হবে। কয়েকজন মানুষ মিলে চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করলেন, আমাদের সিদ্ধান্ত এই। আর তার কদিন পরেই শুরু হয়ে গেল সেই সিদ্ধান্তের সংশোধন। ইতিমধ্যে ভারতের সংবিধানের শতাধিক সংশোধন হয়ে গেছে। যখন সংশোধন করতে হচ্ছে, তখন এটাই তাঁরা বলতে চাইছেন যে, আমাদের নেতারা ভুল করেছিলেন, সংশোধনের মাধ্যমে আমরা এটাকে ঠিক করছি। কারুর কাছে পরিষ্কার নেই, কি চাইছেন। পরিষ্কার যদি না থাকে, আমি ত্যাগ কেন করতে চাইছি, তার মাথা খারাপ হতে বাধ্য। আমাদের পরিষ্কার থাকা উচিৎ, আমি কি চাইছি।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, যে জিনিসগুলি প্রতিনিয়ত পাল্টাচ্ছে, ওই পরিবর্তনশীল বস্তুগুলিকে ছাড়ো। কিন্তু সেটা করতে গেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে, কারণ সব জিনিসই তো পাল্টাচ্ছে। বলছেন *নাসতো বিদ্যতে ভাবো*, এই সৎ জিনিসটা কি, সতের নম্বর শ্লোকে এবার এর ব্যাখ্যা করছেন। যখন আমরা জীবনে কোন কিছু ছাড়ছি, জীবনে যখন এগোতে চাইছি, যখন আমরা সচ্চরিত্র, ভাল মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছি, এই চেষ্টার মানেই দাঁড়ায় আমাদের ত্যাগ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে মন্দ জিনিস ত্যাগ করছি। ভাল মন্দের তফাৎ আমরা বুঝব কি করে? ইন্দ্রিয়কে যদি ছাড় দিয়ে দেওয়া হয়, তখন এটাই হয় যাবে মন্দ। আমাদের পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় আর পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, এদের সবাইকে যখন ছাড় দিয়ে দেওয়া হল, যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই করছে, তখন এটাই হল মন্দ। মন যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে, তখন এটাই হয়ে গেল ভাল।

ভাল আর মন্দের এটাই তফাৎ। পরে গীতাতেও বলবেন, মন্দ কি, যখন ইন্দ্রিয়কে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। ভাল কি, যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হচ্ছে। কেউ যদি আমাকে ভাল বলে, আপনি তো খুব ভাল মানুষ, তার মানে আমি অনেক জায়গায় ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি। ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা মানেই ত্যাগ, ত্যাগ মানেই ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু এই ত্যাগের পিছনে যদি একটা কোন আদর্শ না থাকে, সব কিছু এলেমেলো হয়ে যাবে। এবার আমরা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সতের নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যাতে যাচ্ছি।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি।।১৭।।

(যিনি এই সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে আছেন, তাঁকেই অবিনাশী আত্মা বা ব্রহ্ম বলে জানবে। কেউই এই অব্যয় আত্মার বিনাশ করতে সমর্থ হয় না।)

এর আগে আলোচনা করা হয়েছিল, ধর্মই মানুষকে মহৎ করে। বিশ্বে যত মহাপুরুষ আছেন, যত শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন, যদি আমরা কয়েকটা গুণকে বৈশিষ্ট্য রূপে ধরে নিই, তাহলে দেখা যাবে সব মহাপুরুষরাই ধর্ম জগৎ থেকে এসেছেন, যীশুও তাই, ভগবান বুদ্ধও তাই, স্বামী বিবেকানন্দও তাই। আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়নের মত মানুষদের যখন বিচার করি, তখন আমরা তাঁদের বীরপুরুষ রূপে, একজন নেতা রূপে দেখি। কিন্তু ভাল মানুষ বলতে যেভাবে আমরা ভাবি বা দেখি, যাঁর ভিতর সদ্ভাব রয়েছে, অপরের প্রতি করুণা রয়েছে, এই জিনিসগুলো নেতা বা বীরপুরুষদের মধ্যে আমরা সচরাচর দেখতে পাইনা। কিন্তু সক্রেটিস একমাত্র লোক, যাঁর জীবন খুব উচ্চমানের, কিন্তু তাঁর সততা ধর্মের উপর ভিত্তি করে ছিল না। পরে পরে পাশ্চাত্যের চিন্তকরা নিয়ে এলেন Good for good sake, morality for morality sake, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই থিয়োরী দাঁড়াতে পারলো না। স্বামীজীও এর নিন্দা করে বলছেন, Morality cannot be an end by itself, কিন্তু সক্রেটিসের কাছে moralityই ছিল শেষ কথা। সক্রেটিসের কাছে ছিল, আমি ভাল হব এটাই শেষ কথা, আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হব, এটাই আমার শেষ কথা। গান্ধীজী যদি রাম নাম না করতেন, তাহলে মনে হত গান্ধীজী সক্রেটিসের লাইনের। তা না, গান্ধীজীর জীবন পুরো ধর্মের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত, তিনি ধর্মকে ভিত্তি করেই জীবন দাঁড় করিয়েছিলেন।

এখানে এবার গীতা পরিষ্কার করছেন। এই যে তুমি ত্যাগ করবে বলছ, সব কিছু ত্যাগ করে ভিক্ষা করবে বলছ, কিন্তু ত্যাগের উদ্দেশ্য হল সেই সত্যকে পাওয়ার জন্য, সেই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। কি সেই সত্য? *অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি*, অবিনাশির অর্থ হল, যেটা কক্ষণ নষ্ট হবে না, কোন পরিস্থিতিতে বিনাশ হয়ে যাবে না। *অবিনাশি তু*, এই যে তু শব্দ বলছেন, এর অর্থ হল যা কিছু বিনাশশীল আছে, তার সাথে তফাৎ করার জন্য, মানে অসৎ বস্তুগুলোর সঙ্গে তফাৎ করার জন্য। যেটারই বিনাশ হয় সেটাই অসৎ, আর ষোল নম্বর শ্লোকে উচ্চমানের তর্কে বললেন, যেটারই নাশ হচ্ছে, আসলে তার অস্তিত্ব আদপেই ছিল না। অর্জুন তোমাকে তাই বলছি, যেটা অবিনাশী সেটাতে তোমার মনটাকে লাগাও।

আচার্য বলছেন *ব্যপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা*, যেটারই নাম সৎ, তার মানে সেটাই ব্রহ্ম। নাম আর নামী অভেদ, তাই ব্রহ্মই সৎ, সৎই ব্রহ্ম। আকাশ যেমন সব কিছুতে ব্যপ্ত, ঠিক তেমনি ব্রহ্ম সব কিছুতে ব্যপ্ত, এমনকি আকাশেও ব্রহ্ম ব্যপ্ত, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। আমরা কল্পনা করতে পারি, সমুদ্রের জলের গভীরে কিছু মাছ আছে, ওরা কোন দিন জলের উপরে আসে না, সমুদ্রের ভিতরেই থাকে। সেখানেই তারা খেলা করছে, জলকে জল থেকে সরিয়ে অনেক কিছু করছে। এখন কেউ যদি এসে মাছেদের বলে, জানো সব কিছুই জল, জল ছাড়া কিছু নেই। মাছেরা তার কথা বুঝতেই পারবে না, কি বলতে চাইছে। কারণ সেই গভীর জলের মাছেরা সর্বক্ষণ জলের মধ্যেই রয়েছে কিনা। যে যার ভিতরে থাকে, সে তার কথা বুঝতে পারে না।

আচার্য বলছেন, ব্রহ্মের পরিভাষা হল অবিনাশী, তাঁর বিনাশ হয় না। তিনি কি করেন? *যেন সর্বমিদং ততম্*, *ততম্* শব্দের অর্থ ব্যপ্ত, সব কিছুকে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, ব্রহ্ম সমস্ত কিছুর ভিতরে ঢুকে রয়েছেন। আমার শরীরের ভিতরে ব্রহ্ম, আমার শরীরে যত অঙ্গ আছে, এই হাত, পা, এর ভিতরেও সেই ব্রহ্ম, হাতের তালু, হাতের আঙুল, তার ভিতরেও ব্রহ্ম। আঙুলকে আরও যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তাতে যে কোষিকাগুলি আসবে, তার মধ্যেও ব্রহ্ম। সেই কোষিকার মধ্যে এ্যটম্, তার মধ্যেও ব্রহ্ম। এ্যটমের মধ্যে ইলেক্ট্রন, প্রোটন, তার মধ্যেও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ওতপ্রোতো হয়ে আছেন। কেন ওতপ্রোতো? কারণ ব্রহ্মই সব হয়েছন। জন্মদিনে চকলেট দিয়ে অনেকে অনেক কিছু তৈরী করে, যা কিছুই বানাক, সবটার মধ্যেই চকলেট ওতপ্রোতো হয়ে আছে। নর্থ পোল, সাউথ পোলে বরফের নানা রকমের আকৃতি দেখা যায়। বরফের যত আকৃতি আছে, সব আকৃতির মধ্যে জল রয়েছে। সেই আকৃতিগুলি কোথায় আছে? সমুদ্রের উপর ভাসছে। তার বাইরেও জল, ভিতরেও জল।

একটা হিমশৈল জলে ভেসে ভেসে যাচ্ছে, সে বলছে, আমার বাইরেও জল, ভিতরেও জল, আমি নিজেও জল। কেউ হয়ত বলতে পারে, 'আরে ভাই, জলটা তো তরল, তুমি তো নিরেট বরফ'? তাহলেও আমি জল, আমি জল থেকে আলাদা কিছু না। এই উপমাগুলি বোঝানর জন্য, এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, ওই রকম আছে বলে এই রকম বলা হচ্ছে। তা একেবারেই না, আমরা ষোল নম্বর শ্লোক যতটা পারা যায় যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছি।

এরপর বলছেন, এটা হল *বিনাশমব্যয়স্যাস্য*, ব্রহ্মের একটাই পরিভাষা, *অব্যয়ঃ*। ব্যয় মানে ক্ষয় হওয়া, বলছেন যেটার কক্ষণ কোন পরিস্থিতিতে ব্যয় হয় না, তাঁর কম-বেশী হয় না। ঈশ্বরকে বা পরমসত্তাকে যদি পরিভাষিত করতে হয়, তাহলে তার একটাই পরিভাষা হবে, ঈশ্বর অনন্ত। ব্রহ্ম শব্দের মানেই হয় অনন্ত, ব্রহ্ম মানে সবচেয়ে বৃহৎ, এর অর্থই হল অনন্ত। অনন্ত মানে, ওর কোথাও যাওয়ার নেই, কখন বড় হবে না, কখন ছোটও হবে না, তার ক্ষয় হবে না, বিস্তার হবে না। পরে এই আইডিয়াটাকে নিয়ে আরও বিস্তারে বলবেন। সৎ ও অসৎ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, অসৎ বলছেন যেটা নাশ হয়ে যায়, ব্রহ্ম জিনিসটা নাশ হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, এর ব্যয় পর্যন্ত হয় না, একটু যে ক্ষয় হবে, তাও হয় না।

কেন ব্রহ্মের ক্ষয় হয় না? আচার্য এখানে খুব সহজ যুক্তি এনে দেখাচ্ছেন। এই ধরণের যুক্তি দেখলে অবাক হয়ে ভাবতে হয়, আচার্যের কি সাংঘাতিক ক্ষুরধার বুদ্ধি ছিল কল্পনা করা যায় না। আচার্য বলছেন, কোন জিনিসের ক্ষয় তখনই হয়, যখন ওর অবয়ব থাকে, অবয়ব মানে parts। যদি different parts থাকে তাহলে একটা parts খসে পড়ে যাবে। যার কোন part নেই, তার খসে পড়ারও কিছু নেই। আমাকে শরবৎ দেওয়া হয়েছে, খেয়ে বলছি, শরবৎটা পান্‌সে। কেন পান্‌সে? চিনি বা লেবু কম দিয়েছে। চিনি আমি বেশী দিতে পারি কম দিতে পারি। এবার ধরুন জল, জলকে যদি আমার নাশ করতে হয়, তাহলে আমাকে তার মাঝখান দিয়ে ইলেক্ট্রিসিটি প্রবাহিত করে দিতে হবে, তার ফলে হাইড্রোজনে আর অক্সিজেন আলাদা হয়ে যাবে। কারণ এই দুটো parts দিয়ে জল তৈরী, জলের একটা part হল হাইড্রোজেন, আরেকটা part হল অক্সিজেন। শরবতের একটা part হল জল, আরেকটা part হল মিষ্টি, ওর একটা partকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয়, শরবৎ জিনিসটার নাশ হয়ে যাবে। আমার আপনার নাশ কখন হবে? যদি হাত কেটে দেয়, পা কেটে দেয়, কারণ অবয়ব দিয়ে আমরা তৈরী। কিন্তু যে জিনিসটার কোন অঙ্গ নেই, তাকে আমি কাটব কি করে! এটা ধারণা করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন, কারণ এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সবটাতে parts রয়েছে। জগতে যা কিছু আছে, সব কিছুই বিভিন্ন parts দিয়ে তৈরী, যেটা আমরা ষোল নম্বর শ্লোকে আলোচনা করলাম।

যে কোন জিনিসকে যদি আমরা পিছনের দিকে ঠেলতে শুরু করি, ঠেলতে ঠেলতে আমরা পৌঁছে যাব ইলেক্ট্রন প্রোটনে। কিন্তু ইলেক্ট্রন প্রোটনও part। ঠেলতে ঠেলতে আরও যদি পিছনের দিকে যাই, তখন আসবে কোয়ার্ক, ওটাও part। এইভাবে ঠেলে ঠেলে যদি পিওর এনার্জিতে চলে যাই, এইবার ওটাকে নাশ করা যাবে না, কারণ ওর কোন part নেই। এই কারণে সাংখ্য দর্শন ও অন্যান্য দর্শন এনার্জিকে শাশ্বত মনে করে, আর এই জন্য অনেকে বলেন এনার্জিই শেষ সত্য। কিন্তু আমরা আলোচনা করে দেখলাম, যদি ঈশ্বরই সত্য হন তাহলে এনার্জি কখনই সত্য হতে পারে না; তাই যদি হয় তাহলে ঈশ্বর সীমিত হয়ে যাবেন। এই জিনিসটার আলোচনা আমাদের আগে হয়ে গেছে, শুধু এখানে এই জিনিসটা বোঝানর জন্য বলছেন, কোন জিনিসের যদি তার অঙ্গ থাকে, সেই অঙ্গ বা টুকরোকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু যে জিনিসের কোন অবয়ব নেই, তাকে আমরা কাটব কি করে! যার জন্য বিশাল বিশাল যে পাথর হয়, যার নামই হল monolith, ওটার টুকরো হবে না। কিন্তু এখানে শুদ্ধ চৈতন্যের কথা বলা হচ্ছে, শুদ্ধ চৈতন্যের কোন অঙ্গ নেই, সেইজন্য এর কখন ক্ষয় হবে না।

অনেক সময় এমন হয় জিনিসটা থাকে, কিন্তু তার অন্য কিছু আছে যেটা চলে গেল; যেমন একজন মানুষের সব টাকা চলে গেল, আমরা তখন বলি লোকটা শেষ হয়ে গেল; কিংবা তার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে, বলি, লোকটার পতন হয়ে গেল; কিন্তু মানুষটা থেকে যাচ্ছে। বলছেন, এই যে ব্রহ্ম, এর নিজস্ব কোন পদার্থ নেই, তাই কোন কিছু চলে যাওয়ারও প্রশ্ন নেই। প্রথম কথা হল ব্রহ্ম অবয়ব শূন্য, দ্বিতীয় এর নিজস্ব কোন কিছু দিয়ে নিজের কাছে আসে না যে, সেটা চলে যাবে। যেমন আমরা মানুষ, প্রথম আমাদের অঙ্গ রয়েছে, তারপর অনেক কিছু অর্জন করে থাকি, বাড়ি করলাম, গাড়ি করলাম, টাকা আয় করলাম, ওগুলো যখন চলে গেল, আমরা তখন বলছি, আমার নাশ হয়ে গেল। ব্রহ্মের সেটাও নেই। সেইজন্য কোন অর্থেই আমরা বলতে পারব না যে, ব্রহ্মের নাশ হয়ে গেছে।

এরপর বলছেন, *ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি*, যিনি অব্যয়, কেউ তাঁর নাশ করতে পারে না। যদি কেউ যুক্তি দিয়ে বলতে চায়, আচ্ছা ব্রহ্ম তো অনন্ত, অনন্ত মানেই তিনি সর্বশক্তিমান তাঁকে কেউ নাশ করতে পারে না, কিন্তু তিনি তো নিজেকে নাশ করতে পারেন। যদি তিনি নিজেকে নাশ করতে না পারেন, তাহলে তিনি শক্তিমান নয়। আর যদি নাশ করতে পারেন, তাহলে ব্রহ্মের নাশ হয়ে গেল। দুদিক দিয়েই ব্রহ্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। আগের শ্লোকের আলোচনা করতে গিয়ে অনবস্থা দোষের কথা বলা হয়েছিল। ঠিক তেমনি এই যুক্তিতে একটা মারাত্মক দোষ আছে। তোমার কথার মধ্যে দোষ আছে, ইংরাজীতে বলা হয় inherent contradiction। আচার্য এখানে বলছেন, *ন কশ্চিদ্ আত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি ঈশ্বরঃ অপি*, কেউই অর্থাৎ ঈশ্বরও নিজেকে নিজে নাশ করতে পারেন না। কারণ *আত্মা হি ব্রহ্ম স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ*, নিজের উপর ক্রিয়া হয় না। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বাক্য।

প্রথমে বললেন, এর কোন অবয়ব বা পার্ট নেই বলে এর বিনাশ হবে না। তাহলে নিজেকে যদি নিজে মারতে পারে? পারবে না। কেন পারবেন না? বলছেন *স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ*, যে কোন জিনিস নিজের উপর ক্রিয়া করতে পারে না। ডান হাত দিয়ে আমি সারা জগৎকে ধরে নিতে পারি, কিন্তু ডান হাত দিয়ে নিজের ডান হাতকে কোন দিন ধরতে পারব না। চোখ দিয়ে আমরা সমস্ত জগৎকে দেখে নিতে পারি, কিন্তু আমার চোখ দিয়ে আমি নিজের চোখকে কোন দিন দেখতে পারব না। কোন জিনিসই নিজের উপর ক্রিয়া করতে পারে না, ক্রিয়া করার জন্য subject object এর duality লাগে, subject object duality যদি না হয় ক্রিয়া করা যাবে না। তাছাড়া ব্রহ্ম হলেন শেষ কথা, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নেই। ব্রহ্ম কখন object হন না যে, তার উপর ক্রিয়া করা যাবে।

সমস্যা হল আমরা যখন ব্রহ্ম, শুদ্ধ চৈতন্য বা আত্মার আলোচনা করি তখন অনেক উপমা এনে জিনিসটাকে বোঝানর চেষ্টা করা হয়। যেমন সমুদ্রের উপমা প্রায়ই নেওয়া হয়, কখন আবার আকাশের উপমা নিয়ে আসা হয়। কিন্তু যখনই সমুদ্রের উপমা আনছি, তখনই আমরা মনে করি এইতো সমুদ্রের ঢেউ উঠছে, সমুদ্র যদি শুকিয়ে যায়, সমুদ্র অবশ্যই কোন না কোন সময় শুকিয়ে যাবে। কিন্তু কে সমুদ্রকে শুকিয়ে দেবে? সূর্যই শুকিয়ে দিতে পারবে। সেটা আরেকটা জিনিস এসে গেল। কিন্তু ব্রহ্মের ওখানে তো আর কিছুই নেই, ওটাই আছে। যুক্তির দিকে থেকে তিনি কি নিজেকে নাশ করতে পারেন? কখনই পারবেন না। কারণ নিজের উপর ক্রিয়া হয় না। যেমন আগুন নিজেকে পোড়াতে পারে না, জল নিজেকে ভেজাতে পারে না, এটাই স্বক্রিয়া অভাব।

এখানে যেমন সৎকে ব্যাখ্যা করছেন, সৎ হল ব্রহ্ম, তিনি অব্যয়, অবিনাশী। তাহলে অসৎ কি? আগের শ্লোকে আমরা লম্বা আলোচনা করেছিলাম। এবার আঠারো নম্বর শ্লোকে কি বলছেন আমরা দেখব।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যাস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।।১৮।।

(প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত, অবিনাশী ও নিত্য আত্মার এই সকল দেহ নশ্বর বলে উক্ত হয়েছে। অতএব হে অর্জুন, তোমার এই জড় দেহ কালে বিনষ্ট হবেই; কিন্তু তুমি আত্মারূপে অবিনাশী। অতএব যুদ্ধ করে স্বধর্ম পালন কর।)

যেটারই অন্ত আছে, বিনাশ আছে, সেটাকেই বলছেন অন্তবন্ত। আমরা মরীচিকা দেখছি, মরীচিকাতে জল দেখছি। কিন্তু জ্ঞান হয়ে গেলে বুঝতে পারি, এখানে জল নেই, আসলে এটা বালি। তার মানে জ্ঞানপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ওই মরীচিকার নাশ হয়ে গেল। ঠিক তেমনি জ্ঞান হলে তখন দেখা যায়, জগৎ কখন ছিলই না, সেইজন্য এই জগৎটা হল অন্তবান। যা কিছু জগতে আমরা দেখছি, শরীর হোক, বস্তু হোক সবটাই অন্তবান। এর জন্ম হয়েছে, একদিন সে শেষ হয়ে যাবে। এই যে অন্তবান যা কিছু আছে, শুদ্ধ ব্রহ্ম এই শরীরগুলো ধারণ করে নিচ্ছেন। কিন্তু আসলে এগুলো সব শক্তির খেলা, মায়ার খেলা। সব কিছুর একটা সময় জন্ম হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে, এক সময় সবটারই নাশ হয়ে যাবে।

এখানে একবার বলছেন নিত্য, আরেকবার বলছেন অবিনাশী, ব্যাপারটা খুব interesting। বেদের আলোচনায় একটা নিয়ম আছে, যেখানে বলা হয় পুনরোক্তি দোষ, একই কথা বারবার বলছেন, বেদে এটা নিষেধ আছে। আচার্য বলছেন, আসলে কি হয়, শাস্ত্রের কথা সহজে ধারণা করা যায় না, সেইজন্য শাস্ত্র কৃপা করে একই কথা বারবার বলতে থাকেন যাতে মানুষ ধারণা করতে পারে। ভাগ্নে হৃদয়রাম ঠাকুরকে বলছে, মামা, তুমি একই কথা বারবার বলো কেন? ঠাকুর বলছেন, আমি একই কথা বারবার বলি তাতে তোর কিরে শালা। এটা পুনরোক্তি না, বোঝানর জন্য বারবার বলা হচ্ছে, জানেন এরা বুঝতে পারবে না, তাই বারে বারে মনে করিয়ে দেওয়া হয়। আচার্যরাও অনেক সময় একই কথা বারবার বলেন কারণ উনি জানেন এরা ধারণা করতে পারবে না।

বলছেন *অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য*, *অনাশিনঃ* হল যার কখন নাশ হয় না, অবিনাশী আর প্রমেয় শব্দের অর্থ যেটাকে মেপে নেওয়া যায়, অপ্রমেয় মানে যেটাকে মাপা যায় না। আমরা যখন *মাত্রাস্পর্শাস্তু* আলোচনা করছিলাম, সেখানে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, ইন্দ্রিয়গুলি বাইরে গিয়ে কিভাবে বস্তুগুলিকে গ্রহণ করে, সেখান থেকে মন বলতে পারে আমি এটা জানলাম, জানতে পারে যে আমি এটাকে মেপে নিয়েছি। আত্মা অপ্রমেয়, ইন্দ্রিয় তো দূরের কথা আত্মাকে কোন মন, বুদ্ধি জানতে পারবে না, সেইজন্য বাণীও আত্মার ব্যাপারে কিছু বলতে পারবে না। সেইজন্য আত্মা অপ্রমেয়। কোন প্রমাণের দ্বারা আত্মাকে মাপা যায় না। প্রমাণ মানে যে জিনিসটাকে দিয়ে মাপা হয়, পরে এই বিষয়টা যখন আসবে তখন আমরা বিস্তারে এর আলোচনা করব।

আমরা যে মাপি, সেখানে একটা standard আছে, যেমন এক কিলো ওজন, এটা standard, সেটা দিয়ে বাকি জিনিসকে মেপে বলা হয় এর এত ওজন। প্যারিসে সব standard রাখা আছে, সেখান থেকে কপি সমস্ত দেশে গেছে, যেখান থেকে এক কিলো, এক মিটার এগুলো হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিও জগতের সব জিনিসকে মেপে দেখছে। কোন খাবার জিব দিয়ে চেখে বলে দিই রান্না ভাল হয়েছি কি মন্দ হয়েছে, নুন বেশী হয়েছে কি কম হয়েছে, মিষ্টি বেশী হয়েছে কি কম হয়েছে, সব কিছুকে মেপে নেওয়া হচ্ছে। কিভাবে? জিহ্বার দ্বারা আস্বাদ করে। কারুর বাড়িতে চা খেতে দিলে জিজ্ঞেস করে, চিনি কতটা দেব, যার যে রকম টেস্ট, সেইভাবে মেপে চিনি দেওয়া হবে। জগতের সব কিছুকেই মেপে নেওয়া যায়। আত্মাকে মাপা যাবে না। কেন মাপা যাবে না? কারণ আত্মা সব কিছুর পারে।

তার সাথে আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। যে কোন জিনিসকে জানার জন্য প্রমাণ দরকার। কাউকে কোন কথা বললেই, সে বলবে, এই কথার কি কোন প্রমাণ আছে? বা বলবে, তোমার কথার প্রমাণ দাও। কোন বিষয়ের উপর কিছু লিখতে বললে, আমরা সেখানে লিখি, রবীন্দ্রনাথ এই বলেছিলেন, স্বামীজী এই বলেছিলেন; আসলে আমি বলতে চাইছি, আমার বক্তব্য যে ঠিক, এই কথাগুলো হল তার প্রমাণ। হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে, হাত কঙ্গন কো আরশি কেয়া, হাতে বালা পরে আছ, সেটার জন্য আয়নার কি দরকার। আয়না কিসের জন্য? আমার সাজগোজ ঠিক হয়েছে কিনা, টিপ ঠিক পরা হয়েছে কিনা, চুল ঠিকমত আঁচড়ানো হয়েছে কিনা। কিন্তু হাতে বালা আছে কিনা এটার জন্য আয়নার কিসের দরকার। কারণ এটা হল স্বতঃসিদ্ধ, আমি তো দেখছি আমার হাতে বালা আছে।

বলছেন, আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। তাহলে আত্মা অপ্রমেয়, এ-কথা কেন বলছেন? আচার্য এখানে খুব সূক্ষ্ম যুক্তি আনছেন, খুব সুন্দর বলছেন, মানুষ কোন না কোন ভাবে নিজেকে জানে। আমি ভাব সবারই ভিতর আছে, আমি অমুক, আমি তমুক, আমি সেই –এই ভাব সবারই ভিতর আছে। এই বোধটাই সবাইকে ঠেলে দেয় এক অজানা অনুসন্ধানের দিকে, আমাকে জানতে হবে আত্মার বাস্তব স্বরূপ কি। বাচ্চা থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ সবারই এই বোধটা আছে যে, আমি আছি। এই কথা বলার পর আচার্য বলছেন, যত শাস্ত্র আছে, যত গুরুবাক্যগুলি আছে, এরা আত্মার উপর অনাত্মা বস্তু যে অধ্যারোপ হয়ে আছে, সেই অনাত্ম বস্তুগুলিকে সরিয়ে দিতে সাহায্য করে। যেমন আমি শুদ্ধ আত্মা, আপনিও শুদ্ধ আত্মা, কিন্তু আমি কি আপনাকে শুদ্ধ আত্মা রূপে দেখি? দেখি না। আমি দেখি শরীর, আমি দেখি মন, আমি দেখি এর মন ভাল, ওর মন খারাপ, আমি দেখি বিদ্যা, আমি দেখি বুদ্ধি, আমি দেখি রূপ, আমি দেখি রঙ। কিন্তু রূপ, রঙ, বিদ্যা, বুদ্ধি, মন এ-সবই অনাত্মা, উপর থেকে শুদ্ধ আত্মার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্র, গুরুবাক্য উপর থেকে এগুলিকে সরিয়ে দেন। শাস্ত্র নূতন করে কিছু বলে না, যে অনাত্ম জিনিসগুলো আত্মাকে আবৃত করে রেখছে, শাস্ত্র শুধু সেই অনাত্ম বস্তুগুলিকে সরিয়ে দেয়।

এই সব কথা বলে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, বাপু, তুমি এই জিনিসগুলি ভাল করে বুঝে নাও, এবং বুঝে নিয়ে *তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত*। এই প্রথম গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বললেন। আচার্য শঙ্কর এখানে পরিষ্কার বলছেন, এটা হল অনুমোদন মাত্র। এই পয়েন্টের সাথে মহাভারতের যে মূল সমস্যা, গীতার যে মূল সমস্যা, সেটার সাথে সংযোগ আছে। অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বলে ভগবান এখানে যুদ্ধ করাটা তোমার কর্তব্য এই বিধান দিচ্ছেন না। কারণ অর্জুন তো আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন যুদ্ধ করার জন্য, যুদ্ধভূমিতে এসে ভীষ্ম, দ্রোণ, এবং আত্মীয়স্বজনদের দেখে অর্জুন শোক আর মোহগ্রস্ত হয়ে ভগবানকে পণ্ডিতদের মত অনেক কথা বললেন। অর্জুনকে সেখানে ভগবান একবারও বলছেন না যে, যুদ্ধ করারটাই তোমার কর্তব্য। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে, যুদ্ধ করাটা ঠিক কি ঠিক না, আমি তোমাকে অনুমোদন মাত্র করছি যুদ্ধ করাটাই ঠিক। কিন্তু আমি তোমাকে যুদ্ধ করার জন্য উস্কে দিচ্ছি না, বা বাধ্য করছি না যে, না, তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। তুমি জানতে চাইলে, যুদ্ধ করাটা ঠিক হবে কিনা, তার উত্তর আমি বলছি হ্যাঁ এটাই ঠিক।

অর্জুন এক বীরযোদ্ধা, কিন্তু শোক আর মোহ তাঁর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, অর্জুনের ক্ষত্রিয় ধর্ম, যেটা তাঁর স্বধর্ম, সেই স্বধর্মের স্বাভাবিক অবস্থায় শোক আর মোহ আসতে দিচ্ছে না। সেইজন্য ভগবান এখন যখন বলছেন, তুমি যুদ্ধ করো, এর দ্বারা তিনি অর্জুনের এই শোক আর মোহকে সরিয়ে দিচ্ছেন। এমনও হতে পারে, এখানে এসেই হয়ত সব কথা শেষ হয়ে গিয়ছিল, তুমি জিজ্ঞেস করছিলে যুদ্ধ করাটা ঠিক কিনা, হ্যাঁ আমি বলছি ঠিক, এই এই কারণে। এখানেই সব মিটে যাওয়ার কথা, কিন্তু তারপরেও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনের সংলাপ চলছে। কারণ গীতার একটাই উদ্দেশ্য, এই সংসারের যে কারণ শোক আর মোহ, এটাকে নাশ করা।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, আসল সত্য হল, আত্মা কোন ক্রিয়া করেন না, আত্মার উপরেও কোন ক্রিয়া হতে পারে না, কারণ আত্মা অনন্ত। তাঁর উপর কেউ কাজ করতে পারে না, অনন্তের উপর কে কাজ করবে! অন্য দিকে আত্মাও কারুর উপর কাজ করে না, কারণ আত্মা ছাড়া তো আর কিছু নেই, কাজ করবেন কোথায়! অনেকের হয়ত মনে হতে পারে, কেন এই যে বলা হয় ভগবান আমাদের ফল দেন। আমরা মনে করছি বটে ভগবান আমাদের ফল দেন, কিন্তু ভগবান কাউকে কোন ফল দেন না। ভগবান অবশ্যই আমাদের ফল দিতেন, যদি ভগবান আর আমরা আলাদা হতাম। আর চিরন্তন রূপে যদি আলাদা হতাম। আমরা সবাই বলি, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর দেখবেন। কোন দিন ঠাকুর দেখবেন না, কারণ ঠাকুরের যে সত্তা, সেটা আমারও সত্তা। এই জগতে আমাদের মনে হয় ঠাকুর আমাদের থেকে আলাদা, তাই আমরা মনে করি তিনি আমাদের দেখবেন, ভাল কর্ম করলে তিনি ভাল ফল দেবেন, মন্দ কর্ম করলে তিনি মন্দ ফল দেবেন। তপস্যা জপধ্যান করে যেদিন ঠিক ঠিক বোধ হবে, ঠাকুর আমার ভিতর আছেন, ঠাকুর আপনার ভিতর আছেন, ঠাকুর সবার ভিতর আছেন, সেইদিন এই ভেদভাব মিটে যাবে। আমরা যখন বলি, হে ঠাকুর, অমুক আমার সাথে খুব অন্যায় করেছে, আমার ভাল না হক, ও যেন শাস্তি পায়, ও যেন কষ্ট পায়। কিন্তু যেদিন দেখব, ঠাকুর তার ভিতরেও আছেন, তখন কি আর এই কথা বলা যাবে বা বলতে পারব?

গীতা এখন কঠোপনিষদের দুটি মন্ত্রকে সরাসরি তুলে আনছেন, দুটো মন্ত্রে শব্দ বিন্যাসে একটু তফাৎ আছে, কিন্তু বাকি সব কিছুই সমান। পঞ্চোদশ অধ্যায়েও আবার কঠোপনিষদ থেকে একটা মন্ত্র নিয়ে আসবেন। কঠোপনিষদ থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে মানে, এই প্রমাণ দেওয়ার জন্য যে, ব্যাসদেব বা ভগবান যে কথাগুলো বললেন, এই কথাগুলো তাঁর মনের কথা নয়, তাঁর বুদ্ধির কথা নয়, কারণ বেদেও এই একই কথা বলা হয়েছে। এই প্রমাণ দেওয়ার জন্য ঊনিশ নম্বর আর কুড়ি নম্বর শ্লোক নিয়ে আসছেন, এই দুটো শ্লোক আসলে বেদেরই মন্ত্র।

আঠারো নম্বর মন্ত্রে বর্ণনা কর হল, আত্মা, যেটা আমাদের অস্তিত্ব, এটাই আসল। এই শরীরটা *অন্তবন্ত*, এর নাশ হয়। তার আগে মন্ত্রে বলেছিলেন *নাসতো বিদ্যতে ভাবো*, এই শ্লোকটা ভাল ভাবে বুঝে নিলে আমাদের বেদান্ত বুঝতে সুবিধা হয়। অসৎ জিনিস কখন অস্তিত্বে আসে না, সৎ জিনিসের কখন অভাব হয় না। বাকি যে জিনিসগুলো হচ্ছে, এগুলো শুধু পরিবর্তন। পরিবর্তনটা আমাদের কাছে নাশের মত মনে হয়, আর পরিবর্তনটাই আমাদের কাছে জন্মের মত বোধ হয়।

গীতাতে একটা শব্দ বারবার আসবে, যেটা আসা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, যখন ভগবান অর্জুনকে কর্ম নিয়ে বলছেন –যুদ্ধ কর। তৃতীয় অধ্যায়ে এটাকে আরও বিস্তারে আলোচনা করবেন। আচার্য বলবেন, শাস্ত্রে পুনরোক্তির নিষেধ আছে, একই কথা বারবার বলা নিষেধ আছে। আচার্য স্বীকার করছেন, গীতাতে কিন্তু পুনরোক্তি আছে, একই কথা অনেকবার বলা হয়েছে। আচার্য তখন বলছেন, আসলে বিষয়টা অতীব দুর্বোধ্য কিনা, বোঝা বা ধারণা করা খুব কঠিন, সেইজন্য বারবার করে বলা হচ্ছে। গীতা প্রথম প্রথম যদি কোন ভাল আচার্যের কাছে শোনার সৌভাগ্য হয়, তখন শোনার পর মনে হবে গীতা সব বুঝে ফেলেছি। সেই গীতাই সাত বছর পর যখন ট্রেনিং সেন্টারে এসে পড়তে হয়, তখন গীতার কথা শুনতে শুনতে মনে হয়, সাত বছর আগে আমি কি বোকাই না ছিলাম, তখন মনে হত সব বুঝে ফেলেছি। তারপর আরও দশ বছর পনের বছর নিজে নিজে যখন গীতা অধ্যয়ন করে চিন্তন মনন করতে শুরু হয় তখন মনে হবে, প্রথম যখন গীতা শুনেছিলাম, তখন কি আমি গীতা সত্যিই বুঝেছিলাম? যত গীতার গভীরে গিয়ে চিন্তন মনন করা হবে, ততই মনে হবে, এর আগে কি আমি গীতা সত্যিই আদৌ বুঝতে পেরেছিলাম? একটা সময় আসে তখন মনে হয় আশা করি সত্যিই আমি গীতা বুঝে নিয়েছি, কিন্তু তখনও মনে একটা খটকা লেগে থাকে, জানি না পরে নিজের উপর হাসতে হবে কিনা। কিন্তু বিজ্ঞান বা সাহিত্য বা অন্য কোন বিষয় বুঝে নিলে হয়ে

গেল, আমি আলাদা জ্ঞান আলাদা। ধর্ম তত্ত্বে তা হয় না, যতক্ষণ ওই তত্ত্বের সাথে আমি এক না হয়ে যাচ্ছি, তার অর্থ হল ততক্ষণ কিন্তু আমি ঠিক ঠিক বুঝিনি। যদি তাত্ত্বিক ভাবে জিনিসটাকে ঠিক ঠিক বুঝে নেওয়া যায়, তারপর যখন প্রত্যক্ষ হয়, বাস্তব জ্ঞানটা যখন হয়, তখন দেখে, পড়ে যা বুঝেছিলাম এখন ঠিক তাই মিলছে।

গীতাতে একটা শব্দ বারবার আসবে, যে শব্দটা আমরাও আনতে বাধ্য, তা হল কর্ম। এই কর্ম দুই প্রকার হয় – লৌকিক কর্ম ও বৈদিক কর্ম। লৌকিক কর্ম হল, যে কর্ম দিয়ে আমাদের ঘর সংসার, প্রাত্যহিক জীবন চলছে। বৈদিক কর্ম হল, বেদ যেটা আমাদের করতে আদেশ করছে। আদেশ আর নির্দেশ দুটো আলাদা অর্থ বহন করে। বেদ আমাদের আদেশ দেয়, আর বাড়ির লোকেরা নির্দেশ দেয়। গীতার আলোচনায় অধিকার আর কর্তব্য, এই দুটি শব্দও ঘুরে ঘুরে আসবে। অধিকার আর কর্তব্য এই দুটি গীতার টেকনিক্যাল শব্দ। কর্তব্যের অর্থ দায়ীত্ব, আমাকে এটা করতে হবে। অধিকার থেকে যে অর্থ বেরিয়ে আসে, তা হল, তোমার এলাকা এত পর্যন্ত, তোমার যতটুকু এলাকা এর মধ্যে তোমাকে এই এই করতে হবে।

আচার্য এবার জ্ঞানীর ব্যাপারে বলতে শুরু করেছেন। জ্ঞানী বলতে এখানে একটা জিনিস ভাল করে বোঝার আছে। যিনি তত্ত্বতঃ বুঝে নিয়েছেন আত্মাই সত্য, তিনিও জ্ঞানী, আবার যাঁর জ্ঞান হয়ে গেছে অর্থাৎ আত্মাকে যিনি প্রত্যক্ষ করে নিয়েছেন, তিনিও জ্ঞানী আর যাঁরা এই পথে পা রেখেছেন তাঁরাও জ্ঞানী। জ্ঞানী বলতে এই তিনটে অর্থেই বলা হয়। এখন জ্ঞানী কোন জায়গায় কোন অর্থে বলছেন, বলা মুশকিল, ভাষ্য দেখে বুঝে নিতে হয়। আচার্য বলছেন, যিনি তত্ত্বতঃ বুঝে গেছেন, তাঁর আর কোন কর্তব্য থাকে না।

স্বামীজী আলমোড়াতে অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করেছিলেন, কলকাতার এন্টালিতে তারই একটা শাখা আছে। সেখানে কোন পূজা আদি হয় না, কোন ধরণের উপাচার হয় না। ওখানকার সাধু ব্রহ্মচারীরা প্রত্যেক রবিবার বেলুড় মঠে আসেন। বেলুড় মঠের সাধুরা এনাদের দেখে রসিকতা করে বলতেন, 'এই রে এদের এবার অদ্বৈত থেকে দ্বৈতে মনটা নেমেছে'। মাঝে মাঝে মজা করার জন্য বলতেন, 'আচ্ছা তোমরা খাও কি করে? যে অদ্বৈত সে খাবে কেন'? ব্রহ্মচারীরা তখন বুঝতে পারতেন না, এসব প্রশ্নের কি উত্তর হতে পারে। আসলে বলতে চাইছেন, যেখানেই কর্তব্য বোধ আছে, তার মানে মনে একটা চাঞ্চল্য আছে। কারণ কর্তব্য বোধ থাকা মানে মনে চাঞ্চল্য থাকবে। হিন্দুরা যদি বৈদিক কর্ম না করে, তাহলে তাদের মন খুঁত খুঁত করবে। একজন হিন্দু জানে বৈদিক কর্ম করা আমার কর্তব্য, এটা আমাকে করতে হবে। কর্মের নিয়ম হল, যেমনি একটা কর্মের কথা জেনে গেল, যেমন ব্রাহ্মণ ছেলের উপনয়ন হয়ে গেলে তার গুরু বলে দেন, তুমি আজ থেকে দ্বিজ হলে, আজ থেকে তোমাকে এই এই করতে হবে। প্রথম দিন থেকে নিয়ম ভেঙে যায়, সেটা আলাদা জিনিস। কিন্তু এখনও গুরুরা বলে দেন, তোমাকে রোজ এই এই করতে হবে। কুমারী মেয়েকে তার বিয়ের প্রথম দিন থেকেই বড়রা সাবধান করে দেন, বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তোমার এখন বিয়ে হয়ে গেছে এখন তোমার এই এই দায়ীত্ব। ঠিক তেমনি বৈদিক কর্ম করাটা দায়ীত্ব।

গীতায় যখন কর্মের কথা আসে, সেখানে খুব সাধারণ স্তরে বৈদিক কর্মের যে বিধান আছে, সেটাকে নিষেধ করছেন। আর উচ্চস্তরে গিয়ে সমস্ত কর্মের নিষেধ হয়ে যায়। তাহলে যে মজা করে বলতেন, জ্ঞানীরা কি খায় না? সাধারণ স্তরের জ্ঞানীরা অবশ্যই খান, আমি খাচ্ছি এই বোধ থাকে না। সমাধিবান পুরুষ, যেমন ঠাকুর ছিলেন, তাঁর খাওয়া-দাওয়ারও কোন হুঁশ থাকত না, কোন রকমে মুখের মধ্যে একটু দুধ ঢেলে দিচ্ছে, সেখানেও বেশীর ভাগ দুধ বাইরে গড়িয়ে পড়ত।

কথামৃতে একটা খুব বিখ্যাত গল্প আছে, ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন, কোন নৌকা নেই, গোপীরাও দাঁড়িয়ে আছেন। গোপীরা বলছেন, যমুনার পারে যাবার জন্য আপনি কিছু একটা করুন। ব্যাসদেব বললেন, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আগে কিছু আমাকে খেতে দাও। গোপীদের কাছে দই, মাখন ছিল, ব্যাসদেবকে খেতে দিলেন। খাওয়ার পর ব্যাসদেব বললেন, আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তাহলে হে যমুনে তুমি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। তাই হল, যমুনা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, সবাই সেই পথ দিয়ে যমুনা হেঁটে পার হয়ে গেল। গোপীরা ভাবছেন, তিনি এত কিছু খেলেন, তাও কি করে বললেন, যদি আমি কিছু না খেয়ে থাকি? এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত সত্যটা বোঝা একটু কঠিন। ব্যাসদেব, যাঁর আমিত্ব হল শুদ্ধ আত্মার, শুদ্ধ আত্মা কখন কোন ধরণের ক্রিয়া করেন না, খাওয়া-দাওয়া, এটা, সেটা কিছুই করেন না। আদৌ যদি তাঁর মন একটু নীচে নেমে থাকে, তখন যেটা সামনে পড়ে গেল, সেটা করে বেরিয়ে যান। তাঁরা দায়ীত্ব বোধ নিয়ে কিছু করেন না, যা কিছু করেন করুণাবশাৎ।

একটা কাহিনী আছে, মূলতঃ এটা খ্রীশ্চান সম্প্রদায়ের কাহিনী, এখন সব পরম্পরার লোকেরা নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছে। দুজন ফাদার নদী পার করবেন বলে ঘাটে এসেছেন, সেখানে একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটি পায়ে আঘাত পেয়েছে, হাঁটতে পারছে না, তার প্রেমিক নদীর ওপারে থাকে, সে তার প্রেমিকের কাছে যাবে বলে মন খারাপ করে বসে আছে। একজন ফাদার তাকে নিজের কাঁধে বসিয়ে নিয়ে ওপারে গিয়ে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। তারপর ফাদার দুজন নিজেদের চার্চে চলে গেছেন। অন্য ফাদারের কাছে এই কাজটা ভাল লাগেনি। সন্ধ্যাবেলায় দেখা হতে বলেই দিলেন, 'আপনি একজন খ্রীশ্চান ফাদার, একটা যুবতী মেয়েকে কাঁধের উপর তুললেন? এটা আপনি কি করলেন'? উনি তখন হেসে বলছেন, 'আমি তো নদীর পারেই যুবতী মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে এসেছি, আর আপনি এখন তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন'? আসলে তিনি জ্ঞানী নন, আইডিয়াটা ঠিক তাই। ইনি জ্ঞানী, সামনে পড়ে গেছে, একটা কিছু করে দিলাম, করে বেরিয়ে গেলেন।

একবার অমরনাথ যাত্রায় কিছু সন্ন্যাসী চলেছেন। যেতে যেতে একজনের পায়ে কি করে একটা চোট লাগে, তিনি ব্যাথায় বসে পড়েছেন। সন্ন্যাসীরা সবাই চিন্তিত। সেই সময় অন্য এক সম্প্রদায়ের সাধু ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, পরে জানা গেল তিন প্রতি বছর পায়ে হেঁটে অমরনাথ দর্শনে যান। তিনি দেখছেন একজন সাধুর পায়ে চোট লেগেছে। তিনি তাঁর ছোট্ট একটা পুটলি থেকে কি একটা বার করে ওনার পায়ে ঘষে দিয়ে বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই সব ঠিক হয়ে যাবে'। দিয়ে তিনি হন্ হন্ করে সামনের দিকে এগিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। জিজ্ঞেসও করলেন না, আপনারা কোথা থেকে আসছেন, কোথায় থাকেন, কোন সম্প্রদায়ের। আমরা তো খোস গল্প জুড়ে দিতাম, আরও আগ বাড়িয়ে হয়ত বলতাম, চলুন সামনে একটু চা খাওয়া যাক। কিছুই না, অতটুকু করে দিয়ে যেমন হন্ হন্ করে আসছিলেন, তেমন হন্ হন্ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। এটাকে বলে নিষ্কাম কর্ম। সামনে একটা কাজ কিংবা কোন সমস্যা এসে গেল, করে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব, আচার্য শঙ্কর, এনারা সবাই জ্ঞানী, এনাদের কখনই মনে হবে না যে, আমি কিছু করছি। যদি কাহিনীর মাধ্যমে বুঝতে হয়, তাহলে আমাদের ব্যাসদেবের যমুনা পার হওয়ার কাহিনীকে মনে রাখতে হবে।

আগে যেখানে আমরা শেষ করলাম, সেখানে বলছেন *তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত*। এবার এখান থেকে যে দুটি শ্লোকে যাচ্ছেন, এই দুটি শ্লোক কঠোপনিষদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ব্যাসদেব ছিলেন একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব; ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, সাহিত্য সব বিষয়ে তাঁর সাংঘাতিক ক্ষমতা, অথচ তিনি ছিলেন এক অবৈধ সন্তান। পরাশর মুনি ও এক জেলের মেয়ের সম্পর্ক থেকে ব্যাসদেবের জন্ম। সেইজন্য অনেক শাস্ত্রে ব্যাসদেবকে বলা হয় পরাশার্য, পরাশর মুনির সন্তান। তাহলে কেন আমাদের শাস্ত্রের কোথাও এর নিন্দা বা সমালোচনা করা হয় না? কারণ আমাদের

কাছে এই স্থূল শরীরটার কোন গুরুত্ব নেই, সূক্ষ্ম শরীরের গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক বেশী। যেমন শুকদেব, ব্যাসদেব আবার বিয়েই করলেন না, কিন্তু তাঁর সন্তান শুকদেব। অন্য দিকে কৌরব, পাণ্ডবরা হলেন ব্যাসদেবের সন্তান। এনারা সব সময় সূক্ষ্ম শরীরকে গুরুত্ব দেন। কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরকে একটা স্থূল শরীর ধারণ করার জন্য তাকে একটা গর্ভ দিয়ে আসতে হয়। সেই গর্ভ কিভাবে হবে, সেদিকে এনারা বেশী দৃষ্টি দিতেন না। ব্যাসদেব প্রথম যে কাজটা করলেন, বেদের সব ঋচাগুলি, যেগুলি বিভিন্ন ঋষি, বিভিন্ন আশ্রমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, উনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেদের সব ঋচাগুলিকে সংগ্রহ করে এক জায়গায় রেখে দিলেন। পরাশার মুনির সন্তান হওয়াতে তাঁর বিরাট সম্মান, তার সাথে উনি খুব ভাল ভাল শিষ্য পেয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিক ভাবে ব্যাসদেব বেদ উপনিষদ সবটাই জানতেন। চারটে বেদেরই জ্ঞান তাঁর আছে, বেদের জ্ঞানরাশি তিনি তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন।

ব্যাসদেব আর-একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি ঠিক করে দিলেন। হঠাৎ একজন উঠে বলে দিল, আমি এই সত্যটা পেয়েছি, এটা সত্য। ইদানিং কালে সোস্যাল মিডিয়াতে, বিশেষ করে ফেসবুকে, ইউটিউবে বাবাজীরা ছেয়ে আছেন, কেউ গান শেখাচ্ছেন, কেউ নাচ শেখাচ্ছেন, কেউ আবার ধ্যান শেখাচ্ছেন। খারাপ কিছু না, ঈশ্বরীয় কথাই বলছেন। কিন্তু যখন ঘষতে শুরু করা হবে, তখন তাঁদের ভিতরের সব চুনোপুটি বেরিয়ে আসতে শুরু হবে। ঠাকুর যেমন বিদ্যাসাগরের নামে বলছেন, চুনোপুটি বেরিয়ে এলো। ভিতরের অজ্ঞানরাশি গুলি বেরোতে শুরু হয়ে যায়। ব্যাসদেব কি করলেন, গীতাতে আমরা এটা পরিষ্কার দেখতে পাই, এবং পরে হিন্দু পরম্পরায় এটা দাঁড়িয়ে গেল – সত্যের তিনটে মাপকাঠি, three conditions of truth। হঠাৎ একজন উঠে বলে দিলেন আমি বলছি, এটা তোমরা মানো, আমি বলছি এটা সত্য, তোমরা মানো। আমরা কেউই মানতে বাধ্য হব না, যতক্ষণ না এই তিনটে মাপকাঠি দিয়ে তোমার কথাকে দেখা হচ্ছে। হঠাৎ যে কোন লোক একটা কথা বলে দেবে, সেই কথা আমরা কি করে মেনে নেব?

এই তিনটে মাপকাঠি দিয়ে দেখা হবে– শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি। শ্রুতি মানে, তুমি যে কথাটা বললে, তোমার এই কথার পরম্পরা আছে কিনা। একজন এসে বলছে, আমার জ্ঞান আছে, এই জ্ঞান আর কারু হবে না। তোমার এই কথা আমরা কোন দিন শুনিনি, অর্থাৎ এর কোন পরম্পরা নেই; কি করে তোমার কথা গ্রহণ করব! দ্বিতীয় মাপকাঠি যুক্তি, জিনিসটা যুক্তিতে ঠিক ঠিক দাঁড়াচ্ছে কিনা। আমরা গীতার আলোচনায় শাস্ত্রের কথা বলছি; ভগবান, ঈশ্বর, আত্মা, জীব, জগৎ সবই বলছি, আবার যেমন যেমন সুযোগ আসছে, তেমন তেমন এর পিছনে কি কি যুক্তি আছে, সেটারও আলোচনা করে যাচ্ছি। সবচেয়ে বড় হল তৃতীয় মাপকাঠি অনুভূতি। আপনি যে কথা বলছেন, এটা আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন কি? বা আগে বা পরে কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন কি করেননি? বলতে পারেন, বেদে একটা কথা আছে যে, যুক্তিতে দাঁড়ায় কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যায় না, ওটার কোন দাম নেই। এই হল শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতি; সত্যটা আদৌ সত্য কিনা তার পরিমাপ করার এই তিনটে শর্ত।

ব্যাসদেব এখন আত্মতত্ত্ব বলতে শুরু করলেন, এর পরেও বলবেন। ব্যাসদেবের যে authority, তাতে সবাই মেনে নেবেন, আর সবটাই ব্যাসদেবের নিজের রচনা। কিন্তু তিনি এই জায়গাতে যাতে কারুর কোন সংশয় না হয়, সেইজন্য কঠোপনিষদ থেকে দুটো মন্ত্র নিয়ে আসছেন। ওনার বক্তব্য হল, এখানে আমি যে কথা বলছি, এটা যে শুধু আমি বলছি তা না, বেদেও একই কথা বলা হয়েছে। বেদ মানে হিন্দুদের শেষ কথা। ব্যাসদেবও নিজের মত করে বলছেন। এটাই একজন লেখক বা প্রবন্ধকারের সঠিক পন্থা, আপনি নিজের কথা বলুন, আপনি লিখুন আপনি কি বলতে চান। তবে যদি মনে হয় এই জায়গাতে কোন বিতর্কের সম্ভবনা আছে, বা লোকের মনে

সংশয় হতে পারে, তখন সেখানে এমন একজনের একটা কোটেশান দিতে হয়, যাঁকে সবাই মানে, যাঁর কথাকে সবাই মান্যতা দেয়, দেখানো যে উনিও এই কথাই বলেছেন।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।।১৯।।

(যিনি এনাকে হন্তা বলে মনে করেন এবং যিনি এনাকে নিহত বলে ভাবেন, এনারা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানেন না। আত্মা কাউকেও হত্যা করেন না এবং কারও দ্বারা নিহতও হন না। কারণ, আত্মা অবিনাশী।)

প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত আত্মাকে নিয়েই আলোচনা চলছে। যে মনে করছে আমি মারছি, মারা মানে হনন ক্রিয়া, তার সাথে যে মনে করছে, আমি মারা গেলাম, দুজনেই ভ্রান্ত। আত্মার যে বাস্তবিক স্বভাব, এটাকে তারা জানে না তাদের অবিবেকীতার জন্য। তাদের বুদ্ধি এমন ভাবে আবৃত হয়ে আছে যে, তারা আত্মার বাস্তবিক স্বরূপ জানে না। সেইজন্য তারা মনে করে, আমি মারছি বা আমি মারা গেলাম। এখানে যে হনন ক্রিয়া আনা হচ্ছে, অষ্টাদশ অধ্যায়ে গিয়ে আবার এটাকে নিয়ে বলবেন। কিন্তু অর্থটা শুধু মারামারিকে নিয়ে না, হনন ক্রিয়া দিয়ে সমস্ত ক্রিয়াকে নিয়েই বলা হচ্ছে। এখানে ব্যাসদেবের যমুনা পার হওয়ার কাহিনীটা মনে রাখতে হবে, সমস্ত ক্রিয়াকে নিয়েই বলা হচ্ছে। উনি যেটাই করছেন, তিনি জানেন এটা আমি করছি না। আমার শরীর ইন্দ্রিয় সব করছে, আমি এগুলো থেকে আলাদা।

একটা ঘটনা আছে, কঙ্খলের সেবাশ্রমে এক সাধুবাবা এসেছেন, তার শরীরে বিশাল একটা ক্ষত হয়েছে, ওটার অপারেশান করাতে হবে। সাধুবাবাকে বলা হল, অপারেশানের জন্য ওনাকে এ্যানাস্থেসিয়া দেওয়া হবে। সাধুবাবা গীতার শ্লোক আউড়ে বলছেন, 'আরে উসকো কুছ জরুরৎ নহি, *য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্*, ম্যায় তো শুদ্ধাত্মা হুঁ'। ডাক্তার ছুরি চালিয়ে দিয়েছে। সাধুবাবা যন্ত্রণায় খুব জোর চেঁচিয়ে উঠেছেন। 'এই যে আপনি বলছিলেন, আপনি শুদ্ধ আত্মা'। 'আরে ওতো গীতা মে হ্যায়'। গীতার শ্লোক এমনিতে ফরর ফরর করে মুখে বলা যায়, কিন্তু জীবনে নামাতে গেলে দম বেরিয়ে যাবে। ছুরি চালাতেই তখন চিৎকার করে উঠবে।

স্বামী তুরিয়ানন্দজী মহারাজের পিঠে একবার কার্বঙ্কল হয়েছিল। ওনার পিঠেও ডাক্তার ছুরি চালাতে গেছে, উনি সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, দাঁড়াও, আগে মনটাকে তুলে নিই। মহারাজ মনটাকে ওখান থেকে উঠিয়ে নিলেন, ডাক্তারও আরামসে অপারেশন করে দিলেন। আবার আরেকদিন কি আর-একটা অপারেশন করতে যাচ্ছিল, ওনাকে না জানিয়েই ছুরি চালাতে গেছে, ছুরি লাগাতেই মহারাজ জোর চিৎকার করে উঠেছেন। ডাক্তার বলছেন, 'আগের অপারেশান তো এর থেকে অনেক বড় ছিল, সেদিন কিছু বললেন না, আজ কেন চেঁচিয়ে উঠলেন'? মহারাজ বললেন, 'তখন আমি তো মনটাকে সরিয়ে নিয়েছিলাম, এখন তো মন আমার ওখানে লাগানো আছে'। এই হল দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। বয়স কালে লোকেরা আসে মনের নিয়ন্ত্রণ করতে, যে বয়সে বাহ্য প্রস্বাবের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, আর উনি করবেন মনের নিয়ন্ত্রণ। একদিনেই সবাই যোগী হতে চাইছে, যেখানে খুশী মনকে লাগাবো, মন সেখানে বসে যাবে, যখন চাইব তুলে নেব। একদিনে কি এই ক্ষমতা আসবে! এই ঘটনা গুলো বলা হল বোঝানর জন্য। এটা যে অসম্ভব তা না, এটা যে একজন দুজনের হয়েছে তাও না, এটা যে একদিনেই হয়ে যাবে তাও না। তাই বলে যে সবারই হয়ে যাবে, তাও না।

এই শ্লোকে একজন মারছে, আরেকজন মার খাচ্ছে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের মতে যে মারছে, তাকে বলা হয় কর্তা, ইংরাজীতে subject। যে মার খায় বাংলার ব্যকরণে বলে দ্বিতীয়া,

ইংরাজীতে object, আর এর সংস্কৃত শব্দ হল কর্ম। কর্ম বললে সংশয় হয়ে যাবে তাই আমরা দ্বিতীয়া বলি, প্রথমা আর দ্বিতীয়া। যিনি ক্রিয়া করেন, তাকে বলা হয় কর্তা, যার উপর ক্রিয়া করা হয় তাকে বলে দ্বিতীয়া। এখানে বলছেন, *য এনং বেত্তি হন্তারম্ যশ্চৈনং মন্যতে হতম্*, এখানে যে মনে করছে আমি মারছি, সে হল কর্তা আর যে বলছে আমি মার খাচ্ছি, সে হল দ্বিতীয়া, subject and object। আত্মা subjctও না, আত্মা objectও না। কিন্তু প্রায়ই বলা হয় eternal subject, এটা উপাচার, ব্যবহারের দৃষ্টিতে বলা হয়। কারণ একমাত্র আত্মা, যাঁর চৈতন্য আছে, একমাত্র আত্মা, যিনি জানতে পারেন। কিন্তু এই জানাটা এখানে ক্রিয়া অর্থে না। যেমন আমি কলমটা দেখছি, আমি কলমটা ধরলাম; এখানে আমি কর্তা; ধরা, দেখা ক্রিয়া আর কলম দ্বিতীয়া।

আমি আর কলমের সাথে ক্রিয়া জড়িয়ে আছে, তার সাথে কারকের বিভক্তিগুলি ধরলে আরও অনেকে কিছু এসে জুটে যাবে। যেমন আমি হাত দিয়ে কলম ধরছি, এখানে আরেকটা বিভক্তি জুটে গেল। সংক্ষেপে এটাকে তিনটেতেই নিয়া আসা হয়, কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া। আত্মার ব্যাপার যেখানেই আসবে, সেখানে না আসবে কর্তা, না আসবে কর্ম আর না আসবে ক্রিয়া। কথামৃতে ঠাকুর একাধিকবার বলছেন, ধ্যাতা, ধেয় ও ধ্যান এক হয়ে যায়, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হয়ে যায়। এক হয়ে যাওয়া মানে, ওখানে আত্মা ছাড়া কিছুই থাকে না। এগুলো ধারণা করা যায় না, তাতে মন খারাপ করে বসে থাকলে তো চলবে না, শুনে যেতে হবে। শুনতে শুনতে একটা ধারণা হবে, তখন আত্মার ব্যাপারে একটা দৃঢ় বিশ্বাস আসবে, এতেও অনেক উপকার হবে।

এখানে বাতিল করা হচ্ছে; আত্মা কর্তাও নন, আত্মা কর্মও নন। যিনি কর্তাও নন, কর্মও নন, তাহলে তিনি ক্রিয়া কি করে করবেন? আত্মা না করেন কোন ক্রিয়া, না করা যায় তঁর উপর কোন ক্রিয়া। এর আগেও বলেছিলেন যে, নিজের উপর কখনই ক্রিয়া করা যায় না। কারণ একমাত্র আত্মাই আছেন, এবং আত্মা অনন্ত; ফলে তিনি সাবজেক্টও নন, অবজেক্টও নন, তিনি কার উপর ক্রিয়া করবেন! এগুলো কেন হয় না? কারণ কর্তা যেখানে হবে, কর্ম যেখানে হবে, ক্রিয়া যেখানে হবে, সেখানে বিকার থাকতে হবে। অনন্ত যিনি, তাঁর বিকার হয় না। সীমিত যিনি, তাঁরই বিকার হবে। খুব সাধারণ কথা, আমি হয়ত বললাম, দুধটা কেটে গেল। তার মানে দুধের উপর একটা ক্রিয়া হল। কেন ক্রিয়া হল? কারণ দুধ হল বিকারবান। লোকটা মারা গেল। কেন মারা গেল? কারণ মানুষ বিকারবান। যে জিনিসটা বিকারযুক্ত, তার উপরেই ক্রিয়া হবে, তা নাহলে কোন কর্ম হবে না। যার কোন বিকার নেই, তার উপর আমরা কি করে ক্রিয়া করব! লোহাকে আমরা ইস্পাতে রূপান্তরিত করে দিতে পারি। হীরা এত কঠিন পদার্থ, তাকেও আমি পালিশ করে বিশেষ ভাবে ভেঙে দিতে পারি। বলে এ্যটমকে ভাঙা যায় না, কিন্তু ইউরেনিয়াম এবং অন্য অনেক কিছু এ্যটমকে ভেঙে দিচ্ছে, যদিও অন্যান্য এ্যটমকে ভাঙা একটু কঠিন। বিকারযুক্ত মানেই সে যৌগিক, যেটা দুই বা দুইয়ের অধিক জিনিস দিয়ে তৈরী, সেটা বিকারবান। যেটাই বিকারবান, সেটারই উপরে ক্রিয়া হবে। আত্মা হলেন, সহজ, সরল, অনন্ত, ফলে তাঁর মধ্যে কোন বিকার হয় না। এই জিনিসটাকে এবার কুড়ি নম্বর শ্লোকে বলছেন, এটাও কঠোপনিষদের মন্ত্র।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ।।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।২০।।

(এই আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না। কারণ পূর্বে না থেকে পরে বিদ্যমান হওয়ার নাম জন্ম এবং পূর্বে বিদ্যমান থেকে পরে না থাকার নাম মৃত্যু; আত্মাতে এই দুই অবস্থার কোনটিই নাই। অর্থাৎ আত্মা জন্ম ও মৃত্যু-রহিত, অপক্ষয়হীন এবং বৃদ্ধিশূন্য; শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।)

কুড়ি নম্বর শ্লোক হল হিন্দু ধর্মের প্রাণ, বেদান্তের প্রাণ। এই একটি মন্ত্র যদি মনে রাখা যায়, তাহলে আত্মতত্ত্ব কি, পুরোটাই পরিষ্কার বোঝা যায়। এই কুড়ি নম্বর শ্লোক থেকে সেই আত্মতত্ত্ব এবং বেদান্ত কিভাবে বেরিয়ে আসছে আমরা বোঝার চেষ্টা করব। যুক্তিটা এখানে খুব সাধারণ। কোন জিনিসের পরিবর্তন তখনই করা যাবে, যদি সেটা যৌগিক হয়। কোন মৌলিক জিনিসের উপর কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। পরে আমরা আর-একটা যুক্তি নিয়ে আলোচনা করব, যেখানে বলা হবে যেটা খুব সরল, একেবারে বেসিক, যেমন কেমেস্ট্রিতে বলা হত building blocks, একেবারে fundamentals, এই মৌলিক জিনিসকে পরিভাষিত করা যায় না। যেগুলি যৌগিক, সেগুলিকে মৌলিকের সাহায্যে পরিভাষিত করতে হয়। যদি আমরা দুইকে ব্যাখ্যা করতে চাই, তাহলে এক দিয়ে আসতে হবে, এক আর এক দুই। জগতের যে কোন জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে হলে, যেটা সহজ সেটাকে দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হয়।

বাচ্চা যখন প্রথম শিক্ষা পায়, তখন সে একটা জিনিসকেই জানে, তার ফুড সোর্সকে। মা বুকে টেনে এনে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, তখন সে জানে এটা আমার ফুড সোর্স। আড়াই মাস, তিন মাসের বাচ্চাকে যে কেউ গালে লাগালে সে গালটাকেই চুষতে থাকবে দুধ খাওয়ার জন্য। ওই বয়সের শিশু শুধু খাওয়াটাই বোঝে। বাবাকে যবে থেকে দেখতে শুরু করে, বাচ্চা তফাৎ করতে পারে না, বাবাও তার কাছে মায়ের মত মনে হয়। ওর কাছে একটাই শব্দ ফুড সোর্স। কোন ভাষা, কোন সংস্কৃতি কত সমৃদ্ধ যদি বুঝতে হয়, আমাদের দেখতে হবে তার জন্য কত শব্দ আছে। যে কোন সমৃদ্ধ ভাষা, যেমন সংস্কৃত ভাষা, খুব সমৃদ্ধ ভাষা, একটা জিনিসের জন্য পঁচিশ খানা শব্দ আছে। সংস্কৃতে এক এক বয়সের জন্য তার এক একটা নাম, এইভাবে হাতির ষাট খানা শব্দ আছে। এক বছরের হাতির এই নাম, দু বছরের হলে এই নাম, তিন বছরের হলে এই নাম। হাতির উপর সংস্কৃতে একটা পুরো বই আছে গজশাস্ত্র, শুধু হাতিকে নিয়ে। এতেই বোঝা যায় সংস্কৃত কত সমৃদ্ধ ভাষা। আইসল্যাণ্ডে শুধু বরফের জন্য চল্লিশ খানা নাম আছে। নূতন বরফ, বরফ জমে গেছে, বরফ টুকরো হয়ে আছে, সব আলাদা আলাদা নাম। কিন্তু আমাদের কাছে একটাই শব্দ, বরফ। এইভাবে বোঝা যায় কোন ভাষা কত সমৃদ্ধ।

আমরা বলছিলাম, সহজকে দিয়ে যৌগিককে বোঝান হয়। সহজকে বোঝান যায় না, সহজকে ধারণা করতে হয়। আত্মা সহজ, ঈশ্বর সহজ, সেইজন্য আত্মা বা ঈশ্বরকে কোন দিন ব্যাখ্যা করা যাবে না। আত্মা বা ঈশ্বরকে দিয়ে বাকি সব কিছুর ব্যাখ্যা হবে। আত্মা সহজ, সেখান থেকে সব কিছুই যৌগিক, সৃষ্টি মানেও তাই; কিন্তু সৃষ্টির যে উৎস, সেটা সহজ। মৌলিকের সাথে অনেক কিছু মিলে মিশে অনেক কিছু দেখায়, আত্মা ওই অর্থে সব কিছুর মিলে মিশে দেখা না। এটা বোঝানর জন্য। আমরাও দিনরাত কিভাবে এই জিনিসগুলিকে নিয়ে আছি। যেমন রঙ, মাত্র তিন খানা রঙ, এই তিনটে রঙ মিলেমিশে জগতে কত রকম রঙের বাহার হয়ে চলেছে।

আগে বলা হল আত্মা অবিকারী। তার সাথে বলা হল, আত্মা সাবজেক্টও না, অবজেক্টও না, কেন এই রকম বলা হচ্ছে? কারণ আত্মা অবিকারী, আত্মার কোন ধরণের বিকার নেই। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আত্মা কি, তখন আমরা এই কুড়ি নম্বর শ্লোক বলতে পারি। আর সেটা যদি মনে না থাকে, তাহলে একটা কথাই বলা যেতে পারে, আত্মা অনন্ত। আর কিছু বলার দরকার নেই। একবার অনন্ত শব্দটাকে নিয়ে এলে, বাকি সব কিছু নিজে থেকেই চলে আসবে। এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে এক-একটা পরিবর্তনকে নিয়ে, এক-একটা ক্রিয়াকে নিয়ে; এগুলো সেই অনন্তই, তাঁকেই বিভিন্ন ভাবে বলা হচ্ছে। এই যেমন বলা হল হাতি, হাতির অতগুলি নাম, কিন্তু বস্তু সেই এক।

আত্মা অনন্ত, অনন্তের কিসে থেকে জন্ম হবে, সেইজন্য আত্মা হলেন অজ, আত্মার কখন জন্ম হয় না। *ন জায়তে*, কখন যে তাঁর জন্ম হয়ে গেছে, তাও না। আর সেইজন্য আত্মার মৃত্যুও হয়

না। যেটা অনন্ত, সেটা মরবে কি করে, কারণ কোন বিকার নেই কিনা। কম্পাউণ্ড যদি হতে, আমরা ভেঙে দিতে পারতাম্, কিন্তু এককে ভাঙা যাবে না।

আমরা এতক্ষণ ধরে যে বিকারের কথা বলে যাচ্ছি, হিন্দু শাস্ত্রে ছয় রকমের বিকারের কথা বলা হয়। এই ছটি দ্বারা পরিভাষিত হয়, একটা জিনিসের বিকার আছে কিনা। এটাকে বলে ষড়্‌বিকার। প্রথমটা হল *জায়তে*, যার জন্ম হয়। দ্বিতীয় হল *অস্তিত্বে*, যার অস্তিত্ব থাকে; জন্মাল আর মরে গেল তা না। জন্ম হয়েছে, সে একটা সময় পর্যন্ত থাকবে; মাইক্রো সেকেণ্ডই থাকুক, কিন্তু থাকবে। তৃতীয় *বর্ধতে*, বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ *পরিণমতে*, একটা থেকে আরেকটাতে তার পরিণতি হতে থাকে, অর্থাৎ পাল্টাতে থাকে। পঞ্চম *অপক্ষিয়তে*, তার ক্ষয় হয়। শেষ বিকার *বিনশ্যতে*, তার বিনাশ হয়। যে কোন জিনিসের এই ছটি বিকার থাকবে —*জায়তে, অস্তিত্বে, বর্ধতে, পরিণমতে, অপক্ষিয়তে এবং বিনশ্যতে*। কোন জিনিসের যদি একটি বিকার থাকে, তাহলেও সেটা বিকারী হবে। একটা বিকার থাকা মানে তার মধ্যে বাকি বিকারগুলিও আছে।

অবিকারী কি? যার মধ্যে ছয়টি জিনিস নেই। আত্মাতে এই ছটির কোনটাই নেই, পুরোটাই অভাব। বস্তুতে ছটাই থাকবে, তার জন্ম হবে, তার অস্তিত্ব থাকবে, তার বৃদ্ধি হবে, তার একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসে পরিণতি হবে, আর ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকবে, তারপর শেষে একদিন তার বিনাশ হয়ে যাবে। আমরা যখন বলছি, অমুক মারা গেছেন, তার মানে কি? মারা যাওয়টাই একটি বিকার? কিন্তু তা না, তার জন্ম হয়েছে, তার অস্তিত্ব ছিল, সেখান থেকে সে বড় হয়েছে, তার নানা রকম অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে তার ক্ষয় হতে শুরু হয়েছে, বৃদ্ধাবস্থা মানে ক্ষয় হয়ে হয়ে এই জায়গায় এসেছে, শেষে মৃত্যু। তার মৃত্যু হয়ে গেল বলে আমরা কান্নাকাটি করছি, কিন্তু তার যে এতগুলো পরিবর্তন হয়ে মৃত্যু হল, সেটার দিকে আমরা কেউ তাকাই না। শৈশব থেকে একদিন যৌবনে প্রবেশ করল, গোফ-দাড়ি বেরোল, শৈশব চলে গেল বলে কেউ কি কান্নাকাটি করে?

এখানে এনারা ইতিবাচকতাকে নিয়ে কোন উপদেশ দিচ্ছেন না। এনাদের উপদেশ হল, যেটা আগে বলা হল, *অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*, শরীর অন্তবান। কেন অন্তবান? কারণ শরীর এই ছটা পরিবর্তনের মধ্যে বাঁধা। আত্মা অবিকারী। কেন অবিকারী? আত্মা এই ছটি বিকারের বাইরে। এই জিনিসটাকে কঠোপনিষদ থেকে এনে বলছেন, *জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ*। কদাচিৎ বলা মানে, ছটি বিকারগুলিকে, *জায়তে, অস্তিতে, বর্ধতে, বিপরিণমতে, ক্ষিয়তে, বিনশ্যতে* সব কটাকেই না করে দেওয়া হল। আসলে কুড়ি নম্বর শ্লোকের সাথে ঊনিশ নম্বর শ্লোকের সরাসরি যোগ রয়েছে। কিভাবে যোগ আছে আমরা এবার দেখব।

এখানে যুক্তিটা চলছে, অর্জুন এর আগে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি করে আমি যুদ্ধ করব, যুদ্ধ করলে আমার প্রিয়জনরা মারা যাবে; আপনি এখন বলুন আমি কি করব? ভগবান তখন অর্জুনকে বলছেন, তুমি যেটার জন্য 'আমি' 'আমি' করছ, এর আসল আমিটা আত্মা। আত্মা কোন ক্রিয়া করে না, আত্মার উপর কোন ক্রিয়া হয় না। এটা হল ভগবানের প্রথম পয়েন্ট। আমরা এগুলো শ্লোকে পাব না, কিন্তু এটাই শ্লোকের conclusion, বিশেষ করে আচার্য তাঁর ভাষ্য রচনার সময় এই যুক্তিগুলিকে দাঁড় করিয়ে দ্বিতীয় পয়েন্টে বলছেন, ক্রিয়া সব সময় বিকারী বস্তুতেই হয়। তৃতীয় পয়েন্টে হল বিকার ছয় প্রকার। চতুর্থ পয়েন্ট এই ছটি বিকারের মধ্যে কোন বিকারই আত্মার মধ্যে নেই। এই চার নম্বর পয়েন্টটাকে ভগবান কুড়ি নম্বর শ্লোকে উল্লেখ করছেন। এই চারটে পয়েন্টকে আমরা যদি মনে রাখি, তাহলে এখন, এর ঠিক পরে পরে আত্মাকে নিয়ে যত বারই আলোচনা হবে বা যে কোন শাস্ত্রে, উপনিষদে, যোগে, বেদান্তে, স্বামীজীর কথায়, ঠাকুরের কথায় আত্মাকে নিয়ে, ঈশ্বরকে নিয়ে, ব্রহ্মকে নিয়ে যত আলোচনা আছে, সবটাতে কিন্তু এই চারটে যুক্তি চলবে।

প্রথম আত্মা কোন ক্রিয়া করে না, আত্মার উপর কোন ক্রিয়া হয় না। তাহলে ঠাকুরের ইচ্ছা? ইচ্ছাটাও তো একটা ক্রিয়া, সেটা কোথায় যাবে? ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে আমাদের নিয়ে ইচ্ছা করতে। কারণ ঠাকুর আর আত্মা এক। ঠাকুর কোন ক্রিয়া করেন না। দ্বিতীয়, ক্রিয়া শুধু বিকারী বস্তুর উপরই হয়। তৃতীয়, বিকার ছয় প্রকার। আত্মা এই ছটি বিকারের পারে, *ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ*।

ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি, ধর্ম মানে বিশ্বাস করে যাও; ধর্ম মানে কটি শাস্ত্র আছে, ওই শাস্ত্র কটির কথা মেনে নাও। এদিকে শাস্ত্রগুলো এক অপরের সাথে ঝগড়া করছে, ধর্মগুলি এক অপরের সাথে লড়াই করছে, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এসব কিছুই কিছু না, ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে যুক্তির উপর চলে। তথাকথিত যারা নিজেদের যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমস্কতার মানুষ মনে করে, তাদের গীতার এই দুটি শ্লোক বোঝার ক্ষমতা আছে? এতটুকু যুক্তি বোঝার ক্ষমতা আছে? সেইজন্য এদের কথা আলোচনা না করাই ভাল।

যাই হোক, এবার ছটি বিকারের উপর জোর দিচ্ছেন, শুধু তাই না, এর সাথে আরও যা যা হতে পারে, সবটাকে নিয়েই বলছেন। আত্মার কোন জন্ম নেই, এই কথা বলছেন কঠোপনিষদের ঋষি ধ্যানের গভীর থেকে। ঠাকুর ব্রহ্মকে নিয়ে, আত্মাকে নিয়ে, মা কালীকে নিয়ে যা যা বলছেন, সাক্ষাৎ নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে বলছেন। সেই প্রত্যক্ষের কথা এখানে চলছে। ব্যাসদেব নিজের খুশি মত কিছু বলে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন না। ঋষিদের হাজার হাজার বছরের পরম্পরা দিয়ে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেমে এসেছে, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা চলছে। কি সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান?

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, আত্মার জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না। *বা কদাচিৎ*, এই কথা দিয়ে বাকি সব কিছুকে বলে দিলেন। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, আত্মা জন্ম নিল, বিকারের অনুভব করে তারপর অভাব হয়ে গেল? তার মানে বাকি বিকারগুলি হয়নি বলতে চাইছে। না, *নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ*, এই যে মৃত্যু জিনিসটা যখন বলা হয়, তখন এই নয় যে হঠাৎ করে চলে গেল বা চিরদিনের জন্য চলে গেল। এর আবার নানা রকমের যুক্তি আছে। যেমন মনে করা যাক একটা ঘট আছে, ঘটের এবার নাশ হয়ে গেল, ভেঙে দিল। ঘটের নাশ হওয়াকে বলা হয় ঘটের অভাব। ঘটের নাশের সাথে এই অভাবের জন্ম হল, আর চিরদিনের জন্য এটা অনন্ত, কারণ এই ঘট আর কোন দিন হবে না। আত্মা কি এই রকম কিছু একটা? আত্মার জন্ম হল, তারপর আর কোন দিন থাকবেন না, তাও না। সব দিক থেকে প্রতিষেধ করছেন।

এখানে বাকি শব্দগুলি, *বা ন ভূয়ঃ*, এগুলো বোঝানর জন্য বলছেন, এই নয় যে, আগে ছিল না, তারপর তার জন্ম হয়ে গেছে। যেমন আমার এই কলম আছে, অনন্তকাল থেকে এর অনুপস্থিতি ছিল, কোন দিন ছিল না। কোম্পানি এই কলমকে যেদিন তৈরী করল, সেদিন এর জন্ম হয়ে গেল। তার মানে অনন্ত ছিল ঠিকই, কিন্তু অভাবটা অনন্ত থেকে আসছিল, বুম্ করে হয়ে গেল। আত্মার ক্ষেত্রে তাও প্রযোজ্য নয়। যেদিক থেকেই যুক্তিতর্ক আনা হোক, শুধু বলা হবে আত্মাতে এটা নেই। সেইজন্য বলছেন, আত্মা অজ এবং অমর, আত্মার জন্ম হয় না, মৃত্যুও হয় না। যে কোন ভাবে জন্মকে নেওয়া হোক না কেন, মানুষ হিসাবে জন্মাচ্ছে তাও না, আবার অনন্ত কাল থেকে জিনিসটা নেই, অভাবের নাশ হয়ে গিয়ে হঠাৎ করে এসে গেল, তাও না। *অজ*, অর্থাৎ অজন্মা বলে দিলেন, তার মানে মাঝখানের বাকি সব কিছুকে উড়িয়ে দিলেন।

তাহলেও একটু পুনরোক্তি করে বলছেন, *শাশ্বতোহয়ং*, যে জিনিসটা সব সময়ই আছে সেটাই শাশ্বত, আত্মা সব সময়ই আছেন, কখনো এদিক সেদিক যান না। শাশ্বত মানে আবার, যার কক্ষণ কোন ক্ষয় হয় না। আত্মার মধ্যে কোন অবয়ব নেই, সেইজন্য স্বরূপ থেকে কখন কোন ক্ষয় হয় না,

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। ক্ষয় দুই প্রকার হয়, প্রথম বলা হয় স্বরূপ ক্ষয়। মানুষের দুটি হাত, একজন মানুষের একটি হাত কাটা গেল, আমরা বলি ক্ষয় হয়ে গেছে। এটাই স্বরূপ থেকে ক্ষয় হয়ে যাওয়া। কারণ তার অঙ্গ ছিল, সেই অঙ্গটা কাটা গেছে। আবার যখন কোন গুণ চলে যায়, সেটাকেও ক্ষয় বলে। ওষুদের প্যাকিংএ লেখা থাকে expiry date, তার মানে ওষুদের যে গুণ, এই গুণের আয়ু এতদিন আছে। তার মানে ওই তারিখের পর ওষুদের গুণ আর কাজ করবে না, ওষুধটা আছে কিন্তু কাজ করবে না। এটাও ক্ষয়। প্রথমটাতে তার অঙ্গটা নাশ হয়ে গেল, দ্বিতীয়টাতে জিনিসটা আছে, কিন্তু তার ক্ষমতা চলে গেছে।

তারপর বলছেন, *পুরাণো*, পুরাণ মানে যার কোন বৃদ্ধি হয় না। যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে। যেমন হিমালয়, প্রথম দিন থেকে যেমনটি দেখে আসছি, আজও তেমনটি আছে। কোন কিছু দিয়ে তার পুষ্টি হচ্ছে, বড় হয়ে যাচ্ছে, সেটা হয় না। প্রথমেও নূতন ছিল, এখনও নূতন আছে। পুরাণের একটা অর্থ হয়, পুরনো হয়েও নূতন।

তারপর বলছেন, *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। বয়সের সাথে সাথে শরীর যেমন দুর্বল আদি হয়ে যায়, আত্মার সেরকম কিছু হয় না। অনেক সময় দেখা যায় একটা জিনিসের বিপরীত স্বভাব হয়ে যাচ্ছে। সোডিয়াম পুরোটাই বিষ, ক্লোরিন পুরো বিষ, অথচ সোডিয়াম আর ক্লোরাইড দুটো যখন মিশে যায়, তখন লবণ হয়ে যায়, বিপরীত পরিণাম হয়ে যাচ্ছে। যে জিনিসটা ঘাতক, সেই জিনিসটাই আমাদের খাদ্যের জন্য এক প্রয়োজনীয় দ্রব্য হয়ে যায়। আমরা বলতে পারি, আত্মারও এই রকম বিপরীত স্বভাব হয়ে যেতে পারে? না, তারও কোন সম্ভবনা নেই।

এই শ্লোক, যেটা কঠোপনিষদের একটা মন্ত্র, তাতে দেখানো হল, আত্মা কিভাবে অবিকারী, নিত্য, সব সময়েই আছেন। যদিও আমরা খুব সংক্ষেপে বলে দিই, আত্মা অনন্ত। এটাকে আরও ভাল করে বোঝানর জন্য বলছেন, *অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। শরীরের যদি নাশ হয়ে যায়, আত্মার তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ আত্মাতে তো কোন অঙ্গ নেই, কোন অবয়ব নেই, যা আছে একাই আছে। পদার্থ কখন এই রকম হয় না, যোগ, সাংখ্য, বেদান্ত সৃষ্টিকে যেভাবে দেখছেন, সেখানে অর্থাৎ সৃষ্টিতে যা কিছু আছে, সবই সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে জিনিস মিলেমিশে আছে। সেইজন্য জগতে কোন জিনিস নেই, যেটাতে এই তিনটে জিনিস মিলেমিশে থাকবে না। আমাদের মনটাও ওই সৃষ্টির মধ্যে, মনের মধ্যেও সত্ত্ব, রজো ও তমো আছে, সত্ত্ব রজো তমো আছে বলেই আজকে মন খারাপ হয়ে গেল, কাল মন ভাল হয়ে গেল, মনের বৃদ্ধি হয়, মনের নাশ হয়, কারণ মনটাও সত্ত্ব, রজো ও তমো দিয়ে মিশে আছে। এই জগতে কোন কিছু নেই যেটাতে এই তিনটে গুণ নেই। অঙ্গ আছে বলেই এই দুরবস্থা। কিন্তু আত্মার তো কোন অঙ্গই নেই।

বোঝানর জন্য বলা যেতে পারে, সাধারণ ভাবে যে জিনিসগুলো পিওর ফর্মে থাকতে পারে, সেটার সহজে নাশ হয় না। যেমন সোনা, সোনা সহজে নাশ হয় না, কারণ ওটা পিওর। তবে লোহাতে মরচে ধরে, ওর তাড়াতাড়ি নাশ হওয়ার সম্ভবনা অন্যদের থেকে বেশী। তবে বেশীর ভাগ জিনিসগুলি প্রতিক্রিয়া করে না। হাইড্রোজেন ওই ভাবে react করে না, হিলিয়াম তো একেবারে react করতেই চায় না, পিওর ফর্মে যেগুলি আছে সাধারণ ভাবে react করে না। কিন্তু এটার সাথে আমাদের শ্লোকের কোন সম্পর্ক নেই, এটা শুধু বোঝানর জন্য বলা হল। আত্মাতে কোথাও কোন ধরণের বিকার হয় না।

এতক্ষণ *অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং* থেকে শুরু করে আত্মাকে নিয়ে যে আলোচনা চলছিল, আত্মার এই আলোচনাকে আরও পুষ্ট করবার জন্য ব্যাসদেব কঠোপনিষদ থেকে দুটি মন্ত্র নিয়ে এলেন।

এরপর তিনি আলোচনার উপসংহার টানছেন। যেমন কেউ যদি একটা ভাল প্রবন্ধ রচনা করেন, ইদানিং কালে জার্নালিস্টরা অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ লেখেন, সেখানে ওনারা নিজেদের বক্তব্য বলে যেতে যেতে হঠাৎ মাঝখানে আগেকার কোন বড় চিন্তাবিদ্, ঐতিহাসিকের কথা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা ইতি টেনে নিজের সিদ্ধান্তটা বলে দেবেন। এই concluding remark ব্যাসদেব দিচ্ছেন একুশ নম্বর শ্লোকে।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্।।২১।।

(হে পার্থ, যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলে জানেন, তিনি কিভাবে কাকেই বা হত্যা করেন এবং কাকেই বা হত্যা করান?)

আত্মার কথা বলার পর ভগবান বলছেন, *বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্,* হে অর্জুন, এটাকে জানো, এটা অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয়, এ-রকম যদি হয়, কে একে মারবে, কেই বা কাকে মারবে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পুরোটাই এই শ্লোকের বিস্তার। আগেও আমরা বলেছি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সব কিছু সংক্ষেপে বলা হয়েছে, পরে এক-একটা অংশকে ধরে ধরে তৃতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই জিনিসটাকে নিয়েই বলা হয়েছে।

একটু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, পুরো হিন্দু ধর্মতত্ত্ব, হিন্দুদের যেটা প্রাণ, তার বর্ণনা সতের নম্বর শ্লোক, যেখানে বলছেন *নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ,* সেখান থেকে হিন্দু ধর্মের মূলতত্ত্বের আলোচনা শুরু হয়ে গেল। এই শ্লোকের আলোচনায় বলা হয়েছিল, যদি একটা জিনিস সৎ হয়, সেই জিনিসের কখনই নাশ হবে না। আর যদি অসৎ হয়, বুঝতে হবে ওর কখনই জন্ম হবে না। আমরা যা কিছু দেখছি, এগুলো সব বিকার। এরপর গীতা উপনিষদ থেকে দুটি মন্ত্র নিয়ে এলেন, দেখানোর জন্য যে উপনিষদের ভাবও এটাই। এখানেও গীতা তাই নূতন কিছু বলছেন না।

এবার যেন পুরো জিনিসটাকে আবার একটা জায়গায় গুটিয়ে আনছেন। এর পরের শ্লোক, তার পরে শ্লোকেও একই কথা যেন বারবার বলছেন। শাস্ত্রে এটাকে বলে পুনরোক্তি দোষ। শাস্ত্রে পুনরোক্তি নিষেধ আছে। সাহিত্যেও একই কথা বারবার বলা নিষেধ। উচ্চমানের লেখকরা একটা বিশেষ শব্দকে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করেন না। ভাবের পুনরোক্তি, শব্দের পুনরোক্তি নিষেধ। এখানে বলছেন, এই জায়গাতে পুনরোক্তি আছে। কারণ এই কথাগুলো অত্যন্ত উচ্চমানের, যারা শুনছে, তারা নিতে পারবে না। বারবার শুনতে শুনতে একটু ধারণা হয়।

একুশ নম্বর শ্লোকে ভগবান আবার একই জিনিস নিয়ে আসছেন। কয়েকটা জিনিস সব সময় মনে রাখতে হয়। প্রথম, অর্জুনের একটা সমস্যা এসে গেছে, দ্বিতীয় দর্শন, তৃতীয় হিন্দু ধর্মতত্ত্ব। এই তিনটে জিনিসকে নিয়ে চলছে। সেইজন্য ঘুরে ঘুরে অর্জুনের সমস্যায় নিয়ে আসবেন। অর্জুনের সমস্যা আবার অনেক ধরণের। প্রথম কথা, কাউকে মারা যাবে কিনা, কারণ হিংসা করা যাবে না। দ্বিতীয়, এই যুদ্ধ করাটা কি ঠিক, না ঠিক না; ধর্ম আর অধর্মে কোথাও একটা যেন ধোঁয়াশে ভাব। মূল সমস্যা ছিল, যুদ্ধ করাটা ঠিক কিনা। এই অংশে ভগবানের মূল বক্তব্য হল, জাগতিক দৃষ্টিতে যদি দেখ, মানুষ জন্মায়, মানুষ মরে, সেইজন্য তুমি তোমার স্বধর্ম কেন ছেড়ে দেবে। আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যদি দেখ, তাহলে আত্মার জন্ম নেই, আত্মার মৃত্যু নেই, এখানে কে কাকে মারছে। এটা ঠিক যে, এগুলোকে আমরা অনেক ভুলভাল প্রয়োগ করি। সর্বসাধারণের জন্য এই কথাগুলো নয়। একটা গল্পে দুই যুবক এক আম বাগানে গিয়ে আম চুরি করছিল। দারোয়ান যখন

ওদের ধরেছে, তখন বলছে, কার বাগান, কার গাছ, কার আম। বলতে চাইছে, সবই তো ঈশ্বরের। দুজনকে ধরে দারোয়ান খুব উত্তম-মধ্যম দিচ্ছে আর চেঁচিয় চেঁচিয় বলছে, কার ডাণ্ডা, কার পিঠ, কার গায়ে লাগছে। নিতে হলে দুটোই নাও, একটা কেন নেবে।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং, ভগবান বলছেন, এই যে আত্মতত্ত্বের কথা চলছে, এই আত্মাকে অবিনাশী রূপে জানো, কখন তাঁর বিনাশ হয় না। আবার যদি আমরা *নাসতো বিদ্যতে ভাবো* শ্লোকে যাই, সেখানেও বলছেন, সৎ বস্তুর কখন নাশ হয় না, এটা অবিনাশী, এটাকে ভাল করে জানো। *অজম্*, এর কখন জন্ম হয়নি। এর আগের শ্লোকে *ন জায়তে ম্রিয়তে*, দেখানো হল ষড়্‌বিকারের কোন বিকার আত্মার মধ্যে থাকে না। এর উপর আগে আলোচনা হয়ে গেছে, এখানে conclude করছেন। *অব্যয়ম্*, আত্মা অনন্ত, অনন্তের কক্ষণ ব্যয় হয় না। কারণ ব্যয় হয়ে যাবেন কোথায়, সব জায়গাতেই তো আত্মা আছেন। আমাদের সব কিছু যদি মাথায় না থাকে, তাহলে একটা জিনিস মনে রাখলেই হবে, আত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, তিনটের একটাই পরিভাষা, অনন্ত। আত্মা অনন্ত, ঈশ্বর অনন্ত, ব্রহ্ম অনন্ত। আত্মাকে নিয়ে, ঈশ্বরকে নিয়ে, ব্রহ্মকে নিয়ে উপনিষদে যা কিছু পড়ি, সব কিছু ওখান থেকেই আসে। কোন পদার্থ কখনই অনন্ত হতে পারে না। সেইজন্য আত্মা বা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ব্যক্তি না, ঈশ্বর কখনই ব্যক্তি হতে পারেন না। কারণ ব্যক্তি মানেই পঞ্চতত্ত্ব থেকে, পদার্থ থেকে তৈরী। যেহেতু অনন্ত, সেইহেতু তাঁর জন্ম হয় না, কোন কিছু থেকে যে তাঁর জন্ম হবে, তাহলে তিনি কিসের অনন্ত! সেইজন্য আত্মার নাশ হতে পারে না। কারণ তাঁকে কে নাশ করবে, আত্মার বাইরে তো কিছু নেই। আর যেহেতু নিজের উপর ক্রিয়া হয় না, তাই নাশ হতে পারে না।

তার সাথে আচার্য বললেন, যদি কোন মিশ্র পদার্থ থাকে, তাহলে সেই মিশ্রণটা ভেঙে যেতে পারে। এক অপরের সংস্পর্শে ভেঙে গিয়ে নাশ হয়ে যেতে পারে। তিনি তো অনন্ত, কার সাথে কিসের সংস্পর্শ হবে, তিনি মৌলিক, সেইজন্য কখনই তাঁর নাশ হতে পারে না। আর তিনি হলে শুদ্ধ চৈতন্য। এটাই এখানে পুনরাবৃত্তি করছেন, *বেদাবিনাশিনাং*, '*বেদ*' শব্দের অর্থ জানা, এটাকে তুমি জানো যে আত্মা অবিনাশী। *নিত্যং*, তিনি চিরদিন আছেন, গতকাল ছিলেন, আজকেও আছেন, আগামীকালও থাকবেন। সেইজন্য আত্মা *অজম্* এবং *অব্যয়ম্*, আত্মার জন্ম হয়নি, আত্মার কোন রকম ব্যয় হয়ে যায় না।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্, যিনি এই জিনিসটা জেনে গেছেন, তুমিই সেই, তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তুমি গতকালও ছিলে, আজও আছ, আগামীকালও থাকবে, তিনি তখন কি প্রকারে কাউকে হত্যা করতে পারেন বা করাতে পারেন। ইদানিং Power of Positive Thinkingএর উপর কত বই বেরিয়েছে, যেখানে বলছেন, you can do it। এটা পড়েই কত লোক কত কিছু করে দিচ্ছে। শুধু বলে দিচ্ছে, তুমি এটা পারবে, তাতেই এত কিছু হয়ে যাচ্ছে। জেহাদীদের শুধু বলে দিয়েছে, আল্লা তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তাতেই মানববোমা হয়ে নিজেকে উড়িয়ে দিচ্ছে। যদি আমরা একবার জেনে যাই, আমি নিত্য, আমি অবিনাশী, তাহলে আমাদের কি ক্ষমতা হবে কল্পনা করা যায়! Positive thinkingএর কথা যারা বলছে, ওটাও সত্য, যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে জেহাদী হয়ে যাওয়াটাও সত্য, আর যারা হিন্দু, তারা জানে আমি অবিনাশী, নিত্য, আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, সেটাও সত্য। আসলে তিনটের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

স্বামীজী বলছেন, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যেই। কারণ তুমি শুদ্ধ আত্মা। স্বামীজীর যত নামকরা কোটেশান আছে, যে কোটেশানগুলিকে বাচ্চা থেকে শুরু করে প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, প্রাচীন, নবীন সব সন্ন্যাসীরা সমস্ত ভাষণে উগড়ে যাচ্ছেন; সব কোটেশানের পিছনে, পুরো কথামৃতে, স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী জুড়ে ওই একটাই তত্ত্ব –আত্মা অনন্ত, আর তুমিই সেই আত্মা।

উপনিষদের মহাবাক্য *তত্ত্বমসি*, তুমিই সেই, আর কিছু না। তুমি কে? আত্মা। আত্মাটা কি? অনন্ত। সেইজন্য চারটি মহাবাক্য নিয়ে এলেন, *অহং ব্রহ্মাস্মি*, *তত্ত্বমসি*, *প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম* এবং *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* সব একই কথা, শুধু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছেন। সাধু, সন্ন্যাসীরা সর্বত্র শুধু এই একটা জিনিসকে হাজার হাজার বছর ধরে ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। অনেক সময় মনে হয়, স্বামীজী এইসব কথা বলে দেশকে জাগ্রত করলেন। স্বামীজী কি জাগ্রত করবেন, ভারতভূমি এই বিদ্যা নিয়েই চিরদিন বেঁচে আছে। কি সেই বিদ্যা? *বেদাবিনাশিনং নিত্যং*। ভগবানও অর্জুনকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন, অর্জুন তুমি ভাল করে জানো, তুমি অবিনাশী, তোমার কখন জন্ম হয়নি, তুমি নিত্য, চিরদিন ছিলে, চিরদিন থাকবে, *অব্যয়ম্*, তোমার কোন ক্ষয় হবে না।

পুরো জিনিসটা আসে শুধু এই একটি কথা থেকে, আত্মা অনন্ত। এর বাইরে আর কোন কিছু নেই। এই একটা জিনিসকে বুঝে নিতে পারলে সমস্ত শাস্ত্রকে বোঝা হয়ে যাবে। তাহলে বাকি শাস্ত্র এত এত কথা কেন বলছেন? কারণ আমাদের বুদ্ধি খুব স্থূল, কিন্তু আত্মা সূক্ষ্মতম। ভক্ত সম্মেলনে গিয়ে আগে খোঁজ নেবে কোন কোন মহারাজ গান করবেন। কারণ ওটাই সবাই বুঝতে পারে কিন। যদি বলা হয়, আপনারাও আমার সাথে হাততালি দিয়ে গান করুন, তাহলে তো আর কোন কথাই নেই; আহা, এনার মত আর কেউ হন না। গান, নাচ, এর বাইরে আমরা কিছু জানি না, স্থূল বুদ্ধি কিনা। লেকচারে ঠাকুরের জিলিপি খাওয়া, আর শ্রীমার শরতও আমার ছেলে, আমজাদও আমার ছেলে, একটু ইমোশানালের ছোঁয়া আছে কিনা, তাই এটুকুই বুঝতে পারি, এর বাইরে আর কিছু বুঝতে পারি না। শাস্ত্র হল মায়ের মত, এই দুরূহ আত্মতত্ত্বকে শাস্ত্র নানা দিক দিয়ে, বিভিন্ন ভাবে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন, সেইজন্য শাস্ত্রকে এত কথা বলতে হয়।

এবার এই শ্লোকের যে তাৎপর্য, সেটাকে এখন বলছেন, *কথং স পুরুষঃ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্*। যে ব্যক্তি বুঝে গেছে আত্মা অনন্ত, আর আমি সেই আত্মা, তখন সে কাকেই বা মারবে, আর তাকেই কে মারবে! এর মানে, সে ব্যক্তি কাউকেই মারে না। আগে যে আলোচনা করা হয়েছে, সেটাই এখানে conclude করছেন। এই জায়গাতে আচার্য শঙ্কর, তিনি সত্যিকারের আচার্য কিনা, তিনি কিছুক্ষণ পর পর থেকে থেকে বেশ কিছু জিনিস আলোচনা করছেন, আজকে আমরা বেদান্ত বলতে যা বুঝি, আচার্যের এই আলোচনা গুলির উপরই তা দাঁড়িয়ে আছে। উপনিষদেও আচার্য এটাই করেছেন, গীতাতে আরও বেশী করেছেন। কারণ গীতাতে অন্যান্য দর্শনগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, আর ব্রহ্মসূত্রেও তাই করেছেন।

আগে যেটা বলা হল, আত্মা subjectও না, objectও না, কারণ আত্মা অনন্ত, অনন্তের উপর কে ক্রিয়া করবে, কার উপর তিনি ক্রিয়া করবেন, সম্ভবই না। ফলে আত্মা কর্তাও নন, কর্মও নন। এখানে ক্রিয়া হল *হন্তি*, *হন্তি* মানে মারা, শুধু মারা না, মারা এই একটি ক্রিয়া দিয়ে সমস্ত রকম ক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে। গীতা হল শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদ, অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, এদের আমি মারব কি মারব না, কিন্তু মন্ত্রটা নেওয়া হয়েছে কঠোপনিষদ থেকে, কঠোপনিষদে মারামারির কোন ব্যাপারই নেই, ওখানে ওটা একটা poetic expression। বলছেন, আত্মা কর্তাও না, কর্মের দ্বিতীয়াও না। যার এই বোধ বা জ্ঞান হয়ে গেছে, তাঁর আর কোন কর্তব্য বোধ থাকে না, তিনি আর কোন কাজ করেন না। যদি কাজ করেনও, ওই কাজ করার মধ্যে তাঁর কোন কর্তব্য বোধ থাকে না।

সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী নিয়ে লোকেদের মধ্যে অনেক ভুলভাল ধারণা ঢুকে আছে, অনেকে বলে সন্ন্যাসীদের উচিত লেকচারবাজী বন্ধ করে লোকেদের সেবা করা। কিন্তু যারা এই ধরণের কথা বলে, তাদের জেনে রাখা দরকার, সন্ন্যাসীর কক্ষণ কোন কর্তব্য হয় না। সন্ন্যাসীর কারুর প্রতি কোন কর্তব্য নেই; মা-বাবার প্রতি কোন কর্তব্য নেই, সমাজের প্রতি কোন কর্তব্য নেই। এমন কি শাস্ত্র, যে হিন্দু ধর্মকে বিধান করে, সেই শাস্ত্রের কোন কথা সন্ন্যাসীর উপর প্রযোজ্য নয়। উপাচারের দিক

থেকে সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাস নেওয়ার সময় নিজের আদ্যশ্রাদ্ধ করে নেন, পিণ্ড দান করে নিয়েছেন, সমস্ত শাস্ত্র থেকে সন্ন্যাসী তাই মুক্ত। হিন্দুদের যে ষোড়শ সংস্কার, সংস্কার মানে শুদ্ধিকরণ, শেষ সংস্কার হল অন্ত্যেষ্টি। অন্ত্যেষ্টির পরে শ্রাদ্ধ কর্ম, যা কিনা শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়, সব কিছুই সন্ন্যাসীর জন্য আগেই সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। শাস্ত্রের কোন নিয়ম সন্ন্যাসীর উপর প্রযোজ্য হয় না।

সন্ন্যাসীদের যত মন্ত্র আছে, সমস্ত মন্ত্রই ত্যাগকে আধার করে। যখন কোন কর্ম হয়, এমনকি খ্রীশ্চান ফাদাররা যখন ফাদার হন, তখন তাঁদের কোন কোন ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা বা দিব্যি দিতে হয়; কিন্তু আমাদের সন্ন্যাসীদের কোন প্রতিজ্ঞা করতে হয় না বা দিব্যি দিতে না, তাঁদের কোন ব্রত নিতে হয় না। সন্ন্যাস নেওয়ার পর সন্ন্যাসীরা সব কিছুর পারে চলে যান। ব্রহ্মচারীদের ব্রত নিতে হয়, আমাকে এমনটা করতে হবে, এমনটা করব না। সন্ন্যাসীরা সব ত্যাগ করে বেরিয়ে যান। সন্ন্যাসীরা কি তাহলে আলতু ফালতু যা খুশী করতে পারে। তা নয়, সন্ন্যাসী সব কিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেছেন, সমস্ত কিছুর ত্যাগ হয়ে গেছে। যে কোন কর্মের পিছনে একটা কামনা থাকে, এষণা থাকে, সন্ন্যাসীর মনে কোন এষণা থাকবে না।

সন্ন্যাসীরা তাহলে সারা দিন কি নিয়ে থাকবেন? আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *বেদান্ত বাকেষু সদা রমন্ত*; বেদান্তের বাক্য হল আত্মা অনন্ত। এই ভাব থেকে সন্ন্যাসী যদি একবার সরে আসে, তাহলে তাঁর পতন অনিবার্য। সন্ন্যাসীর পতন কামিনী-কাঞ্চনের পিছনে দৌড়ালে হয় না, নাম-যশের পিছিনে দৌড়ালে হয় না। যে মুহূর্তে সন্ন্যাসী আত্মা অনন্ত, এই ভাব থেকে সরে এসেছে, সেই মুহূর্তে তাঁর পতন নিশ্চিত হয়ে যায়। আত্মা অনন্ত এই ভাব থেকে সরে আসা মানেই, জগতের বাকি সব কিছুর মধ্যে নেমে পড়া। আত্মা অনন্ত এই ভাব শুধু সন্ন্যাসীদের জন্যই না, যাঁরা এই কথা শুনছেন, তাঁদের জন্যও প্রযোজ্য। যে কোন লোক, যার মধ্যে এই বোধ এসে গেছে, আত্মা অনন্ত, আমি সেই আত্মা, ওর কিন্তু আর কোন দায়ীত্ব থাকবে না। এটাকে নিয়ে আচার্য এবার আলোচনা করবেন, খুব সূক্ষ্ম আলোচনা।

আচার্য প্রথম আপত্তি করছেন, যেমন জ্ঞান সব সময় জ্ঞানী থেকে আলাদা হয়। আমি এই কলমকে জানলাম, কলম আলাদা, আমি আলাদা। আর আমরা সব সময় বস্তুকে জানছি, আমি আপনাকে দেখছি, আপনি আমাকে দেখছেন। একটা জিনিসকে আমি জেনে নিলাম, তাই বলে কি আমার সব দায়ীত্ব শেষ হয়ে গেল, তাই কি কখন হয়? আত্মাকে আমি জেনে গেলাম, আত্মজ্ঞানের ব্যাপারটা জেনে গেলাম, তাই বলে আমার কর্তব্য বোধ কেন শেষ হয়ে যাবে? যাঁরা আপত্তি করছেন, ফোকাসটা তাঁদের রয়েছে জ্ঞানের উপর। কিন্তু এখানে হল আত্মজ্ঞান, যিনি জেনে গেছেন আত্মাই সত্য, যিনি জেনে গেছেন আত্মা অনন্ত আর আমিই সেই আত্মা, তাহলে তাঁর আর কোন কর্তব্য থাকে না। যারা আপত্তি করছে, তারা বলছে, কেন তা হবে, ফোকাসটা রয়েছে জ্ঞানকে নিয়ে। আচার্য বলছেন না, তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তফাৎ হল, এখানে জ্ঞান হল, আত্মা কোন বিষয় নন, আত্মা কোন পদার্থও নন যে, এটাকে আমি জানছি। এই জিনিসটাকে আমরা আগে অল্প একটু বলেছিলাম, এবার সেটাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

এই কলমটাকে আমি জানছি, তার মানে আমার এই বোধটা পরিষ্কার যে, আমি আলাদা, কলমটা আলাদা। যখনই আমরা ঈশ্বর দর্শনের কথা বলি, ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের কথা বলি, জন্মজন্মান্তর ধরে 'জানা' ব্যাপারটাকে নিয়ে যে আমাদের এই সংস্কার চলে আসছে তাতে আমরা অবশ্যই সব সময় ঈশ্বরকে বস্তু বলে ভাবব, ব্রহ্মকে বস্তু বলে বোধ করব, আত্মাকেও বস্তু বলে বোধ করব। ফলে আমরা মনে করি, আমি আলাদা, আত্মা আলাদা, আমি আত্মাকে জানলাম, তাতে আমার কেন মুক্তি হবে? আমি আত্মাকে জানলাম বলে কর্মত্যাগ কেন হবে? আচার্য বলছেন, মূল জিনিসটাই তুমি ভুল বুঝছ। আত্মা কোন object নন, আগে আমরা কয়েকবার এর উপর *ন জায়তে ম্রিয়তে*

শ্লোকে বা এই জায়গাতেও আমরা আলোচনা করলাম কিভাবে আত্মা কর্তাও নন, কর্মের দ্বিতীয়াও নন। কর্তা ও কর্ম থাকা মানেই সেখানে একটা ক্রিয়া এই দুটোকে জুড়ে রেখেছে। আমি কলমকে দেখছি, আমি আলাদা কলম আলাদা, আমি কর্তা, কলম দ্বিতীয়; কিন্তু আত্মা অনন্ত। আত্মা কর্তা ও কর্মের মধ্যে যত রকম তফাৎ হতে পারে, সবটার ঊর্ধ্বে।

তার সাথে বলছেন, কোন জড় বস্তু কখনও কাউকে জানতে পারে না। আমরা এই কলমের কথা বলছি, কলম জড়। এখানে বলা হচ্ছে তুমিই সেই আত্মা। আত্মা যদি জড় বস্তু হত, তখন এই সমস্যাটা আসত। কিন্তু তা তো না, আত্মা চৈতন্য, আত্মা অনন্ত। ফলে আমি যখন তাঁকে জেনে গেলাম, এই জানাকে জগতের কোন বস্তুকে জানার সাথে তুলনা করা যাবে না। এই সমস্যা আমাদের সব সময়ই হয়, আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বরদর্শনকে আমরা জাগতিক বস্তুকে জানার মধ্যে গুলিয়ে ফেলি। আর তার সাথে সংশয় হয়, আমি যেভাবে সংসারকে জানছি, পাঁচটা জিনিসকে জানছি তাতে মুক্তি হচ্ছে না, কর্মমুক্তি হয় না, অথচ আত্মা বা ঈশ্বরকে জানলে আমি মুক্ত হয়ে যাব, কর্মমুক্তি হয়ে যাবে। এই ধারণাটা আমাদের ভুল। শুধু সাধারণ মানুষ না, যাঁরা বেদান্ত নিয়ে লেকচার দেন, তাঁরাও অনেক সময় এই ভুল করেন। তাঁরা মনে করেন অদ্বৈত বলতে বোঝায় এক। অদ্বৈত তা নয়, অদ্বৈত এক দুইয়ের পারে।

কথামৃতে বর্ণনা আছে, ঠাকুর নরেনকে জিজ্ঞেস করছেন, দশটি জলপূর্ণ পাত্র, সেখানে দশটি সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, তাহলে কটি সূর্য? দশটি প্রতিবিম্ব সূর্য ও একটি আসল সূর্য, মোট এগারোটি সূর্য। একটি একটি করে পাত্র ভাঙতে ভাঙতে একটি পাত্র অবশিষ্ট থাকল, তাহলে কটি সূর্য? উপরে একটি আসল সূর্য ও নীচে একটি প্রতিবিম্বিত সূর্য, মোট দুটি সূর্য। শেষ পাত্রটিকেও ভেঙে দেওয়া হল, এবার কটি সূর্য থাকল? নরেন সঙ্গে সঙ্গে বলছে, একটি সূর্য। ঠাকুর বলছেন, কি আছে কে বলবে। এটা হল অদ্বৈত। যেমনি আমি বললাম, একটি সূর্য, আমি মুসলমান বা খ্রীশ্চান বা জুহুদি হয়ে গেলাম। এই তিনটে ধর্মে বলা হয় ঈশ্বর এক, এটাই একশ্বরবাদ। একেশ্বরবাদে বস্তু থেকে যাচ্ছে, কোথাও একটা মনের ভাবটা থেকে যায়। পাত্র ও জল হল মন, আসল সূর্য হল সেই চৈতন্য। সেই চৈতন্যই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে পাত্রগুলিতে। যখন একটি পাত্রও নেই, তখন কে বলবে, কাকে নিয়ে বলবে। সেজন্য কি আছে মুখে বলা যাবে না। তাহলে কি ওটা এক? বলা যাবে না। তাহলে কি শূন্য? বলা যাবে না। এক দুইয়ের পার কি? টেকনিক্যালি সেটাও কিন্তু বলা যাবে না। কি আছে আর মুখে বলা যাবে না, কারণ মন জিনিসটাই তো নেই। বিদেশী পণ্ডিতরা এই ধরণের কথা নিতেই পারে না। অনেক সময় অদ্বৈতকে ইংরাজীতে অনুবাদ করছেন মনোইজিম্ (monisim), কিন্তু এটা মনোইজিম্ না, ইংরাজীতে ঠিক শব্দ হল non-duality।, অদ্বৈত, 'অ'এর পর একটা হাইফেন আছে – অ-দ্বৈত, যেটা দ্বৈত নয়। যেটা দ্বৈত নয়, আসলে ওটা কি? এবার আপনি বুঝুন কি।

এখন প্রশ্ন ওঠে, আত্মা যখন কর্তাও নন, কর্মও নন, কারণ কোন জড় বস্তু কাউকে জানতে পারে না, আত্মাও জড় বস্তুর মত জানার কিছু নয়, তাহলে আত্মজ্ঞানী শব্দটা কেন ব্যবহার করা হচ্ছে? একদিকে আপনারা বলছেন আত্মা অনন্ত, অনন্তই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আত্মা কর্তাও নন, কর্মের দ্বিতীয়াও নন, কর্তা ও কর্ম যদি না থাকে, তাহলে জ্ঞান, আত্মজ্ঞানী এই শব্দগুলি কেন আপনারা বারবার নিয়ে আসেন? আচার্য বলছেন, এটা উপাচার মাত্র। উপাচার মানে, একটা আর-একটার সঙ্গে যখন জড়িয়ে যায়, তখন এক অপরকে নিয়ে বলে। যেমন সংস্কৃত সাহিত্যে একটা শব্দ ওনারা প্রায়ই ব্যবহার করেন, কোন উদাহরণ দেওয়ার সময় 'ন্যায়' শব্দটা লাগিয়ে দেন। যেমন কাকতালীয় শব্দটা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, সেখান থেকে ন্যায়শাস্ত্রে বলছে 'কাকতালীয় ন্যায়', যেমন কাক বসেছে বলে বেল পড়ে গেছে, সেখান থেকে এসে গেল 'কাকতালী ন্যায়'। তেমনি বলা হয়, 'দেহেলী ন্যায়', আগেকার দিনে বিদ্যুৎ ছিল না, প্রদীপের ব্যবহার হত, যদি প্রদীপকে দরজার মাঝখানে রেখে দেওয়া হয় তাহলে প্রদীপ ঘরের ভিতরেও আলো দেয়, বাইরেও আলো দেয়, এটা

হয়ে গেল 'দেহেলি ন্যায়'। তেমনি আবার আছে 'ছত্রি ন্যায়'। আগেকার দিনে রাজা, জমিদার ও ব্রাহ্মণরাই ছাতা ব্যবহার করতে পারতেন। একজন বড়লোক ছাতা মাথায় যাচ্ছে, ওর সাথে সাথে যারা যাচ্ছে তাদের মাথায় ছাতা নেই, কিন্তু বলা হয় 'ছত্রি যাচ্ছে'। ছাতা মাথায় একজন যাচ্ছে, কিন্তু বাকি সবাইকে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। এটাকে বলে উপাচার, একটাকে ধরে বাকি অনেক কিছুকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন এখানে অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরা আছেন, কিন্তু তাঁদেরও বলা হচ্ছে ছাত্র। এটাও উপচার, যারাই বিদ্যার্জন করতে আসছে, সবাইকেই ছাত্র বলা হয়।

এখানে বলছেন, মনে যে বৃত্তিগুলি ওঠে, যখন কোন জিনিসের জ্ঞান হচ্ছে, যেমন এই কলমকে যখন আমি জানছি, তার মানে আমার বুদ্ধি এই কলমকে নিচ্ছে, এটাকে বলে বৃত্তি। কিন্তু আত্মা বা অনাত্মা, চৈতন্য বা জড়, এই জিনিসটাকে তফাৎ করার যে বৃত্তি, আসলে এটা কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তি নয়, কিন্তু এটাকে বলা হয় বুদ্ধি বৃত্তি। এর নামই হল, আত্মনাত্মক বুদ্ধি বৃত্তি। যখন আমরা তফাৎ করছি, চৈতন্য কি জড় কি, এটা বুদ্ধি বৃত্তি নয়, কারণ সেখানে কোন জ্ঞান গ্রহণ করা হয় না। ঠিক তেমনি বিশুদ্ধ আত্মা, যেটা মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেই জড়ানোর জন্য, উপচারের জন্য বলা হয় জ্ঞান। জ্ঞান হয় বুদ্ধির, আত্মা এখানে নিজেকে বুদ্ধির সাথে জড়িয়ে রেখেছে বলে এটা কথার কথা, আসলে আত্মজ্ঞানী বলে কিছু হয় না। কারণ নূতন করে কোন জ্ঞান হয় না। জ্ঞান শব্দ বলতে আমরা বুঝি, আমি আগে জানতাম না, এখন জেনেছি। কিন্তু আত্মা সব সময় আছে, আর আমি সেই আত্মা, তাহলে নূতন করে কোন জ্ঞান হচ্ছে না। অথচ আত্মজ্ঞানী বলা হয়, এটা কথার কথা। যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি জানেন, আমার কখন জন্ম হয়নি, আমার কখন মৃত্যু হয় না, আমি কখন অজ্ঞানে ছিলামই না। উদাহরণ বা বোঝানর জন্য স্বপ্নের কথা বলা হয়, স্বপ্নে আমি বিদেশে গেলাম, বিদেশ থেকে একটা ডিগ্রি নিয়ে এলাম। ঘুম ভাঙার পর দেখছি, যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। বিদেশে আমি যাইনি, বিদেশ থেকে ফেরতও আসিনি, কিন্তু স্বপ্নে আমার বিদেশ ভ্রমণ হয়ে গেল। স্বপ্নে কত কিছু আসছে, আবার চলে যাচ্ছে, আসলে কিছুই হচ্ছে না। ঠিক তেমনি, আত্মজ্ঞানী জানেন আমার কখন জন্মও হয়নি, মৃত্যুও হবে না, আর কোন অবস্থাতেই অজ্ঞানে ছিলাম না। আত্মজ্ঞানী বাস্তবিক এটাই দেখেন। যাঁদের আত্মার এই বোধ হয়ে গেছে, আত্মার ব্যাপারটা যাঁরা বুঝে নিয়েছেন, একমাত্রা তাঁরাই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পথে যেতে পারেন।

কিন্তু যারা যজ্ঞাদি করতে চাইছে, যারা গৃহস্থ ধর্ম পালন করতে চাইছে, যারা সংসারে থেকে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তারা কেন এই পথের পথিক হতে পারে না? ঠাকুরকেও অনেকে জিজ্ঞেস করতেন, সংসারে কি হয় না? ঠাকুরও বলে দিচ্ছেন, কেন হবে না। কিন্তু তারপরেই যা যা করতে বলে দিচ্ছেন, সেগুলো সব সন্ন্যাসীদের ধর্ম। আচার্যও স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন সংসারীদের জন্য কখনই আত্মবিদ্যা হতে পারে না। এখানে সংসারে যারা বিয়ে করে স্ত্রী সন্তানাদি নিয়ে আছে, তাদের কথা বলা হচ্ছে না। এখানে তাদের কথাই বলা হচ্ছে, যার মনে দ্বৈত ভাব আছে। কথামৃতে ঠাকুর একটা চিঠির কথা বলছেন, চিঠিতে লেখা আছে একটা কাপড় ও পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাবে। চিঠি পড়ার পর জেনে গেল তাকে কি কি করতে হবে। এবার সে নেমে পড়ে কোথা থেকে ধুতি কিনতে হবে, কোন দোকান থেকে ভাল সন্দেশ আনতে হবে। যাদের মনে সংসার সত্য হয়ে বাসে আছে, যেমনি তারা কোন কর্মের খবর পেয়ে গেল, যেমন কোন যজ্ঞের কথা শুনল, এই যজ্ঞ করলে তুমি অবশ্যই স্বর্গে যাবে; তেমনি তারা ওই যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। যজ্ঞের উপকরণ জোগার করতে, যজ্ঞের জন্য উপযুক্ত পুরোহিত সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। পাড়াতে যখন দূর্গাপূজা হয় সেখানেও কত কিছু আয়োজন করতে হয়, কত খাটাখাটনি।

আত্মজ্ঞানে তা হয় না, একটু আগে এষণা ত্যাগের কথা বলা হল, যিনি জেনে গেলেন আমিই সেই অনন্ত আত্মা, এরপর প্রথম যেটা করেন, তা হল, সব কিছু ত্যাগ করতে শুরু করেন। তার মানে, কর্ম ও জ্ঞান স্বভাবেই এরা বিপরীত। কারণ যেমনি কর্মের ব্যাপারটা জানা হয়ে গেল,

এরপর আমাকে সব কিছু জোগার-যন্ত্র করতে হবে, আয়োজন করতে হবে, সেই কর্মের একটা ফল হবে। আচার্যের সময় পূর্বমীমাংসকদের দর্শন খুব শক্তিশালী ছিল, আর ওনাদের কাছে ছিল যজ্ঞই শেষ কথা। আচার্য এটাকে নাকচ করছেন, কর্ম ও জ্ঞান দুটো একসাথে চলতে পারে না। আমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে, স্বামীজী কর্মের কথা, উপাসনার দ্বারা জ্ঞান লাভের কথা বলছেন। ওই জায়গাতে জ্ঞান মানে নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক, আত্মা ও অনাত্মার বিবেক, স্বামীজী শেষ জ্ঞানের কথা এখানে বলছেন না।

অনেকে আবার বলতে পারেন, আত্মাকে কেন আমি সত্য বলে মানব? এই প্রশ্ন খুব পুরনো প্রশ্ন, আগেও আমরা এই প্রশ্নকে নিয়ে আলোচনা করেছি। অনেক সময় আমাদের মনে হয়, যে জিনিসটা আমি দেখতে পাইনা, সেটাকে কেন আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আগের আলোচনায় বলা হয়েছিল, মন কখন অনন্ত জিনিসকে ধারণা করতে পারে না, সেইজন্য মন কখনই আত্মাকে জানতে পারবে না, জানা সম্ভবই না। আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কারণ আত্মা ইন্দ্রিয়ের পারে। আত্মা অনন্ত, সেই জায়গায় ইন্দ্রিয়গুলি একেবারেই সীমিত। তর্ক দিয়ে আত্মাকে বোঝা যাবে না, কারণ তর্ক বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। যে মানুষের যত বুদ্ধি, সে তত ক্ষুরধার তর্ক দিয়ে একটা কিছু প্রমাণ করে দিতে পারে। আমাদের দেশে যত ঝামেলা হয় নিম্ন আদালতে মামলা করে, নিম্ন আদালতে না হলে হাইকোর্ট যাবে, হাইকোর্টেও না হলে সুপ্রীম কোর্টে যাবে। সুপ্রীম কোর্টে এই উকিল একভাবে প্রমাণিত করে দেবে, সেই উকিল আরেক ভাবে প্রমাণিত করে দেবে, জজ সাহেব আবার আর-একটা অন্য কিছু বলে দিলেন। সবটাই বুদ্ধির খেলা, সত্যটা কি, মিথ্যাট কি, আমরা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারি না। যার যেমন বুদ্ধি, সে তেমন বুদ্ধি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাবে। যার বুদ্ধি আছে, সে বলে দিয়ে গেল আত্মা আছেন। পরে যার আরও বেশী বুদ্ধি আছে, সে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, আত্মা বলে কিছু নেই। সেইজন্য বলা হয় শাস্ত্র প্রমাণ।

কিন্তু শাস্ত্র-প্রণেতাদের কথা কেন আমরা মানতে যাব? না মানার কোন কারণ নেই। কারণ ওনারা সবাই নিজেদের জীবন ত্যাগ তপস্যায় ঢেলে দিয়েছিলেন, যাঁদের কোন নিজস্ব স্বার্থ ছিল না। যেমন, যে লোক কোন ভুল কথা বলছে, তার কোন স্বার্থ থাকা চাই; যার কোন স্বার্থ নেই, সে কেন আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করতে চাইবে। যখন কেউ চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, তার স্বার্থ রয়েছে। এনাদের কোন স্বার্থ ছিল না, যীশু নিজের প্রাণ দিয়ে দিলেন, ঠাকুর অভাবগ্রস্থ সারা জীবন থেকে গেলেন, ভগবান বুদ্ধ নিজের সাম্রাজ্য ছেড়ে দিলেন। যদি বলেন, ওনাদের মাথাটা খারাপ ছিল। মাথা খারাপ হতেই পারে না, কারণ তাঁরা যে কথাগুলি বলে গেছেন, সব কথা যুক্তিতে পুরোটা প্রতিষ্ঠিত। তোমার কথা আমাকে মানতে হবে, আর তাঁদের কথা আমি মানব না, এটা কি ধরণের যুক্তি। স্টিফেন হকিং বলছেন, ঈশ্বর বলে কিছু নেই, তাঁর কথা মানব কিন্তু ভগবান বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, চৈতন্য মহাপ্রভু, শঙ্করাচার্য, এনাদের কথা মানব না? ইদানিং ফিল্ম স্টার থেকে শুরু করে বড় বড় সেলিব্রেটিরা হিন্দু ধর্মকে নিয়ে দিনরাত কত বিরোধিতা করে যাচ্ছে, এদের কথা আমি মানব, আর ঋষিদের কথা আমি মানব না?

যদি না মানতে হয়, আমি কোনটাই মানব না। যদি মানতে হয়, আমাকে দুটোই মানতে হবে, দুটোকে মানতে গেলে আমাকে বিচার করতে হবে। বিচার করতে গিয়ে দেখছি, তোমার তো স্বার্থ আছে, তোমার ভিতরে লোভ আছে। যখন তোমার নিজের ব্যাপার আসে, তখন তো তুমি একটুও ডানদিক বামদিক কর না। তোমার যত জ্ঞান ধর্মের বেলাতেই বেরিয়ে আসে। তোমার কথা আমি কি শুনব! ঠাকুর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠিক এই কথাই বলছেন, তোমার কথা আমি কী শুনব, তুমি কামী, লোভী, অহঙ্কারী। স্বার্থপর লোকের কাছে কি শুনব ধর্মের কথা? যে লোকটি কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, তার কাছ থেকে আমি শুনব ধর্মের কথা?

এরপর আবার বলবেন, আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম আত্মা আছে, কিন্তু আত্মজ্ঞান হয় না। আজকাল যত গুরু ও বাবাজী হয়েছে, সব কজন অদ্বৈত বিরোধী। কেউ গান করছে, কেউ নাচছে, কেউ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া শেখাচ্ছে। আর ঘুরে ফিরে বলতে থাকবে, অদ্বৈত বলতে কিছু নেই। আচার্য শঙ্কর অত্যন্ত সহজ যুক্তি দিচ্ছেন। যে শাস্ত্র আত্মার কথা বলছেন, যে শাস্ত্র কৃষ্ণের কথা বলছেন, যে শাস্ত্র স্বর্গলোকের কথা, বৈকুণ্ঠলোকের কথা বলছেন, সেই শাস্ত্রই আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন। তাহলে তুমি selective হবে কেন? ভাগবত থেকে তুমি কৃষ্ণের কথা নেবে, ভাগবত থেকে বৈকুণ্ঠের কথা নিতে পারবে, ভাগবত থেকে ভক্তির কথা নেবে, আর ভাগবত থেকে তুমি আত্মজ্ঞানের কথা নেবে না, এটা তোমার কেমন ধারা! মানুষ যখন কাউকে কিছু উপদেশ দিতে চায়, তখন বেছে বেছে উপদেশ দেয়। আবার স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার সময় বেছে বেছে একজন একজনকে কথা বলবে। সবাই বেছে বেছে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি হবে, এমন কথাগুলো মনে রেখে দেয়। তোমার এমন selective memory কেন, নিতে হলে পুরোটাই নাও।

আচার্য শঙ্করের যত ভাষ্য আছে, তাঁর সব রচনায় একটি সহজ যুক্তি – যদি বলতে হয় পুরোটাকে নাও, খাপাছাড়া কিছু চলবে না। বেছে বেছে কোটেশান দেবে, এখানে তার অনুমতি দেওয়া হয় না। নিতে হলে তোমাকে পুরোটাকে নিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি কেউ বলে এটা তো মিলছে না। তাকে বলতে হবে, তুমি তো বলে দিলে মিলছে না, আগে তুমি এর পরিবর্তে কিছু দাও। আচার্য পর পর যুক্তি দিয়ে সব দেখাচ্ছেন, না মেলার কিছু নেই। *নাসতো বিদ্যতে ভাবো* শ্লোক থেকে শুরু হয়েছে আত্মা অনন্ত। অনন্ত তাই ষড়্‌বিকার নেই, এগুলো আগে আমরা আলোচনা করে নিয়েছি। সেখান থেকে আসছেন, আত্মাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না, আত্মার ব্যাপারে জানতে হলে শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়ে জানতে হবে। তখন রামানুজ, মাধ্বাচার্য, বৈষ্ণবরা বলছেন, হ্যাঁ আমরাও শাস্ত্রপ্রমাণের কথা বলি। কিন্তু তার সাথে বলে দেন শাস্ত্রে যেখানে অদ্বৈতের কথা আসবে সেখানে কানে আঙুল দিয়ে রাখবে। নিতে হলে তুমি পুরোটা নাও, একটা নেব, আরেকটা নেব না, এই বেছে বেছে নেওয়াটা আগে ছাড়ো।

ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য লেখার সময়েও আচার্য বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, মীমাংসা সবাইকে যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। একা শঙ্কারাচার্য বৌদ্ধ ধর্মকে ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। আচার্য পরিষ্কার যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন, তোমার যুক্তিতে কোন দম নেই। আস্তে আস্তে এখানে বৌদ্ধ ধর্মই শেষ হয়ে গেল; তবে ভারতে সব ধর্মের লোক থাকে, সেই হিসাবে কোথাও কোথাও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে যেতে পারে। তথাগতের জন্ম ভারতে, ভগবান বুদ্ধকে আচার্য কোথাও অস্বীকার করছেন না, তিনি মহাপুরুষ এটাও আচার্য সব সময় মানছেন; কিন্তু তাঁর দর্শনকে আচার্য শেষ কথা রূপে নিচ্ছেন না।

ঠিক আছে, তুমি বলছ শাস্ত্রে এই রকম কথা আছে, মানছি। কিন্তু শাস্ত্রই আবার বলছে, আত্মা মন বুদ্ধির পারে। মন বুদ্ধির পারেই যদি আত্মা হন, তাহলে কি করে জ্ঞান হচ্ছে? তখন বলছেন, ঠিকই, আত্মা মন বুদ্ধির পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *শাস্ত্রাচার্যোপদেশশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে কারণম্*, শাস্ত্র আর আচার্য, এই দুজনের কাছ থেকে যখন উপদেশ পায়, সেই উপদেশকে আধার করে মানুষ যখন শম, দমাদির দ্বারা নিজের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করে, তাতে বুদ্ধি সংস্কৃত হয়ে যায়। আত্মদর্শনেরও একটা কারণ দরকার পরে। কি দরকার? শাস্ত্রের কথা আচার্যে মুখ থেকে আসতে হবে, সেই উপদেশ অনুসারে শম, দম, আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করতে হবে, এই অনুশীলনের ফলে তার মন শুদ্ধ হবে। ঠাকুর বলছেন, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা এক। শম হল মনের ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রণ, দম হল বহিরিন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ না হলে মন শুদ্ধ হবে না। মন শুদ্ধ না হলে আত্মজ্ঞান কোন দিন হবে না। আত্মাকে নিয়ে যত তত্ত্ব আছে, সব তত্ত্বগুলি বলে যেতে পারবে, কিন্তু আত্মজ্ঞান হবে না। *কারণম্* বলছেন এই জন্য যে, কথাটা ঠিকই, আত্মা মন বুদ্ধির পারে। কিন্তু এই মন আর বুদ্ধিই

যখন সংস্কৃত বা শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন এটাই আত্মজ্ঞানের কারণ হয়। ঠাকুরও খুব সুন্দর ভাবে বলছেন, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক।

বর্তমান কালে কাউকে যদি বলা হয় গীতা কোর্সে ভর্তি হতে, সঙ্গে সঙ্গে বলবে, এখন কি আমার গীতা পড়ার বয়স হয়েছে? বয়সকালে দেখা যাবে। ঠিক তেমনি আগেকার দিনে ভারতে খুব প্রচলিত কথা ছিল, সন্ন্যাস বলে কিছু হয় না। মানুষ যখন মৃত্যুর মুখে, তখন তাকে সন্ন্যাস দিতে হত। এই প্রথা অনেক জায়গাতেই আছে। আসলে সন্ন্যাসীর যদি পতন হয়ে যায়, সেটা খুবই জঘন্য ব্যাপার, মৃত্যুর সময় সন্ন্যাস দিলে পতনের আর ভয় থাকে না। আগেকার দিনে কুলীন ব্রাহ্মণের অবিবাহিত কন্যা বাড়িতে থাকা মানে সামাজিক ভাবে সে খুব হীন হয়ে গেল। ব্রাহ্মণরা মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য খোঁজ নিতেন কোথা ঘাটের মড়া কুলীন ব্রাহ্মণ আছে, দুদিন পরেই হয়ত মরে যাবে, দিয়ে দাও তার সাথে মেয়ের বিয়ে। দুদিনের মধ্যে স্বামী মরে গেলে সম্পত্তি চাইবে? সেইজন্য সতীপ্রথা দিয়ে তাকে পুড়িয়ে দাও, সব ঝামেলা চুকে যাবে। বিচিত্র বিচিত্র সব প্রথা, শাস্ত্র না পড়লে, শাস্ত্রের অধ্যয়ন না করলে যা হয়।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, তা হবে না। গীতাতে পরে পঞ্চম অধ্যায়ে বলবেন, *নবদ্বারে পুরে দেহি*, এই শরীরের মধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন, এই জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁর আচরণ কেমন হয় গীতাতেই পরে সেখানে বলবেন। সেইজন্য কেউ বলবে, যে একটু পরে বা কদিনের মধ্যে মরে যাচ্ছে, সে আত্মজ্ঞান নিয়ে কি করবে! স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী যখনই গীতা নিয়ে কথা বলতেন, তিনি বারবার এই কথা উপর জোর দিতেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এই জগৎকে এইখানে এই শরীরেই তোমাকে জয় করতে হবে। এটাই বেদান্ত, বেদান্তে মৃত্যুর সময় সন্ন্যাস হয় না, সন্ন্যাস জীবদ্দশায় হয়। কেন হয়? কারণ আত্মা অনন্ত।

যার এই বোধ হয়ে গেছে, সে কাকে মারবে, কেই বা তাকে মারবে। যার এই বোধ হয়ে গেছে, তার আর কিসের কর্তব্য। তাহলে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা কাজ করেন কেন? ফাঁকা সময় যতটুকু আছে, ততটুকু সময় নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করে দিচ্ছেন; এর বাইরে সন্ন্যাসীদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তাহলে সন্ন্যাসীরা কি আত্মজ্ঞান পেয়ে গেছেন? সবাই পান না, তবে সন্ন্যাসীরা সবাই এই পথেই চলেছেন, চলতে গিয়ে পাঁচবার হোঁচট খাবেন, আবার উঠে চলতে থাকবেন। কিন্তু এই আদর্শের সাথে যিনি আপোষ করে নেন, তাহলে তিনি শেষ হয়ে গেলেন, আর কোন দিন উঠতে পারবেন না। আদর্শটাকে সব সময় সামনে রাখতে হবে, এরপর পাঁচবার হোঁচট খাবেন, পাঁচবার উঠে দাঁড়াবেন, একদিন এই করে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু যদি আমি পারব না বলে আদর্শটাকেই ছেড়ে দেন, তাহলে তাঁর আর কোন গতিই থাকল না, কোন দিন আর পৌঁছাতে পারবেন না। এই হল একুশ নম্বর শ্লোক।

বাইশ নম্বরে একটু সাধারণ স্তরে নিয়ে আসছেন। এতক্ষণ অবিনাশী, সর্বব্যাপী আত্মার আলোচনা হচ্ছিল, সেখান থেকে এবার একটু জীবাত্মার দিকে নিয়ে আসছেন। আসলে বাইশ, তেইশ, চব্বিশ নম্বর শ্লোক মিলেমিশে আছে। কোন জায়গায় জীবাত্মার কথা বলছেন, কোন জায়গায় শুদ্ধ আত্মার কথা বলছেন। যদিও জীবাত্মা আর শুদ্ধ আত্মার কোন তফাৎ নেই। যেমন, রাস্থা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন ভদ্রলোককে দেখলাম, আমি বলছি ভদ্রলোক। যদি দেখি ভদ্রলোকের সাথে তার ছেলে আছে, ছেলে দুষ্টুমি করছে, বাবা ছেলেকে বকছে, আমি বলব, দেখ দেখ বাবা কেমন ছেলেকে বকছে। ভদ্রলোক থেকে ইনি হয়ে গেলেন বাবা, কারণ সাথে ছেলে আছে। ঠিক তেমনি, আত্মা ও জীবাত্মার এই সম্পর্ক। আত্মা সব সময় আত্মা, কিন্তু যেমনি বুদ্ধির সাথে আত্মার একটা যোগ হয়ে যায়, যোগ মানে মিলেমিশে এক হয়ে যায় না, আসলে যোগ হওয়ার কিছু নেই, দুটোই বিপরীত ধর্মী। কিন্তু মনে করে আমি ওর সাথে এক হয়ে গেছি।

পিজি উডহাউস, খুব নামকরা লেখক, ইংরাজী সাহিত্যের খুব নামকরা humorous writer। ইয়ং বয়সের লোকেরা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে, একটা বয়সে পর লেখাগুলো একঘেঁয়ে লাগে। সবটাই প্রেম নিয়ে, ওর মধ্যে খুব নামকরা Jeeves series, Blinding Castle, প্রায় আশি নব্বইটা বই লিখেছেন। যাঁরা ইংরাজী শেখেন তাঁরা পিজি উডহাউসের বই পড়েন। ওনার একটা কাহিনীতে একজন ভদ্রলোক, তাঁর প্রথম স্ত্রী থেকে এক সন্তান আছে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ভদ্রলোক দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী তার সন্তানের নামে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড একটা ট্রাস্টের কাছে রেখে দিয়ে গেছেন। একুশ বছর হয়ে গেলে সে এই বিপুল অর্থের মালিক হবে। ইতিমধ্যে সে মালিক হয়েও গেছে। কিন্তু ছোটবেলা থেকে সে তার সৎমার কাছে লালিত পালিত হয়ে এসেছে, সৎমাও তাকে খুব কড়া শাসনে রেখে নিজের মুঠোয় রাখত। ছেলেটি বড় হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও সৎমা যা বলে ছেলেটি তাই করে, ছোটবেলা থেকে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ছেলেটি আবার একটা মেয়ের সাথে প্রেম করতে শুরু করেছে, বিয়ে করে মেয়েটিকে নিয়ে সে পালাতে চাইছে। কিন্তু সৎমায়ের ভয়ে সে আর পালাতে পারছে না। ছেলেটির এক বন্ধু ভেবে পাচ্ছে না, ওর মাকে সে এত ভয় পায় কেন। ছেলেটির সাথে অনেক ভাবে কথাবার্তা, আলাপ আলোচনা করে বুঝতে চাইল, কি রহস্য, 'তুমি তোমার সৎমাকে এত ভয় পাও কেন'।

ছেলেটি ভেবে বলছে, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ঠিক কি কারণে ভয় পাই'।

বন্ধুটি বলল, 'তোমার টাকার তো তুমিই মালিক। লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের তুমি মালিক, আর কোথা থেকে কে একজন উড়ে এসে জুড়ে বসে তোমাকে হুমুক দিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি তাকে ভয় করে আসছ'।

'তাই তো এটা তো আমি কখন ভেবে দেখিনি'।

পুরুষ আর প্রকৃতি, চৈতন্য আর জড়ের ঠিক এই সম্পর্ক। চৈতন্য জড়ের সাথে মিশতে পারে না, জড় চৈতন্যের সাথে মিশতে পারে না। কিন্তু চৈতন্য থেকে জড় চেতনা পেয়ে যায়, চেতনা পেয়েই প্রকৃতি তার নাচ শুরু করে দেয়। প্রকৃতির নাচ দেখে পুরুষ মুগ্ধ হয়ে নিজের স্বরূপকে ভুলে যায়। পুরুষ মনে করে এই সব কিছু আমারই জন্য, প্রকৃতি আমার, আমি প্রকৃতির। বাংলায় একটা ফিল্মের গান চারিদিকে মাইকে বাজত, 'আমি যে তোমার, তুমি যে আমার'। সবাই তাই মনে করে, কিন্তু কেউই কারু না। প্রকৃতি পুরুষের না, পুরুষও প্রকৃতির না, কিন্তু এমন কি একটা করে দেয় যে, মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই মনে করে, 'আমি যে তোমার তুমি যে আমার', এর মধ্যেই আমরা সবাই ঘুর ঘুর করতে থাকি। যেমনি একটু বিচার করতে যাবে, কে কার? কেউ কারু নয়, কিসের সম্পর্ক, কারু সাথে কারু কোন সম্পর্ক নেই।

আত্মা যখন বোকার মত সম্পর্কটা নিয়ে আসে, তখন সে মনে করে তুমিই আমার সব। কিন্তু তাতেও আত্মার পুরো স্বভাবটা চলে যায় না, পুরো স্বভাবটা তখনই চলে যায়, যখন সে আরেক ধাপ নীচে নেমে নিজেকে শরীরের সাথে জুড়ে দেয়। আমরা আগে একবার আলোচনা করেছিলাম, মোটামুটি আত্মার তিনটে স্তর, দেহাত্মা, যখন দেহের সাথে জুড়ে রেখেছে, জীবাত্মা, মনের সাথে বা অজ্ঞানের সাথে জুড়ে রেখেছে আর শুদ্ধাত্মা। এবার এটাকে বাইশ নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করছেন –

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।২২।।

(মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নূতন বস্ত্র ধারণ করে, আত্মা সেই রকম জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নূতন শরীর ধারণ করে।)

বাইশ নম্বর শ্লোকে জীবাত্মার বর্ণনা করা হচ্ছে। হে অর্জুন, তুমি যদি আত্মার এই তত্ত্ব নাও নিতে পার। তা তুমি জীবাত্মা রূপেই নাও, যে রূপে তুমি এখন নিতে চাইছ; মৃত্যুর পর এই আত্মা দেহকে ছেড়ে চলে যায়। ভগবান তেরো নম্বর শ্লোকে অবস্থার পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন, বাল্যাবস্থা, কৌমারাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা, ঠিক তেমনি মৃত্যুটাও একটা অবস্থার পরিবর্তন। শরীর আর বস্ত্র যেমন আলাদা, ঠিক তেমনি জীবাত্মা আর শরীর আলাদা। ছোট্ট বাচ্চাকে তার বাবা তাকে একটা নূতন জামা দিয়ছে, খুব আনন্দ। জামা গায়ে পরে ছুটোছুটি করে খেলছে। কেউ যদি একবার জামাটা একটু টেনে দেয়, তারপর আর তাকে দেখে কে; মারামারি, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে – আমার জামা কেন ছুঁলে। বাচ্চাদের এটাই স্বভাব, ছোট ছোট সাধারণ জিনিসের সাথে নিজের আমিত্বকে এক করে ফেলে। একটা কিছু হাত থেকে নিয়ে নিলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তুলবে। যেমন যেমন বড় হয় তেমন তেমন সে এই জিনিসগুলি থেকে তার আমিত্বকে বার করে নিয়ে আসে।

একজন নামকরা মনস্তাত্ত্বিকের একটা লেখাতে তিনি লিখছেন, তাঁর সাত বছরের একটা ছোট্ট মেয়ে আছে। তিনি মেয়েকে শিক্ষা দিতে চাইছিলেন আমিত্বের ভাব যেন তার না থাকে। মেয়েটির বন্ধু এসেছে, দুজনের জন্য কুকিস বানানো হল। সব দিক থেকে সমান, সাইজ, আকার দুজনের সমান। মেয়েটিকে বোঝানর জন্য, দেখ তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তোমার বন্ধুকেও তাই দেওয়া হয়েছে। মেয়েটি বন্ধুকে বলছে, 'আমার বিস্কুটটা তোমার বিস্কুটের মত, কিন্তু তোমার বিস্কুটটা আমার বিস্কুটের মত নয়'। আমিত্বটা কিছুতেই ছাড়বে না, আমিত্ব, এই যে শ্রেষ্ঠ ভাব এটা আনবেই। মানে, তোমার যা কিছু আছে তা আমার মধ্যে আছে, আমার যা কিছু আছে তোমার মধ্যে নেই।

অর্জুনকে ভগবান বোঝাচ্ছেন, তুমি যে এত কান্নাকাটি করছ, শোক করছ, তুমি এটা বুঝে নাও যে, তুমি যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ফেলে দিয়ে নূতন বস্ত্র গ্রহণ কর, জীবাত্মার যখন সময় হয়ে যায়, তখন সেও এই শরীরটা ছেড়ে দেয়। সেইজন্য তুমি স্বধর্ম কেন ত্যাগ করতে যাবে, আজ হোক কি কাল হোক জীবাত্মা এই শরীরটাকে ছাড়বে। আমার আপনার সবারই সমস্যা যেটা হয় তা হল, সংস্কৃতে একটা শব্দ আছে, *আত্যন্তিক নাশ*, যার অর্থ পুরোপুরি শেষ; মৃত্যুকে আমরা *আত্যন্তিক নাশ* রূপে দেখি। আমরা মনে করি মৃত্যু মানে সব শেষ; কিন্তু মৃত্যুতে কিছুই শেষ হয়ে যায় না। মানুষ যেমন পোষাক পালটায়, তেমনি জীবাত্মা দেহ পালটায়। পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান বলবেন, *বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ*, যাঁরা যোগী, যাঁদের মন শুদ্ধ হয়ে গেছে, তাঁরা পরিষ্কার দেখতে পান মৃত্যুর সময় দেহ থেকে জীবাত্মা কিভাবে আলাদা হয়ে যায়; যারা বিমূঢ়, যারা সাধারণ তারা এটা দেখতে পায় না। ঠাকুরও বলছেন, তিনি পরিষ্কার দেখছেন, খাপ থেকে যেমন তলোয়ার বার করা হয়, জীবাত্মা সেই ভাবে দেহ থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমরা পড়ছি, আচার্য তাঁর ভাষ্যে ধারালো যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন কথাগুলি কিভাবে যুক্তি সঙ্গত, কিভাবে প্রত্যেকটি কথা একেবারে সত্য। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না, সাধারণ লোকেরা গীতার কথাগুলি গাঁজাখুরি বলে মনে করে। একটা আশ্রমে সুন্দরবন থেকে একটি ছেলে কাজ করতে এসেছিল। আশ্রমে একটা রেফ্রিজারেটর ও একটা হটকেস ছিল। গ্রামে গিয়ে সে বলছে, 'আমাদের আশ্রমে একটা বাক্স আছে যেটাতে জিনিস রাখলে ঠাণ্ডা থাকে, আরেকটা বাক্স আছে সেখানে জিনিস রাখলে গরম হয়'। ওর কথা শুনে গ্রামের সব লোক হেসে গড়াগড়ি দিতে শুরু করেছে। 'তুই গাঁজাখুরি গল্প বলার আর জায়গা পেলি না, একটা বাক্সে জিনিস রাখলে নাকি সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আর-একটা বাক্সে জিনিস রাখলে সব গরম হয়ে যায়'!

বিজ্ঞান যেমন অজ্ঞানীদের কাছে একটা চমৎকার বলে মনে হয়, আধ্যাত্মিক সত্যগুলি ঠিক তেমনি সাধারণ লোকের কাছে শুধু চমৎকারের না, তিরস্কারের জিনিস বলে মনে হয়। ভগবান এখানে অর্জুনকে বলছেন, এটা তুমি বোঝ। আর এটা যে শুধু আমার কথা তা না, এটাই সত্য। আর আমরা অতি ভাগ্যবান যে, ঠাকুর আসাতে আমরা এগুলোকে এখন সত্যি বলে মানতে পারছি, কেন না, ঠাকুর এই সব কটা সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

মানুষ কি সত্যিই দিন দিন বোকা হয়ে যাচ্ছে? আগে অবস্থা অবশ্যই খারাপ ছিল, কিন্তু বর্তমান কালে এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে, দেখে সত্যিই আতঙ্ক লাগে। কি নিয়ে মানুষ প্রতিবাদ করছে, কেন বলছে, নিজেরা একটু ভেবে দেখে না। বিশেষ করে হিন্দুদের যে কোন জিনিসকে নিয়ে শুধু হাসিঠাট্টা। ধৈর্য ধরে একটু শাস্ত্রের কথা শুনবে সেটাও নেই, আর বলবে, হিন্দুদের যা কিছু আছে সবটাই খারাপ। অথচ এই একটা সাধারণ কথা জানে না যে, হিন্দু ধর্ম বাদে বিশ্বের কোন ধর্মই সেকুলার না। একমাত্র হিন্দু ধর্মই সেকুলার, যে ধর্ম তাদের ধর্মীয় শাস্ত্র থেকে সাধারণ জীবন চলে না। অন্যান্য ধর্মে তাদের ধর্মশাস্ত্র যা বলছে, ওদের সাধারণ জীবন তেমন ভাবেই চলবে। হিন্দু ধর্মে হল, সিদ্ধান্ত যেটা বলছে, সেই অনুসারে শাস্ত্র পাল্টাবে, সেই মত তোমার জীবন পাল্টাবে। এরা আবার সেকুলারের অর্থও বোঝে না।

সেকুলারের অর্থ হল, চার্চের যে নিয়ম, সেটা স্টেটে যাবে না। পশ্চিম ইউরোপে চার্চ সব কিছুর বিধান দিতেন, আমরা কি করব আর কি করব না। ফ্রান্স প্রথম চার্চের বিধান মত চলার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। ওরা বলল, চার্চের বিধান চার্চের, চার্চের কথায় আমরা চলব না; চার্চের নির্দেশ আমাদের ক্ষেত্রে চলবে না, সেটা হল state of political levelএ। হিন্দুদের সাধারণ জীবন কখন একটি বই দিয়ে চলে না। অন্য দিকে মুসলমানরা কোরানের বাইরে কিছু করবে কল্পনাই করতে পারে না। খ্রীশ্চানদের চার্চ বাইবেলকে আধার করে যেটা বলে দেবে, সেই মত সবাইকে চলতে হবে। পার্সিদেরও তাই, বৌদ্ধদেরও তাই। একমাত্র হিন্দু ধর্ম বলে সিদ্ধান্ত যা বলছে, সেই অনুসারে শাস্ত্র ও জীবনকে সাজাতে হবে। হিন্দু ধর্মের স্বভাবেই সেকুলার, অন্য ধর্ম স্বভাবেই নন-সেকুলার। সেইজন্য রাজ্যগুলি বলে ধর্মের কথা দিয়ে আমাদের চালাতে যেও না, আমরা তোমাদের থেকে আলাদা। হিন্দুরা প্রথমেই বলে দেয়, শাস্ত্র দিয়ে তোমার চলার কথা নয়, তুমি তোমার নিজের মত চল। এটাও বলছেন না যে, তুমি তোমার মত চল, আমি আমার মত চলছি, আমার চলার মধ্যে যদি নাক গলাও তোমার নাকটা ফাটিয়ে দেব। এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তুমি উন্নতি করতে চাও কি চাও না, সেটা তোমার ব্যাপার। এরা এসে এখন আমাদের সেকুলারিজম্ শেখাচ্ছেন।

গীতাতে যা কিছু বলছেন, এতে কোন কাব্য নেই, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কিছু বলছেন না, এটাই সত্য। আগে যেটা বলা হয়েছিল, সেটাকেই এখানে এবার পরের শ্লোকে বোঝাচ্ছেন, তবে অন্য ভাবে। তুমি যে মনে করছ, তুমি মারা যাবে, তুমি কাউকে মারবে, তা নয়। কি বলছেন –

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।২৩।।

(কোন শাস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করতে পারে না। অগ্নি এঁকে দহন করতে পারে না। জল এঁকে আর্দ্র করতে পারে না এবং বায়ু এঁকে শুষ্ক করতে পারে না।)

শস্ত্র এঁকে ছেদন করতে পারে না, আগুন এঁকে দগ্ধ করতে পারে না, জল এঁকে সিক্ত করতে পারে না, বায়ু এঁকে শুষ্ক করতে পারে না। কারণ খুব সহজ, আত্মার কোন অবয়ব নেই, আত্মা কোন মিশ্র পদার্থ নয়। ছেদন করা, দগ্ধ করা, সিক্ত করা, শুষ্ক করা, এই ক্রিয়াগুলো শুধু মিশ্র পদার্থের মিশ্রণের উপরেই হয়। যেমন কয়লা একটা মিশ্র পদার্থ, কয়লাকে পোড়ালে অন্য একটা

মিশ্র পদার্থে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। ভেজা কাপড় বাইরে শুকোতে দেওয়া হয়েছে, ভেজা কাপড়ও একটা মিশ্র পদার্থ, সূর্যের তাপ কাপড়ের জলকে বাষ্প করে দিচ্ছে, বাতাস সেই বাষ্পকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুকে কাটা মানে, ওই বস্তু বিভিন্ন জিনিস দিয়ে জোরা দেওয়া বলে কাটা যাচ্ছে। যদি একটা একক পদার্থ হত, তাহলে কাটা যেত না।

যেমন এ্যটম, এ্যটমকে প্রথমে ভাঙতে পারছিল না। ডাল্টন যখন এ্যটমিক থিয়োরি দিলেন, তখন তিনি বললেন, এ্যটম হল Smallest indivisble। পরে যেখন এ্যটমকে ভেঙে দিল, তখন সবাই অবাক হয়ে গেল। তারপর দেখছে এ্যটমের ভিতরেও অনেক parts রয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, parts হলেও ওর property পুরো পাল্টে যায়। যেটা পুরো ইউনিফর্ম, যেখানে কোন পার্টস নেই, ওটাকে কিছু করা যাবে না। যদি দেখা যায় জিনিসটা জ্বলছে, ভিজে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে হবে ওই জিনিসটা অনেকগুলি পার্টস দ্বারা নির্মিত। দূর্গা প্রতিমা, সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জনের পর দেখা যায়, প্রতিমার কোন হাত খুলে বেরিয়ে গেছে, কোন প্রতিমার মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেছে, কারণ প্রতিমা বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরী। যে কোন বস্তুর যদি একাধিক অঙ্গ থাকে, অবয়ব থাকে তবেই এই ক্রিয়াগুলো হবে। পরের শ্লোকেও একই ভাবে বলছেন –

অচ্ছেদ্যোহমদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ।।২৪।।

(এই অপরোক্ষ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল এবং সনাতন।)

যে জিনিসগুলো আগে বলা হয়েছে, এটাকে এবার ধীরে ধীরে একটা উপসংহারের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। খুব সহজে এই বিষয়টা আসবে না, অনেক পরে পরে আসবে। আত্মাকে ছেদন করা যায় না, জ্বালা যায় না, ভেজানো না, শুষ্ক করা যায় না। আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী, এই যে পঞ্চভূত, এর ধর্মই হল এক অপরকে নাশ করে। এক অপরক যেমন দাঁড় করায়, তেমনি এক অপরকে নাশ করে দেয়। বাচ্চাদের মধ্যে বন্ধুত্বও যেমন, ঝগড়াও তেমন। এই পঞ্চভূত কাউকে ছেড়েও থাকতে পারবে না, আবার কারু সঙ্গে থাকতেও পারবে না। বাচ্চারাও ঠিক তাই।

একটা প্রবাদ আছে, ভাইয়ের মত বন্ধু নেই, ভাইয়ের মত শত্রু নেই। রাম আর লক্ষ্মণ দুই ভাই, এদের মত বন্ধু নেই; রাবণ আর বিভীষণও দু ভাই, এদের মত শত্রু নেই। একই কাহিনীতে দুই সহোদর, কিন্তু দুটো আলাদা কাহিনী রূপে একটা সম্পূর্ণ বিপরীত সম্পর্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চভূতও ঠিক তাই, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবীর জন্ম। এরা এক অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, অথচ এক অপরকে নাশ করে। যেখানে কাটাকাটি হয়, যেখানে জ্বলন হয়, যেখানে ভেজানো হয়, যেখানে শুকনো হয়, এগুলো সব সেই পঞ্চতত্ত্ব, যেখানে এক অপরকে নাশ করছে। আত্মা এগুলোর বাইরে, আত্মার নিয়ম এখানে খাটবে না।

হ্যারি পটারের কাহিনীতে আছে, একবার হ্যারি পটার একটা ম্যাজিকের মধ্যে ফেঁসে গেছে। ওখানে তাকে তার এ্যসিস্টান্ট উদ্ধার করতে এসেছে। পটার ওকে জিজ্ঞেস করছে, আরে ম্যাজিকটা তোমার উপর কাজ করছে না? বলছে, এটা আপনাদের ম্যাজিক, আপনাদের উপরেই কাজ করে, আমাদের উপর কাজ করে না। এই বলে হ্যারি পটারকে ওখান থেকে বার করে নিয়ে চলে গেল। পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্বের উপরে কাজ করে, এর বাইরে ওর কোন এক্তিয়ার নেই। আগেকার দিনে একজন মহিলা কম্প্যুটারে কাজ করছে। আর কম্প্যুটারের ওখান থেকে গোমড়া মুখে উত্তর দিচ্ছে, আমি তোমার স্বামী না, উল্টোপাল্টা কমাণ্ড দিও না। তোমার এক্তিয়ার যত দূর, তার বাইরে যেও না। পঞ্চতত্ত্বের এক্তিয়ার পঞ্চতত্ত্বের ভিতরে, তার বাইরে তুমি যেও না, সাবধান করে দিচ্ছে। আত্মা এর এক্তিয়ারের বাইরে, সেইজন্য পঞ্চতত্ত্বের কোন কিছুই আত্মার উপর খাটবে না।

বলছেন, নিত্য, সর্বগতঃ, স্থানু, স্থানু একটা খুব সুন্দর শব্দ। স্থানু বলতে আমরা বুঝি পাথরের মত বা মরা একটা গাছের মত, কিন্তু স্থানু শব্দের অর্থ হল, যাকে নাড়ানো যায় না। যার জন্য শিবের একটা নাম স্থানু, পরে বিষ্ণুরও একটা নাম হয়ে যায় স্থানু। আত্মা সব জায়গাতেই আছে, সেইজন্য আত্মা স্থানু। আত্মা যেহেতু স্থানু, সেইজন্য এটা অচল, কোথাও চলাফেরা করতে পারে না, কোথাও যাওয়ার নেই। যাবেটা কোথায়, আত্মা তো সর্বব্যাপী হয়ে আছেন। সেইজন্য বলছেন *সর্বতঃ*। আত্মা তাই সনাতন, সব সময়ই আছে। কারণ কোন কিছুর থেকে আত্মা উৎপন্ন হয়নি। উৎপন্ন হলে আমরা বলতাম নবীন। আত্মাকে পুরনো এই জন্য বলা হয়, আত্মা চিরদিন, আদি অনন্তকাল ধরে আত্মা আছে সেইজন্য পুরাতন। নবীন এই জন্য বলা হয়, মনে হয় সদ্য তার জন্ম হয়েছে। যেই অর্থ আমরা নবীন বা পুরাতন বলি, সেই অর্থে বলা হচ্ছে না, কারণ এটা সনাতন। *সর্বগতঃ*, সব জায়গায় আত্মা বিদ্যমান।

আত্মাকে নিয়ে যে এত কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে, এর একটাই key word, তা হল আত্মা অনন্ত। বাকি সব কিছু এই একটা শব্দ অনন্ত থেকে বেরিয়ে আসে, অনন্তেরই এগুলো নানান ভাব। কোথাও শব্দ দিয়ে, কোথাও বিচার দিয়ে পুনরুক্তি করে যাচ্ছেন। আত্মার ব্যাপার অত্যন্ত কঠিন, তাই নানা ভাবে বর্ণনা করতে হয়, একই ভাবকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করে যাচ্ছেন। পরের শ্লোকে এই জিনিসটার ইতি টানছেন –

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।।২৫।।

(শাস্ত্রে এই আত্মাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকারী বলে উক্ত করা হয়েছে। অতএব (হে অর্জুন) আত্মার এই সনাতন স্বরূপ অবগত হও এবং শোক পরিত্যাগ কর।)

হে অর্জুন তুমি ভাল করে বুঝে নাও, যাদের নিয়ে তুমি শোক করছ, এই ভীষ্ম, দ্রোণ বা অন্যান্যরা, এনারা সবাই আসলে আত্মা; আত্মার স্বরূপ অবগত হও এবং শোক পরিত্যাগ কর।

যে জিনিসটাকে বুদ্ধি ধরতে পারে সেটাকে বলে ব্যক্ত। ব্যক্ত মানে, যে জিনিসটা বেরিয়ে এসেছে এবং দেখা যাচ্ছে, জানা যাচ্ছে। কোন জিনিস কখন বেরিয়ে আসে? বুদ্ধি যখন ওটাকে গিয়ে ধরে। কিন্তু বুদ্ধি আত্মাকে ধরতে পারে না, কারণ বুদ্ধি সীমিত আর আত্মা অসীম। এক সের ঘটিতে পাঁচ সের দুধ ধরে না। সেইজন্য বলছেন আত্মা অব্যক্ত। আত্মাকে কোন দিন জানা যাবে না, সম্ভবই না। অন্ধকারে আমরা কোন জিনিসকে হয়ত দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু স্পর্শ দিয়ে জিনিসটার অনুভব পাওয়া যায়, জিনিসটার বিশেষ কোন গন্ধ থাকলে, সেই গন্ধ দিয়েও জিনিসটার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। ঠিক তেমনি বুদ্ধি যখন শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন আত্মার সাথে এক হয়ে অনুভব করে এই রকম কিছু একটা আছে।

অচিন্ত্যঃ অয়ম্, ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন জিনিসকে দেখার পর, শোনার পর, ওটাকে নিয়ে আমরা চিন্তা করি। ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মাকে কোন দিন জানা যাবে না, সেইজন্য আত্মা *অচিন্ত্যঃ*। আসলে অব্যক্ত এবং অচিন্ত্য একই অর্থে হয়, এখানে অব্যক্ত বুদ্ধিকে নিয়ে বলছেন আর অচিন্ত্য ইন্দ্রিয়কে নিয়ে বলছেন।

অবিকার্যঃ অয়ম্, আত্মা অবিকারী। ষড়্‌বিকারের আলোচনাতে বলা হয়েছিল, একটা জিনিস যখন আরেকটা জিনিসে পরিবর্তিত হয়, দুধ যেমন দইয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়, আত্মার এই ধরণের কোন পরিবর্তন নেই। আগেও বলা হল, তাঁর কোন অবয়ব নেই, সেইজন্য সে অবিকারী থাকে।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং, অর্জুন তুমি এই জিনিসটাকে খুব ভাল করে বোঝ, ভীষ্ম দ্রোণের আসলটা হলেন আত্মা। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তার বিকার নেই। *নানুশোচিতুমর্হসি*, এটা বুঝে নিয়ে তুমি আর শোক করো না, উঠে দাঁড়াও এবং যুদ্ধ কর।

আমরা পঁচিশ নম্বর শ্লোকের আলোচনা করলাম, এরপর ছাব্বিশ ও সাতাশ এই দুটো শ্লোকও পঁচিশ নম্বর শ্লোকের সাথে সংযোগ আছে এবং তিনটে খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, হিন্দুদের তিনটে জীবনদর্শনকে এর মধ্যে নিয়ে আসছেন। পঁচিশ নম্বর ঘোর অদ্বৈত, ছাব্বিশ নম্বর যেন মীমাংসাকে নিয়ে আসছেন, হিন্দুদের যেটা খুব প্রাচীন মত। আর সাতাশ নম্বর নিয়ে আসছেন সাধারণ মানুষের ধারণা, যারা মনে করে মরে গেলেই সব শেষ। জীবনে যা কিছুই হয়ে থাকুক না কেন, এই তিনটেই সম্ভবনা, এই তিনটে সম্ভবনার বাইরে কিছু থাকতে পারে না। তবে চতুর্থ আরেকটা মত আছে, যেটা মুসলিম, খ্রীশ্চানরা মানেন, এনাদের কাছে হল, জন্ম একবারই হবে, আর মৃত্যুর পর সে চিরদিনের জন্য স্বর্গ বা নরকে চলে যাবে। পরের শ্লোকে বলছেন –

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি।।২৬।।

(অর্জুন, এরপরেও তুমি যদি মনে কর যে, আত্মা প্রত্যেক শরীরের উৎপত্তির সঙ্গে জাত হন এবং প্রত্যেক শরীরের বিনাশের সঙ্গে মৃত হন, তবুও হে মহাবাহো, এর জন্য তোমার অনুশোচনা করা উচিত নয়।)

মূল শ্লোকে যাওয়ার আগে আমাদের একটু পিছনে যেতে হবে। প্রথমেই অর্জুন বলেছিলেন, আমি যুদ্ধ করব না। যুদ্ধ কেন করবেন না? এতগুলো লোক মারা যাবে, এরা সবাই আমার আপনজন, পিতামহ আছেন, আচার্যরা আছেন, মামা আছেন, ভাইয়েরা সবাই আছে। অর্জুনের দ্বিতীয় সমস্যা ধর্মকে নিয়ে। যেগুলোকে আমরা শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে জানি, তাঁরা বলছেন হিংসা করো না। নীতি শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্রের একটু নীচে যারা, তারা বলছে, যারা আততায়ী তাদের বধ করতে পারো। নিয়ম হল, যদি ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়, তাহলে ধর্মশাস্ত্রের কথাই মান্যতা পাবে।

ভগবান অর্জুনের কথা শুনে অবাক হয়ে গেছেন। ভগবান অর্জুনকে একসাথে দুটোকে মিলিয়ে বলছেন, তোমার বাস্তব স্বরূপ আত্মা, আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, আত্মা সর্বব্যাপী, আত্মা নিত্য, *কং ঘাতয়তি হন্তি কম্*, কে কাকে মারে, কে কাকে কিভাবে মারান। এই শ্লোকগুলির আলোচনার সময় বলা হয়েছিল, এটাই ঠিক ঠিক হিন্দুদের ধর্ম দর্শন ও জীবনদর্শন। আমরা হরিবোল হরিবোল করতে পারি, জয়রাম সিয়ারাম করতে পারি, জয় হনুমান জ্ঞানগুণ সাগর করতে পারি, আমরা চণ্ডী পাঠ করতে পারি, কিন্তু আমাদের মূল ভাব হল ওই একটা –আত্মা অনন্ত। যে হিন্দুরা এটা বোঝেন না, পালন করেন না, তাদের জন্য একটাই শব্দ –অভাগা। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, A Hindu, who is not spiritual, I do not consider him as a Hindu। যে হিন্দু সচেতন হয়ে মুক্তির জন্য চেষ্টা করছেন না, তিনি কিন্তু হিন্দু নন। তুমি নিজেকে নাস্তিক বল, ভোগবাদী বল, তুমি নিজে কিন্তু হিন্দু না। হিন্দু মানেই, সে এই ব্যাপারে সচেতন থাকবে –তোমার বাস্তবিক সত্তা আত্মা, যার জন্ম নেই, যার মৃত্যু নেই, যে অজর, অমর, নিত্য, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান আর সর্বজ্ঞ।

তাহলে আমার এই দুরবস্থা কেন? কারণ তুমি ঐ রকম ভাবছ বলে তোমার এই দুরবস্থা। একজন বড়লোক কোন কারণে গরীব হয়ে গেছে, সে এখন চেষ্টা করবে কিভাবে আবার বড়লোক হতে পারে। আঠারো মাস আগে ইয়েস ব্যাঙ্ক সেরা ব্যাঙ্ক ছিল, গতকাল সেই ব্যাঙ্ককে বন্ধ করে দিয়েছে। অন্য দিকে তাকে আবার উপরে তোলার চেষ্টা হবে। যদি তুমি মানুষ হও, যদি তোমার এই অহঙ্কার থাকে আমি একজন মানুষ, তাহলে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। যেটা তোমার মনে হচ্ছে

এটা ঠিক, সেই ব্যাপারে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। যে অনন্ত স্তর থেকে তোমার পতন হয়ে গেছে, এবার সেখান থেকে নিজেকে তোলো। তোমার টাকা-পয়সা যদি চলে গিয়ে থাকে, তাহলে অর্থোপার্জন করো। সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়েছিল। শ্রীরাম যুদ্ধ করে রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করলেন। যুদ্ধের পর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, আমি ক্ষত্রিয়, আমার স্ত্রীর উপর যে হাত দেবে তাকে আমি উড়িয়ে দেব। আমি তাই রাবণকে উড়িয়ে দিলাম, এর মধ্যে অন্য আর কোন ব্যাপার নেই। এটাই বাল্মীকি রামায়ণের মত। আমার যে আসল সত্তা, যেটা আমি, কোন কারণে যদি নিজের স্বরূপ থেকে নড়ে যাই, আমাকে এবার প্রাণপন চেষ্টা করতে হবে, যাতে আমি আবার আমার আসল সত্তাতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পঁচিশ নম্বর পর্যন্ত এই ভাবকে কেন্দ্র করেই ভগবান অর্জুনকে বলে গেছেন। ছাব্বিশ থেকে এবার অন্য বিষয়কে নিয়ে বলবেন। আবার দশটা শ্লোক পরে আবার এই টপিকে চলে আসবেন।

ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে যেটা বলছেন, এটাও একটা জীবনদর্শন। প্রসঙ্গ থেকে সরে আমরা একটা অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। আমাদের জীবনে কেন এত সমস্যা, কেন আমরা দুর্বল প্রকৃতির, কেন আমাদের জ্ঞান লাভ হচ্ছে না, কেন আমাদের শক্তি নেই, কেন আমরা সব সময় নিজেকে অসহায় মনে করছি? এই প্রশ্নগুলিকে অনেক ভাবনা চিন্তা করার পর যেটা পাওয়া যায়, তা হল –আমাদের সমস্যা একটা জায়গায়। তা হল –আমাদের জীবনে কোন আদর্শ নেই বলে এত সমস্যা। জীবনে আদর্শ সব সময় আসে জীবনদর্শন থেকে। আগে জীবনদর্শন থাকতে হবে। যদি আমরা না বুঝি জীবনটা কি, তাহলে আমরা আদর্শ তৈরী করব কিভাবে। মুখে আমরা অনেক বড় বড় কথা বলে দিতে পারি। ঠাকুর ওই দেশে গেছেন, ওখানকার তাঁতিরা জিজ্ঞেস করছে, উনি কোন কৃষ্ণ মানেন। ঠাকুর বলছেন, এদিকে তাঁতি অন্য দিকে লম্বা লম্বা কথা। ভক্তদেরও সবার লম্বা লম্বা কথা – ঠাকুর সব দেখছেন, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে।

একজন নূতন ব্রহ্মচারী এক আশ্রমে জয়েন করেছেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ সব সময় বলতেন, ‘আমাদের স্বামীজীর আদর্শ পালন করে চলতে হবে’। একদিন ব্রহ্মচারী জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা মহারাজ, ‘স্বামীজীর ঠিক ঠিক আদর্শটা কি’? অধ্যক্ষ বলছেন, ‘সেটা ভাববার বিষয়’। উনি নিজেও জানেন না, স্বামীজীর ঠিক ঠিক আদর্শ কি। শুধু মুখে বলে যাচ্ছেন। সকালে এসে প্রথমে ওটাই বলবেন, আমাদের জীবনকে ঠিক ঠিক স্বামীজীর আদর্শে চালাতে হবে। আর যদি জিজ্ঞেস করা হয়, স্বামীজীর আদর্শটা কি? তখন বলবেন, সেটা ভাববার বিষয়। সারা দেশে এই দুরবস্থা। সবাই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। একবার জিজ্ঞেস করুন, আপনার জীবনের আদর্শটা কি? এটা গেল প্রথম।

দ্বিতীয়, আপনি কি সেটাকে নিয়ে চেষ্টা করছেন যে, এই জীবনে সেই আদর্শকে ধরে রাখবেন? আপনি অসফল না হতে পারেন, আপনার পদস্খলন হতে পারে, আপনি হোঁচট খেতে পারেন, কিন্তু আপনি কি আপনার জীবনের আদর্শের ব্যাপারে সচেতন?

এখানে ভগবান জীবনের প্রথম আদর্শ বললেন, তুমিই সেই আত্মা, তুমি অজর, অমর। আমরা এখানে দেখব একজন মানুষের জন্য কত প্রকার জীবনদর্শন হতে পারে। প্রথম জীবনদর্শন হল খুব নামকরা জড়বাদীদের, যারা বস্তুবাদী। গ্রীক ফিলজফিতে এপিক্যুরাস ছিলেন একজন বিরাট বড় সাধু, ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কিভাবে কিভাবে ওনার অনুগামীদের মধ্যে কোথাও একটা এলেমেলো হয়ে যায়, তাতে লোকেরা ভুল বুঝলেন, বলতে শুরু করলেন তোমরা ভোগ কর। আসলে উনি বলতে চাইছিলেন, ত্যাগ কর, ভোগে কিছু নেই। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে এলেমেলো হয়ে গেছে। ফিলজফারসরা এদের ভোগবাদকে নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছেন। আগেকার বিজ্ঞান না, বর্তমান কালের বিজ্ঞানের কি দর্শন, বোঝা যায় না, সবটাই এলেমেলো। আর হিন্দুদের প্রাচীন দর্শন চার্বাক হল ভোগবাদী।

ভোগবাদী বা জড়বাদী হল, আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা কিছু জানছি, চোখের সামনে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি, এই কলম আছে, আমি দেখছি এটা কলম, আর আমি জানি কলম একটা পদার্থ। যদি পদার্থকে গুছিয়ে একটা জায়গায় নিয়ে আসা হয়, তখন সব কটা হয়ে যায় এ্যটম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এ্যটম ছাড়া কিছু নেই। এই এ্যটমগুলি মিলেমিশে বিভিন্ন বস্তু তৈরী হয়। বিশ্বের যত পশু, পাখি, মানুষ আছে, এরাও এ্যটম থেকেই তৈরী হয়। একটা ইঞ্জিনের মধ্যে এনার্জি বিশেষ ভাবে কাজ করে, তাই ইঞ্জিন চলে। ঠিক সেইভাবে এনার্জি আমাদের ভিতরে একটা বিশেষ ভাবে কাজ করছে, এটাই প্রাণ। তাহলে আত্মা কি? জড়বাদী বলবে, এ্যটম যখন একটা বিশেষ ভাবে অর্গানাইজড হয়, এটাই একটা sense of consciousness create করে, consciousness হল product of matter। এটাই জড়বাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী।

যেখানেই বলা হবে, পদার্থ থেকে মন এসেছে, সেখানেই বুঝতে হবে আসলে এরা জড়বাদী। আর স্বাভাবিক ভাবে এটাকে যদি আরও টেনে আনা যায়, তখন বেরিয়ে আসবে –আমার জন্ম হয়েছে, আমি মরে যাব। আমি আগে কখন ছিলাম না, কোন না কোন ভাবে এমন কিছু একটা হয়েছে, বাবা-মার সংযোগে হতে পারে, কিংবা কোন না কোন ভাবে এ্যটমসগুলি এক সঙ্গে পরস্পরের সংযুক্তিতে কোন ভাবে আমার এই সত্তা এসেছে। একদিন এমন হবে সেই শক্তিটা চলে যাবে, এ্যটমসগুলো আবার degenerate করে নিজের নিজের basic formএ চলে যাবে, সেদিন আমি শেষ। যেদিন আমি শেষ হয়ে যাব, চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাব। এটা হল খুব সাধারণ এবং একেবারে lowest form।

সেখান থেকে আমরা ধর্মের দিকে আসছি, সেখানে অন্য একটা দর্শন চলে আসে। যারা আত্মাকে মানে, আত্মাকে মানা মানে, এই যে তুমি যেটা আছ, এই তুমি মৃত্যুর পর কোন না কোন ভাবে বেঁচে থাকবে, তুমি চলতে থাকবে। Materialist মানে মৃত্যুর সাথে সব শেষ, non-materialst মানে মৃত্যুর পরেও সত্তা কোন না কোন ভাবে চলতে থাকে। সমস্ত ধর্ম হল non-materialist। Non-materialistরা মনে করে, তোমার যে আসল আমি, এই আমি মৃত্যুর পরেও কোন না কোন রূপে চলতে থাকবে।

কোন না কোন রূপে, এটা কত রূপ হতে পারে? এর মধ্যে প্রথম আসে সেমেটিক ধর্ম, যে ধর্মে জুহুদিরা, মুসলমানরা এবং খ্রীশ্চানরা আছেন। সেমেটিক ধর্ম বলতে মূলতঃ এই তিনটি ধর্ম, এর মধ্যে পার্সিদেরও কিছুটা ধরা যেতে পারে। এনারা বলেন, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ আছে, এ্যটম দিয়ে মানুষ তৈরী কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ভিতরে যে স্পিরিট, যে চেতনা, সেটা ভগবান দিয়েছেন। ফুঁ মেরে দিয়ে থাকুন বা যে ভাবেই দিয়ে থাকুন, এটা তিনি দিয়েছেন। এই স্পিরিট শব্দ থেকে স্পিরিচুয়ালিটি শব্দ এসেছে। স্পিরিচুয়ালিটি মানে ভিতরে আত্মা আছেন। তাহলে মৃত্যুর পর কি হবে? মৃত্যুর পর স্পিরিট তার এই শরীরটাকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে।

এখানে এসে খ্রীশ্চান, জিউস ও ইসলামে একটু তফাৎ হয়। একটা সময় আসবে যখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শেষ হয়ে যাবে, তখন যিনি আমাদের স্রষ্টা, সেই স্রষ্টার সামনে আমাদের সবার বিচার হবে। বিচারের পর আমাদের কারু চিরদিনের জন্য স্বর্গ বা চিরদিনের জন্য নরকে চলে যেতে হবে। এই দুটোই জায়গা, তৃতীয় কোন জায়গা নেই, নূতন আর কোন কর্মও হবে না, এই দুটোর একটাতে চিরদিনের মত তুমি চলে যাবে। তোমার ভিতরে যে আমিত্ব রয়েছে, এ নূতন শরীর পাবে। এই নূতন শরীরে গিয়ে নরকের জ্বালা চিরদিনের জন্য ভোগ করতে থাকবে। যারা স্বর্গে যাবে, তারা এই নূতন শরীরে চিরদিনের জন্য স্বর্গসুখ ভোগ করতে থাকবে। এটা কতটা ঠিক, কতটা ভুল, সেটা কোন ব্যাপার না, এই হল এদের দর্শন।

হিন্দুদের ছয়টি মূল দর্শন। ছয়টির মধ্যে খুব নামকরা হল মীমাংসা। সব হিন্দুরাই মীমাংসা দর্শন না বুঝেই পালন করে। সেমেটিক ধর্মে যেভাবে বলছেন, মীমাংসাও সেভাবেই মানেন –এই শরীর আছে, শরীরের ভিতর আত্মা আছেন, মৃত্যুর পর এই আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যান। বেরিয়ে কোথায় যান? এই মতে আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে কোথাও প্রতিক্ষা করেন না, যেমন কর্ম করেছে, সেই কর্মানুসারে হয় স্বর্গে যাবেন, নয়তো নরকে যাবেন কিংবা অন্যান্য প্রাণীর শরীরে ঢুকবেন, নয়তো অনেক ধরণের স্বর্গ আছে, সেখানে ঘুর ঘুর করবেন, ঘুরে ঘুরে আবার সে মনুষ্যলোকে এসে একটা শরীরে ঢুকবেন, সেখান থেকে মৃত্যুর পর আবার স্বর্গে যাবেন। এভাবে কত দিন চলবে? এটাই চলতে থাকবে। মুসলমানরা যেমন চিরন্তন স্বর্গের কথা বলে, মীমাংসা তেমন এই চিরন্তন আসা যাওয়াকে নিয়ে বলে। পরে এটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কারণ সৃষ্টি অনন্ত, সৃষ্টির মধ্যে আসা যাওয়াটাও চলতে থাকবে।

সমস্যা হয়ে যাওয়ার জন্য পরে মীমাংসা তার নিজের দর্শনকে একটু সাজালেন। ওদের মতে ব্রহ্মলোক যদি কেউ চলে যায়, যেটা শ্রেষ্ঠ স্বর্গ, তাহলে সহজে খুব তাড়াতাড়ি নামতে হবে না, অনেক অনেক কাল পর্যন্ত সে ব্রহ্মলোকের বাসিন্দা হয়ে থাকবে।

কিন্তু ব্রহ্মলোকও সৃষ্টির মধ্যে পড়ে, কারণ মীমাংসা ঈশ্বর মানে না। হিন্দুদের যে মূল দর্শন, সেই মীমাংসা ঈশ্বর মানে না, ভগবান মানে না। তারা মানে আত্মাকে, তারা মানে বিভিন্ন লোক, তারা মানে শরীর। আমরা বিচার করে নিজেকে দেখি, আমি নিজেকে কিভাবে দেখি? একজন হিন্দু রূপে দেখছি। আমি কথায় কথায় কর্মফলের কথা বলি, কথা কথায় পরজন্মের কথা বলি। কিন্তু কখন কি আমি আপনি সচেতন ভাবে বলি মুক্তিই আমার উদ্দেশ্য, আর এই জন্মেই, এইখানেই যে করে হোক আমাকে মুক্তি লাভ করতে হবে? কখনই তা বলি না। মুখের কথা হিসাবে ভক্তরা বলতে পারেন, মৃত্যুর পর ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন। ঠাকুরের ভারি বয়ে গেছে কাউকে নিয়ে যেতে, কেন তিনি নিয়ে যাবেন। আমাদের মত দু-চারটে আহাম্মক নিয়ে তিনি কি করবেন। কিন্তু মনে মনে আমরা ধরে নিয়েছি, তিনি নিয়ে যাবেন। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবেন, কেন নিয়ে যাবেন, সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *পুনরপি জননং পুনরপি মরণং। পুনরপি জননি জঠরে শয়নম্। ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়াপারে পাহি মুরারে*। আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার মাতৃগর্ভে বাস, ভগবান যদি পার করেন, এ ছাড়া গতি নেই। আমরা বেদান্তের কথা বলি, অদ্বৈত বেদন্তের কথা বলি, বড় বড় কথা বলি, লম্বা লম্বা কথা বলি, কিন্তু ঘুরে ফিরে আমাদের সব কথা একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, আমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে ঘুরে চলেছি।

সেখান থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলে এসে যাবে সাংখ্য দর্শন ও যোগ দর্শন। সাংখ্য ও যোগের দর্শন কিছুটা মীমাংসার মত, আর বাকিটা সেমেটিক ধর্মের সাথে মিলে যায়, শুধু হেভেনের পরিভাষাটা পাল্টে যায়। সাংখ্য আর যোগ দর্শন বলে, আত্মার জন্ম হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে; যেমন তার কর্ম হবে সেই অনুসারে সে শরীর পাবে। জন্ম-মৃত্যুর এই চক্রের মধ্যে বিভিন্ন শরীরের মধ্যে আসা যাওয়া করতে করতে, যখন তার মন পুরোপুরি মুক্তির দিকে, ঈশ্বরের দিকে যাবে, তখন সব কিছু ছেড়ে মুক্তির পথে নেমে গিয়ে বলবে, আমি আর কিছু চাই না, আমি মুক্তি চাই। একবার মুক্তি হয়ে গেলে সে চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়ে গেল, তাকে আর জন্ম নিয়ে কোন লোকে গিয়ে কোন শরীর ধারণ করতে হবে না; ঠিক যেমন সেমেটিক ধর্মে বলা হয় তুমি যখন eternal heavenএ চলে যাবে, আর তোমাকে ফেরৎ আসতে হবে না, দুটো একই জিনিস।

বেদান্ত হল হিন্দুদের শেষ দৃষ্টিভঙ্গী, যেটা আমরা এগারো থেকে পঁচিশ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আলোচনা করলাম। বেদান্তের কথা হল, তোমার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পূণ্য এগুলো সব তোমার কল্পনা। কেন কল্পনা? কারণ তুমি শুদ্ধ আত্মা, তুমি সর্বব্যাপী,

সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। তুমি ভেবে নিয়েছ তুমি বন্ধনে আছ, তুমি নিজেকে শরীর রূপে কল্পনা করে ভাবছ আমি শরীর, তুমি নিজেকে মন ভাবছ। সেইজন্য তুমি কল্পনা করছ, তোমার জন্ম আছে, তোমার মৃত্যু আছে, তোমার দুর্বলতা আছে। যেদিন তুমি ঠিক করবে, আমার এসব কিছুই লাগবে না, তারপর তুমি চেষ্টা করতে থাক। যেদিন বেরিয়ে এলে, সেদিনই তুমি মুক্ত, চিরদিনের জন্য মুক্ত। চিরদিনের জন্য মুক্ত, এটাও তো যোগের সাথে, ইসলাম, খ্রীশ্চানের সাথে মিলে গেল। না, মিলবে না। কারণ তখন তুমি দেখবে, আদপে তোমার কখনই জন্মই হয়নি, জন্ম যদি না হয়, তাহলে মৃত্যুরও কোন প্রশ্ন ওঠে না, মুক্তিরও কোন প্রশ্ন নেই।

ঠাকুর এই জিনিসটাকে খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন, একজন জাদুকর রাজসভাতে খেলা দেখাতে গেছে, রাজাকে দেখিয়ে একটা আঙুল নাড়তে শুরু করেছে। আঙুল নাড়ছে নাড়ছে, দুম্ করে সবাই দেখছে, কোথা থেকে ঘোড় সওয়ার এলো, যুদ্ধ হচ্ছে, কাটাকাটি হচ্ছে। তারপর দেখছে কিছুই হচ্ছে না, শুধু আঙুলটা নেড়ে যাচ্ছে, তাতেই সবাই সম্মোহিত হয়ে কত কি দেখে যাচ্ছে। আগেকার দিনে সিনেমা হলে প্রোজেক্টরে রীল ঘুরত আর সাদা কাপড়ের পর্দার উপর ছবি প্রতিফলত হয়ে কত কিছু দেখাচ্ছে। রীল ঘুরতে ঘুরতে শেষ হয়ে গেল, তারপর সাদা পর্দাটা ছাড়া আর কিছুই নেই। আমরা হিরো, হিরোইনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রেখে কখন হাসছি, কখন কাঁদছি। রীল শেষ হয়ে গেল, দেখছি পর্দায় সাদা আলোটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। আগেও আলো ছিল, শেষেও আলো, মাঝখান থেকে কয়েকজন হেসে খেলে কেঁদে চলে গেল। আসল পরিবর্তন কোথাও হয়নি।

আমরা এই পাঁচখানা জীবনদর্শনের কথা বললাম, এই পাঁচটি ছাড়া ছ-নম্বর কোন জীবনদর্শন হতে পারে না। এই পাঁচটির মধ্যে মীমাংসা কিন্তু এখন আর নেই, যদিও আমাদের মাথায় মীমাংসার দর্শনটা এখনও বেশী জেঁকে বসে আছে। এই পাঁচটির মধ্যে, আপনি কোন জীবনদর্শনকে মানেন? যখন লম্বা লম্বা কথা বলে লেকচার দিতে হবে, তখন আমরা বেদান্তী হয়ে যাই। ভোগ করবার সময় আমরা চার্বাক হয়ে যাই, লুটেপুটে খাও, খিমচে খামচে যত পারো নিজের জন্য টেনে নাও। যখন যে রকম সুবিধা পাওয়া যাবে, সেই অনুসারে জীবনকে চালিত কর। বলা হয় দুই নৌকায় পা রাখতে নেই। আমাদের এখানে নৌকা দুটো না, অনেকগুলো নৌকা, একটাতে ডান হাত, আরেকটাতে বাঁ হাত, একটাতে বাঁ পা, আরেকটাতে ডান পা, আর মাথাটা আরেকটা নৌকায়। ফলে একটা নৌকা যদি কোন রকমে দোলা শুরু করে, তখন সব এক সঙ্গে কুমিরে ভরা নদীতে পড়ে শেষ।

আমরা যে পাঁচটা দর্শনের কথা বললাম, এই পাঁচটির কোন দর্শনই কিন্তু মৃত্যুকে কোন দাম দেয় না। অথচ সারা বিশ্বকে বাদ দিন, ভারতকে ছেড়ে দিন, কলকাতাও থাক, নিজের পাড়াতে গিয়ে দেখুন, সবাই মৃত্যুকে নিয়ে কাঁদছে। ঠাকুরের কাছে একজন বলছেন, আমি পুনর্জন্মকে ভয় পাই না। ঠাকুর বলছেন, তুমি বলো না, তোমার এখনও ভোগ করার ইচ্ছা আছে। ভোগ করার ইচ্ছা আছে, সেইজন্য বলছে, আমার আরেকটা জন্ম হোক। একটু বিচার করলে দেখা যাবে, কোন দর্শনে মৃত্যুর কোন স্থান নেই, অথচ আমরা সবাই সব থেকে বেশী ভয় পাই মৃত্যুকে। এখনও অনেক জায়গায় চার প্রজন্ম ধরে মানুষ বেঁচে আছে। ঠাকুরদার বাবা মারা গেছে, সেখানেও চোখের জল।

ভগবান গীতাতে তিনটে জীবনদর্শনে নিয়ে আসছেন। সেমেটিকদের যে দৃষ্টিভঙ্গী, এটা একটা বেমানান ধারণা। কারণ একটা জীবনে আমি ভাল মন্দ যাই করি না কেন, তার জন্য চিরদিনের জন্য স্বর্গ বা চিরদিনের জন্য নরক বাস হবে, এটা হিন্দুরা কখনই মানে না। আর যোগের যে ধারণা, এটা মীমাংসা ও বেদান্তের মাঝামাঝি পড়ে বলে সেটাকেও আর আলোচনা করা হয় না। সেইজন্য বেদান্ত, মীমাংসক আর চার্বাক এই তিনটে জীবনদর্শনকে নিয়ে গীতা আলোচনা করছেন। বেদান্ত আগেই বলে দিয়েছেন, তুমি আত্মা, তোমার জন্ম নেই, তোমার মৃত্যু নেই।

এবার ভগবান নিয়ে আসছেন, *অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্*, যদি তুমি মনে কর তোমার জন্ম হচ্ছে, তোমার মৃত্যু হচ্ছে, জন্ম-মৃত্যু তোমার লেগেই আছে, তাহলেও তো তোমার শোক করার কিছু নেই, *তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি*। এখানে আচার্য বলছেন, *লোকপ্রসিদ্ধয়া*, আচার্য শঙ্করের এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর জীবনকে এমন স্পষ্ট দেখছেন, অবাক হয়ে ভাবতে হয় মাত্র ষোল বছর বয়সে এই ভাষ্য রচনা করেছেন, এটা কি বিশ্বাস করা যায়। বলছেন, *লোকপ্রসিদ্ধয়া*, এই সংসারে লোকেরা এভাবেই মনে করে, আমার জন্ম হয়েছে, আমার মৃত্যু হবে, আবার আমার জন্ম হবে, আবার আমি মারা যাব, যদি তুমি এটাই মনে কর তাহলে –

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।২৭।।

(যেহেতু জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং স্বীয় কর্মানুসারে মৃত ব্যক্তির পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী, সেইহেতু এই অপরিহার্য বিষয়ে শোক করা তোমার উচিত নয়।)

যার জন্ম হয়েছে সে মরবে, যে মরেছে সে আবার জন্মাবে, এটা অপরিহার্য, তাই এটাকে নিয়ে এতো ভাবার কি আছে। নাগরদোলায় চেপে ঘুরছে, যেটা নীচে আছে সেটা উপরে যাবে, যেটা উপরে আছে সেটা নীচে যাবে, এই নিয়ে তোমার মাথা ব্যাথা করার কি আছে! সাতাশ নম্বর শ্লোককে অনেকে ভুল করে মনে করে এটা গীতার মত, কিন্তু এটা গীতার মত নয়। এখানে বলছেন, যদি তুমি এই রকম মনে করো। গীতার মত পঁচিশ নম্বর শ্লোক পর্যন্ত ছিল। ছাব্বিশ, সাতাশ আর আটাশ এই তিনটে শ্লোক গীতার মত না, সাধারণ ভাবে লোকেদের মনের যে ভাব, সেটাকে কেন্দ্র করে বলছেন, যদি তুমি এই রকম মনে কর। তার মানে তুমি যদি মীমাংসা দর্শনের মতাবলম্বী হও, তোমার জন্ম হয়েছে তুমি মরবে, মরে আবার জন্ম নেবে। জন্ম-মৃত্যু মানে এই ঘর আর ওই ঘর, এই ঘর থেকে ওই ঘরে গেলে, আবার ওই ঘর থেকে এই ঘরে এলে। মৃত্যুর জন্য এত কান্নাকাটি করার কি আছে! গীতায় আমরা প্রথম দিকে আলোচনা করেছিলাম, গীতার একটাই উপদেশ, শোক আর মোহ এই দুটো থেকে বেরিয়ে আসা। তোমার মৃত্যুর জন্য এত শোক কেন, আর জন্মকে নিয়ে এত মোহ কিসের? যেমন গতকাল, তেমন আজকে, তেমনই আগামীকাল থাকবে, যেমন গত জন্ম, তেমন এই জন্ম, তেমন পরে জন্ম হবে। এত কান্না কিসের?

এখানে একটা শব্দ আছে অপরিহার্য, কোনটা পরিহার্য আর কোনটা অপরিহার্য, এই দুটোকে নিয়ে মাঝে মাঝে খুব ভাল করে বিচার করতে হয়। জীবনে যেটা আমার অপরিহার্য, সেটাকে নিয়ে এত কান্নাকাটি করতে নেই, বিচার করতে হয় যে এটা আমার জীবনে অপরিহার্য, মানে এটাকে কোন ভাবেই কাটানো যাবে না। যদি একবার ভাল করে বুঝে নেওয়া যায়, যেটাকে কখন কাটানো যাবে না, সেটাকে নিয়ে বেশী অস্থির হতে নেই। বাচ্চারা বোঝে না বলে চেঁচামেচি, কান্নাকাটি করে। এক আশ্রমে সাত-আট বছরের বাচ্চাদের নিয়ে একটা কম্পিটিশান হয়েছিল। তার মধ্যে ছবি আঁকা, কবিতা পাঠ, আরও কিছু আইটেম ছিল। যা হয়, একটা বাচ্চা ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে, আর-একটি বাচ্চা কোন প্রাইজ পায়নি। তারপর বাচ্চাটির সেকি কান্না, ও কেন প্রাইজ পেল, আমি কেন পেলাম না। কেউ ওকে বোঝাতে পারছে না। বড় হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের এই স্বভাবটা থেকে যায়।

যে কোন একটা সমস্যা, দেখতে হবে এই সমস্যার কোন সমাধান আছে কিনা। এখন যেমন করোনা ভাইরাস এসেছে, এটা একটা সমস্যা। আলবার্ট কামু, একজন খুব নামকরা লেখক, সাহিত্যে নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন। তার বিখ্যাত একটা বইয়ের নাম 'দা প্লেগ'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাকে আধার করে এই কাহিনীটা লিখেছিলেন। কাহিনীতে দেখাচ্ছেন, প্লেগের মহামারী ঠেকাতে কিছুই করা যাচ্ছে না, পুরো শহরকে কোয়ারেন্টাইন করে দিয়েছে। ওর মধ্যেই লোক মরছে, ওই মৃত্যুর মধ্যেও সব কাজকর্ম চলছে। তার মধ্যে অন্য শহরের একজন লোক

সেই শহরে এসেছে, এসে সেও ফেঁসে গেছে। দিনের পর দিন শহরের সব কিছু বন্ধ। আলবার্ট কামু একজন কত উচ্চমানের লেখক এখানেই বোঝা যায়, বর্ণনা হচ্ছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের, নিয়ে এলেন প্লেগ। একটা সময় ফ্লু ইংল্যাণ্ডে হাজারে হাজারে লোক মেরেছে। ওখানে একটা হলে নাটক হচ্ছে, সেখানে একজন হাঁচি দিয়েছে, হাঁচি দেওয়ার জন্য নিমেষে পুরো হল ফাঁকা হয়ে গেল।

আজকে করোন ভাইরাস এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ উপায় বার করে নিয়েছে কিভাবে মানুষকে বাঁচাতে হয়। চীনে করোনা ধরা পড়তেই দশ দিনের মধ্যে একটা সুপার স্পেশালিটির আইসোলেশান হসপিটাল বানিয়ে দিয়েছে। যদি পরিহার্য হয়, তাহলে পরিহার কর, আর এটা যদি সমস্যা, তাহলে এর সমাধান বার কর। সমস্যার যদি কোন সমাধান না থাকে, তাহলে এটা সমস্যা নয়, এটা একটা পরিস্থিতি। পরিস্থিতির সমাধান হয় না, ওটাকে মোকাবিলা করতে হয়। সমস্যা আর পরিস্থিতিকে আমরা প্রায়ই গুলিয়ে ফেলি।

একজনের চোখে চশমা আছে, শুধু চশমা না, তার সাথে আবার চোখে ছানি পড়তে শুরু হয়েছে। চোখে ভাল দেখতে পারছে না। ডাক্তার দেখে বলল, ছানি এখনও ম্যাচিওর করেনি, আরও কিছু দিন যাক। এখন সে কি করবে? চোখে ঝাপসা দেখছে, তাই বলে সেকি লেখাপড়া বন্ধ করে, কাজকর্ম শিকেয় তুলে দিয়ে কাঁদতে শুরু করবে। ধৈর্য ধরে বসে থাক, সময় হলে হবে। কারণ এটা সমস্যা না, এটা পরিস্থিতি। একটা সময় আসবে, পরিস্থিতিটা পাল্টে সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, তখন ভাবতে হবে এর সমাধান কি। একজন কোন কারণে অন্ধ হয়ে গেল। এখন সে কি করবে। সারা জীবন যদি কাঁদতে থাকে, অন্ধ চোখটা তো আর ভাল হয়ে যাবে না।

মানুষ সব সময় নূতনকে পছন্দ করে, পুরনোকে যত তাড়াতাড়ি ছেড়ে নূতনকে আয়ত্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুখের ক্ষেত্রেও তাই, একই রকমের সুখ যদি হয়, বিরিয়ানি খেতে খুব ভাল লাগে, রোজ যদি বিরিয়ানি খেতে দেওয়া হয়, কদিন পরে বিরিয়ানিতে বিরক্ত ধরে যাবে।

একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। বড়লোক বাড়ির একটি যুবক কোরান পড়ে তার মাথায় ঢুকে গেছে, এই জীবনে কিছু নেই, আমাকে স্বর্গে যেতে হবে। আসলে ছেলেটির মানসিক ভারসাম্য ছিল না। অনেক চিকিৎসা করেও ঠিক করা যাচ্ছিল না। শেষে একজন হাকিমের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। হাকিম সব দেখে বললেন, 'আমি ঠিক করে দেব'। তারপর তিনি একটা নাটক করলেন। হাকিম চ্যাম্বারে ঢুকে ছেলেটির বাবাকে বলছে, 'আপনি কার চিকিৎসা করাতে এসেছেন, এতো মরে গেছে'।

ছেলেটি এতদিন চাইছিল আমি মরে যাব, মরে গিয়ে স্বর্গে যাব। হাকিম বলছে 'ওতো মরে গেছে, খেলা শেষ, আমার কিছু করার নেই'। এবার আল্লার দূতরা এসে একে স্বর্গে নিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে চারজন লোক সাদা কাপড় পড়ে চ্যাম্বারে ঢুকে বলছে, 'এই সেই ব্যক্তি, যাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে হবে'।

চোখ বেঁধে ছেলেটিকে নিয়ে ওই বাড়িতেই অনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন ওকে স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক ঘুরিয়ে একটা ঘরে এনে ঢুকিয়েছে। খুব সুন্দর ঘর বানিয়েছে। ছেলেটি এবার পুরোদমে জেগে উঠেছে, ভিতরে শক্তি এসেছে কিনা, আমি স্বর্গে এসে গেছি। খাওয়ার জন্য ওকে ভাত আর পেপে সেদ্ধ দিয়েছে।

'এটা আবার কি খাবার? আমি বাড়িতেও এই খাবার কোন দিন খাই না'। ওকে বলা হল, 'আসল স্বর্গে যখন যাবেন, তখন হয়ত ভাল খাবার পাবেন। এখন আপনাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে'। 'কত দিন অপেক্ষা করতে হবে'? 'যতদিন আপনি যাদের সাথে ছিলেন, বাবা, মা, ঠাকুরদা এরা সবাই না আসছেন'। ছেলেটির মাথা ঘুরে গেছে। রাত্রিবেলা আবার সেই ভাত আর পেপে সেদ্ধ।

দ্বিতীয় দিন দুবেলা সেই ভাত আর পেপে সেদ্ধ, তৃতীয় দিনও সেই ভাত আর পেপে সেদ্ধ। এইভাবে সাত দিন কেটে গেল।

ছেলেটির এবার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বলছে, 'আর কত দিন এই খাবার খেতে হবে'? 'আপনি কি চান, আপনার বাবা মা সবাই ওখানে মরে যাক'? 'না হয় মরেই যাক। কিন্তু মরছে না তো'। শেষে বলছে, 'তবে একটা উপায় আছে, আপনি যদি প্রার্থনা করেন আপনি আবার ফেরত যেতে চান, তাহলে আপনি আরেকটা সুযোগ পেতে পারেন'। 'এক্ষুণি আমাকে ফেরত নিয়ে চলে যাওয়া হবে? তাহলে ঠিক আছে'।

আবার ওর চোখ বেঁধে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওখানে নিয়ে এসেছে। আগে থেকেই পুরোটা সাজানো আছে। হাকিম দেখেই বলছে, আরে এর প্রাণ কি করে ফিরে এলো। সেই দিন থেকে আর কোন দিন ছেলেটি মৃত্যুর কথা বলল না। এখানে অর্থটা হল, একই খাবার যদি আমাকে দিনের পর দিনে খেতে হয়, তাহলে কি হতে পারে।

কিছু দিন আগে একটা কার্টুন বেরিয়েছিল, প্লেনে একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছে। ব্রেকফাস্ট দেখে এয়ারহোস্টেসের উপর চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছে, 'সরিয়ে নিয়ে যাও, সরিয়ে নিয়ে যাও, রোজ রোজ আমি একই ব্রেকফাস্ট করতে পারব না'। বেচারি রোজ ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালোর থেকে বম্বে, বম্বে থেকে ব্যাঙ্গালোর করে। এয়ারলাইনসে সব ফিক্সড, একই জিনিস রোজ খেতে হচ্ছে।

কোথাও গিয়ে মানুষ এক সময় বিরক্ত হয়ে যায়। সুখ হোক আর দুঃখ হোক, মানুষের জন্য চাই সব সময় নূতন কিছু। আমার দুঃখের কাহিনী, আমার কান্না লোকে শুনবে, একদিন শুনবে, দুদিন শুনবে। আস্তে আস্তে যারা আমার কান্না শুনতে আসছে তাদের সংখ্যা কমে যাবে। কারণ ততদিনে তারা বুঝে গেছে, এটা আমার কোন সমস্যা না, এটা একটা পরিস্থিতি। পরিস্থিতির কোন সমাধান হয় না, পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এটাই বলছেন, যে কোন অপরিহার্য জিনিসের মুখোমুখি হও। পরের শ্লোকে এর থেকে আরও নীচে নামিয়ে জড়বাদীদের মতে নিয়ে আসছেন; যদি তুমি মনে কর পদার্থ থেকে আমি এসেছি, বিজ্ঞানীরা যেমন বলেন।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধানান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।২৮।।

(হে ভারত, শরীর উৎপত্তির আগে জীব সমুদয় অপ্রকাশিত থাকে, স্থিতিকালে মাত্র প্রকাশিত এবং বিনাশের পরেও অপ্রকাশিত থাকে। এতে শোকের কি আছে?)

খুব সহজ অর্থ। জন্মের আগে তুমি ছিলে না, অব্যক্ত ছিলে। মৃত্যুর পরেও থাকবে না, আবার অব্যক্তে চলে যাবে। মাঝখানে এই কটা দিনের জন্য এত কান্নাকাটি কেন? আমরা যদি বর্তমান ফিজিক্সকে মানি, তবে ফিজিক্স প্রত্যেক দিনই গতকালের থিয়োরি পাল্টে নূতন অন্য একটা থিয়োরি নিয়ে আসছে। যত দিনে ভাবছি এই ফিজিক্স বইটা পড়ে নেব, তত দিনে দেখছি বইটা শেষ করতে না করতে আর-একটা নূতন থিয়োরি এসে গেছে। আমরা জানি ভদ্রলোকের এক কথা, সেই হিসাবে আর যাই হোক বৈজ্ঞানিকরা ভদ্রলোক না। তাও যদি এদের কথা মানি, তাহলে সৃষ্টি হয়েছে পনের'শ কোটি বছর আগে। আর আমরা নাকি এখন সৃষ্টির মাঝখানটায় আছি। মানুষের এটা পুরনো স্বভাব, সব সময় নিজেকে মাঝখানে রাখে। গ্রীক গণিতজ্ঞরা বলতেন, পৃথিবীটা ব্রহ্মাণ্ডের ঠিক মাঝখানে। এখন পদার্থ বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমরা হলাম সময়ের মাঝামাঝি।

নিজেকে কেন্দ্রে না রাখতে পারলে মানুষ থাকতেই পারবে না। সমস্ত বিশ্বের আমি কেন্দ্র। বাইরে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিক তাকালে দেখা যাবে, আকাশ আমাকে কেন্দ্র করে বেঁকে রয়েছে। আমাদের এটা জানা নেই যে, সামনে যে লোকটা আমার মত দাঁড়িয়ে আছে, তারও মাথার উপর কেন্দ্র করে আকাশ বেঁকে রয়েছে কিনা। এ্যস্ট্রোফিজিক্সে বলা হয়, যত গ্যালাক্সি আছে, এর কোন পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ নেই, তার যে কোন পয়েন্টটাই সেন্টার। আমরাও বাস্তবে সেন্টারে আছি, কারণ সবটাই সেন্টার। আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, সব সময় আমি টপে আছি, কারণ পৃথিবী আমাকে কেন্দ্র করে ঝুঁকছে, কারণ পৃথিবীটা গোল।

কিন্তু টাইমের ব্যাপারে এভাবে বলা যাবে না, যেহেতু বিজ্ঞানীরা বলছেন, তাই আমরা মেনে নিচ্ছি আমরা সময়ের মাঝখানে আছি। তার মানে পনেরশ কোটি বছর পেরিয়ে এসেছি আর ওদিকে আরও পনেরশ কোটি বছর পড়ে রয়েছে, তার মানে মোট তিন হাজার কোটি বছর দাঁড়ায়। আপনার একটা জীবনের আয়ু ধরলাম একশ বছর। এবার ওদিকে পনেরশ কোটি আর এদিকে পনেরশ কোটি, মাঝখানে আপনার একশ বছর। এবার মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ বা পেরিস্কোপ, সব স্কোপ লাগিয়ে যদি দেখা হয়, তাহলেও কি আপনার অস্তিত্ব ওর মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে? কোটিতে সাত খানা শূন্য হয় আর তার সাথে এক হাজারকে ধরলে আরও তিন খানা শূন্য। একের উপর দশ খানা শূন্য আর ওদিকেও একের উপর দশ খানা শূন্য, মাঝখানে একশ বছর। কোথায় আর কি করে ওই একশ বছরকে আপনি খুঁজে বার করবেন। গীতার কি simple logic। তুমি যদি মনে কর, জন্মের আগে তুমি ছিলে না, মৃত্যুর পরেও তুমি থাকবে না। বর্তমান কালের ইয়ং ছেলেমেয়েরা বলে YOLO, you only live ones। তাহলে এত বেঁচে থাকার কি দরকার। এক হাজার কোটি বছরে একশ বছরও যা, পঞ্চাশ বছরও তাই। তুমি যদি সুইসাইড করে নাও, সবারই শান্তি হবে। তোমার জন্য কোন ব্যাপার না, তুমি মরে গেলে তো তুমি শেষ, তোমারও শান্তি বাকিদেরও শান্তি। চারিদিকে যে পাগলামোগুলি করে বেড়াচ্ছ, তাতে তুমিও মরবে, সবারই শান্তি। কিন্তু আমরা তা মনে করি না, আমাদের সমস্যা আছে। কারণ আমি জানি আমাকে আবার ঘুরে আসতে হবে। আর মুক্তি যতদিন না হয়, আমাকে এই এক হাজার কোটি বছর পর্যন্ত চলতে হবে।

আবাসিক স্কুলে হস্টেল গুলিতে ছেলেরা সব সময় খাবার নিয়ে অভিযোগ করে। দেওঘর আশ্রমে মহারাজরা ছাত্রদের সাথে একসাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করেন। একদিন ক্লাশ টেনের একটি ছেলে দুঃখ করে বলছে, 'মহারাজ, এই খাবার খাওয়া যায় বলুন'! যে মহারাজকে বলছে, সেই মহারাজ তাকে আরও দুঃখ করে বলছেন, 'তুমি তো আর তিন কি চার মাস পর ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেলে এই হস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে চলে যাবে, কিন্তু আমাকে সারা জীবন এই খাবার খেয়ে থাকতে হবে, এটা একবার ভেবে দেখ'। ছেলেটি খুব করুণার দৃষ্টি নিয়ে মহারাজের দিকে তাকালো, সত্যিই তো এই লোকটার খুবই দুরবস্থা। যে মনে করছে, মরে গেলে সব শেষ, তার তো শান্তি। কিন্তু আমরা তো জানি এক হাজার কোটি বছর ধরে আমাকে জন্ম নিতে হবে, মরতে হবে, আবার জন্ম নিতে হবে, আবার মরতে হবে, জন্ম মৃত্যু চলতেই থাকবে।

সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি আগে ঠিক কর তুমি কোন থিয়োরিটা মান। যদি তুমি মনে কর আত্মা অবিনাশী, আত্মা অমর, আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; আর যদি মনে কর তুমি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আছ, জন্মেছ, মরবে, মরার পর আবার জন্ম নেবে, তাই এত ভাবার কি আছে। আর যদি মনে কর বাইচান্স জন্ম হয়েছে, মরে গেলে সব শেষ, তাহলে কয়েক বছর আগে আর পিছনে, *তত্র কা পরিদেবনা*, এটাকে নিয়ে এত ভাবার কি আছে। সেইজন্য অর্জুন তোমাকে বলছি, তুমি ভাবাভাবি করো না, তুমি স্বধর্ম পালন কর। স্বধর্ম নিয়ে ভগবান পরে বলবেন, তার আগে পুরো টপিকটা আরও একবার গুছিয়ে আনছেন। কারণ গীতা মূলতঃ বেদান্ত দর্শন, কিন্তু মাঝ মধ্যে অন্যান্য দর্শনকেও নিয়ে আসছেন জিনিসটাকে স্পষ্ট করার জন্য। এবার ঊনত্রিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান

বেদান্তের একটা খুব দারুণ সত্যকে নিয়ে আসছেন। তার আগে একটা খুব মর্মস্পর্শী ঘটনার কথা বলা দরকার।

অনেক আগেকার ঘটনা, সেই সময় বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ। তখনকার দিনে বিদ্যামন্দিরে ফুলটাইম প্রফেসার বেশী ছিলেন না। কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে একজন ফিজিক্সের প্রফেসর সপ্তাহে একদিন বিদ্যামন্দিরে ছেলেদের বিশেষ করে ফিজিক্স পড়াতে আসতেন। উনি সব সময় শেষ পিরিয়ডে ক্লাশ নিতেন। ক্লাশের পর উনি স্বামী তেজেসানন্দ মহারাজের অফিসে এক সঙ্গে বসে এক কাপ চা খেতেন। চা খাওয়ার পর উনি বাসে করে বাড়ি চলে যেতেন। পড়ানোর জন্য তিনি কোন অর্থ নিতেন না, সমাজসেবা হিসাবে পড়াতেন।

একদিন ক্লাশ নিয়েছেন, নেওয়ার পর মহারাজের চ্যাম্বারে গিয়ে চায়ের জন্য বসেছেন। মহারাজ প্রফেসারের দিকে এক নজর তাকিয়ে বলছেন,

'আপনার মুখটা আজ খুব শুকনো লাগছে। এখান থেকে বাড়ি যাবেন তো'?

'না, এখান থেকে আমাকে শ্মশানে যেতে হবে'।

'শ্মশানে কেন যেতে হবে'? অধ্যাপকের একটাই ছেলে, সেদিনই ছেলেটি মারা গেছে। সেই খবর দিয়ে বলছেন, 'শ্মশানে গিয়ে ছেলেকে এখন দাহ করাতে হবে'।

স্বামী তেজেসানন্দজী একজন সন্ন্যাসী, কিন্তু তিনিও কেঁপে উঠলেন। 'ছেলে মারা গেছে! কখন'?

'আজ সকালে'।

'এই অবস্থায় আপনি আজ এখানে পড়াতে এলেন'?

'না, আমি ভাবলাম, এই ছেলেগুলো আমার অপেক্ষায় থাকবে, ছেলে তো চলে গেছে, ওখানে আমার তো এখন কিছু করার নেই, তাই ভাবলাম ছেলেগুলিকে পড়িয়ে দাহ করতে যাব'।

তারপর তিনি ওখান থেকে উঠে চলে গেলেন, ছেলেকে দাহ করতে।

এটাই ঠিক ঠিক Indian outlook, এটা ঠিক ইণ্ডিয়ানও নয়, ইণ্ডিয়ান বলাটা একেবারেই ভুল। পার্ক সার্কাসে প্রচুর মুসলমানরা থাকে, অনেক বছর আগেকার কথা। একটা কি অঘটন ঘটে একটা মুসলিম বাচ্চা মারা যায়। কাগজেও এই খবরটা বেরিয়েছিল। বাচ্চাটির বাবার চোখ ছলছল করছে। তার মধ্যে রিপোর্টাররা জিজ্ঞেস করছে, ভদ্রলোক বলছেন, 'আল্লা দিয়েছেন, আল্লাই নিয়ে নিলেন, কোন ব্যাপার না'। একবার ভাবুন, সন্তান শোক সামলাবার জন্য কতটা শক্তি লাগে। শ্রীকৃষ্ণের সব সময় হাসিমুখ। এই যে তিনটে দর্শনের কথা বলা হল, এর যে কোন একটিকে যদি ধরে থাকে, তাহলে তার দুঃখ কেটে যাবে। কিন্তু ধরা সম্ভব না। আদৌ কি সম্ভব? তিনটে দর্শনের এই টপিকটা এখানে শেষ। ভগবান আবার আত্মার টপিকে ফেরত চলে গেছেন। ঊনত্রিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছে –

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চার্যবচ্চৈনমন্যাঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।২৯।।

(কেউ কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যতুল্য দেখেন। অন্য কেউ আত্মাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন। অপর কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন এবং কেউ কেউ এনাকে শুনে, বলে বা দেখেও জানতে পারেন না। কারণ আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়।)

(দ্বিতীয় ব্যাখ্যা –যিনি আত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই আশ্চর্য (দুর্লভ)। যিনি আত্মতত্ত্ব উপদেশ দেন বা শ্রবণ করেন, তিনিও আশ্চর্য। এরূপ আত্মদর্শী, আত্মোপদেষ্টা বা আত্মতত্ত্ব-শ্রোতা অনেক সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ দুই-একজনই হয়। কারণ, আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বোধ্য। –শঙ্করভাষ্য।)

এর সহজ অর্থ, আত্মাকে কেউ আশ্চর্যের মত দেখে, কেউ আশ্চর্যের মত শ্রবণ করে, কেউ আশ্চর্যের মত বলে, আবার কেউ আছে এর ব্যাপারে কিছু শুনে বুঝতে পারে না। এই যে আত্মতত্ত্ব, আত্মা অনন্ত, আত্মা সর্বজ্ঞ, আর তুমিই সেই। আমরা বুঝতে পারছি না যে, এর কি সাংঘাতিক দাম। আমরা এভাবে কল্পনা করতে পারি; স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় লেকচার দিয়ে বলতে শুরু করলেন, ওঠো ভারত ওঠো, তোমার শক্তিকে প্রকাশ করো। স্বামীজীর এই আহ্বাণে সারা দেশটা কেমন চার্জড্ হয়ে গেল। অবাক হয়ে সারা দেশ স্বামীজীর কথা শুনছে। কিন্তু দেশ বুঝতে পারছে না যে, স্বামীজী কোন নূতন কথা কিছু বলছেন না। কারণ এটাই ভারতের জীবনদর্শন।

গীতা বলছেন, *আশ্চর্যবৎ*, আশ্চর্য কোন জিনিসটা লাগে? যেটা অদ্ভূৎ জিনিস, আগে কখন দেখা যায়নি। আমরা অনেক সময় বলি, তোমার ব্যবহার দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আবার কখন বলি, কি আশ্চর্য! কেন আশ্চর্য? এ-রকম কখন আগে দেখিনি। অদ্ভুৎ কিছু হতে হবে, আর তার মত, মানে *আশ্চর্যবৎ*। যেটা আগে দেখা হয়নি, শোনা হয়নি, বলা হয়নি, সেটাই *আশ্চর্যবৎ*, *আশ্চর্যবৎ*, *আশ্চর্যবৎ*।

আত্মতত্ত্ব ছেড়ে দিন, ঠাকুর কথামৃতে বর্ণনা করছেন, যাঁরা জপধ্যান করে, সাধনা করে, তপস্যা করে, তাদের ভিতরে একটা শক্তি জেগে ওঠে। ভিতরের সেই শক্তিকে বলা হয় কুণ্ডলীনি। কুণ্ডলীনি নীচের দিকে থাকে, তার প্রথম তিনটি নীচে, তার চতুর্থ স্থান হৃদয়। কুণ্ডলীনি হৃদয়ে যখন ওঠে, তখন তাঁর জ্যোতি দর্শন হতে থাকে। তখন অবাক হয়ে বলে 'একি! একি'! ঠাকুর বলছেন, জ্যোতি দর্শনেই বলে 'একি একি'। তাহলে আত্মাকে যদি দর্শন করে, তখন কি হবে?

তুলসীদাস খুব উচ্চমানের কবি, আবার তিনি একজন সন্ত। রামচরিতমানসে অনেক কাহিনী তাঁর নিজের সৃষ্টি। একটা দ্বীপে এক রানী আছে হনুমানকে সেখানে যেতে হবে। মহাবীর হনুমান সেখানে গিয়ে দেখছেন একজন মহিলা প্রচণ্ড ঐশ্বর্যময়ী, দেখতে খুব রূপসী, জাম কাপড়, সোনা, গয়নাতে ভরপুর। হনুমান হাতজোড় করে বলছেন, আপনিই কি এখানকার রানী? মহিলা খুব বিরক্ত হয়ে বলছে, রানী কি দাসী কি দাসী উসকি ম্যায় দাসী বিশ্বাসী। রানীর যে দাসী, সেই দাসীর যে দাসী, সেই দাসীর হলাম আমি বিশ্বস্ত দাসী। কতগুলি ধাপে নামছে, রানী, রানীর দাসী, তার দাসী, সেই দাসীর আমি হলাম বিশ্বাসী দাসী। তার মানে, তুলসীদাসও বর্ণনা করতে পারছেন না, সেই রানীর ঐশ্বর্য কেমন। বর্ণনা কিভাবে করছেন? রানীর দাসীর দাসীর দাসী, রানীর ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিয়ে বলবেন, এবার বাকিটা আপনি বুঝে নিন। রাম আর সীতার বিয়ের যে জাঁকজমক, সেটা বর্ণনা দিয়ে বোঝান যাবে না। বোঝানর জন্য তুলসীদাস শিব আর পার্বতীর বিয়ের বর্ণনা করার পর বলছেন, এর থেকে হাজার গুণ জাঁকজমক রাম আর সীতার বিয়েতে হয়েছিল।

একটা বিরাট শক্তিকে বোঝাতে হলে, যেমন শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, তাঁর শক্তিকে বোঝাতে হলে কি করে বোঝাবেন? বোঝান যাবে না। সুগ্রীব বলছেন, আমার দাদা বালির এত শক্তি ছিল যে, বিশাল শাল গাছকে এমন নাড়িয়ে দিতেন যে গাছের সব পাতা ঝরে যেত। গাছের সবুজ পাতা কখন

কি ঝরে পড়তে পারে, কিন্তু বালির এত শক্তি ছিল যে তিনি বিশাল গাছকে ঝাঁকিয়ে দিলেই সব সবুজ পাতা ঝরে পড়ত। এবার বলছেন, ওখানে পর পর সাত খানা বিশাল শাল গাছ ছিল। বালি একটা বাণেই সাতখানা বিশাল শালগাছকে বিদ্ধ করে দিতেন। সুগ্রীবের কথা শেষ হওয়ার পরেই রাম তূণীর থেকে একটা বাণ নিলেন, ধনুতে সংযোজন করে তীর চালালেন, তীর সাতটা গাছকে ভেদ করে সমস্ত পৃথিবী পরিক্রমা করে আবার তূণীরের মধ্যে ঢুকে গেল। মাঝখান থেকে সাতটা গাছের সমস্ত পাতা ঝরে পড়ে গেল। রামের কত শক্তি বোঝানর জন্য বলা হল।

রামের শক্তি বোঝান হচ্ছে না, ঈশ্বরের শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি এই রকম। যে কোন ধর্মে, তা ইসলাম হোক, খ্রীশ্চান হোক, যখন ঈশ্বরকে নিয়ে বর্ণনা করে, তখন এই রকম একটা উপমা দিয়ে বোঝানর চেষ্টা করানো হয় ঈশ্বরের শক্তি কেমন। হৃদয়ে যদি কুলকুণ্ডলীনি জেগে যায়, তখন জ্যোতি দর্শন হয় তাতেই বলছে, 'একি একি'।

ঠাকুর আবার বলছেন, সাত দেউড়ির পারে রাজা। প্রথম দেউড়িতে যে বসে আছে, তাকে দেখেই বলছে, 'এই কি রাজা'? 'ধুস্, এটা তো প্রথম দেউড়ি; রাজাকে যখন দেখবে তখন নিজেই বুঝতে পারবে, তোমাকে আর জিজ্ঞেস করতে হবে না। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করতে হয়, তার মানে ও রাজা না'। একটার পর একটা দেউড়ি অতিক্রম করে যখন রাজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন সে আর বর্ণনা করতে পারছে না, হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কেনোপনিষদেও খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, সেই ব্রহ্ম, সেই আত্মতত্ত্ব একটা যক্ষ রূপে দেবতাদের দেখা দিলেন। যক্ষ রূপে মানে, আসলে বর্ণনা করা যাবে না যে জিনিসটা কি। দেবতারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, এ কে?

এটাই শ্লোকে বলছেন, *আশ্চর্যবৎ পশ্যতি*, আত্মার যখন দর্শন হয়, শুদ্ধ চৈতন্যের যখন সরাসরি অনুভূতি হয় তখন অবাক হয়ে যায়। *আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ*, যাঁরা আত্মার কথা বলেন, তাঁদেরও চোখে বিস্ময়ের ছটা লেগে থাকে, চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। বাচ্চারাও যখন কোন আশ্চর্যের কিছু দেখে, স্কুলে যাওয়ার পথে হয়ত দেখেছে, বাড়িতে এসে বড়দের যখন বলে তখন তার চোখগুলো বড় বড় করে বলবে। বাচ্চাদের জগৎটা ছোট্ট কিনা।

আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, আর যিনি আত্মার কথা শ্রবণ করেন, তিনিও অবাক হয়ে শুনতে থাকেন। সামান্যতম চেতনা যদি আমাদের থাকে, গীতার এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা যখন শুনবেন তখন অবাক হয়ে বলবেন, গীতায় এই জিনিসগুলো বলা হয়েছে! বাকিরা শুনে বলবে, যত রাজ্যের গাঁজাখুরি গল্প বলছে। আগেকার দিনের সাধুরা গাঁজা ভাং খেয়ে বুঁদ হয়ে আবোলতাবোল ভাবত, সেগুলোই এখানে বলছে।

কঠোপনিষদে এটাই একটু অন্য ভাবে বলছেন, *আশ্চর্যো বক্তা কুশলোহস্য লব্ধা*, আত্মতত্ত্বের কথা সবাই বলতে পারে না, যিনি আত্মতত্ত্বের বক্তা, তিনি এক আশ্চর্য পুরুষ। গীতাও সবাই বলতে পারবে না, একটু যদি না বুঝে থাকে বলতে পারবে না। আর আত্মতত্ত্বের কথা শুনে সবাই ধারণা করতে পারবে না। তাঁরাই ধারণা করত পারবেন, যাঁদের কিছু প্রস্তুতি আছে। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন, উঁচু জায়গায় জল জমে না। একটা বাচ্চাকে বলা হল, এই পাত্রটা করে কল থেকে জল নিয়ে এসো। বাচ্চাটা ট্যাপের তলায় পাত্রটা উল্টো করে রেখেছে, জল আর পাত্রে জমছে না। পাত্রটা সোজা করে রাখলে তবেই না জল জমবে। আমরাও যখন শাস্ত্রের কথা শুনি, পাত্রটা আমরা আস্তে করে উল্টে রেখে দিই। বিষয় ভোগের ব্যাপার যখন আসে তখন পাত্রটা আবার সোজা করে রাখি। ফলে ভোগের সব উপকরণ দিয়ে আমাদের মাথাটা বোঝাই হয়ে আছে। আর যোগের সমস্ত জিনিস পড়ছে ঠিকই, কিন্তু সব বাইরে বেরিয়ে যায়।

এই শ্লোককে এভাবেও বলা যেতে পারে –যিনি আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি একজন আশ্চর্য পুরুষ, (দুর্লভ ব্যক্তি)। যিনি আত্মার কথা শুনেছেন বা উপদেশ দেন তিনিও একজন আশ্চর্য পুরুষ। তার মানে যিনি আত্মতত্ত্ব বোঝাতে পারদর্শি, তিনি কোন সাধারণ জন নন। যিনি শুনে বুঝতে পারছেন তিনিও কোন সাধারণ ব্যক্তি নন। একজন মহারাজের সাথে কথা হচ্ছিল, বেদ অপৌরুষেয় কেন। অন্যান্য ধর্মে অপৌরুষেয় বলা হয় না ঠিকই, কিন্তু ঘুরিয়ে বলেন। যেমন প্রফেট মহম্মদ বলছেন আল্লা এই কথাগুলো বলেছেন, বক্তব্য হল এই কথাগুলো আমার কথা না, ঈশ্বরীয় কথা। বাইবেলে যীশুকে মনে করা হয় তিনি ঈশ্বরের সন্তান। যীশু যা কিছু বলেছেন, সেটাও ঈশ্বরীয় কথা। অপৌরুষেয় কথার অর্থ হয়, এই কথা কারুর মুখের কথা না, মন বা বুদ্ধির কথা না। এই কথা এমনই সত্য যে, এই কথা সবার উপর প্রযোজ্য।

স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, I am a voice without form, কেন বলছেন? স্বামী বিবেকানন্দ যদি ওই কথা না বলে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আর-একজন বলে থাকবেন। আসলে স্বামীজী কোন কথাই নূতন কিছু বলছেন না, স্বামীজীর কথাগুলোকে যদি একটু নাড়াচাড়া করা হয়, তাহলে দেখা যাবে স্বামীজীর কথাগুলো চলে যাবে আমাদের কোন না কোন শাস্ত্রে। যেমন স্বামীজীর কর্মযোগের উপর ভাষণ, যেখান থেকে আমরা পেলাম বিখ্যাত বই কর্মযোগ। কর্মযোগ গীতার তৃতীয় অধ্যায় ও কিছুটা চতুর্থ অধ্যায়ের কথাই বলছেন। মূলতঃ তৃতীয় অধ্যায়কে স্বামীজী শুধু নিজের ভাষায় বলেছেন, এটাই হয়ে গেল কর্মযোগ। স্বামীজীর জ্ঞানযোগ হল পুরোপুরি কঠোপনিষদের বক্তব্য, ঠিক তেমনি ভক্তিযোগ – নারদীয় ভক্তিসূত্র। স্বামীজী এই শাস্ত্রগুলিকে আধার করে ভাষণ দিয়েছেন, কিন্তু নিজের ভাবে ও নিজের ভাষায়।

স্বামীজী একজন ঋষি, শাস্ত্রগুলি যদি ঋষিবাক্য হয়, সেদিক দিয়ে স্বামীজীর প্রতিটি কথাও ঋষিবাক্য। স্বামীজী যে voice without form বলছেন, আসলে স্বামীজী কিছু সত্যকে বলে চলে যাচ্ছেন, এই সত্য কেবলমাত্র স্বামীজীর উপর নির্ভর করে না। আমি বলছি, অমুক আমার বাবা, এটা একটা conditional truth, এই সত্যটা শুধু আমার উপরই খাটবে, অন্যের উপর খাটবে না। কিন্তু যদি বলা হয়, ভগবান জগতের পরম পিতা, এটা হয়ে গেল অপৌরুষেয় সত্য। কারণ খ্রীশ্চানরাও এই কথা বলছে, জুহুদিরাও এই কথা বলছে, মুসলমানরাও বলে, হিন্দুরাও বলে। কিন্তু হিন্দুরা যখন বলছে, ঈশ্বর; মুসলমানরা যখন বলছে আল্লা, এটা তখন conditional truth হয়ে গেল। আমাদের সব সময় অপৌরুষেয় সত্যে, যেটা unconditional truth সেটাতে focus করতে হয়। যেটা conditional truth, সেটাতে অত focus করার দরকার নেই।

গীতার *আশ্চর্যবৎ পশ্যতি* যেমন আমরা বললাম, কঠোপনিষদে এটাই অন্য ভাবে আসে, আরও যেটা আশ্চর্যের, বাইবেলে যীশুও একই কথা বলছেন। বাইবেল মোটামুটি চারটে অংশে আছে, তার মধ্যে সেন্ট ম্যাথু যীশুর কথাগুলো বলছেন। তেরো নম্বর অধ্যায়ে যীশু নিজের শিষ্যদের বলছেন –অনেক প্রফেট হয়েছেন, অনেক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত মানুষ হয়েছেন, তোমরা যেটা দেখছ, সেটা ওনারাও দেখতে চেয়েছেন, কিন্তু তা তাঁরা দেখতে পারেননি; ওনারা এই কথাগুলো, যে কথাগুলো তোমরা আমার কাছে শুনছ, শুনতে চেয়েছেন, কিন্তু শুনতে পারেননি। ঠিক ঠিক ঈশ্বরীয় কথা, আত্মতত্ত্ব সবাই শোনার সুযোগ পায় না, সবাই দেখার সুযোগ পায় না। যীশু নিজের শিষ্যদের বলছেন, তোমরা এই সুযোগটা পেয়েছ। আবার ওখানকার লোকেরাই যারা এই কথাগুলো শুনেছে, তারা বলছে, যীশু আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, ওকে ক্রুশিফাই কর; তারা শুনেও বুঝতে পারল না। এরপর ভগবান তিরিশ নম্বর শ্লোকে এই প্রসঙ্গের ইতি টানছেন –

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।৩০।।

(হে ভারত, সমস্ত প্রাণীর দেহে অবস্থিত আত্মা সদা অবধ্য। সেইজন্য কোন প্রাণীর দেহনাশে তোমার শোক করা উচিত নয়।)

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, আমি এদের মারব বা এরা আমাকে মারবে, এতে কার কি হবে? ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, তুমি জেনে রেখো, তুমি নিজেকে যে দেহ মনে করছ, সেই দেহের ভিতর যিনি আছেন, তিনি হলেন দেহী। দেহী হলেন মালিক, দেহ হল তার ভৃত্য। যেমন রথ আর রথী, রথী হলেন মালিক, রথ একটা যন্ত্র। এই দেহী যিনি, তিনি সর্বব্যাপী, এর মধ্যে কোন অবয়ব নেই, সেইজন্য দেহীকে কেউ বধ করতে পারে না। আগে যেমন বলা হল, কোন শস্ত্র একে ছেদন করতে পারে না। কি করে ছেদন করবে, দেহী অনন্ত কিনা। অগ্নি এঁকে দগ্ধ করতে পারে না, কি করে দগ্ধ করবে, এনার তো কোন অঙ্গ নেই। আর বলছেন, জল এনাকে সিক্ত করতে পারে না, বাতাস এনাকে শুষ্ক করতে পারে না। সেইজন্য ভিতরে যিনি দেহী আছেন, তিনি *নিত্যমবধ্যোঽয়ং*। তুমি যে মনে করছ এদের তুমি মারবে; না, তুমি মারতে পারবে না। তুমি আমাকে ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করেছ, আমিও ধর্ম দিয়ে উত্তর দিচ্ছি। ভগবান ধর্মের আবার তিনটে দৃষ্টিভঙ্গীকে নিলেন, কিছু আগে আমরা তিনটে জীবনদর্শনের মাধ্যমে যার আলোচনা করলাম।

তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি, শুধু তুমি না, জগতে যত প্রাণী আছে সবার সামনে দুটো সত্য; একটা সত্য হল যেটা চোখের সামনে আছে, আরেকটা সত্য হল যেটা ভিতরে আছে। আগেকার দিনে কোন স্কুলে বা চাকরির ফর্ম ভরার সময় বলত, নাম, বাবার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা। ঠিকানা দুই প্রকার হয়, permanent and present, আপনার দুটো ঠিকানা হয়ত এক হতে পারে, কিন্তু দুটো ঠিকানাই জিজ্ঞেস করবে। ঠিক তেমনি আমাদের যে অস্তিত্ব, এই অস্তিত্বও দুটো, একটা permanent আরেকটা present। আমার Present যে অস্তিত্ব, সেটা হল, আমি স্বামী সমর্পণানন্দ, আমার permanent অস্তিত্ব হল শুদ্ধ পবিত্র আত্মা। আমি কোনটার সাথে নিজেকে জুড়ে রাখব, সেটা আমার ব্যাপার। কিন্তু ভগবান আগে দেখালেন, তুমি যদি নিজের দেহের সাথেও জুড়ে রাখ, তাতেও তোমার শোক করার কিছু নেই, সৃষ্টির পর পনেরশ কোটি বছর চলে গেছে, সামনে পনেরশ কোটি বছর পড়ে আছে, মাঝখানে মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের জন্য তোমার অস্তিত্ব, এর জন্য এত কান্নাকাটি করার কি আছে।

এই বলে ভগবান এখানে আত্মতত্ত্বের আলোচনা শেষ করলেন। এরপর সপ্তম অধ্যায়ে অল্প একটু আত্মতত্ত্বকে নিয়ে বলবেন, তারপর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আবার পুরোদমে আত্মার আলোচনা আসবে। এখান থেকে ভগবান লৌকিক ধর্ম, তুমি ক্ষত্রিয়, নিজের ধর্ম ত্যাগ করো না, এই জিনিসটাকে বোঝাবেন। আর সেখান থেকে শুরু হবে কর্মযোগ।

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করছিলাম, এটাকে বলে সাংখ্যযোগ, এই সাংখ্যযোগকে আবার কপিলের সাংখ্য দর্শনের সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না, কারণ কপিলের সাংখ্য দর্শন পুরো আলাদা। গীতার সাংখ্যযোগ মানে শুদ্ধ বেদান্ত, সাংখ্য মানে ঠিক ঠিক; সত্য যেমনটি তেমনটি দেখা, এটাকেই সাংখ্যযোগ বলা হয়। গীতাতে সাংখ্যযোগ আর কর্মযোগ, এই দুটো যোগের কথা বলছেন। সাংখ্য হল তত্ত্ব, কর্মযোগ হল তত্ত্বকে পাওয়ার উপায়। কর্মযোগ একটু পরে আসবে, কিন্তু তার আগে আমরা আলোচনা করব স্বধর্মকে নিয়ে। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, তুমি যদি স্বধর্মের দিকেও তাকাও, তাও তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে।

এগারো থেকে কুড়ি নম্বর শ্লোক, এই কুড়িটি শ্লোক হল হিন্দু ধর্মের অধ্যাত্ম দর্শন, হিন্দু ধর্মের প্রাণ। যিনি এই কুড়িটি শ্লোক ভাল ভাবে বুঝে নিতে পারবেন, তাহলে তাঁর হিন্দু ধর্মের ধর্মকে নিয়ে যে মূল আদর্শ, সেটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই কুড়িটি শ্লোক এমনিতে সহজ মনে

হবে, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম, তাই সহজে ধারণা করা যায় না। সেইজন্য গীতা আস্তে আস্তে এটাকে বিস্তারে নিয়ে যাচ্ছেন।

অর্জুনের যে প্রশ্ন ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান পারমার্থিক দৃষ্টিতে বললেন, অর্জুন, তোমার জীবনদর্শন যাই থাকুক, তুমি জন্মেছ তুমি মরবে, এই মতে যদি তুমি বিশ্বাস করো, তাতেও তুমি স্বধর্মকে কেন ছাড়বে। যদি তুমি মীমাংসক এবং সাধারণ লোকেদের মত মনে কর, তোমার নিত্য জন্ম, নিত্য মৃত্যু; তাতেও কোন দোষ নেই। আর যদি শুদ্ধ বেদান্তের দিক থেকে মনে কর, তাহলে তো আর কোন প্রশ্নই নেই, কিসের জন্ম, কিসের মৃত্যু! আমাদের উপনিষদ এই ভাবকে নিয়েই চলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আবার এই আত্মতত্ত্বের পুনরাবৃত্তি করবেন। সেখানে বলবেন, *যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে*, আমিত্ব বোধ যার নাশ হয়ে গেছে, বুদ্ধি যার কোন কিছুতেই লিপ্ত হয় না; *হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে*, সে সমস্ত বিশ্বকে নাশ করে দিলেও তার কোন বোধ হয় না, আর নিজের নাশ হয়ে গেলেও কোন কিছুর নাশ হয় না। এটাই গীতার সার। বুদ্ধিটা যেন কোন কিছুতে লিপ্ত না হয়, বুদ্ধি যেখানে লিপ্ত হবে আপনি সেটাই। বুদ্ধি যখন আত্মতত্ত্বে লিপ্ত হয়, তখন কোন কিছুই তাকে নাশ করতে পারবে না, সেও কোন কিছু নাশ করতে পারবে না।

একত্রিশ নম্বর শ্লোক থেকে ভগবান একেবারে অন্য একটা পন্থা নিচ্ছেন। এই পন্থাটাই পরে ধীরে ধীরে ধর্মতত্ত্বে ঢুকে যাবে, অর্থাৎ কর্ম, এবং কর্ম থেকে কর্মযোগে ঢুকবেন। ভগবান বলছেন, পারমার্থিক ব্যাপারটা আমরা ছেড়ে দিলাম, এবার সবটাকে তুমি পুরো জাগতিক দৃষ্টিতে দেখ। গীতা যদিও মূলতঃ পারমার্থিক, কিন্তু জগতে সব কিছুকে যেভাবে দেখা হয়, সেটাকেও জানা দরকার, ভগবান তাই ওই লৌকিক দৃষ্টিতে এখন বলছেন। ইদানিং ম্যানেজমেন্ট ক্লাশে গীতার উপর অনেক স্টাডি করতে হয়, তাঁরা মূলতঃ গীতার এই অংশ থেকেই যুক্তি ও শিক্ষা নেন।

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।৩১।।

(আর স্বধর্মের দিক থেকে যদি লক্ষ্য করো, তাতেও তোমার ভীত হওয়া উচিত নয়। কারণ, ধর্মসঙ্গত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকার কিছুই নাই।)

তুমি পারমার্থিক দৃষ্টিকে ছেড়ে দাও, যদিও তোমার প্রশ্ন পারমার্থিক ছিল; কিন্তু তুমি যদি নিজের স্বধর্মেকেই দেখ, মৃত্যুকে ছেড়ে যদি তোমার এই জীবনটাকেই শুধু নাও, তাহলেও ধর্ম থেকে তোমার বিচলিত হওয়াটা ঠিক নয়। তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের জন্য ধর্মযুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ থেকে ভাল জিনিস তোমার জন্য আর কিছু হতে পারে না। এখানে *স্বধর্মমপি* বলছেন, তৃতীয় অধ্যায়ে আবার বলবেন, *স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ*, পরের ধর্ম নেওয়া থেকে নিজের স্বধর্মে মৃত্যু বরণ করা অনেক ভাল। স্বধর্ম কথাটা খুব নামকরা কথা, আর ইদানিং রাজনৈতিক নেতারাও রাজধর্ম, স্বধর্ম শব্দগুলি প্রচুর ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। এখানে একটা ছোট ব্যাখ্যার দরকার।

ধর্ম মানে, যেটা আমাদের ধরে আছে। যেমন অগ্নির ধর্ম হল দাহিকা শক্তি। বাইবেলে যীশুও বলছেন, লবণের যদি লবণত্ব চলে যায়, সেটা আর কোন কাজে লাগে না, পাথর মনে করে ফেলে দিতে হয়। জলের ধর্ম আর্দ্রতা, সব কিছুকে ভিজিয়ে দিতে পারে। আর্দ্রতা ভাব যদি চলে যায়, সেটাকে আর জল বলা যাবে না। এই হিসাবে তাহলে মানুষের কি ধর্ম? আমরা সহজে এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা করে দিই; তুমি মানুষ তোমার এই এই করা উচিৎ, তুমি মানুষ তোমার এই করা উচিৎ নয়। আরও সহজে বলে দেওয়া যায়, স্বধর্ম। জিনিসটাকে যদি বুঝতে হয়, আমাদের আরেকটু গভীরে যেতে হবে।

আমরা অনেক আগে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম, collectivism, individualism and universalism, আমরা যদি এটাকে ভাল করে একবার বুঝে নিতে পারি, তাহলে স্বধর্ম জিনিসটা বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। যখন একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিস থেকে আলাদা করা যায় না, ওটাকে তখন বলে collectivism, পুরো জিনিসটা এক হয়ে আছে। কাঠের গোলাতে সব কাঠের টুকরো জড়ো করা আছে, সব কাঠ একই রকম দেখতে; এটাকে বলে collectivism। একটা কাঠের টুকরো বদলে আরেকটা কাঠের টুকরো নিলাম, কিন্তু দুটোই সমান। একই গাছ থেকে এসেছে, একই ভাবে কাটা হয়েছে, একই ভাবে সিজিনিং করা হয়েছে, সবটাই এক। এবার ওই কাঠ দিয়ে একটা চেয়ার বানানো হল, চেয়ারটা আর ওই collectivity তে নেই, কাঠ আলাদা, চেয়ার আলাদা। চেয়ার সেটাও কিন্তু কাঠ। আগেকার দিনে কাঠকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হত; চাইলে চেয়ারকেও আমরা জ্বালানি হিসাবে লাগাতেই পারি। চেয়ারকে কাঠ হিসাবেও ব্যবহার করা যায়, আবার চেয়ারকে চেয়ার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু কাঠের যে দাম তার থেকে চেয়ারের দাম বেড়ে গেছে, তার একটা individuality এসে গেছে।

চেয়ার শুধু এক রকমের হয় না, অনেক রকমের ডিজাইনের হতে পারে। কিন্তু সব চেয়ার যখন একসাথে রাখা থাকে, তখন একটা চেয়ার আরেকটা চেয়ারের সাথে সমান। এখন একজন বিশেষ দক্ষ কারিগর একটা চেয়ারকে খুব সুন্দর ডিজাইন করে একটা অর্নামেন্টাল চেয়ার তৈরী করল। ওই সূক্ষ্ম কাজের জন্য এই চেয়ারটার দাম বেড়ে গেল। দেখে মনে হবে ওর individuality বেড়ে গেল, কিন্তু individuality বাড়ে না, individuality বাড়া মানেই হয় universality বাড়া, ওর universality বাড়ছে। কারণ এই চেয়ার এখন ornamental groupএর সাথে থাকতে পারে, ওকে আমরা চেয়ার হিসাবে কাজে লাগাতে পারি, ওটাকে আমরা কাঠ হিসাবেও কাজে লাগাতে পারি। কাঠ এখন তিনটে অবস্থায় চলে গেল।

এটাকে এবার যদি রাজসিংহাসন রূপে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়, তখন এর individuality আরও বেড়ে গেল। কিন্তু তার সাথে সাথে বেড়ে গেল তার universality। রাজসিংহাসন যদি কাঠের হয়, সেটা একদিকে রাজসিংহাসন, আবার ornamental চেয়ার, আবার শুধু চেয়ার, আবার কাঠ, সবটাই হতে পারে।

একটা খুব সুন্দর গল্প আছে। ইউরোপে, বিশেষ করে ইতালিতে আগেকার দিনে অনেক রকম খুব সূক্ষ্ম সংস্কৃতি ছিল। প্রাচীন রোমের সংস্কৃতি খুব উচ্চমানের ছিল। রোমে একজন খুব বড় শিল্পী ছিলেন, অনেক কিছুতে তিনি খুব সূক্ষ্ম কাজের মাধ্যমে তিনি নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে গেছেন, কিছুটা চিত্রকলায়, কিছুটা কার্ভিংএর কাজ করেছিলেন। একজন খুব সাধারণ মানুষ, আগে তার দিনকাল ভাল ছিল, এখন খুব খারাপ অবস্থা। তার বাড়িতে একবার এক খুব নামকরা শিল্পী এসেছেন, টেবিলটা দেখে বলছেন, 'আরে এই টেবিলটা তো অমুক শিল্পীর করা; এই শিল্পটার এক জায়গায় বর্ণনা আছে, এর দাম তো লক্ষ লক্ষ টাকা। তবে এটা প্রমাণ করতে হবে যে এই শিল্প অমুক শিল্পীই করেছেন'। বলছেন, 'এই শিল্পী তাঁর প্রত্যেকটি কাজে, নিজের নামটা লিখে রাখেন, যেমন এই টেবিলের পায়াতে খুব সূক্ষ্ম ভাবে উনি নিজের নামটা লিখে রেখেছেন। ওই নামটাই প্রমাণ যে এটা ওনার রচনা'।

বলতে বলতে তাঁর নজর টেবিলের পায়ার দিকে গেছে। 'টেবিলের একটা পায়া দেখছি না, পায়াটা কোথায়'? বাড়ির গিন্নী বলল, 'আপনি খেতে আসবেন, বাড়িতে কাঠ ছিল না, ওটাকে উনুনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছি'। যেটা প্রমাণ সেটাই শেষ হয়ে গেছে। এত দামী জিনিস, এটাকে কেউ জ্বালানি হিসাবে লাগাতেই পারে, কোন আপত্তি নেই। মানুষের এটাই বৈশিষ্ট্য। একটা ছোট্ট

ইউনিসেলুলার এ্যমিবা বা করোনা ভাইরাস, যখন ঢুকছে সব শেষ করে দিচ্ছে। মানুষও তাই, যখন ঢুকবে শেষ করে দেবে। মানুষ নিজেকে কখন ভাইরাস রূপে, এ্যমিবা রূপে ব্যবহার করতে পারে, বাঘ, সিংহ, কুকুর বেড়াল, ছাগলের মতও ব্যবহার করতে পারে। বেশীর ভাগই ছাগলের মতই ব্যবহার করে।

এটা হল মানুষের collectivity, সেখান থেকে মানুষ আস্তে আস্তে উপরে দিকে উঠছে। আরও উপরে উঠতে উঠতে শেষ যেটা উঠতে পারে, তা হল, মানুষ ঈশ্বর দর্শন করতে পারে। এটা তার individuality, এটাই তার ঠিক ঠিক personality, এটাই তার uniqueness, এই uniqenessটা হওয়ার পিছনে একটা জিনিস আছে, কারণ তার রয়েছে universality। Individuality আর universality, আসলে দুটো এক।

ওরহান পামুর একজন নামকরা সাহিত্যিক, তাঁর My Name Is Redএ উনি ঠিক উলটো বলছেন। Styleকে তিনি বলছেন, এটা হল তার defect, একটা জিনিস আছে, তার একটা সিস্টেমে কিছু defect হয়ে গেল, লোকেরা সেটাকেই defect বলে চালাতে শুরু করে দিল। প্যান্ট বানাতে গিয়ে কাপড় কম পড়ল, আরেকটা কাপড় জুড়ে দিল, লোকেরা ওটাকেই ফ্যাশান বলে চালিয়ে দিল। এই ফ্যাশান জিনিসটা কি universal? না। আমি বলছি আমি আলাদা, আমরা সবাই মনে করি আমি আলাদা। একদম ঠিক, আপনি সবার থেকে আলাদা, কারণ আপনার মধ্যে defects অনেক বেশী রয়েছে। এত বেশী defects রয়েছে যে, আপনি নিজেকে যে individual মনে করছেন, আসলে আপনি individual না, আসলে আপনি অনেক নীচু স্তরে আছেন। কারণ যার মধ্যে ঠিক ঠিক individuality রয়েছে, আপনি যদি আলাদা কিছু হন, universalityর যে পিরামিড তাতে আপনি সবচেয়ে উপরে থাকবেন। আপনি সব কটার সঙ্গে এক থাকবেন। উপর থেকে নীচ পর্যন্ত, যে রাজসিংহাসনের কথা বলা হল, ওখান থেকে শুরু করে কাঠের যে টুকরো, সব কটার সঙ্গে আপনি এক।

কিন্তু আমরা বেশীর ভাগই হলাম defective জিনিস। Defective জিনিস কারু সঙ্গে ফিট করে না। গাড়ির একটা পার্ট ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে, ওটাকে খুলে ফেলে দিয়ে একটা নূতন পার্ট লাগিয়ে দেওয়া হল। এখন ওই খুলে দেওয়া পার্ট বলছে, দেখেছো আমি কত আলাদা, আমি ওদের মত না, ওরা সবাই গাড়ির মধ্যেই পড়ে আছে। তুমি আলাদা করে কেন ভাবছ, তুমি তো এখন বাতিলের দলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমরা সবাই ফেলে দেওয়া মাল, কিন্তু মনে করছি আমরা ইউনিক। কিন্তু ভাবছি, I am unique in every sense, সমাজ আমাকে চিনতে পারল না। সমাজ তোমাকে ঠিক চিনেছে, চেনার পর তোমাকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে।

এর verification কোথায় হয়? Verificationটা হয় স্বধর্মে এসে। স্বধর্মকে পরিভাষিত করার সময় হিন্দুরা সব সময় colecetive level থেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে indivudality leveleএ নিয়ে যাবে, individual level থেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে universalর শেষ সীমাতে নিয়ে চলে যান। অন্যান্য ধর্মে বিশেষ করে ইসলাম, খ্রীশ্চান ধর্মে একটি মাত্র বই আছে, সেই বইতে বলে দিয়েছে তুমি কি করবে কি করবে না। হিন্দুদের সবটাই open system। হিন্দুদের কিছু কিছু আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত রয়েছে। তাহলে মানুষ হিসাবে আমরা কি কি হতে পারি? মানুষ হিসাবে আমরা সমস্ত প্রাণীর সাথে এক, মানুষ হিসাবে যে কোন দেশের, *বসুধৈব কুটুম্বকম্*, তার সাথে এক; ভারতের নাগরকি হিসাবে আমি এক, বাঙ্গালী তাই বাংলার লোকেদের সাথে আমি এক, পরিবারের লোক বলে আমি পরিবারের সবার সাথে এক, সমাজে আছি তাই সমাজের সাথে এক। কিন্তু সবচেয়ে বেশী হল, আমি আমার নিজের জন্য এক। দরকার আমার নিজের উন্নতি। তার সাথে দরকার, এই যে এত কিছুর সাথে আমি জড়িয়ে আছি, সেইজন্য সবারই প্রতি আমার কর্তব্য

রয়েছে। আমার বাড়ির লোকের প্রতি, মা-বাবার প্রতি কর্তব্য রয়েছে। বিয়ে করে থাকলে স্ত্রীর প্রতি, সন্তানের প্রতি কর্তব্য রয়েছে। তাছাড়া সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি আর সমস্ত মানবজাতির প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে। এই সমস্ত কর্তব্যকে একটা জায়গাতে হিন্দুরা গুছিয়ে আনছেন, সেটাকে এনারা বলছেন বর্ণাশ্রম।

হিন্দু ধর্মের চারটি আশ্রম, প্রথম ব্রহ্মচর্য আশ্রম। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে কেউ স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জন করে না। দ্বিতীয়, বিবাহ করার পর সংসারে প্রবেশ করা। বিবাহও যদি না করেন, অনেকে অকৃতদারও থাকেন, তাকেও একটা সময়ের পর গৃহস্থ মনে করা যেতে পারে, যদি সে স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জন করে। বাণপ্রস্থ গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী আশ্রমের মাঝামাঝারি। তার আয় কিছুটা আসে গৃহাস্থাশ্রম থেকে, কিন্তু অন্য দিকে সে ত্যাগের পথে চলে গেছে। চতুর্থ ও শেষ আশ্রম সন্ন্যাসী, তার কোন জাগতিক উপার্জন থাকবে না। ব্রহ্মচর্য আশ্রম ও সন্ন্যাস আশ্রমে কোন আয় নেই, সেইজন্য এরা সবাই গৃহস্থের উপর নির্ভর করে। আর ঠিক এই কারণেই গৃহস্থকে খুব সম্মানের চোখে দেখা হয়। কারণ গৃহস্থ যদি না থাকে তাহলে ব্রহ্মচারীও থাকবে না, সন্ন্যাসীও থাকবে না। আর বাণপ্রস্থীরা গৃহস্থাবস্থায় এককালে যে আয় করেছিল, সেই আয় দিয়ে এখন চলছে।

ব্রহ্মচারীরা কিভাবে থাকবেন, গৃহস্থরা কিভাবে থাকবেন, বাণপ্রস্থী বা সন্ন্যাসীরা কিভাবে থাকবেন, এগুলিকে মনু কোডিফাই করে দিয়েছেন। মহাভারত ও আমাদের অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রেও এর আলোচনা রয়েছে। কিন্তু এগুলো গতিশীল, মনু নিজেও বলেছেন দেশ ও কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে এগুলোও একটু একটু করে পাল্টাবে, নূতন করে ধর্মশাস্ত্র রচনা হবে। আশ্রম ধর্মই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখান থেকে নিজের নিজের উন্নতি সাধন হয়ে থাকে। হিন্দুদের জীবনের উদ্দেশ্য হল মুক্তি, আমরা সবাই মুক্তির পথে এগোচ্ছি। কিন্তু সচেতন ভাবে মুক্তির দিকে এগোতে হলে এই চারটে অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, আমাদের এগোতে হবে। নিজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি আমাদের সবারই কর্তব্য আছে, এটাকে বলে বর্ণ।

খড়্গপুরের মত বড় বড় আইআইটিতে মাঝে মাঝে Pre placement counseling হয়, সেখানে সেকেণ্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফোর্থ ইয়ারের হাজার হাজার স্টুডেন্টসরা অংশ নেয়, এটা চাকরিও না, চাকরির আগে কাউন্সেলিং। একজন প্রফেসর খুব দুঃখ করে বলছিলেন, কোন ছেলে জিজ্ঞেস করে না, আমাকে কি কি কাজ করতে হবে, আমার দায়ীত্ব কি হবে, সবাই জানতে চায় আমার স্যালারি কত, আর কি কি প্যাকেজে পাবো। এটাই দেশের দুর্ভাগ্য। আমরা এইসব প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের শিক্ষা নিতে পাঠাই, আর ওখানে গিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে মাথার মধ্যে হিসাব ঘুরতে থাকে, পাশ করে বেরিয়ে আমি কত টাকা আয় করব। এই কাজটা বৈশ্যদের, টাকা অর্জন করা।

আমাদের দেশের বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা, তাতে শিক্ষা কম ব্যবস্থা বেশী। ব্যবস্থা মানে, যিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন তিনি নিজের ব্যবস্থা করে নেন, আর যারা করছে তাদেরও একটা ব্যবস্থা করে দেন। বলে না, আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও। এখানেও শিক্ষা গেছে, ব্যবস্থাটাই আছে। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা কখনই এভাবে ছিল না। হিন্দুদের ব্যবস্থা ছিল, সমাজের প্রতি তোমার এই এই দায়ীত্ব, তুমি দায়ীত্ব পালন করবে। বদলে তোমার জীবন চালানোর জন্য কিছু দেওয়া হবে, যাতে সবারই চলে যায়। এই ভাবে আমাদের সমাজে শত শত জাতি উদ্ভব হয়েছে। একটা জাতি ছিল, যাদের কাজ ছিল শুধু মাটি খুঁড়ে কুয়ো থেকে জল বার করা। এই একটা কাজেই তারা বংশ পরম্পরায় দক্ষ ছিল। একটা জাতি ছিল, যারা এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় পাল্কিতে লোকদের বহন করে নিয়ে যেত। একটা জাতি ছিল, যারা শুধু নৌকা চালাতো। তারা ওই কাজ করে করে দক্ষতা অর্জন করে, নূতন নূতন উদ্ভাবন দিয়ে ওই জিনিসটার আরও উন্নত করে যেত। আর

বংশ পরম্পরায় ধরে শুধু এই কাজই করে যাচ্ছে। ওই জাতির জ্যেষ্ঠরা যা করতেন সেটাই ধর্ম, কিন্তু ওই ধর্ম আমাদের বেদ থেকেই আসত।

পরে পরে আমাদের ঋষিরা দেখলেন, হাজার হাজার জাতি, হাজার হাজার ধর্ম তো হতে পারে না, সব কটাকে চারটেতে নিয়ে এসো। এসে গেল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যারা শুধু বিদ্যাকে নিয়ে থাকবে, তারা ব্রাহ্মণ। সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য এবং অপরের রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, আর বাইরের কোন আক্রমণ হলে দেশ ও সমাজকে প্রতিরক্ষা করবে, রক্ষা ও প্রতিরক্ষা ক্ষত্রিয়ের জন্য এই দুটো কাজ। অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা বৈশ্যের কাজ। এর বাইরে বাকি যা কিছু আছে, পরচর্যাদি, এগুলো শূদ্রের কাজ।

এবার আমাদের পুরো জিনিসটাকে বিচার করতে হবে। ধরুন একজন ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু সে চালাচ্ছে রেল, এখানে টেকনিক্যালি সে কিন্তু একজন শূদ্র, কারণ ওটা পরিচর্যাত্মক কর্ম, সে একটা service sectorএ আছে। কিন্তু একজন ইঞ্জিনিয়ার, সে বলছে, আমি শুধু গবেষণা নিয়ে থাকব, ওই ইঞ্জিনিয়ার চলে যাবে ব্রাহ্মণ বর্ণে। একজন রেল চালাচ্ছে, সে হয়ে গেল শূদ্র। যে বলছে, আমি ব্যবসা করে জীবন চালাবো, সে হয়ে গেল বৈশ্য। আর যে মনে করছে আমি চুরি চামারি করে টাকা কামাব, সে শূদ্র থেকেও নীচে চণ্ডালে চলে গেল। পুরো ভারতবর্ষ জাতিটাই এখন চণ্ডাল জাতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আজকে এই ব্যঙ্ক বন্ধ হয়ে গেল, কাল অমুক ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর দেখা যাচ্ছে সবাই টাকা মেরে বসে আছে। এগুলো সবই চণ্ডালের কাজ। ঋষিরা এই চারটে বর্ণ তৈরী করে বলে দিলেন –তোমার সমাজের প্রতি এই এই দায়ীত্ব। হিন্দুরা যখন ধর্মের কথা বলে তখন তারা বর্ণাশ্রম ধর্মের কথাই বলে। এই বর্ণাশ্রম ধর্মকে কোডিফাই করেছেন, মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্যের মত মহান ঋষিরা। এই ধরণের অনেক ঋষিরা ছিলেন, যাঁরা তাঁদের সময় বিভিন্ন স্মৃতি দিয়ে গেছেন। বাংলায় যেমন রঘুনন্দন স্মৃতি চলে। কিন্তু পরে দেখা গেল, বেশীর ভাগ স্মৃতি বিয়ে কিভাবে হবে, শ্রাদ্ধ কিভাবে হবে, এই জিনিসগুলির দিকে বেশি চলে গেছে। দায়ীত্ব জিনিসটা কোন ভাবে চলছে; এখনও পুরোটাকে কোডিফাই করে এনে কেউ যে বলবেন, হিন্দু ধর্ম বলতে এই; এই এই সিদ্ধান্ত, জিনিসটা এভাবে হবে, সেভাবে এখনও কিছু হয়নি।

স্বধর্মে আশ্রম ধর্ম ও বর্ণধর্ম এই দুটো প্রথম আসে। এরপর তৃতীয় যেটা আসে তার নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম, এটাও একটা টেকনিক্যাল শব্দ; যেখানে বর্ণ আর আশ্রম দুটো মিলে গিয়ে একটা ধর্ম হয়। যেমন একজন ক্ষত্রিয়, তার বয়স হয়ে গেছে, এখন তিনি আর লড়াই করতে পারবেন না। তিনি এখন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যুবকদের শিক্ষা দেবেন। এখনও সেনাবাহিনীতে এই সিস্টেম আছে, যখন তরুণ থাকে তখন লড়াই করছে। একটা বয়সের পর তাঁরা আর যুদ্ধ করেন না, সৈন্য বাহিনীতে যারা নূতন আসে তাঁরা তাদের ট্রেনিং দিতে শুরু করেন। একটা বিশেষ বয়স হয়ে যাওয়ার পর দায়ীত্বটাও পাল্টে যায়। ব্রাহ্মণ যদি গৃহস্থ হন তাঁর এক রকম কর্তব্য, ব্রাহ্মণ যদি বাণপ্রস্থি হন, তখন তাঁকে অন্য রকম দায়ীত্ব পালন করতে হয়। ক্ষত্রিয় গৃহস্থ হলে তার এক রকম দায়ীত্ব, সেই ক্ষত্রিয়ই যখন বাণপ্রস্থি হয়ে গেল, তখন তার দায়ীত্বও অন্য রকম হয়ে যাবে। তার মানে, বয়সের সাথে সাথে ওই বর্ণের মধ্যে থাকলেও তার দায়ীত্ব পাল্টাতে থাকে।

স্বধর্মের সাথে চার নম্বর থাকে নিমিত্তধর্ম। নিমিত্তধর্মের অর্থ প্রায়শ্চিত্ত কর্ম করা। যারা বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে থেকে বিভিন্ন দায়ীত্ব পালন করছে, সেখানে জান্তা-অজান্তায় সবাই অনেক ভুলভ্রান্তি করবেই। সেইজন্য আমাদের হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান দেওয়া হয়েছে, যেমন একাদশী ব্রত পালন করা, তীর্থে যাওয়া, গঙ্গাস্নান করা, গঙ্গাজল মুখে দেওয়া, কুম্ভে যাওয়া, এগুলো নিমিত্তধর্মের মধ্যে পড়ে। পাঁচ নম্বর হল গুণধর্ম। গুণধর্ম হল, একটা বর্ণে আছে এবং কোন একটা আশ্রমে আছে, সেখানে তাকে বর্ণধর্ম পালন করতে হচ্ছে, তার সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করতে হচ্ছে,

কিন্তু ওই বর্ণাশ্রমে সে একটা বিশেষ পদমর্যাদায় এসে গেছে; যেমন একজন ক্ষত্রিয় রাজা, রাজা এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওই ক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্যগুলি একটু পাল্টাবে কিন্তু রাজা হিসাবে দায়ীত্বটা ঠিক থাকবে। একজন ক্ষত্রিয় রাজা, তার এখন কত রকমের দায়ীত্ব, যেমন ক্ষত্রিয় হিসাবে তার কিছু কর্তব্য আছে, আবার সে একজনের স্বামী, স্বামী রূপে তার কিছু কর্তব্য আছে; সন্তান আছে, বাবা হিসাবে কিছু দায়ীত্ব আছে এবং সে রাজা, রাজা হিসাবে তার কিছু দায়ীত্ব আছে।

সীতাকে বনবাসে পাঠানোর পিছনে শ্রীরামের এই দ্বন্দ্বটা তৈরী হয়েছিল। গুণধর্ম আর শ্রীরামের আশ্রম ধর্ম, এই দুটো ধর্মের মধ্যে বিরোধ লেগেছে। গুণধর্ম বলছে, তুমি রাজা, তোমাকে রাজার মত আচরণ করতে হবে। আশ্রম ধর্ম বলছে, সীতার ভালমন্দ তোমাকে দেখতে হবে। দুটো ধর্মের এই দ্বন্দ্ব গীতার বিষয় না, এটা মহাভারতের বিষয়। দুটো ধর্মের মধ্যে বিরোধ হয়ে গেলে কোন ধর্মটা নিতে হবে, এই জিনিসটাকে বুঝতে হলে আমাদের মহাভারত ও বাল্মীকি রামায়ণে যেতে হবে। মানুষের জীবনে এই দ্বন্দ্ব প্রায়ই লেগে থাকে। একজন শিক্ষক, তার ছেলেও সেই স্কুলে পড়ে; একদিকে সে শিক্ষক, অন্য দিকে সে সন্তানের পিতা। গার্হস্থ্য ধর্ম বলছে, তুমি সন্তানকে এভাবে দেখবে, অন্য দিকে গুণধর্ম বলছে, তুমি এর শিক্ষক, তুমি একে এভাবে দেখবে। ফলে কিছু দ্বন্দ্ব আসবে। তবে সবটা মিলিয়েই ধর্ম তৈরী হয়। শেষ ধর্ম হল সামান্য ধর্ম, সামান্য ধর্ম মানে, মানবজাতির প্রতি আমাদের সবারই কিছু দায়ীত্ব আছে।

ক্ষত্রিয়রা ক্ষমতার শীর্ষে রয়েছে। কোন রাজার কাছে অনেক সময় কেউ এসে বলত, আমি আপনার শরণাগত। রাজা বলে দিল, ঠিক আছে, তুমি আমার রাজ্যে আশ্রয় নাও। এবার যে রাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য সে পালিয়ে এসেছে, সে তাকে আক্রমণ করতে এসেছে, রাজা কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাকে কোন দিন ছাড়বে না। কারণ সামান্য ধর্ম তাকে বলছে, তুমি শরণাগতের রক্ষা করবে, অন্য দিকে তার গুণধর্ম বলছে, নিজের প্রজাকে রক্ষা কর, গৃহস্থ ধর্ম বলছে, পরিবারের সদস্যদের রক্ষা কর। ওনারা সামান্য ধর্মকে সব সময় সবার উপরে রাখতেন। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে এই জিনিসগুলিকে তাঁরা বিভিন্ন ভাবে বলেছেন। আমরা এর বিস্তারে যাচ্ছি না, আর এটা আমাদের বিষয়ও না। এই ছটিকে মিলিয়ে স্বধর্ম।

বর্তমান যুগের নিরিখে স্বধর্ম হল, যে দায়ীত্ব আপনি নিয়েছেন, সেই দায়ীত্ব পালন করাটা আপনার স্বধর্ম। এবার অর্জুনকে ভগবান বলছেন, *স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য*, অন্য ধর্মকে বাদ দাও, আমরা যে আত্মার কথাগুলো বললাম এগুলোকেও যদি বাদ দিয়ে শুধু যদি স্বধর্মের দিকে তাকাও, তাহলেও *ন বিকম্পিতুমর্হসি*, তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নয়। *ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে*, ধর্মের জন্য যে যুদ্ধ, আচার্য খুব সুন্দর বলছেন, *ধর্মার্থং প্রজারক্ষণার্থং চ*, ধর্মের জন্য আর প্রজা রক্ষণের জন্য। কৌরব পাণ্ডবের এই যুদ্ধ ধর্মের লড়াই, এখানে ধর্ম আর অধর্মের লড়াই না। কৌরবরা বলছে তারা ঠিক, পাণ্ডবরা বলছে তারা ঠিক। অর্জুনকে তাই বলছেন, তুমি তো কোন লোভে পড়ে যুদ্ধ করছ না, তুমি মনে করছ এটা ধর্মের লড়াই। ক্ষত্রিয়ের জন্য এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না। এই ভাবটাই পরের শ্লোকে টেনে নিয়ে বলছেন –

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়ঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।।৩২।।

(হে পার্থ, অনায়াসপ্রাপ্ত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারসদৃশ এই প্রকার ধর্মযুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়রাই লাভ করেন।)

যে জিনিসটা পাওয়ার জন্য আপনি সারাটা জীবন বসে আছেন, সেটা এখন না চাইতেই এসে গেছে। *যদৃচ্ছয়া*, তুমি তো এটা চাওনি, নিজে থেকে এসেছে, অর্থাৎ এমন এক পরিস্থিতি হয়ে গেছে যে, তোমার সামনে যেন নিজে থেকেই এসে গেছে। যে জিনিসটার জন্য আমি অপেক্ষা করে

আছি, যদি যোগাযোগ হয়ে ওটা সামনে এসে যায়, ওখান থেকে পিছিয়ে আসতে নেই; কারণ আমি তো এটাই চাইছিলাম। যদি না চেয়ে থাকি, কিন্তু ঘটে যাচ্ছে, সেটা অন্য জিনিস। চাইছি কিন্তু ঘটছে না, সেটাও অন্য জিনিস। কিন্তু চাইছি, কিন্তু আমার চেষ্টা ছাড়াই সেটা ঘটছে, এর জন্য তো তোমার নিজেকে সুখী মনে করা উচিত। আর বলছেন, এই ধরণের সুযোগ যখন আসে, তখন *স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্*, স্বর্গদ্বার খুলে যায়। কারণ বর্ণাশ্রম যখন পালন করা হয়, মানুষ যখন ধর্ম জীবন পালন করে, তার জন্য তখন স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। যার ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়, তারাই এই ধরণের যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। সব ক্ষত্রিয় নিজের জীবনে ধর্মযুদ্ধ করার সুযোগ পায় না।

তাহলে জেহাদের সাথে এর কি তফাৎ? মুসলমানী জেহাদীরাও তাই বলছে। তফাৎ আছে, মুসলমানরাও আসলে যুদ্ধ করে না। তবে অনেক সময় কোন একটা কারণে বলে দেয়, জেহাদ, ধর্মযুদ্ধ। ইসলামের বিরুদ্ধে, কিংবা কোরাণের বিরুদ্ধে বা প্রফেট মহম্মদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলে দিলে বা কিছু করলে যদি সেটাকে জেহাদ বলে দেওয়া হয়, তখন সমস্ত মুসলমানদের এটাই ডিউটি হয়ে যায়। কিন্তু এখানে একটা তফাৎ হয়ে যায়। ক্ষত্রিয়দের জীবনটাই হল একটা ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রজা রক্ষণের দায়ীত্ব পালন করা। এখানে মারামারির কোন স্থান নেই। যদি যুদ্ধ করতেই হয়, তার আগে তারা পরস্পর আলোচনা করেন। বিভিন্ন পক্ষের লোকেরা এসে বিবাদটাকে আগে মিটমাট করার চেষ্টা করবেন। মিটমাট না হলে চারিদিকে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে, আমাদের লড়াই অপরিহার্য। তারপর লড়াই করতে নামবে। লুকিয়ে, চুরিয়ে, চোরাগোপ্তা বোমা মেরে দেওয়া, কাউকে খুন করে দেওয়া, এই জিনিসের অনুমোদন কখনই ক্ষত্রিয়দের ধর্মযুদ্ধে দেওয়া হত না।

ধর্মযুদ্ধে সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, দু পক্ষের সেনা মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে, পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হবে যুদ্ধ এই এই ভাবে হবে, এই এই ভাবে যুদ্ধ করা যাবে না। সাধারণ মানুষ সেখানে কোন ভাবেই জড়িত হয় না। এমন কি যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, খাদ্য-পানীয় বহনকারীদের উপরেও যেন আক্রমণ করা না হয়। কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র সন্ত্রাসবাদীরা সাধারণ নিরীহ লোকের উপর বোমা মেরে দিয়ে চলে যাচ্ছে, শিশু মহিলা কাউকে ছাড়ে না, তাও আবার চোরগোপ্তা ভাবে। এটা কিসের জেহাদ! ঠিক ঠিক জেহাদ যদি করতে হয়, তুমি সামনা সামনি এসো। গীতার এই যুদ্ধ সেইজন্য জেহাদের সাথে কখনই তুলনা করা যাবে না, দুটো পুরোপুরি আলাদা জিনিস। শুধু বলে দিচ্ছেন যে, ক্ষত্রিয় হিসাবে তোমার এই যুদ্ধ করা কর্তব্য।

সেখান থেকে বলছেন, যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না করো তাহলে কি হবে? সেটাকে তেত্রিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান এর উত্তর দিচ্ছেন। যে মুহূর্তে তুমি বুঝে গেলে যে, তোমাকে ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করতে হবে, যদি না কর তখন কি হবে?

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।।৩৩।।

(আর যদি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহলে নিজ ক্ষত্রিয়ধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগের কারণে তুমি প্রত্যবায়ভাগী হবে।)

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং, এই যুদ্ধ ধর্মের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে, এখানে অধর্মের কিছু নেই, কোন লোভ নেই, কোন কামনা বাসনা নেই। ক্ষত্রিয় হিসাবে তোমার এই ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়াটা কর্তব্য, এটা তোমার দায়ীত্ব। যদি যুদ্ধ না করো, তাহলে এতদিন যে তুমি কীর্তি অর্জন করে এসেছ; তুমি মহাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলে, যদিও সেখানে তোমার জয় আসেনি, কিন্তু মহাদেবের সাথে যুদ্ধ করে জোর টক্কর দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করে পাশুপত অস্ত্র লাভ করাটা একটা বিরাট কীর্তি, বা পরে পরে তুমি ইন্দ্রের সাথে গিয়ে অনেক জায়গায় যুদ্ধ করেছ, বা পরে তুমি

বিরাটের রাজ্যে দিব্য অস্ত্র দিয়ে সমস্ত কৌরবদের পরাস্ত করেছিলে, এইভাবে এতদিন তুমি যত কীর্তি অর্জন করেছ, তোমার অর্জিত সমস্ত কীর্তিই নাশ হয়ে যাবে। স্বধর্ম থেকে সরে আসা এবং কীর্তি নাশের জন্য তুমি প্রত্যবায়ভাগী হবে।

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়ষ্যন্তি তেহব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে।।৩৪।।

(আরও কি হবে, সবাই চিরকাল তোমার অখ্যাতি ঘোষণা করবে। সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অখ্যাতি মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখদায়ক।)

এরপর লোকেরা তোমার নিন্দা করবে, তোমার নামে সবাই হাসবে। *সম্ভাবিতস্য* মানে সমাজে যাঁর প্রতিষ্ঠা আছে, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির যদি অকীর্তি বা দুর্নাম হয়, সেটা তার জন্য মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর। অনেক সময় লোকেরা যদি কোন ভুল কাজ করে ফেলে, তখন তার মনে হয়, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই, আত্মহত্যা করে নিই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খুব সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে। ভারত থেকে প্রচুর সৈন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। একজনের একটা খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। যৌথ বাহিনী আর ইতালীর মুসোলিনির সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। সেখানে ভারতের লোক বিভিন্ন পদে কাজ করছিল, সৈন্য বাহিনীতেও ছিল, আবার রেডক্রশের হয়েও কাজ করছিল। যুদ্ধে যারা আহত হয়ে পড়ে থাকত, তাদের স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসতে হত। চারিদিকে গুলি চলছে, সেখানে ভারতীয় সৈনিকরা নির্বিকার, স্ট্রেচার নিয়ে যাচ্ছে, আহতদের তুলে নিয়ে আসছে। জীবনের কোন পরোয়া নেই, এটাই আমার ধর্ম, ওই গোলাগুলির মধ্যে স্ট্রেচার নিয়ে যাচ্ছেন, আহত সৈন্যদের স্ট্রেচারে তুলছেন আর নিয়ে আসছেন।

একজন বড় অফিসার, আইএএস ট্রেনিং একাডেমির উনি ডেপুটি ডিরেক্টর, তিনি এক জায়গায় বর্ণনা করছিলেন। যারা নূতন আইএএস হয়, তাদের সব জায়গায় ট্রেনিং এর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। আর্মির যে ফ্রন্টলাইন আছে, সেখানেও তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্থান বর্ডারের একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে একটা ছোট্ট নদী, নদীর ওপার পাকিস্থান এপার ভারত। সেখানকার একজন ইনচার্জ হলেন একজন ক্যাপ্টেন। বর্তমান ক্যাপ্টেন দু-তিন দিন হয়েছে এখানে নূতন এসেছেন। ওনার আগে যিনি এখানে ক্যাপ্টেন ছিলেন, একদিন পাকিস্থান ওপার থেকে গুলি চালাতে শুরু করে, জানলাটার একটা পাল্লা খোলা ছিল, সেখান দিয়ে গুলি এসে আমার আগের ক্যাপ্টেন মারা যান। তারপর আমি এখানে কদিন আগে এসেছি। সেই অফিসার, উনি নিজেও একজন আইএএস অফিসের, তিনি বলছেন, ক্যাপ্টেনের বয়স খুব জোর সাতাশ আটাশ হবে, কিন্তু এমন ভাবে মৃত্যুর বর্ণনা করছেন, যেন matter of fact। পাকিস্থান আর্মি ওই জায়গাতে আছে জানে, গুলি চালালে যে কোন সময় মরে যেতে পারে। বলছেন, আইএএস ট্রেনিরা জনা কুড়ি পঁচিশ জন, ওই জায়গায় তাদের একটা ব্রীজ পার করতে হবে। ক্যাপ্টেন বলছেন, ওরা যদি জানতে পারে, এমনিতে জানা আছে, কিন্তু টাইমটা যদি জেনে যায়, অবধারিত যে ওরা গুলি চালাবেই চালাবে। তারপর একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে, রাত্রির মধ্যে, চুপচাপ যাতে কোন আওয়াজ না হয়, বিরাট লম্বা বর্ণনা। এই যে ভাব, আমি ডিউটি করছি, ডিউটি করতে করতে মারা গেলাম, এটা নিয়ে অত হৈ চৈ করার কি আছে।

সম্ভাবিতস্য চাকীর্তিঃ, এক দেশ আরেক দেশের উপর যে গুপ্তচর বৃত্তি করে, জার্মানরা আমেরিকানদের ব্যবহার করে গুপ্তচর বৃত্তি করে, আমেরিকানরা জার্মানদের ব্যবহার করে গুপ্তচর বৃত্তি করত, ভারত পাকিস্থানে গিয়ে গুপ্তচর বৃত্তি করে, পাকিস্থানরা ভারতে এসে গুপ্তচর বৃত্তি করে। আবার নিজের লোকের উপর লক্ষ্য রাখার জন্যও কাউন্টার গুপ্তচর লাগানো হয়। কোন অফিসার গুপ্তচর বৃত্তি

করতে গিয়ে যদি কখন ধরা পড়ে যায়, তখন একজন এসে বলবে, সব প্রমাণ সামনে রেখে দেওয়া হল। ওর সিনিয়র অফিসার ওকে একটা ঘরে ডেকে নেবে। চেয়ারে বসতে বলল, চেয়ারে বসল। ওর পুরো ফাইল, তার অকীর্তির পুরো ইতিহাস সামনে রেখে দেওয়া হত। ফাইলের সাথে একটা রিভলবার, রিভলবারে মাত্র একটা গুলি, রেখে দিত। অর্থ হল তুমি নিজে সুইসাইড করে নাও, তোমার জন্য এটা সম্মানীয় মৃত্যু। যদি তুমি নিজে না কর, তাহলে কোর্ট মার্শাল করতে হবে, তাতে তোমার চাকরিটাও যাবে, পেনশানটাও চলে যাবে। আর এটা হলে বলা যাবে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সে সুইসাইড করে নিয়েছে, ফাইলটা ওরা চেপে দেবে। বাড়ির লোকেরা পেনশানটা পাবে। সবচেয়ে বড় হল, বাড়ির লোকেদের জন্য সম্মান। কিন্তু তোমার অকীর্তি যদি ফাঁস হয়ে যায়, সব দিক দিয়ে তুমি শেষ। এই ধরণের যত কেস আছে, invariably সবাই নিজেকে গুলি মেরে উড়িয়ে দিত।

আর-একটা ঘটনার বর্ণনা আছে, কিভাবে একজন জানতে পেরেছে, জানার পর একটা গাড়ি নিয়ে ফুল স্পীডে চালিয়ে পাহাড়ে চলে গেছে। তারপর ওখানে একটা খাদের কাছে গিয়ে গাড়ি শুদ্ধু নিজেকে খাদে ফেলে দিয়ে সুইসাইড করে নেয়। সত্যিকারের যারা খুব সম্মানীয় আর্মি অফিসার, যদি কোন কারণে ধরা পড়ে যায়, ওরা সুইসাইড করে নেয়।

ইজরাইল দেশটা চারিদিক দিয়ে মুসলিম দেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। ইজরাইলি মুসাদ জানে আমাদের খুব বিপদ, বত্রিশ দাঁতের মধ্যে যেমন জিহ্বা। মুসাদের একজন চীফ জানতেন, একদিন না একদিন ইজরাইলের উপর আক্রমণ আসবে। তিনি তাঁদের প্রধাণ শত্রুদের মধ্যে স্পাই লাগিয়ে ওদের সব স্ক্যাণ্ডালগুলো বার করলেন, কে কে কোন কোন মেয়ের সাথে জড়িত। মুসাদের কাছে খবর এসে গেছে, অমুক দিনে নটি দেশ মিলে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। তার ঠিক দুদিন আগে ওদের এয়ারফোর্সের সব নামকরা অফিসারদের কাছে বড় বড় খামে চিঠি গেল, সাথে ডকুমেন্টস, কে কোন মেয়ের সাথে জড়িয়ে আছে, ছবি সহ। অর্থটা স্পষ্ট, হয় এয়ারফোর্স থেকে রেজিগনেশান দাও, নয়তো গুলি করে নিজেকে শেষ করো, আর তা নাহলে তোমার ফ্যামিলিতে সব খবর পৌঁছে যাবে। প্রত্যেকটা অফিসার রিজাইন করে দিল। ঠিক যুদ্ধের সময় ওরা দেখছে, ওদের সমস্ত অফিসার রিজাইন করে দিচ্ছে। সমাজে যাদের একটা সম্মান আছে, বাড়িতে সম্মান আছে, হঠাৎ বাড়ির লোকেরা যদি শোনে, আমার বাবার, আমার স্বামীর, আমার ছেলের মহিলা সংক্রান্ত একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে, তার থেকে এটাই ভাল তার আগে যেন আমি মরে যাই।

এই মানসিকতা সব ক্ষেত্রেই হতে পারে। একটা বাচ্চা ছেলেও যদি মনে করে, স্কুলে এমন কোন ঘটনার সাথে সে জড়িয়ে গেছে, যার জন্য সে সবার কাছে ছোট হয়ে যাবে, সে খালি ভাবতে থাকে, আমি পালিয়ে যাবো, আমি এই করব, সেই করব। ইদানিং কত ইয়ং ছেলে মেয়েরা সুইসাইড করছে। বন্ধুর কাছে দামী মোবাইল, তার কাছে নেই, বাবার কাছে চেয়েছে, বাবা কিনে দেয়নি, সুইসাইড করে দিল। ভেবেছে বাবা-মা আমাকে সম্মান দিল না। দুজনের প্রেম ভেঙে গেল, একজন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে গেল। আমার যা পাওয়ার আমি পেলাম না। সব কটার পিছনে হল, *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তিঃ*। যারা প্রতিষ্ঠিত, তারা নিজের অকীর্তি নিতে পারে না।

হে অর্জুন, তুমি এত দিন ধরে নিজের কীর্তিকে দাঁড় করিয়েছ, তোমার এত সম্মান, তুমি এই অকীর্তি কি করে নেবে! আর যুদ্ধ ভূমি থেকে যদি তুমি পালিয়ে যাও, লোকেরা তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।।৩৫।।

(কর্ণ প্রমুখ মহারথীর মনে করবে, তুমি ভয় পেয়েই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছ এবং তুমি যাঁদের কাছে সম্মানিত ছিলে তাঁদের কাছেই তুমি হেয় প্রতিপন্ন হবে।)

সবাই মনে করবে ভয় পেয়ে তুমি কাপুরুষের মত পালিয়ে গেছ। এই মহারথীরা, যাঁরা সামনে যুদ্ধ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁরা বলবেন, অর্জুন ভয়ে পালিয়ে গেছে। বিরাট রাজার ছেলে উত্তর, বারো তেরো বয়সের, অন্দরমহলে মেয়েদের সঙ্গেই থাকত। মেয়ের সঙ্গে থাকলে যা হয়, নিজেকে মেয়েদের সামনে খুব বড় করে দেখাতে চাইবে। উত্তরও দেখাত, আমি বিরাট বীর, আমি এই করতে পারে, সেই করতে পারি। ইতিমধ্যে একদিন বিরাট রাজার গোধন লুট করার জন্য কৌরবরা বিরাটের রাজ্য আক্রমণ করেছে। কায়দা করে এমন ভাবে আক্রমণ করেছে যে, বিরাট রাজা সব সৈন্যরা সেই দিকে চলে গেছে। এদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, সব সেনা নিয়ে বেরিয়ে গেলে সমস্ত গোধন নিয়ে চলে যাওয়া। খবর এসেছে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন এরা তাদের আসল সেনা নিয়ে সব গরু নিয়ে চলে যাচ্ছে। উত্তর বলছে, কোন ব্যাপারই না, আমি সব কটাকে দেখে নেব। দ্রৌপদী সেখানে সৈরিন্ধ্রী নামে আছে, সে বলল তুমি বৃহন্নলাকে সারথি রূপে নিয়ে যাও। অর্জুন বৃহন্নলা সেজে বিরাটের মেয়েকে নাচ গান শেখায়। অন্দরমহলে উত্তরা বলছে, ভাই তুমি আমার পুতুলের জন্য ওদের জামার কাপড় গুলো কেটে নিয়ে আসবে।

বৃহন্নলাকে নিয়ে উত্তর রথে করে বেরিয়ে এসেছে, রাস্থায় বেরিয়েই বলছে, আমি এই করব, সেই করব। ওখানে গিয়ে যেমনি কৌরব সৈন্যদের দেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। কৌরবরা দেখে হাসতে শুরু করেছে। উত্তর বৃহন্নলার কথা শুনবে না, প্রাণ ছেড়ে দৌড় মেরেছে। অর্জুনকে দেখে সবাই এখন এটাই মনে করবে। পিছনে তুমি নিজেকে বিরাট কিছু মনে করতে পারো, সামনে যখন এসেছো তখন বুঝতে পারলে তোমার মুরদ কত দূর।

পয়ত্রিশ নম্বর শ্লোকের দ্বিতীয় লাইন, *যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্,* যারা এতদিন তোমাকে বিরাট কিছু মনে করেছে, যারা মনে করেছে তোমার মধ্যে প্রচুর ক্ষমতা, তোমার মধ্যে অনেক গুণ, তাদের চোখে তুমি এখন ছোট হয়ে যাবে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি, তোমার কাছে আমি এমনটি আশা করিনি। মজা করে একজন বলছে, প্রথম ভুল করলে জানা যায় লোকেরা তোমাকে কত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত। এটা আমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার, যারা আজকে আমায় সম্মান দিচ্ছে, এতদিন সম্মান দিয়ে এসেছে, এদের দৃষ্টিতে কিন্তু আপনি যে কোন দিন, যে কোন সময় পড়ে যাবেন, এই জিনিসটা যেন কখন না হয়। লোকে যেন আপনার পিছনে হাসাহাসি না করে।

মহাভারতে এই ধরণের প্রচুর কাহিনী আছে। কেউ একটু কাপুরুষ হয়ে গেছে, তার মা তাকে বলছে, 'এমন কিছু করো না, যেটা দেখে তোমার শত্রু যেন না হাসে, যারা তোমাকে সম্মান দিয়ে এসেছে, তার যেন না হাসে। তোমার একান্ত আপনজনেরা কষ্ট পাবে। একবার যদি তুমি হাসির পাত্র হয়ে যাও, তাহলে তো তোমার সব শেষ'। ভগবান পুরো লৌকিক দৃষ্টিতে অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন। প্রথমে শুদ্ধ বেদান্তের দৃষ্টিতে বোঝালেন, সেখান থেকে আরও নীচে নামতে নামতে, ধর্মের যত রকম দৃষ্টি হতে পারে, যত দিক হতে পারে সব ভাবে বোঝালেন। এখন পুরো সামাজিক দৃষ্টিতে বোঝাচ্ছেন।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্।।৩৬।।

(আর তাই না, তোমার শত্রুরাও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করে প্রচুর অকথ্য বাক্য বলবে। এর থেকে অধিকতর দুঃখকর আর কি হতে পারে?)

তুমি যে আগে যত বড় বড় যুদ্ধ করে তোমার বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলে, সেটাকে ভুলে গিয়ে সবাই তোমার এই বলে নিন্দাই করবে –এই যে অর্জুনকে দেখছ, ও কিছুই না, ফাঁকা আওয়াজ, ঢপের শাঁক। তোমার যে সামর্থ্য, তোমার যে ক্ষমতা, সেটাকে নিয়ে সবাই নিন্দা করবে, *ততো দুঃখতরং নু কিম্*, তুমি যদি নাও মারা যাও, তাও এটা কত নিন্দার। এর চাইতে দুঃখ আর কিছুতে হতে পারে না। যদি কেউ কিছু অঘটন করে, মানুষ সেটা ভুলে যায় না, ওটা মনে রেখে দেয়। সেইজন্য অর্জুন, তুমি এই রকমটি করো না।

অর্জুন এর আগে প্রশ্ন করেছিল – *ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ* – হে ভগবান, আপনি আমাকে বলুন আমার পক্ষে কোনটা ভালো, যুদ্ধে জয়লাভ করাটা, না কৌরবদের কাছে পরাজিত হওয়া। এই প্রশ্নের পরিসমাপ্তি টেনে ভগবান উত্তর দিচ্ছেন –

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা মোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়।।৩৭।।

(হে কৌন্তেয়, এই যুদ্ধে নিহত হলে তুমি স্বর্গলাভ করবে; আর জয়ী হলে রাজ্য ভোগ করবে। অতএব যুদ্ধের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে উত্থিত হও।)

এই অধ্যায়ের প্রথমের দিকে অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন, *ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ*, আমি বুঝতে পারছি না কোনটা ঠিক, যুদ্ধ করে মরা যাওয়াটা ভাল, নাকি আমরা ওদের মেরে জয়ী হই। অর্জুন পুরো সংশয়াচ্ছন্ন। এবার ভগবান একবারে পরিষ্কার করে বলছেন, স্বধর্ম পালন করে যুদ্ধ করতে করতে তুমি যদি মরে যাও, তুমি স্বর্গে যাবে। কারণ স্বর্গপ্রাপ্তি তখন হবে যখন মানুষ ঠিক ঠিক কর্তব্য পালনের পথে থাকে। সেইজন্য ভারত সরকারের কোন পুলিশ বা সৈন্য ডিউটি করতে করতে মারা গেলে তাদের একটা বিশেষ সম্মান দেয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে দেয়। ভগবান এখানে বলছেন, তুমি স্বর্গে যাবে। এখানে তোমার হারার প্রশ্ন নেই, হয় তুমি জিতবে, না হয় তুমি মরবে। হারার প্রশ্নই উঠছে না, যদি জয়লাভ করো, তাহলে তুমি এই সাম্রাজ্য পাবে এবং রাজ্যলাভের সুখ ভোগ করবে। তুমি যে প্রশ্ন করেছিলে, এখানে পরিষ্কার, ধর্মযুদ্ধ অন্যায়ের কিছু হচ্ছে না। যুদ্ধে জয়ী হলে তুমি পৃথিবী ভোগ করবে, আর যুদ্ধে মারা গেলে স্বর্গ তোমার নিশ্চিত। হে অর্জুন, তুমি উঠে দাঁড়াও, যুদ্ধ করো। অর্জুনের মধ্যে যে প্রশ্ন ছিল, ভগবান সেটা পরিষ্কার করে দিলেন। আর স্বধর্ম যাঁরা পালন করেন, এবার তাঁদের জন্য পরিষ্কার করে বলছেন। এতক্ষণ কর্মের কথা বলছিলেন, ভগবান এবার আস্তে আস্তে সেটাকে কর্মযোগের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আটত্রিশ নম্বর শ্লোক হল এর পরের টপিকের সাথে যোগসূত্র।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।।৩৮।।

(তুমি ক্ষত্রিয়; ধর্মযুদ্ধই তোমার স্বধর্ম। সুতরাং তুমি সুখে অনুরাগ ও দুঃখে দ্বেষ না করে এবং লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয় তুল্য জ্ঞান করে ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এই রকম করলে গুরুজনাদি-বধজনিত প্রত্যবায় তোমার হবে না।)

অর্জুনের মনে হচ্ছিল, আমার পাপ লাগবে, এই হবে, সেই হবে। ভগবান বলছেন, কিসের পাপ লাগবে; সুখ হোক দুঃখ হোক, লাভ হোক অলাভ হোক, জয় হোক পরাজয় হোক, সব কিছুকে তুমি সমান দৃষ্টিতে রাখো। মনকে স্থির করে সমান দৃষ্টি রেখে যেটাই করো, তোমার কোন পাপ হবে না। এটাকেই কর্মযোগ বলে। তার মানে বুদ্ধি কোন কিছুতে আসক্ত হবে না। এর অর্থ হল, আমিত্ব ভাব কোন কিছুর সাথে জড়াবে না। স্বামীজীও কর্মযোগ বলছেন, duty for duty sake, এটা আমার কর্তব্য, তাই করলাম। কিভাবে করব? শ্রেষ্ঠতম উপায়ে আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করব।

এরপর কর্মের ফল যাই হোক না কেন, আমার তাতে কিছু যায় আসে না। ঠাকুর জাত চাষার কথা বলছেন, সেই চাষা প্রাণ দিয়ে চাষ করছে। বৃষ্টি যদি না হয় আমি কি করব, আমার কিছু করার নেই। আমি সব কিছুই করলাম, আমার যদি কিছু দোষ থাকে বলতে পারেন। যুদ্ধ করাটা তোমার স্বধর্ম, তুমি কোন বিচার করতে যেও না, যুদ্ধে তুমি সুখ দুঃখের ভাব আনবে না, যুদ্ধে লাভ অলাভের ভাব আনবে না, জয় পরাজয়ের ভাব আনবে না। এটাই কর্মযোগ। এরপরের শ্লোক থেকে ভগবান মূল কর্মযোগের উপর বলতে শুরু করবেন।

ঊনচল্লিশ থেকে তিপ্পান্ন নম্বর শ্লোক পর্যন্ত ভগবান অনেক কিছু কথা বলছেন, সব কথাই তিনি কর্মকে নিয়ে বলছেন। এই পনেরটি শ্লোকের মধ্যে ভগবান কর্মযোগের একটা ভূমিকা দিচ্ছেন, যেটাকে তিনি তৃতীয় অধ্যায়ে এবং কিছুটা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারে বলবেন। চতুর্থ অধ্যায় যদিও সরাসরি ঠিক কর্মযোগ না, কিন্তু এখানে যে আলোচনা করছেন, সেটা কোন না কোন ভাবে চতুর্থ অধ্যায়ের সাথেও জড়িয়ে আছে।

গীতার শুরু দ্বিতীয় অধ্যায়ের এগারো নম্বর শ্লোক থেকে, এর আগে যা কিছু আছে, ওটা ভূমিকা শুধু। হিন্দু ধর্মের যে মূল ধর্ম দর্শন, বা বলা যেতে পারে হিন্দু ধর্মের যে সিদ্ধান্ত, সেখান থেকে একটু একটু করে জীবনদর্শন বেরিয়ে আসে, যেটা এর আগে বলা হল। প্রথমে ভগবান অর্জুনকে একটু উপহাস করে বললেন, তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ, অথচ তোমার বিচার মুর্খদের মত। তারপর আত্মার ব্যাপারটা বললেন, সেখান থেকে নেমে তিনি বাস্তবিকতায় এলেন। প্রশ্ন হল, অর্জুন যুদ্ধ করবে কি করবে না, তোমার জীবনদর্শন যাই হোক, তুমি মরে গেলে সব শেষ, তাতেও তোমার যুদ্ধ করা উচিৎ। যদি তুমি মনে কর, তোমার জন্ম জন্মান্তর চলতে থাকবে, তাতেও তোমার যুদ্ধ করা উচিৎ। কিন্তু ওই দুটি শ্লোক, *অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত*, হিন্দুদের মত নয়। ইদানিং অনেকে বলে, নাস্তিক হলেও সে হিন্দু। ভারত সবাইকে স্থান দিয়ে আসছে, ইরানে পার্সিরা যখন মুসলমানদের হাতে মার খেলেন, তারাও ভারতে এসে স্থান পেলেন। ইজরাইলে জুহুদিরা মার খেলেন, তাঁরাও এখানে স্থান পেয়েছেন। সারা বিশ্ব থেকে কম্যুনিস্টরা মার খেয়ে এখন ভারতে স্থান পেয়েছে। এখানে সবাই স্থান পায়। সেইভাবে নাস্তিকরাও এখানে স্থান পেয়েছে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে কোথাও নাস্তিকের ভাব নেই। কদিন আগেও কোর্ট বলেছে, Hindu is a way of life। যার যা মুখে আসছে কিছু একটা বলে দিচ্ছে।

হিন্দু ধর্ম বেদে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু ধর্মের আধার বেদ, বেদের কোথাও নাস্তিক ভাব পাওয়া যাবে না। বাড়িতে কোন ছেলে কুলাঙ্গার হয়ে গেলে, কোন মেয়ে অসতী হয়ে গেলে বাড়ির লোকেরা কি তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবে? মা কি বলবে, আমি মনে করব আমার একটা সন্তান কম? মা বলবে, থাকো, কি আর করবে। সব বংশেই গোলমাল হয়, বাবা ঘর ছাড়া করে দিতে পারে, মা কিন্তু কোন দিন তা করবে না। তুমি থাকো, কিন্তু জানবে তোমার এটা ধর্ম নয়। *অব্যক্তাদীনি ভূতানি*, এটা গীতার মত নয়, তাই হিন্দুদেরও মত নয়। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, যদি তুমি তাই মনে কর, তাতেও তোমার শোক করা উচিত নয়। *অথ চৈনং নিত্যজাতং*, এটা হিন্দুদের মত কিন্তু গীতার মত নয়। গীতার ঠিক ঠিক মত, যেটা হিন্দুদেরও মত –মুক্তি। এমন কি *অথ চৈনং নিত্যজাতং*, এই শ্লোকটি মীমাংসকরা যখন বলন, সেখানেও তাঁরা বলেন যদি ব্রহ্মলোকে চলে যাওয়া যায়, তাহলে এই আসা-যাওয়াটা একটা দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য থামবে। মূল ভাব এই আসা-যাওয়াটাকে থামাতে হবে। যদিও এটা সাময়িক মুক্তি, কিন্তু মুক্তি। হিন্দুদের জীবনদর্শন একমাত্র মুক্তির উপর আধারিত। ক্রিকেটের ব্যাট নিয়ে বল পেটাতে পেটাতে এক সময় শচীন তেণ্ডুলকার হয়ে যাবে, কিন্তু ব্যাট দিয়ে বল মারা জানলে সবাই কি শচীন তেণ্ডুলকার হয়ে যাবে? হয় না, অনুশীলন করতে হয়। এমনকি মীমাংসা দর্শনকে যদি আমরা মানি, সেখানেও যজ্ঞ করে করে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়ে যাবে। অদ্বৈত জ্ঞানে তা হয় না, অদ্বৈত হল জ্ঞান, এটা কোন কর্মের ফল না, উপলব্ধিও কিছু হয় না, এটা জ্ঞান।

আমি ভুলে গেছি আমি কে, আমাকে জানতে হবে আমি কে, জেনে গেলেই হয়ে গেল, সব শেষ। সেটা অবশ্য আলাদা জিনিস। কিন্তু সেটা যদি আমাকে জানতেও হয়, বা করতে যদি হয়, আমাকে মাঠে নামতে হবে। এই মাঠে নামা থেকে গীতার যে বৈশিষ্ট্য, সেটা পুরোদমে শুরু হয়ে যায়, এ অদ্বৈত জ্ঞান প্রাপ্ত করবে কি করে?

বিদেশীরা ট্রেজার আইল্যাণ্ডের মত খুব সুন্দর সুন্দর গল্প লেখেন। আমি জেনে গেলাম সমুদ্রের এই জায়গাতে একটা জাহাজ ডুবি হয়েছিল, এখানে প্রচুর ধন-সম্পদ পড়ে আছে। কিংবা কোন আইল্যাণ্ডে বিশাল গুপ্তধন লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এটা জেনে গেলেই তো সব হাতে এসে যাবে না। আমাকে এবার প্রস্তুতি নিতে হবে, জাহাজ জোগাড় কর, লোকজন সংগ্রহ কর, বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার জোগাড় কর, সব জুটিয়ে নিয়ে এবার যেতে হবে। গেলেই যে সাফল্য আসবে, আমাদের জানা নেই। এখান থেকে গীতা এবার এটাই বলবেন, তোমার জানা হয়ে গেছে যে, জিনিসটা সত্য, এবার তুমি নেমে পড়ো। কাজে যে সাফল্য আসবে, সেটাকে নিয়েও এখানে আলোচনা করবেন। সেই অবস্থায় পৌঁছে, তা উপলব্ধির ব্যাপারই হোক আর জ্ঞানেরই ব্যাপার হোক, এই জিনিসটাকেই এবার বলতে যাচ্ছেন। সাংখ্য শব্দের অর্থ, জিনিসটাকে ঠিক ঠিক জানা। আর ওই জিনিসটাকে উপলব্ধি করার জন্য যে খাটাখাটনি করতে হয়, সেটাকে বলে যোগ –সাংখ্য আর যোগ, এই দুটি শব্দ। সিদ্ধান্তকে জানা এবং ওটাকে কার্যকরী করা, কার্যকরী করাটাকেই বলা হয় যোগ। যোগ হল সেই পদ্ধতি, যে পদ্ধতি দিয়ে সাংখ্যে নিয়ে যাবে।

আমরা বলতে পারি, কেন আমরা তো ষড়দর্শনে দেখি সাংখ্য দর্শন আছে, যোগ দর্শন আছে, আলাদা করে এই দর্শনগুলো তাহলে কি? তার উত্তর হল –ওগুলো পুরো আলাদা। গীতাতে যে সাংখ্য দর্শনের কথা বলছে, এই সাংখ্য দর্শন নিজেকে সাংখ্য এইজন্যই বলেন যে, তিনি মনে করেন আমি তোমাদের ঠিক ঠিক জ্ঞানের দিকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। গীতার যোগ দর্শন নিজেকে যোগ দর্শন এই জন্যই বলে, আমরা আপনাকে ক্রিয়ার মাধ্যমে ওই আত্মজ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু আসলে আমরা যা কিছুই করি না কেন, সবটাই যোগ। পূজা করছি, সেটাও যোগ; সমাজ সেবা করছি, সেটাও যোগ; বিচার যখন করছি, সেটাও যোগ; শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে, সেটাও যোগ, সবটাই যোগ। কারণ এই সব কিছুই আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সেই জ্ঞানের দিকে, সাংখ্যের দিকে। সাংখ্য হল সেই অবস্থা, যেখানে গেলে মুক্তি। এই জিনিসটাকেই এবার ভগবান ঊনচল্লিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি।।৩৯।।

(হে পার্থ, এতক্ষণ তোমাকে সাক্ষাৎ শোকমোহাদি সংসারহেতু-নাশক সাংখ্য নামক তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হল। এবার কর্মযোগের কথা তোমাকে বলছি; শ্রবণ কর। নিষ্কাম কর্মযোগবিষয়ক এই জ্ঞানলাভ করলে তুমি ধর্ম ও অধর্মরূপ কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।)

এগারো থেকে আটত্রিশ শ্লোক পর্যন্ত ভগবান অর্জুনকে সাংখ্যের কথা বললেন। তবে মাঝখানে তিনটে শ্লোক, যেখানে *অব্যক্তাদীনি ভূতানি, অথ চৈনং নিত্যজাতম্,* এগুলোকে বাদ দিয়ে ধরতে হবে। এগারো নম্বর শ্লোককেও যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে বারো, তেরোটা শ্লোকে হিন্দু ধর্ম দর্শনের যে আত্মা, সেটাকে বিস্তারে রেখে দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে শুরু করে পুরো আঠারো অধ্যায়ের কিছুটা পর্যন্ত বলবেন। কিন্তু এই সাংখ্যের অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উপলব্ধিটা কিভাবে হবে? ভগবান এক এক করে উপায়গুলো বলছেন।

আমাদের জীবনে বন্ধন কি, আমরা কোথায় আটকে আছি? কর্মবন্ধন। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম এই তিনটেকে নিয়ে আগে আগে বলা হয়েছিল। কোন কারণে আত্মা তাঁর স্বরূপ ভুলে গেছে, স্বরূপ ভুলে যাওয়ার জন্য মনে কামনা আসে, কামনা আসার জন্য তাঁকে কাজ করতে হয়। কাজ করলে তার ফল আছে, সেই ফল কখন পছন্দের হয়, কখন অপছন্দের হয়। পছন্দ হলে আমরা আরও সেদিকে এগিয়ে যাই, অপছন্দ হলে সেখান থেকে সরে আসি; এখান থেকেই আমাদের উপর বন্ধন চাপতে শুরু হয়ে গেল। যে মুহূর্তে, তাত্ত্বিক ভাবে না, প্রত্যক্ষ জেনে গেলাম আমি কে, সেই মুহূর্তে আমার যত দুঃখ-কষ্ট আছে, শোক আছে, সব নিবারণ হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছানর জন্য সবাইকে অনেক খাটতে হবে। ঠাকুর বলছেন, সিদ্ধি সিদ্ধি বললেই নেশা হয় না, গায়ে সিদ্ধি মাখলেও নেশা হয় না, সিদ্ধি খেলে তবে গিয়ে নেশা হবে। আত্মা আছেন, আত্মা অনন্ত, আত্মা অব্যয়, আত্মার জন্ম-মৃত্যু নেই, এটা আমি জেনে গেলাম, কিন্তু তাতে কিছু হবে না, ওটাকে আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে।

এখানে এসেই আমাদের দেশের সর্বনাশ হয়ে গেল। দিল্লী আশ্রমে এক পণ্ডিত মঠের মহারাজদের পড়াতে আসতেন। কিছু দিন পড়ানোর পর বলছেন, 'রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের কোন দিন পড়ানো যাবে না। পূর্বপক্ষ জানার আগেই আপনাদের সিদ্ধান্ত জানা হয়ে গেছে। খেটে খেটে যে ওখানে যেতে হয়, সেটা জানার আগেই আপনারা সিদ্ধান্ত জেনে গেছেন'। কথামৃতে ঠাকুর বলে দিয়েছেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, ঠাকুর বলে দিয়েছেন, ঈশ্বর দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য। এই কথাগুলো আপনারা জেনে গেছেন, ফলে আপনি আর কিছু শিখবেন না। তাহলে কি আপনি মহাপুরুষ? কিছুই না, কারণ আপনার তো উপলব্ধি হয়নি। যতক্ষণ না জ্ঞান হয়ে যায়, ততক্ষণ আমরা কেউই কিছু না। আপনাকে একবার জ্ঞানটা জানিয়ে দেওয়া হল, এরপর আপনাকে খাটতে হবে, খেটে খেটে ওই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করতে হবে, জ্ঞানোপলব্ধির জন্য। যদি না খাটা হয়, তখন এই একটু আত্মবিষয়ক জ্ঞানই সর্বনাশের কারণ হয়ে যাবে। আগে তাও কিছুই জানতাম না, বোকা মুর্খ ছিলাম, নিজেকে খুব সাধারণ মনে হত। এখন আত্মার বিষয়ে একটু শোনা ও জানার জন্য এবার সেই খাটাটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।

ঈশোপনিষদে এগারো নম্বর মন্ত্রে বলছেন, *অন্ধং তমঃ প্রবিশ্যন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে। তত ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ*।। তুমি কর্ম করছ না, তুমি সাধনা করছ না, উপাসনা করছ না, আর মুখে ফরর ফরর করে সংস্কৃতে শাস্ত্রের মন্ত্র আওড়ে যাচ্ছ, এতে তুমি আরও গোল্লায় যাবে। হিন্দুরা এই ফরর ফরর করে মন্ত্র বলাকে মানেন না। পুরো ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দেওয়ার কারণ, ফরর ফরর করে মন্ত্র শুনিয়ে যাওয়া। স্বামীজী এই জিনিসটাকে দূর করলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করে। তোমাকে কাজ করতে হবে, স্কুল চালাও, ডিসপেন্সারি চালাও, হাসপাতাল চালাও। সমাজে কত ভাল ভাল স্কুল আছে, তাতে রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু আসে যায় না, তাও আমরা স্কুল চালাচ্ছি কারণ ছেলেদের মঙ্গলের জন্য, আমার নিজের মঙ্গলের জন্য। কলকাতা ও তার আশেপাশে এত নামী দামী হাসপাতাল আছে, সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের হাসপাতালের কি দাম। দাম এই জন্য যে, হাসপাতালে সেবাকার্যের দ্বারা সন্ন্যাসীদের মুক্তি হবে। সন্ন্যাসী যখন কোন কাজ করে, তা যে কাজই হয়ে থাকুক, সন্ন্যাসী সমাজের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করে না, নিজের মঙ্গলের জন্যই করে। কারণ মনের মধ্যে যে আবর্জনার ঢিপি জমে আছে, ওই আবর্জনাকে যদি পোড়াতে হয়, তাহলে পোড়াবার একমাত্র উপায় কাজ দিয়ে পোড়ানো।

একবার একটা টিভি চ্যানেলে একজন মহারাজের সাক্ষাৎকার ছিল, সেখানে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনাদের সন্ন্যাসীদের মধ্যে কারুর কি ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তাঁরা কি আপনাদের সাথে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন'?

মহারাজ উত্তর দিলেন, 'শেয়ার করলে প্রথমেই আমরা তাঁকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দেব। যদি কোন মহারাজ বলেন, আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, আমরা তাঁকে সোজা নিয়ে গিয়ে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দেব'।

শুনে ওই সাংবাদিক বলছেন, 'এটা আপনি কি বলছেন'!

'কারণ যাঁদের ঈশ্বরদর্শন হয়, তাঁদের ওই ক্ষমতাটাও এসে যায় সবাইকে নিজের ঈশ্বরদর্শনের কথা বলাকে আটকানোর। আর অন্যান্য জিনিস দিয়ে বোঝা যায়, উনি একজন উচ্চমানের সন্ন্যাসী'।

তারপর প্রশ্ন করেছেন, 'আপনার তো সন্ন্যাস জীবন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর হয়ে গেল, আপনার কি কিছু উপলব্ধি হয়েছে'?

'হ্যাঁ, এতদিনে আমার মনে হয় শাস্ত্রের যে কথাগুলো শুনে এসেছি, এগুলো সব সত্য'।

'এত বছরে আপনার শুধু এতটুকু উপলব্ধি'?

'আমার কপাল খারাপ, আমি আর কি করতে পারি। বাকিরা সৌভাগ্যবান, ওনারা আগেই বুঝে গেছেন এগুলো সত্য'।

আমাদের মন একটা অনাবাদী জমি, যেখানে দুনিয়ার সব আবর্জনা আর আগাছা ভর্তি। ওই জঞ্জাল, আগাছা কেটে সাফ করুন, ট্রাক্টর লাগান, লাঙল চালান, গোবর দিয়ে যান, সার দিয়ে যান, তারপরে ঠাকুরের কথাগুলি বীজ রূপে সেখানে পড়বে, তখন গিয়ে কিছু হবে।

কথামৃতের সব কথাগুলো হল অমৃত বীজ। সেই বীজ আপনি ছড়িয়ে দিলেন, কিন্তু সারা জমিতে পার্থেনিয়াম গাছের জঙ্গল হয়ে আছে, বীজ ওর মধ্যে কোথায় বছরের পর বছর পড়ে থেকে থেকে হারিয়ে যাবে। আগে ওই জমি থেকে সব আগাছা পরিষ্কার করতে হবে, জমিতে জল দিতে হবে। আবার আগাছা বেরোবে। আবার পরিষ্কার করতে হবে। এই খাটনি যদি না থাকে, কোন দিন কিছু হবে না। ওই খাটনিটাকে নিয়ে ভগবান এবার এই শ্লোক থেকে বলতে শুরু করলেন।

আমরা বলতে পারি, আমরা তো সবাই বাড়িতে কত খাটা খাটনি করি। রান্নাবান্না করছি, বাজার করছি, ঘরে কত কাজ করছি, ছেলেকে বড় করছি। সেটাও ভগবান দেখাবেন কিভাবে ওটা তোমার সর্বনাশ করবে। তাহলে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূজারী, কালীঘাটের পূজারী তারাও তো কত কিছু করছে। সেটাও ভগবান দেখাবেন, ওদেরও কত defects আছে, serious problems সেখানে আছে। কাজ করলেই তো হল না, এ্যটলাস পুরো পৃথিবীকে কাঁধের উপর ধারণ করে আছে, সেও তো কত কাজ করছে, তাই বলে কি সে মুক্তির পথে যাবে! কিছুই না, পাথরের মত ওখানেই পড়ে থাকবে। আর মন্ত্র জপ করলেই যদি মুক্তি হয়ে যেত, তাহলে আজকাল টেপরেকর্ডে, সিডি প্লেয়ারে গায়ত্রী মন্ত্র *ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ* বাজানো যায়, ট্যাক্সিতেও শোনা যায়, টেপরেকর্ডারটারও মুক্তি হয়ে যেত, ট্যাক্সিটারও মুক্তি হয়ে যেত। এই পুরো জিনিসটা কি, পনেরোটা শ্লোকে ভগবান ব্যাখ্যা করছেন। পরের পনেরটি অধ্যায়ে এটাকে আরও বিস্তারে বলবেন।

মানুষ যদি যোগে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তা হলে তার জন্য কি কি দরকার? আচার্য বলছেন, *যোগে তু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া*, যোগে প্রথম শর্ত হল নিঃসঙ্গ, এটা আমার কর্তব্য এটা আমাকে করতে হবে, এটাই প্রথম শর্ত। কর্মযোগের প্রথম শর্ত হল নিঃসঙ্গ, নিঃসঙ্গ মানে, আমার এটা দায়ীত্ব তাই আমি করছি। একটু আগে যে বলা হল, রামকৃষ্ণ মিশনের যে কাজগুলো করতে হয়, তার উদ্দেশ্য হল আমার নিজের উন্নতি। সমাজে তাতে দুটো লোকের ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে সেদিকে

আমার দৃষ্টি নেই, ভাল কিছু যদি হয়, সেটা সমাজের লোকেদের সৌভাগ্য। কিন্তু কাজটা হবে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ভাবে, সেখানে কোন প্রকার স্বার্থ থাকবে না। এমনকি আমার মুক্তি হোক, এই কামনাও যেন না থাকে।

আচার্য তাঁর ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় শর্ত বলছেন, *দ্বন্দ্ব প্রহাণপূর্বকম্*, কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না, সর্ব প্রকার দ্বন্দ্ব ত্যাগ করতে হবে। দ্বন্দ্ব মানে, যেখানে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় এই জিনিসগুলি জড়িয়ে আছে, দ্বন্দ্ব মানে দুটো বিপরীত জিনিস। যেখানে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে আছে, সেখানে কর্মযোগ হবে না।

তৃতীয় শর্ত বলছেন, *ঈশ্বরারাধনার্থে*, সমস্ত কাজ হবে ঈশ্বরের আরাধনার জন্য। তিনটে শর্ত বলে দিলেন – প্রথম অনাসক্ত, দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব ত্যাগ এবং তৃতীয় ঈশ্বরের আরাধনার্থে। এটাকে বলে সমাধিযোগ। কর্মযোগ আর সমাধিযোগ দুটো একই, কারণ সেখানে বুদ্ধিটা গিয়ে এক হয়ে যায়, ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত রয়েছে বলে। এই যে চেষ্টা করা হচ্ছে, তাই এটাকে সমাধিযোগ বলেন। তোমার মন এমন উচ্চ অবস্থায় চলে গেছে যে, তুমি যা কিছু করছে, কোন কাজেই তোমার নিজের কোন স্বার্থের মনোভাব নেই। দ্বিতীয় সেখান কোন সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির চিন্তাও থাকবে না। তৃতীয়, যা কিছু হবে সব ঈশ্বরের পূজা রূপে হবে। এর ফলে, তোমার মধ্যে যে কর্মবন্ধন আছে, যেটা তোমাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে, সেই বন্ধনটা আলগা হতে শুরু হবে।

এক রাজার একজন খুব দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার ছিল, তার জ্বালায় রাজা বিরক্ত হয়ে গেছে। সেই কর্মচারীকে রাজা বলে দিলেন, তুমি ওই নদীর ঢেউগুলো গুনতে থাকো; যাতে চুরি না করতে পারে। রাজার আদেশে সে এবার নদীর পারে একটা চেয়ার লাগিয়ে বসে কোন নৌকাকে আর নদীতে ঢুকতে দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না? রাজা আমাকে ঢেউ গুনতে বলেছে, তোমার নৌকা এলে আমার গুনতে গোলমাল হয়ে যাবে। আরে ভাই আমাকে মাল নামাতে হবে। টাকা ছাড়ো, মাল নামাও। ঢেউ গুনতে গিয়ে সেখানেও টাকা আয় করছে। বিরাট লম্বা কাহিনী। কি করে রাজা ও রানীর মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে। শেষে বিরক্ত হয়ে রাজা বললেন, তোমার পদে থেকে তুমি যা চুরি চামারি করছিলে, তুমি সেই পদে থেকে তাই কর, তোমাকে আর এগুলো করতে হবে না।

হিন্দীতে একটা খুব সুন্দর প্রবাদ আছে, চোর চোরিসে যায় হেরাফেরিসে না যায়। একজন জুতো চোর কিভাবে সাধু হয়ে গেছে, তাকে বারণ করা হয়েছে, সে আর চুরি করে না। একবার ওদের আশ্রমে এক ভাণ্ডারা হয়েছে। সেখানে অনেক সাধুরা এসেছে। সেই জুতো চোর থেকে সাধু হওয়া লোকটি সবারই জুতোর এক পাটি নিয়ে আরেকটা জুতোর পাটির সঙ্গে রেখে দিয়েছে। সাধুরা এসে কেউ আর জুতো খুঁজে পায় না, এক পায়ের জুতো পাচ্ছে তো, আর-এক পায়ের জুতো পাচ্ছে না। স্বভাবটা এখনও ছাড়তে পারেনি। সেইজন্য বলছেন চোর চুরি করা ছেড়ে দেয়, কিন্তু উল্টোপাল্টা করে দেওয়ার স্বভাবটা ছাড়তে পারে না।

আমি আপনি সবাই এমন আসক্ত, সংসার থেকে টেনে হিঁচড়ে সব কিছু লুট করে নিতে চাই। গুরু বলে দিয়েছেন, এই নে কৃষ্ণ তোর ইষ্ট, এই নে ঠাকুর তোর ইষ্ট। পরের দিন থেকে ঠাকুরের কাছে হাজির হয়ে গেলাম একটা লম্বা লিস্ট নিয়ে, ঠাকুর আমার ছেলের যেন একটা চাকরি হয়, আমার মেয়ের যেন একটা ভাল পাত্রে বিয়ে দিতে পারি। কর্মের যে বন্ধন, সেখান থেকে আমরা বেরোতে পারব না। উপায় নেই, সেই মানসিকতাই নেই। এবার সে হয়ত কেঁদে কুঁকে বলতে শুরু করল, আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, কিছু একটা করুন।

তখন ভগবান বলছেন, তুমি কাজ কর, তোমার যেটা রোগ সেটাই কর। কাজ করো, কিন্তু তিনটে শর্ত লাগিয়ে দিলেন, কোন স্বার্থ থাকবে না, মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির ভাব থাকবে

না, আর যাবতীয় কাজ ঈশ্বরের পূজা রূপে করো। এভাবে কাজ করলে কি হবে? আচার্য বলছেন, *ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেঃ*, ঈশ্বরের কৃপায় তখন তার জ্ঞান প্রাপ্তি হবে। অনেকে বলেন আচার্য অদ্বৈত বেদান্তী, তিনি ঈশ্বর মানেন না, কত বোকা বোকা কথা। কর্মযোগে আচার্য পরিষ্কার বলছেন, ঈশ্বর কৃপা করেন। কঠোপনিষদেও তাই বলছেন, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ*, আত্মা যাকে বরণ করেন, আত্মা আর ঈশ্বর এক। এইভাবে কাজ করে করে মন যখন একেবারে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেল, ভগবান এবার তাঁকে কৃপা করবেন।

আসল ধর্ম আর নকল ধর্ম। নকল ধর্মকে আমরা ইংরাজীতে বলি religion। আসল ধর্ম মানে spirituality। আগে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক আলাদা ছিল না, আসলে আগে আমরা আধ্যাত্মিক শব্দ বলতাম না, পরে পরে এটা এসেছে, আগে সবটাকে ধর্মই বলা হত। কিন্তু এখন ঠিক ঠিক ধর্ম বলতে একটা বোঝায়, আর চলতি ধর্ম বলতে আর-একটা বোঝায়। চলতি ধর্ম হল, যেখানে আমি পাঁচটা জিনিস দিয়ে ভগবানকে ধরার চেষ্টা করছি। আসল ধর্ম হল, ভগবান যখন নিজে আমাকে ধরে নেন। Spirituality মানে ভগবান যেখানে আপনাকে ধরে নিয়েছেন, এরপর তিনি আপনাকে তাঁর মত চালাচ্ছেন। ধর্ম মানে, ঈশ্বরের সেবা করা, পূজা করা, তীর্থাদিতে যাওয়া, তাঁকে খুশী করার জন্য কর্ম করা, শাস্ত্র পাঠ করা, মন্ত্র জপ করা, ধ্যান করার চেষ্টা করা ইত্যাদি এই সমস্ত কিছুই হল নকল ধর্ম। আসল ধর্ম হয়, এগুলো করে করে মন যখন শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেল, তখন ভগবান আপনাকে ধরবেন, ধরে আপনাকে দিয়েই সব করাবেন। শেষে যা কিছু হয়, তা ঈশ্বরীয় কৃপাতেই হয়, আমার আপনার চেষ্টায় কিছু হয় না। তার আগে পর্যন্ত যা কিছু আছে, কর্মযোগ, সেখান থেকে সমাধিযোগ, সমাধিযোগ মানে মন যেখানে পুরো সমাহিত হয়ে একটা বিন্দুতে চলে এলো। তারপরে আসে ঈশ্বরীয় কৃপা।

এর আগে বলা হয়েছিল, আগাছার মধ্যে আমি যদি বীজ ফেলতে যাই বীজগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে। বেদের কর্মগুলি যদি করা হয়, কর্ম করতে গিয়ে যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তার জন্য পাপ লাগবে; তখন মনে হবে, না করলেই ভাল হত।

এক গ্রামে একটা শিব মন্দির ছিল। একটা ভিল আদিবাসী শিকার করে, সব মাংস নিয়ে শিব মন্দিরে গিয়ে উঠত, আর ওখানে শিবলিঙ্গের উপর পা তুলে ঘুমিয়ে থাকত। সেই মন্দিরেই এক শিবের ভক্ত যেত, সে আবার বেলপাতা, গঙ্গাজল দিয়ে শিবের পূজা করত। একদিন পূজা করতে গিয়ে সেই ভক্তের পা কিভাবে শিবলিঙ্গে ঠেকে যায়। তখন ভগবান শিব খুব রেগে ত্রিশূল দিয়ে ভক্তকে এই মারে কি সেই মারে। ভক্ত অনেক অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগল, 'প্রভু এবারের মত ক্ষমা করুন, আর এই ভুল হবে না, এবার থেকে খুব সাবধান থাকব'। এই রকম কাতর ভাবে প্রার্থনা করাতে শিব তুষ্ট হয়ে বললেন, 'যা, এবারের মত ক্ষমা করে দিলাম'। তখন সেই ভক্ত একটু সাহস করে হাতজোড় করে বলতে লাগল, 'একটু আমার পা লেগে গেল আর তাতেই আপনি আমার প্রতি এত রুষ্ট হয়ে গেলেন? আর ওই ভিলটা রোজ আপনার মাথায় পা রেখে শুয়ে বিড়ি খায়, তার বেলায় আপনি কিছুই করেন না'। 'আরে ওই ব্যাটা তো আমাকে মানেই না, ওকে আমি কি করব। তুই আমাকে মানিস বলে তোকে চমকাচ্ছি'। তাহলে তো না মানাই ভাল। বেদের যজ্ঞ করে, পূজা করে যদি আমার দোষই হয়, তাহলে এই রইল তোমার যজ্ঞ, আমার লাগবে না।

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।৪০।।

(এই মোক্ষমার্গরূপ নিষ্কাম কর্মযোগে কোন প্রকার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় না এবং বৈগুণ্যজনিত প্রত্যবায়ও হয় না। এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।)

অভিক্রম নাশ মানে, ধীরে ধীরে জিনিসটা নাশ হয়ে যায়। যেমন মানুষের শরীর ধীরে ধীরে নাশ হয়। কিংবা আপনার ক্ষেত আছে, ক্ষেতে আপনি বীজ বপন করলেন। কিন্তু ঠিক ভাবে জল দিলেন না, ঠিক ভাবে সার বা সেই বছর খরা বা বন্যা হয়ে গেল, আস্তে আস্তে বীজ হয় শুকিয়ে যাবে নয়তো পচে যাবে। যে কোন সম্পর্কে যদি নিয়মিত জল ঢালা না হয়, সম্পর্কটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবে। মা আর সন্তানের সম্পর্কটাই একমাত্র টিকে থাকে, বাকি যত সম্পর্ক আছে, এমনকি দুই ভাই, তাদেরও সম্পর্ক আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে, যদি তাতে নিয়মিত জল না ঢালা হয়। কিন্তু কর্মযোগে এটা হয় না, কর্মযোগে *অভিক্রম নাশ* হয় না। কর্মযোগ তুমি যতটা করলে, ততটা থেকে যাবে। এরপর যখন আবার আসবে, ওখান থেকে আবার শুরু হবে। জন্মজন্মান্তর ধরে এটা এক ভাবে পড়ে থাকবে। এমন কি এক জন্ম করলে, তারপর চার জন্ম কিছুই করলে না, পঞ্চম জন্মে গিয়ে যদি আবার করতে শুরু করো, ওখানেই ওটা দাঁড়িয়ে থাকবে, শুরু হবে ওখান থেকে, কর্মযোগে কিছু নাশ হয় না।

প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে, বেদে যজ্ঞ করতে গিয়ে যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তাতে পাপ হয়ে যাবে; আবার বলা হয় মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে জপধ্যান না করলে পাপ লাগবে। কর্মযোগে কোন পাপ লাগে না, যতটা করা গেল, ততটা থাকল। যদি বলেন, আমি আর পারছি না, ছেড়ে দিন কোন সমস্যা নেই। কিছু দিন পর ইচ্ছে হল, আবার করতে থাকুন। যতটা ভাল করে এসেছেন, ঠিক সেখান থেকে এবার শুরু হবে।

আমরা এর একটা খুব স্থূল উদাহরণ দিতে পারি। বলা হয় যে, বাচ্চা বয়সে যদি সাইকেল চালানো শেখে, সে নাকি আর কোন দিন ভুলে যায় না। সাঁতার কাটা যদি শিখে নেয়, সেও নাকি জীবনে আর সাঁতার ভোলে না। ঠিক তেমনি কর্মযোগ যদি একবার শিখে নেওয়া যায়, তাহলে কোন দিন আর যাবে না। তিরিশ বছর কেউ আর সাইকেল চালালো না, তারপর যেমনি সাইকেল চালাতে যাবে, একটু টালমাটাল খেয়ে চালাতে থাকবে।

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য, কর্মযোগের একটু যদি অভ্যাস করে, তাতেই *ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*, এই যে সংসার ভয়, এটা নাশ হয়ে যায়। স্বামীজী কর্মযোগের বক্তৃতাগুলিতে নিষ্কাম কর্মকে unselfish বলতেন। স্বামীজী এই কথা খুব বলতেন – Unselfishness is more paying, only people do not have the patience to practice it। নিঃস্বার্থ ভাবে যদি কাজ করা হয়, কর্মযোগ যদি করা হয়, আসক্তি ত্যাগ করে যদি কাজ করে, সব সময় ওর ফল অনেক বেশী হয়। কারণ তখন পুরো দমে কাজ করে কিনা। কিন্তু ফলের আকাঙ্খা নিয়ে যদি কাজ করে, তখন মনের মধ্যে এটা সব সময় জেগে থাকে যে, আমার এতে লাভ হবে কিনা। আমি যদি একটা কাজ করি, আর সেখানে যদি ভাবতে থাকি এই কাজের জন্য লোকেরা আমার প্রশংসা করবে কিনা, লোকেরা কি দারুণ করেছ, বলবে কিনা; মনের একটা ছোট্ট অংশ চলে যায় ওই চিন্তা করতে। কিন্তু যিনি ফলের দিকে না তাকান, তাঁর পুরো মনটাই কাজের প্রতি নিবিষ্ট থাকে, ফলে কাজটাও অনেক ভাল হয়।

আমাদের যখন সমালোচনা করা হয়, তখন এটাই বলা হয়, কি বাচ্চাদের মত কাজ করছ। কারণ বাচ্চারা কাজ করে না, তারা শুধু appreciation চায়, আমি কি দারুণ করলাম। মায়েরা বাড়িতে রান্নাবান্না করছেন, সেখানেও তাঁরা কোন appreciation চান না, কারণ তাঁরা নিজের ভালবাসার জন্য করছেন, সন্তান, স্বামী সবাইকে ভালবাসেন কিনা, প্রাণ ঢেলে রান্নার সব কাজ করেন। গতকালের রান্না আজ থেকে ভাল ছিল, এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা তাঁদের আসে না। কিন্তু যেদিন পার্টি হবে, বাড়িতে অনেক অতিথি আসবে, সেদিন রান্না করতে গিয়ে নার্ভাস লাগে, ভাল করে রান্না করতে হবে, কি জানি খেয়ে কি বলবে, ওই চিন্তাতেই মনের শক্তিটা অনেক ক্ষয় হয়ে যায়, তার মানে পাত্রে একটা ফুটো হয়ে গেল।

চল্লিশ নম্বর শ্লোকে কর্মযোগের ফল কি হয় আগেই বলে দিলেন। কি ফল? কোথাও যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তাতে কোন পাপ হয় না। কর্মযোগের অভ্যাস যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাতে অভিক্রম নাশ হয় না। একটু অভ্যাস যদি করা হয়, তাতেই জীবনে অনেক শান্তি আসে। ওষুধ যদি ঠিক ভাবে সেবন না করা হয়, ফল দেবে না। অনেক সময় ভুল ওষুধ সেবন করলে বিপরীত ফল হবে। কর্মযোগে এসব কিছু হয় না। কর্মযোগ, সেখান থেকে সমাধি যোগ, এটাকে বলছেন, one pointedness। শুধু একটা জিনিসকে নিয়ে আছে, এটাই সমাধি যোগ। একচল্লিশ নম্বর শ্লোকে এটাকে নিয়েই বলছেন –

ব্যবসায়ত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যসায়িনাম্।।৪১।।

(হে অর্জুন, এই নিষ্কাম কর্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ (সকাম বুদ্ধির বহুমুখী ভাবনাশক) হয়। অস্থির চিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী।)

এখানে দুটো শব্দ আনছেন, *ব্যবসায়ি* আর *অব্যবসায়ি*। চল্লিশ নম্বর শ্লোকের শেষাংশে বলছেন, *স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ*। কিসের থেকে আমাদের ভয়? জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে। আমাদের সমস্যা হল, আমরা শুধু এই জন্মটুকুই দেখছি, সেইজন্য আমরা আমাদের সমস্যা বুঝতে পারি না। যারা একটু উন্নত, তারা বুঝতে পারেন, জন্মেছি মরতে হবে, আবার জন্ম হবে, আবার মরতে হবে, এই চক্রটা ঘুরছে তো ঘুরছেই, এটা থেকে আমাকে বেরোতে হবে। তার একটা যে আভাস পাই, সেটা হল শোক আর মোহ। নিত্য আমাদের কষ্ট লেগে আছে, আজকে এই দুঃখ, কাল এটার জন্য মোহ, এর থেকে আমরা একটা আভাস পাই, সব কিছুর মূলে কি রয়েছে – জন্ম-মৃত্যু চক্র। ভগবান বুদ্ধও জন্ম-মৃত্যু চক্রের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। এটা থেকে বেরনোর উপায় বলছেন কর্মযোগ।

কর্মযোগের তিনটে শর্ত বলা হয়েছিল, নিঃসঙ্গ, অনাসক্ত; অনাসক্ত মানে যেখানে নিজের কোন স্বার্থ থাকবে না। আর *দ্বন্দ্বপ্রহারণ*, মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির চিন্তা, সেটাকেও ছেড়ে দেওয়া। শেষে বলছেন, সব কাজ ঈশ্বরের পূজা রূপে করা। এই তিনটে জিনিস যেটা করছেন, এর পিছনে রয়েছে একটা সিদ্ধান্ত, *ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ*। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হল one pointedness। আমার একটাই জিনিস চাই, সেটা হল এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে বেরোন বা এই শোক মোহ থেকে বেরোন। ক্রিমিনালদের মনে একটা জিনিস থাকে –বদলা নেওয়া, আমাকে একে মারতে হবে। বড় বড় যুদ্ধে আর্মি ইউনিটকে বলে দেওয়া হল, go ahead and capture this, ওদের মাথায় এখন একটাই জিনিস, যত লোক মরে মরুক, যত যাই হোক, আমাকে এটাই করতে হবে, I have to capture this এর বাইরে আর কিছু চাই না। যাঁরা নিজেকে যোগী বলেন, যোগী বলতে কিন্তু সবাই, যারা ঠাকুরের মন্ত্রে দীক্ষিত, যারা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন, সবারই উদ্দেশ্য একটাই, এই জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে আমি কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারব –এটাই যোগীর কাছে I have to capture this, এটাই কর্মযোগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি।

এর বিপরীত হল *অব্যবসায়িনাম্*। অব্যবসায়ির বুদ্ধি, বলছেন *বহুশাখা হ্যনন্ত্যশ্চ*, বুদ্ধির অনেকগুলো শাখা বেরিয়ে থাকে। অনেকগুলো শাখা কি রকম? এরা যে কোন কাজ যখন করে, একটা চাকরি করছে, একটা পূজা করছে, তখন তাদের মন লেগে থাকে অনেক কিছুতে –নিজের ভাল চাই, স্ত্রী পুত্রের ভাল চাই, পরের জন্মটা ভাল চাই, ভাল চাই ভাল চাই, এটাও চাই, সেটাও চাই, একটার পর একটা জিনিসে লেগে থাকে। আমরা কি করে বুঝব, একটা লোক সত্যিকারের আধ্যাত্মিক, নাকি জাগতিক? ওর জীবনের লক্ষ্যটা দেখতে হবে। যে বলছে, আমার জীবনের লক্ষ্য

হল টাকা আয় করা, মানছি টাকা আয় করাটা apparently মনে হয় single point devotion to goal। আমরা অনেক সময় বলি, লোকটা এত স্বার্থপর যে, নিজের ক্যারিয়ার ছাড়া আর কিচ্ছু জানে না। যদি তার ক্যারিয়ারটাই সব হয়, তাহলে perfectly alright, you are one pointed। এবার প্রশ্ন আসে, ক্যারিয়ারটা নিয়ে আপনি কি করবেন? টাকা আয় করব। টাকা তো গোল হতে পারে না, টাকাটা নিয়ে আপনি কি করবেন? সঙ্গে সঙ্গে শাখা বেরিয়ে এলো, আমেরিকা যাব, ইউরোপ যাব, ইতালি যাব, তার সাথে ভাল গাড়ি থাকবে, সুন্দর একটা বাড়ি থাকবে, সুন্দরী স্ত্রী থাকবে; বহু শাখা বেরিয়ে এলো। তাই না, যখন কাজ করেন, যাঁরা যোগী তাঁরা তখন ওই একটা কাজই করেন। যোগীদের multi branching, multi tasking দুটোর মধ্যে কোনটাই থাকে না।

একবার আইআইএম, ইন্দোরে একটা ক্লাশ সেসানে একজন মহারাজ ছাত্রদের বোঝাচ্ছিলেন কেন multi tasking করতে নেই। ছাত্ররা তখন বলছে, এর আগে আমাদের এক প্রফেসর ক্লাশে বলে গেলেন ম্যানেজমেন্টে multi tasking কত important। মহারাজ তখন বললেন, হ্যাঁ, তোমরা multi tasking করতে পারে, কিন্তু you will end up being a second grade managers। Multi tasking মানে, এটাও করছি, সেটাও করছি; multi branching মানে, এটার জন্যও করছি, সেটার জন্যও করছি। জীবনে টাকাও চাই, জীবনে নামও চাই, জীবনে নিরাপত্তাও চাই, জীবনে ভাল পার্টনার চাই, ভাল সন্তান চাই। তোমার মন এত কিছু জিনিসের দিকে যাচ্ছে, তার মানেই তুমি সংসারী। দিনের পর দিন একজন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে যাচ্ছে। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করুক, ঠাকুরের কাছে আপনি কি প্রার্থনা করছেন? নিজের ভিতর থেকে কি চাইছেন? যদি দেখা যায়, সে আজকে এটা চাইছে, কাল সেটা চাইছে; তার মানেই সে অবশ্যই সংসারী, সে যোগী কোন ভাবেই নয়। সংসারবৃক্ষকে যদি উপড়ে ফেলতে হয়, তাহলে তাকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিয়ে আসতে হবে। ব্যবসায়ি বুদ্ধি হল, one single goal। তাহলে কি সবাই সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? কখনই না, কারণ যে সংসারে আছে, তারও উদ্দেশ্য হল কর্মযোগ, তারও উদ্দেশ্য হল কিভাবে আমি ঠিক ভাবে কর্মযোগ করব, আমার যে বাড়ি, আমার যে স্ত্রী, আমার যে সন্তান, আমার যে চাকরি, সব কিছুরই উদ্দেশ্য হল একটাই, কিভাবে ধীরে ধীরে আমি নিজেকে মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে; সংসাররূপ যে বন্ধন, এই বন্ধনকে ছিন্ন করার দিকে, এর বাইরে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

ভারতকে নিয়ে বলার সময়, স্বামীজী এই কথা অনেকবার বলছেন, তোমার যে বিবাহ, এই বিবাহ তোমার ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়। যা কিছু তুমি করছ, কোনটাই তোমার সুখের জন্য নয়, এটা তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। আত্মা স্বভাবেই নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত। কোন কারণে এখন সংসারে এসে গেছে। সংসারের যে বিস্তার, তাতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ রয়েছে। তাহলে আত্মা কেন এই সংসারে এসেছে? কোন কারণে তার মধ্যে কাম ভাবের জন্ম হয়েছে, তবেই না এসেছে। যে কাম এসেছে, সেই কামের পুর্তি করে বেরিয়ে যাওয়া, এটাই উদ্দেশ্য। কাম ভোগের মধ্যে যদি জড়িয়ে পড়ে, তাহলে মরবে। যদি না করে, তাতেও মরবে, কারণ কাম পুর্তির জন্যই এখানে আসা।

যদিও এটা খুব স্থূল উদাহরণ, কিন্তু একেবারে সঠিক –কারুর পেটের গণ্ডগোল, স্টেশনে তার টয়লেটে যাওয়ার বেগ এসেছে। স্টেশনের টয়লেট কি রকম হয় সবার জানা, প্রচণ্ড নোংরা, ঢুকলেই গা গুলিয়ে আসে। কিন্তু যতই নোংরা হোক, এখন তাকে সেখানেই কাজ সারতে হবে, অন্য কোন উপায় নেই। টয়লেট সেরে কোন রকমে যত তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে আসা। সেখানে বসে বসে সে সাহিত্য, কবিতা, নৈসর্গিক কোন কিছুর চিন্তা করতে পারবে না। ইতালিয়ান বাথের মত সেখানে বসে আছে তো বসেই আছে, সেটাও হবে না। অন্য দিকে তাকে সেই টয়লেটেই যেতে হবে। সংসারটাও তাই, বিয়ে করতে হবে, সন্তান আনতে হবে, টাকা আয় করতে হবে, বাড়ি করতে হবে, যা কিছু করতে হবে, সবটার উদ্দেশ্য হল, যে ভোগের ইচ্ছাটা এসেছে সেটাকে কোন ভাবে মিটিয়ে যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে আসা। যা কিছুই আমরা করি না কেন, টাকা আয়

করতে হচ্ছে, উদ্দেশ্য জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরোতে হবে। আমার ভিতর কাম-বাসনা আছে, সন্ন্যাসী আমি হতে পারব না, একা একা আমি থাকতে পারব না, আমার সঙ্গ দরকার, খুব ভাল, তুমি বিবাহ কর। কিন্তু সেখানেই শেষ, কারণ উদ্দেশ্য হল, জন্ম-মৃত্যুর চক্র পার করা। আমার খুব ইচ্ছা, দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াব; ঠিক আছে তুমি ঘুরে নাও। উদ্দেশ্য হল, অল্প একটু ভোগ হয়ে গেলে সমস্ত কিছু ত্যাগ করে বেরিয়ে চলে যাওয়া। এটাকে বলছেন ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। বুদ্ধি সব সময় একটাতে লেগে আছে –কি করে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

এর বিপরীত হল অব্যবসায়ি বুদ্ধি। বিজনেস ওয়ার্ল্ডে আমেরিকা আসার পর নানা রকমের বিজনেস মডেল নিয়ে আজ এই কোম্পানী দাঁড় করাচ্ছে, কাল সেই কোম্পানীকে দেউলিয়া করে দিচ্ছে, পরশু সেই কোম্পানীকে খেয়ে নিচ্ছে, কত কি হচ্ছে ভগবানই জানেন। কিসের জন্য করছে, কার জন্য করছে, কদিন পর তুমি মরে যাবে; মাঝখান থেকে কত লোককে তুমি কষ্ট দিলে, লোকগুলো আজ ফেঁসে গেল। এখানে যে শুধু নিজের মুক্তির কথা বলা হচ্ছে তা তো না, আপনার আমার আশেপাশে যারা আছে, তাদেরকেও ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাওয়াটা আপনার কর্তব্য, তাদেরকেও জন্ম-মৃত্যু চক্রের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আপনার যে স্ত্রী বা স্বামী আছে, আপনার যে সন্তান আছে, আপনার যে ভাই বোন আছে, সবাইকে আপনি সেই পথে নিয়ে যাবেন। জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে বেরিয়ে আসার পথটা যাতে তার সহজ হয়, সেই চেষ্টা করুন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী খুব সুন্দর কথা বলতেন। বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারীদের ট্রেনিং সেন্টার উনি ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ব্রহ্মচারীদের বলছেন, একবার একজন মহারাজকে এসে বলল, 'আমাকে কিছু টাকা সাহায্য করুন, আমার মেয়ের বিয়ে দেব'। উনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলাম। মহারাজের এই ভাব –আমি সন্ন্যাসী, আমি বিয়ে করব না, আমার লাগবে না। কিন্তু তোমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া দরকার, এতে তোমারও শান্তি হবে, এই টাকা কটা তুমি নাও, আর ভাল করে মেয়ের বিয়ে দাও। তারপর আবার বলছেন, এক ইয়ং ছেলে একবার মহারাজের কাছে একটা চাকরির জন্য এসেছে, মহারাজ যদি একটা সুপারিশ করে চিঠি লিখে দেন তাহলে তার এই চাকরটি হয়ে যায়। উনি বলছেন, 'আমি সন্ন্যাসি আমার চাকরি লাগবে না, কিন্তু আমার একটা সুপারিশে যদি কারুর চাকরি হয়ে যায় খুব ভাল, এই নাও আমার সুপারিশ'। বলে একটা প্যাডে লিখে দিলেন, I will be very happy, if he gets this job।

অন্যস্য পুর্তিবিধান, অন্যদের মনে যে কামনা-বাসনা আছে, সেগুলোর পুর্তির জন্য তাদের সাহায্য করুন, যাতে তার মন থেকে যদি ওই খিচখিচানি বেরিয়ে যায়, সেখান থেকে সে যদি আবার মুক্তির পথে এগোতে শুরু করে। শুধু আপনি মুক্তির দিকে যাবেন না, আপনার আশেপাশে যারা আছে, তাদেরও মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। আমাদের এখানে এখন হয়েছে, big fish eat small fish, আমি খাবো, যা বাঁচবে সেটাকে মাটিতে ফেলে দেব, অন্য কেউ যেন না পায়, ভারতে আগে কখন এই মনোভাব ছিল না। এই কামনাগুলো এমন বিস্তার লাভ করে যে, যার ফলে মানুষের বুদ্ধিটাও চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। বুদ্ধি ছড়িয়ে গিয়ে অব্যবসায়ি হয়ে যায়। আমরা প্রথমের দিকে যখন গীতার আলোচনা শুরু করেছিলাম, তাতে বলা হয়েছিল – কর্ম, কর্মযোগ ও তার ফল। আর সেখান থেকে হয় sacred religious duties, যা কিনা হিন্দুদের জন্য way।

এর পরের তিন চারটে শ্লোক ভগবান বেদকে নিয়ে বলছেন। বেদের উপর খুব সংক্ষেপে বলা যাবে না, তাও মোটামুটি সংক্ষেপে একটু বলে নিতে হচ্ছে। কর্ম বলতে বোঝায় বেদের কর্ম। ইদানিং কালে সাংসারিক কর্ম আর পূজা আমাদের মধ্যে কোথাও একটা তফাৎ হয়ে গেছে। আমরা মনে করি পূজা আলাদা জিনিস আর সংসারের কাজকর্ম গুলি আলাদা জিনিস। এই সমস্যা এসেছে খ্রীশ্চান ধর্ম থেকে। খ্রীশ্চানিটি হল সমস্ত সমস্যার মূলে। খ্রীশ্চান ধর্মের কাছে কিছু জিনিস হল ঈশ্বরীয়

কাজ, কিছু জিনিস হল জাগতিক কাজ। আর ওদের eternal problem হল কার্টিশান ডিভাইড। একটা গ্রাফে এটা এক্স এক্সিস আর এটা ওয়াই এক্সিস, ওয়াই এক্সিস হল গড্ আর এক্স এক্সিস হল জগৎ, এটা সেকুলার, ওটা সেক্রেড; একা খ্রীশ্চান ফিলজফি কিভাবে পুরো সংসারকে damage করেছে কল্পনা করা যায় না। হিন্দু ধর্মে সেকুলার বলে কিছু হয় না, সাংসারিক কাজ, জাগতিক কাজ বলে কিছু হয় না, সমস্ত কাজ বেদের নির্দেশে হয়ে থাকে। বাচ্চার জন্ম থেকে তার পড়াশোনা, তার বিবাহ, তার সন্তান হওয়া সব কিছু বেদ থেকে হয়। বেদকে যে মানবে না, সে হিন্দু না; সে নাস্তিক হোক, কম্যুনিস্ট হোক, যাই হোক, অন্তত হিন্দু না। কিন্তু একজন আছেন, যিনি বেদকে মানেন না, তিনি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী বেদকে পার করে যান। কেন বেদকে পার করে যান, এটাই আমরা এবার আলোচনা করব।

এখন আলোচ্য হল দুটো –বেদ আর বেদের পারে। যারা বেদকে অগ্রাহ্য করে, বেদের কথা ধরে না, এনাদের কাছে এরা হল চণ্ডাল। তখনও এনাদের কাছে 'চণ্ডাল' শব্দ আসেনি। আচার্য শঙ্করের সময় তখনও মুসলমানরা ভারতে প্রবেশ করেনি, তখন ওনারা এটা জানতেন না। ওনারা বলতেন এরা বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে। তার মানে তুমি কিছুই না। পরে তন্ত্রের প্রচলন ও মহানির্বাণ তন্ত্র আদি আসার পর ওনারা আলাদা একটা জাতি করে দিলেন, তার নাম হল 'সামান্য'। সামান্য হল, যারা কোন কিছু মানে না, এরা কিছুই না। হিন্দু বাবা-মার কাছে জন্ম নিয়েছ, পাসপোর্টে ধর্মের জায়গায় লেখা আছে হিন্দু, এর বেশী কিছু না। বিদেশে গিয়ে বিদেশী হয়ে যায়, হরিদ্বারে গিয়ে হিন্দু হয়ে যায়, এরা কিছুই না। একজন হিন্দুকে তখনই হিন্দু বলা হবে, যখন সে বেদকে মানে, এবং বেদের সব কাজকে সে মানে। বেদ ঠিক সেভাবে মুক্তির দিকে নিয়ে যান না, কিন্তু বেদ সমস্ত কাজকে ঈশ্বরীয় ভাবে নেন। খ্রীশ্চানদের আছে, দৈনন্দিন সব কাজে আধ্যাত্মিকতা। হিন্দুদের spiritualizing in everydays action হয় না, হিন্দুদের সমস্ত actionই হচ্ছে spiritual। হিন্দুরা জানেই না, বেদের বাইরে কোন কাজ হতে পারে, কারণ বেদ সমস্ত কিছুকে ঘিরে রেখেছেন।

বেদ কিভাবে ঘিরে রাখে? একটা হল সেই শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা, যেটা দেশ, কাল, বস্তু, মনের পারে। এর বাইরে হল জগৎ; জগৎ দেশ, কাল, বস্তু, মনের ভিতরে। এই যে দেশ, কাল, মন, যেখানে world of mind and reality of Atman এই যে দুটো সত্য, এর মধ্যে মন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এনারা বলছেন, মনকে সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের অবস্থা দিয়ে বর্ণনা করা যায়। যেমন বলছেন, মন যখন রজোগুণে তখন মন সক্রিয়, মন যখন তমোগুণে তখন মন নিস্তেজ, আর যখন সত্ত্বগুণে মন তখন শান্ত। রজো তমসের বিপরীত; রজো সপ্রভ এবং তমস হল নিষ্প্রভ। সত্ত্ব হল শান্ত, স্নিগ্ধ।

বেদ ঠিক ঠিক মনের জগতেই ঘুর ঘুর করে, মনের জগতের বাইরে যায় না। তার অর্থ দাঁড়ায়, বেদের মধ্যে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণের মধ্যেই ঘুর ঘুর করছে। মনের সাম্রাজ্য বেদের মধ্যে ঘুর ঘুর করছে। কিভাবে? বেদ বলবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি টাকা পাবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি অনেক পশু পাবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি সন্তান পাবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি বৃষ্টি পাবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি তোমার শত্রুকে দমন করতে পারবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি স্বর্গ পাবে, এই যজ্ঞ করলে তুমি ব্রহ্মলোক পাবে, যজ্ঞ কর এটা পাও, যজ্ঞ কর সেটা পাও। যেখানেই কার্য কারণের সম্পর্ক সেটাই হয়ে গেল মনের সাম্রাজ্য। মনের সাম্রাজ্য মানেই, তিনটে গুণের মধ্যে বাঁধা। তার সাথে, বেদের ব্রাহ্মণরা, যাঁরা যজ্ঞাদি করাতেন, বেদকে আধার করে বিভিন্ন যে বিধান দিতেন, এই ব্রাহ্মণরা মনে করতেন, আমাদের মত আর কেউ না। ব্রাহ্মণরা বলবে, তুমি জীবনে টাকা চাও? এই নাও বেদ তোমাকে এই যজ্ঞের বিধান দিয়েছে। সন্তান চাও, এই নাও এই যজ্ঞ কর। অখণ্ড সাম্রাজ্য চাও, এই নাও, তোমার জন্য এই যজ্ঞ রাখা আছে, নিয়ে এলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ। তুমি স্বর্গে যেতে চাও, আমরা তোমাকে সব দেব। সেটাই পরের মন্ত্রে ভগবান বলছেন –

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।।৪২।।

(হে পার্থ, অবিবেকী পুরুষরা বেদোক্ত কর্মের প্রশংসায় অনুরক্ত। স্বর্গাদিফলজনক কর্ম ছাড়া অন্য কিছুই নাই, এটাই তাঁদের বিশ্বাস।)

বেদের যারা পণ্ডিত, যাঁরা বেদের যজ্ঞ করেন, তাঁরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেন, এটা পাওয়া যাবে, সেটা পাওয়া যাবে। ইদানিং একটা নূতন শব্দ এসেছে, spiritual tourism, আজ কোথায় যাচ্ছেন? অমুক জায়গায় যাচ্ছি। ওখানে গেলে কি হয়? আরে, যা প্রার্থনা করা যায় তাই পাওয়া যায়। আজকে তিরুপতী যাচ্ছে, আগামীকাল সিরিডি যাচ্ছে, পরশু হরিদ্বার যাচ্ছে। আর ওখানকার পাণ্ডারা এজেন্টদের মত বলতে থাকবে। আর বাবাজীরা আছে, শুধু একবার দাঁড়ালেই হল, বোল বাচ্চা কেয়া চাহিয়ে, সব মিলেগা। সব মিলেগা তো বুঝলাম, তাহলে আপনি এখানে কষ্ট করে খালি গায়ে কেন বসে আছেন, একটু ভাল করে থাকুন। যত রকমের চালবাজি, ধাপ্পাবাজি; পুরো ধর্মটাকে একটা রিলিজিয়াস মাফিয়াদের গ্যাং চালাচ্ছে। এটাই এখানে ভগবান বলছেন, বেদ এই রকম মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। এই অবিবেকীরা, যারা ভোগের মধ্যে পড়ে আছে, সব সময় শুধু এটা চাই সেটা চাই করে যাচ্ছে; বেদ কিন্তু সেটাই তোমাকে দিচ্ছে। বেদের প্রার্থনাগুলিতে ঘুরে ফিরে সেই এক জিনিস, প্রভু আমার খুব কষ্ট, কষ্ট দূর করে দাও। প্রভু আমার এই নেই, সেই নেই; ব্যবস্থা করে দাও। সবাই এর মধ্যে ঘুর ঘুর করছে।

কিন্তু বেদান্ত আমাদের বেদের বাইরে নিয়ে চলে যান। তবে সাধারণ মানুষ বেদ থেকে বেরোতে পারে না। আজকের দিনের সমাজের দিকে তাকিয়ে যদি বলতে হয়, আমরা দেখছি আজকের সমাজের বেশীর ভাগ লোক ধর্ম জানে না, ধর্মের ব্যাপারের তাদের কোন আগ্রহ নেই। দ্বিতীয়তঃ, যারা ধর্মকে মানে, কিন্তু তারা ধর্মকে কামধেনুর মত মনে করে, নিজের ইচ্ছে মত দুয়ে নাও, যা পাওয়া যায়। একদিকে রয়েছে সেই সব ভক্তকুল, যারা ঠাকুরের সামনে হাতজোড় করে বলে যাচ্ছে, ঠাকুর এটা দাও, সেটা দাও। অন্য দিকে আছে সেইসব ভক্তের দল, ঠাকুরের গল্পে আছে, সোনার ব্যবসা করে, কয়েকজন খদ্দের সেখানে এসেছে, তাদের দেখে একজন বলছে কেশব কেশব, এরা কারা; আর-একজন বলছে গোপাল গোপাল, এরা সব গরুর পাল, একেবারে বোকা। আর-একজন বলছে, হরি হরি, তাহলে কি একে হরণ করা যাবে? সাথে সাথে আর-একজন বলছে হর হর, সব হরণ কর। চারিদিকে বাবাজিরা বসে আছে, ভক্তরা সব আসবে, আর বলবে, কেশব কেশব, তার চ্যালা বলছে, গোপাল গোপাল, এ বোকা কিন্তু মালদার ভক্ত। তাহলে হরি হরি। হর হর, সব ট্যাঁক ফাঁকা করে দাও।

এক অপরের জন্য সব কামধেনু। ভক্ত মনে করছে, এই বাবাজির আশীর্বাদ নিয়ে আমি দুনিয়াকে দুয়ে নেব; আর বাবাজী দেখছে, এক মালদার ভক্ত এসেছে, একে ভাল করে দুয়ে নেব। এর মধ্যে যে বেশী চালু সে বেশী দুয়ে নিচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ভক্তকে আমরা ধনী হতে দেখিনি, সাধুবাবাদেরই বড় হতে দেখেছি। সাধুবাবাদের বুদ্ধি অনেক ভাল, হিন্দীতে প্রবাদ আছে, ভকৎ জগৎ কো ঠকৎ হ্যায়, ভকৎ ঠকই সো সন্ত; ভক্ত জগৎকে বোকা বানায়, আর ভক্তকে যে বোকা বানাতে পারে সেই হল সন্ত। এখানে এটাই বলছে, বেদ ঠিক এটাই করছে। তুমি নিজে খেটে যেটা করতে পারবে, সেটাই তুমি বেদে গিয়ে শর্টকাটে করতে চাইছ। তুমি যদি ঠিক ঠিক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে চাও, তুমি যদি যোগী হতে চাও, যদি তুমি জন্ম-মৃত্যুর চক্রের বাইরে যেতে চাও, এগুলো বন্ধ কর।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং, বেদ মিষ্টি মিষ্টি করে বলে যাবে, আমি তোমাকে এটা করে দেব, সেটা করে দেব। আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি দীক্ষা দেওয়ার আগে প্রথমেই দীক্ষার্থিদের বলে দিতেন, 'দেখ বাপু আমি তোমাদের দীক্ষা দিলাম, এরপর এসে আমাকে বলো না যে, নরেন্দ্রপুরে আমার ছেলেকে এ্যডমিশান করিয়ে দেবেন, আর সেবাপ্রতিষ্ঠানে একটা বেড পাইয়ে দেবেন, আমার দ্বারা এগুলো হবে না'।

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্চর্যগতিং প্রতি।।৪৩।।

(এনারা সবাই কামনাযুক্ত ও স্বর্গকামী। তাঁরা জন্মরূপ কর্মফলপ্রদানকারী এবং ভোগপ্রাপ্তি ও ঐশ্বর্যলাভের উপযোগী বহু ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করে থাকেন।)

বেদের উদ্দেশ্য হল স্বর্গ, সাধারণ স্বর্গ থেকে শুরু করে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। *কামাত্মানঃ স্বর্গপরা*, যাদের মন কামনা-বাসনায় গিজগিজ করছে। *কামাত্মা*, আত্মা অনেক প্রকার হয়, অবিনাশী আত্মা, দেহাত্মা, তার সঙ্গে বলছেন কামাত্মা, যার চেতনা পুরোপুরি কামের মধ্যে ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে, ভোগ ছাড়া আর আমি কিছু চাই না। বলছেন, ভোগ কামনা এটা তার স্বভাব, ভোগ ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না। এই সংসার কিসের জন্য? ভোগের জন্য। মৃত্যুর পর আমি যেন স্বর্গে যেতে পারি। কেন স্বর্গে যাবে? সেখানে আরও ভোগ করতে পারব। ওখান থেকে যখন নেমে আসব, তখন এই শরীর দিয়ে ভোগ করব। কখন স্থূল শরীর দিয়ে ভোগ, কখন সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে ভোগ। ভোগ ছাড়া আর কিছু বোঝে না। বলছেন, এরা কোন দিন যোগী হতে পারে না, কারণ এদের বুদ্ধি অব্যবসায়ি বুদ্ধি। এদের বুদ্ধি বহুশাখা, অনেক দিকে ছড়িয়ে গেছে। আর যাই হোক, যোগী এরা হতে পারবে না।

এই ধরণের কাজ যারা করে, বলছেন, *জন্মকর্মফলপ্রদাম্*, এই কাজগুলিই কর্মের ফল রূপে একটা পর একটা জন্ম দিতে থাকে, এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্র চলতে থাকবে। জন্ম নিল, কর্ম করল, সেই কর্মের আবার ফল হবে, সেই ফলের জন্য আবার একটা জন্ম নেবে। আর বলছেন *ক্রিয়াবিশেষবহুলাং*, অব্যবসায়ি বুদ্ধির জন্য নানা রকমের ক্রিয়া করে যাচ্ছে, এটাও করছে, সেটাও করছে। কিন্তু যিনি যোগী, তিনি একটা জিনিস নিয়েই থাকেন, তার উদ্দেশ্য একটাই, আমাকে জন্ম-মৃত্যুর পারে যেতে হবে। মহাভারতে খুব সুন্দর একটা গল্প আছে। মহাভারত যুদ্ধের সময় শল্য কর্ণের সারথি ছিলেন। শল্য নানা ভাবে কর্ণকে তাঁতিয়ে যাচ্ছেন।

সেই সময় শল্য একটা গল্প বলেন। একটা হাঁস আর একটা কাকের গল্প। একটা কাক সমুদ্রের ধারে থাকত। ওখানে শেঠজীরা কাককে খাওয়া দিত আর কাকটাও নানা রকমের খেলা দেখাত। তাতে শেঠেরা আরও কিছু খাবার ছুড়ে দিত। একদিন ওখানে একটা হাঁস এসেছে। হাঁসের রাজকীয় ওড়া দেখে কাক বলছে 'আমি একশ রকমের উড়তে জানি, তুমি কিছুই না আমার সামনে'। হাঁস বলছেন, 'ঠিকই বলছ, আমি সত্যিই একটা ওড়াই জানি, সোজা ওড়া ছাড়া আমি আর কিছু জানি না'। কাক বলছেন, 'তুমি স্বীকার করো, তুমি আমার কাছে কিছুই না। এসো আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হোক, কে কত রকম উড়তে জানে'। 'ঠিক আছে, চলো, ওড়া যাক'।

সমুদ্রের উপর উড়তে শুরু করেছে, হাঁস একেবারে সোজা সরল রেখায় উড়ে যাচ্ছে, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, এক ভাবে সোজা উড়ে যাচ্ছে। আর কাক অনেক রকম কায়দা দেখাচ্ছে। কত দূর আর কায়দা দেখাবে, সমুদ্রে গিয়ে কায়দা দেখাতে দেখাতে কাকের দম ফুরিয়ে এসেছে, শক্তিটাও কমে আসছে। এবার সে নীচের দিকে পড়তে শুরু করেছে। সমুদ্রের জলের কাছে চলে এসেছে, প্রায় ডুবে যাচ্ছে, জলটা একটু ছুঁয়ে আবার ওড়ার চেষ্টা করছে। উপর থেকে হাঁস বলছে,

'আরে ভাই তুমি তো একশ রকমের ওড়ার কথা বলেছিলে, এটা তো বলোনি যে এটাও একটা ওড়ার কায়দা'। হাঁস সত্যিকারের ভাবছে, এটাও একটা ওড়ার কৌশল, নেমে জল খাবে আবার উঠে আসবে। কাক তো বুঝতে পারছে তার দম শেষ হয়ে এসেছে, এবার সমুদ্রে ডুবে শেষ হয়ে যাবে।

সে কোন রকমে হাঁসকে বলছে, ভাই অপরের এঁটো খেয়ে খেয়ে আমার বুদ্ধিটা ভোঁতা হয়ে গেছে। আমি মরে যাচ্ছি, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, তুমি আমাকে বাঁচাও। হাঁস খুব সরল মনের। সে নিজের ডানা দিয়ে কাকটাকে ধরে উপরের দিকে ছুড়ে দিয়েছে, তারপর কায়দা করে কাকের নীচে এসে ওর পিঠে বসিয়ে নিল। তারপর তাকে সমুদ্রের পারে নিয়ে এসে নামিয়ে দিল। সেদিন থেকে কাক বাতেলা মারা বন্ধ করে দিল। ব্যবসায়ি বুদ্ধি আর অব্যবসায়ি বুদ্ধি, one pointed এবং multi branchএর মধ্যে এই হচ্ছে তফাৎ। এদের মন শুধু *ভোগৈশ্চর্যপ্রসক্তনাং*, মন সর্বদা ভোগৈশ্চর্যের দিকে ছুটছে। ইহজগতে, এখানে আমার ভোগ চাই আর ঐশ্বর্য চাই। ফলে এদের মন ঘুরতে থাকে।

সমাধৌ ন বিধীয়তে, সমাধি মানে মন। আমরা সাধারণ ভাবে সমাধি মানে জানি সমাহিত করা, আর তার সাথে যেখানে সমাহিত করা হয়, সেটাকেও সমাধি বলেন। যাদের মন ভোগ আর ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবে আছে, আর এটার প্রতি যাদের প্রেম আছে, তাদের বিবেক বুদ্ধি, অর্থাৎ কোনটা করা উচিৎ, কোনটা করা উচিৎ নয়, এই বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে এদের মন সাংখ্য আর যোগে সমাহিত হয় না। সাংখ্য মানে, thorough theoretical knowledge of God or of Atman, এই যে আমরা প্রায়ই বলে থাকি, শাস্ত্রের কথা তো শুনছি, কিন্তু মনে থাকছে না। কেন মনে থাকে না? কারণ আমাদের মন ভোগে ডুবে আছে। ভক্তরা বলে, জপ করতে মন বসে না। কি করে জপ হবে? মন তো ভোগে ডুবে আছে। আচ্ছা এত বছর ধরে জপধ্যান করে যাচ্ছি, কিন্তু কিছুই তো হচ্ছে না। হবে কি করে, মন তো ভোগে ডুবে আছে। মনে মনে আপনি ভোগ করছেন, ভোগ ছাড়া কিছু বোঝেননি, one pointedness বুদ্ধি কি করে হবে!

বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ বুদ্ধি বহু শাখাযুক্ত হয়ে আছে, এটাই অব্যবসায়ি বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হবে না। যখন কবিতা পড়ছেন তখনও মনে মনে ভোগ করছেন, যখন কোন বই পড়ছেন, উপন্যাস পড়ছেন, সিনেমা দেখছেন সেখানেও ভোগ করছেন। ঠাকুরের কাছে যাচ্ছেন, সেখানেও ভোগ চাইছেন, স্বর্গের কামনা করছেন। আর শাস্ত্রের কথা শোনার সময় বলবেন, কিছু বুঝতে পারছি না। বুঝবেন কি করে, পাত্রতা নেই, যা অল্প একটু আছে সেটা ভোগে চলে গেছে। সমস্ত কিছু ভোগের মধ্যে ডুবে আছে, ফলে বুদ্ধির পাত্রতটা পুরো নষ্ট হয়ে যায়। বুদ্ধি স্থির হয় না, যোগ ও সাংখ্য দুটোর কোনটাই সে পায় না। ঠাকুর বলছেন, বিষয়ীদের কাছে ঈশ্বরীয় কথা বলতে যাই, ওরা শুনতে চায় না। বলছেন, এই ধরণের মানুষদের মধ্যে বিবেক বুদ্ধি হয় না, সেইজন্য অর্জুন তোমাকে বলছি, তুমি –

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।।৪৫।।

(হে অর্জুন, বেদের কর্মকাণ্ড কামনামূলক ও সংসারপ্রকাশক। তুমি নিষ্কাম হও এবং ঈশ্বরার্থ কর্ম কর। তুমি সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত ও সদা সত্ত্বগুণাশ্রিত হও এবং যোগ (অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি) এবং ক্ষেমের (প্রাপ্তের রক্ষণের) আকাঙ্ক্ষারহিত ও অপ্রমত্ত হও।)

যুদ্ধ ভূমিতে ভগবান অর্জুনকে বোঝাচ্ছেন, অর্জুন তুমি এই ভুলটা করো না, তুমি এই মিষ্টি মিষ্টি কথাতে, যা কিনা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘোরাতে থাকবে, ভুলেও ওর মধ্যে ফেঁসে যেয়ো না। তুমি ওখান থেকে বেরিয়ে এসো। কিভাবে? যে কোন জিনিস যা সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের

মধ্যে ঘুর ঘুর করছে, যেটা মনের এলাকা, সেখান থেকে তুমি বেরিয়ে এসো। সন্ন্যাসী তিন গুণের পারে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কারণ তাঁরা জানেন আত্মজ্ঞান তিন গুণের পার, ঈশ্বর দর্শন তিন গুণের পার। মনের জগৎ তিন গুণের মধ্যে।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা, বেদ এই তিনটে গুণের মধ্যে, অর্থাৎ মনের এলাকার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। *নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন*, হে অর্জুন, এই তিন গুণের এলাকা থেকে বেরিয়ে চলে এসে ত্রিগুণাতীত হও। *নির্দ্বন্দ্বো*, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত হও। *নিত্যসত্ত্বস্থো*, তোমার মন সর্বদা যেন শুদ্ধ পবিত্র থাকে, কখন রজোগুণে বা তমোগুণের দিকে, অর্থাৎ অপবিত্রতার দিকে তোমার মন না যায়। তার সাথে বলছেন, *নির্যোগক্ষেম আত্মবান্*, যোগ আর ক্ষেম এই দুটো শব্দ আমাদের শাস্ত্রে প্রায়ই উচ্চারিত হয়। যোগ মানে, একটা জিনিস আমার কাছে নেই, সেটা পাওয়ার চেষ্টা করাটা যোগ, আর যেটা আছে সেটাকে নিজের কাছে ধরে রাখা, এটাকে বলে ক্ষেম। পরে ভগবান বলবেন, *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্*, এলআইসির লোগোতে এটা লেখা থাকে। যোগ মানে, যেটা নেই সেটা পাইয়ে দেবে, ক্ষেম মানে যেটা আছে, সেটাকে ধরে রাখবে। কিন্তু এখানে অর্জুনকে ভগবান বলছেন, *নির্যোগক্ষেম্*, যোগ আর ক্ষেম এই দুটো থেকেই তুমি বেরিয়ে এসো। কোন কিছু পাওয়ার চেষ্টা করবে না, যেটা আছে সেটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করবে না। *আত্মবান্*, তোমার মন যেন সব সময় আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমাদের জন্য সহজ ভাবে বলতে গেলে এটাই বলা যায় –যে কোন ভোগ থেকে বেরিয়ে এসো, এবং যোগে প্রতিষ্ঠিত হও। এরপর বেদ ও আত্মজ্ঞান এই দুটোকে তুলনা করে বলছেন –

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।।৪৬।।

(সব জায়গা জলপ্লাবিত হলে যেমন কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্নানপানাদিরূপ প্রয়োজনসমূহ প্লাবনের জলরাশিতে সিদ্ধ হয়, সেরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের (পূর্ণোদকস্থানীয়) ব্রহ্মানন্দরূপ যে ফল তাতে (ক্ষুদ্র জলাশয়স্থানীয়) বেদোক্ত সকল কাম্য কর্মের ফল অন্তর্ভুক্ত হয়।)

গ্রাম দেশে ঘরে ঘরে অনেক ধরণের জল থাকে, কোনটা খাওয়ার জল, কোন জল স্নানের জন্য, কোন জল রান্নার জন্য, বাসন মাজার জল, কাপড় কাচার জল, পূজার জল। ইদানিং কালে এখনও বলে, এটা বাথরুমের জল, এটা ফিল্টারের জল, এটা মুখ ধোয়ার জল। কিন্তু কোন কারণে চারিদিকে যদি শুধু জল আর জল হয়ে যায়, তখন কিসের জন্য আর কি ভাবে আলাদা করে জল রাখবে। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে প্রথমের দিকে খুব বাজে জল ছিল। সেইজন্য তখন জলের বিভিন্ন নাম ছিল, এটা বাগানের জল, এটা স্নানের জল, এটা খাওয়ার জল। এখন বেলুড় মঠ থেকে লাইন টেনে নেওয়ার পর ভাল জল আসছে। এখন তাই আলাদা করে কোন জলের ব্যবস্থা নেই। যে জল খাচ্ছি, সেই জল দিয়েই স্নান করছি, সেই জলেই মুখ ধোওয়া হয়, ওই জলই বাগানে যাচ্ছে, সব এক জল।

আত্মজ্ঞান এই জলের মত। আত্মজ্ঞান সব কিছুকে বন্যার মত ভাসিয়ে দেয়। আত্মজ্ঞান যাঁর হয়ে গেল, যেমন ঠাকুর সেই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত, এরপর ঠাকুর এটাকে খুব সহজ ভাবে দেখাচ্ছেন, আত্মজ্ঞানের পরেও তিনি সব কিছুর জন্য মা কালীর কাছেই যাচ্ছেন। হাত ভেঙে গেছে, মা কালী; নরেন কালী মানছে না, মা কালী; মনে সংশয়, মা কালী; কে এখানকার মত উল্টে দিচ্ছে, তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে, মা কালী। বেদ এটা করবে না, বেদ বলবে, বৃষ্টি চাই এই যজ্ঞ কর, সন্তান চাই এই যজ্ঞ কর, সব কিছুর জন্য আলাদা আলাদা যজ্ঞের ব্যবস্থা। এত আলাদা আলাদা কেন তুমি রাখবে, একটাই রাখো। একটা কি? আত্মজ্ঞানের দিকে যদি চলে যাও, ওই একটাই তোমার সমস্ত কামনা পুর্তি করে দেবে।

এখন পর পর যে সাতটি শ্লোক ভগবান বলবেন পুরোপুরি কর্মযোগের উপর বলছেন, আমরা এই সাতটি শ্লোককে নিয়ে এবার আলোচনা করতে যাচ্ছি। ভগবান এই আলোচনটাই আবার তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারে নিয়ে আসবেন। স্বামীজীর বিখ্যাত বই কর্মযোগ, এই সাতটি শ্লোক ও তৃতীয় অধ্যায়কে আধার করেই বলেছেন। স্বামীজীর কর্মযোগ সবারই একবার অন্তত পড়া উচিৎ। একটা ছোট্ট ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে। একবার এক ভদ্রলোক, উনি রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্তও নন, তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। একটা সময় তিনি প্রচণ্ড খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, চারিদিকে প্রচুর সমস্যাতে তিনি জড়িয়ে গেছেন। যাই হোক কোন ভাবে তাঁর কাছে স্বামীজীর কর্মযোগ বইটা ছিল। পরে তিনি বন্ধুদের কাছে বলেছিলেন, আমার জীবনে ওই প্রচুর সমস্যার মধ্যে, ওই কষ্টের সময় স্বামীজীর এই বইটাই আমাকে ধরে রেখেছিল। ভদ্রলোক স্বামীজীকে পছন্দ করেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত নন। স্বামীজীর বইগুলির এটাই বৈশিষ্ট্য, একটা শক্তি দেয়।

বেয়াল্লিশ আর তেতাল্লিশ নম্বর শ্লোকে ভগবান বললেন, বেদের কর্মগুলির উদ্দেশ্য হল মানুষকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া বা একটা শুভ জন্ম দেওয়া। উপনিষদের যে সিদ্ধান্ত, বা গীতার যে সিদ্ধান্ত বা ভগবান বুদ্ধের যে সিদ্ধান্ত, এই ভাবকে ছাড়িয়ে যায়। পুনর্জন্ম, স্বর্গপ্রাপ্তি, এগুলো ধর্মের শেষ কথা না, ধর্মের শেষ কথা মুক্তি, ধর্মের শেষ কথা আত্মজ্ঞান। এরও আগের কয়েকটা শ্লোকে ভগবান বলছেন, বেদই হিন্দুদের ঠিক ঠিক ধর্মশাস্ত্র, কিন্তু বেদ সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণে বাঁধা। এর আগে আমরা এর উপর বিস্তারে আলোচনা করে নিয়েছি। সেখান থেকে ভগবান এবার আসল জায়গায় অর্জুনকে নিয়ে যাচ্ছেন।

মানবের জীবনের পথ হল তপস্যা, সবাইকে তপস্যা করতে হয়। মহাবীর জৈন, ভগবান বুদ্ধ, তুলসীদাস এনারা সবাই তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা হল একটা জায়গায় শান্ত হয়ে বসে মনকে কোন কিছুতে স্থির করা। পরিচিত অপরিচিত ভক্তরা প্রায়ই মহারাজদের কাছে এসে বলেন, মহারাজ, আমাকে একটু ধ্যান করা শেখান, একটু বলে দিন ধ্যান কিভাবে করব। সোশ্যাল মিডিয়াতে, টিভি চ্যানেলে আজকাল কত বড় বড় বাবাজীরা ধ্যান শেখাচ্ছেন, এভাবে বসবে, এভাবে নিঃশ্বাস নেবে, দিনে একবার অন্তত পনের মিনিট স্থির হয়ে বসে মনকে একাগ্র করবে। আমরাও ধরে নিই, দিনে পনের মিনিট ধ্যান করলাম, জপ করলাম, তাতে আমাদের আত্মোন্নতি হয়ে যাবে। কিন্তু এভাবে কখনই কিছু হয় না। ধর্ম পথে ঠিক ঠিক যে এগোতে চাইছে, ওই পনের মিনিট কিছু না, ধর্ম পথে এগোতে হলে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিতে হবে।

কিন্তু ঠাকুর তো বলছেন, কিছু যদি না করতে পার, সকাল সন্ধ্যা বড় করে দুটো প্রমাণ করবে। ঠাকুর কেন এই কথা বলছেন? যখন কিছুই করতে চাইছে না, তখন তাকে দিয়ে একটু কিছু করিয়ে নেওয়ার জন্য এই কথা বলছেন। ধর্মের নামে কখন কেউ উপোস করতে চাইবে না, বিয়ের সময় জোর করে তাকে উপোস করিয়ে নেয়। উদ্দেশ্য একটাই, একটু কিছু তো করো, কোথাও তোমার শুরু তো করতে হবে। তপস্যা করুন, সাধন-ভজন যাই করুন, যতক্ষণ না কেউ চব্বিশ ঘন্টা সময় দিতে পারছে, মন যদি তাতে পুরোপুরি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত না থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্ম পথে এগোতে পারবে না। কেউ যদি মনে করে সন্ধ্যেবেলা বা সকালবেলায় আমি একটু জপধ্যান করব আর তাতেই আমার হবে, এটা ভুল ধারণা। ধর্ম পথে চলার জন্য প্রস্তুতি লাগে, চব্বিশ ঘন্টা যে মন ওই এক ভাবে থাকছে, তাতেই প্রস্তুতি হয়।

আর মনের জন্য যে প্রস্তুতি, তার জন্য দরকার কর্মযোগ, আচার্য এটাকে বলছেন, বহিরঙ্গ সাধন। প্রথমের দিকে স্থূল কাজগুলি বেশি বেশি করতে হয়। ঠাকুর যেমন বলছেন, যে তীর চালানো শেখে, প্রথমে সে কলাগাছ বিঁধতে শেখে, সেখান থেকে অভ্যাস করে করে উড়ন্ত পাখীকে তীর

মারে। প্রথম দিন তীর হাতে নিয়ে কেউ উড়ন্ত পাখী মারতে পারবে না। তার আগে অনেক অভ্যাস চাই। ধ্যান করা মানে উড়ন্ত পাখিকে মারা, সেইজন্য প্রথম দিন থেকেই ধ্যান করা যায় না, তার জন্য প্রস্তুতি দরকার।

এনারা বলছেন, তপস্যা করে যেটা হয়, সাধন-ভজন করে যেটা হয়, ধ্যানে বসে যা হয়, সেটা কাজ করেও হয়। মহাভারতে খুব নামকরা একটা কাহিনী আছে। কৌশিক নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। অনেক দিন ধরে তপস্যা করার ফলে তাঁর একটা যোগশক্তি এসে গেছে। একদিন গাছের নীচে বসে তপস্যা করছেন, ডালে বসে একটা বক মলত্যাগ করেছে, সেটা ব্রাহ্মণের গায়ে পড়েছে। তিনি রেগে উপরের দিকে তাকিয়েছেন, বকটা ভস্ম হয়ে গেল। তারপর ভিক্ষা করতে এক বাড়িতে গেছেন। বাড়ির মহিলা একজন পতিব্রতা স্ত্রী, শুধু স্বামীর সেবা করে সেই নারী যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। সেই মহিলা ব্রাহ্মণকে বললেন, 'মিথিলায় যাও, সেখানে ধর্মব্যাধ আছেন, যিনি মাংস বিক্রী করে ওই একই অবস্থায় পৌঁছেছেন'। হিন্দুদের বক্তব্য হল, এই মনের সংযমে বিভিন্ন ভাবে পৌঁছান যায়, তার মধ্যে কর্মযোগও একটি মাধ্যম।

কেন কর্মযোগের গুরুত্ব? কারণ মানুষ কাজ করবেই, কাজ ছাড়া মানুষ থাকতে পারবে না। এটাকে আমরা দুর্বলতা বলতে পারি, শক্তিও বলতে পারি। যদি মনের দিক থেকে দেখা হয়, তখন দেখা যাবে, মনের কাছে পজিটিভ নেগেটিভ বলে কিছু হয় না। যেমন দাড়িপাল্লাতে ওজন করার সময় ওটা লোহা না সোনা দাড়িপাল্ল বিচার করে না, তার কাছে ওটা ওজন। ঠিক তেমনি মনের কাছে চিন্তা, চিন্তা চিন্তাই, মন দুর্বল সবল বোঝে না, ও বোঝে তীব্রতা। কাজ ছাড়া আমরা থাকতে পারব না, পরিস্থিতি এমন যে কাজ ছাড়া থাকা যাবে না। স্বভাব এমন যে, মানুষ বলে আমি কাজ ছাড়া থাকতে পারি না। তখন বলছেন, এই যে তোমার দুর্বলতা, যেটা তোমার অপরিহার্য, এটাকে তুমি এবার তোমার সুবিধার জন্য ঘুরিয়ে নাও। জুডো খেলায় অনেক রকমের যে মার্শাল আর্টস আছে, সেখানে যার সাথে ওর লড়াই হচ্ছে, সেখানে সে বিপক্ষের যে শক্তি সেটাকেই সে কাজে লাগায়। ফলে বিপক্ষের যত শক্তি বেশী হবে, তত তাকে হারানো সহজ হয়ে যায়। জুডোতে যারা দক্ষ, তার বিপক্ষ যখন তেড়ে এলো, তখন সে একটু সরে যায়। আর এত তাড়াতাড়ি সরে যায় যে, নিজের স্পীডকে কন্ট্রোল করতে পারে না। সেইজন্য স্পীডের খুব গুরুত্ব। ওর গতিকে কাজে লাগিয়ে তাকেই ফেলে দিচ্ছে। অবশ্য এই কৌশল একদিনেই রপ্ত হয় না, প্রচুর অনুশীলন করতে হয়।

কর্মযোগ এটাই বলে, তোমার যেটা শক্তি, যেটা তোমাকে নাশ করছে, সেই শক্তিটাকেই তুমি কাজ লাগাও তোমার মঙ্গলের জন্য, তোমার আত্মোন্নতির জন্য। কাজ আমরা অল্পবিস্তর সবাই করি, কিন্তু এই কর্মই আমাদের বন্ধনের কারণ হয়ে যায়, আমাকে শুভ অশুভ যোনিতে নিয়ে যায়। কাজ ভাল হলে, সাফল্য পেলে আমরা আনন্দ পাই, উৎফুল্ল হই, হর্ষোল্লাস করি। কাজের ফল যদি না পাই তখন আমরা ভেঙে পড়ি, আমাদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। কর্মযোগ এই ইমোশানস্‌গুলিকে নাশ করে দেয় এবং মনকে শক্তি দেয়।

আমার কাছে যা যন্ত্রপাতি আছে, উপকরণ যা আছে, তাই দিয়েই তো আমাকে যা কিছু করার করতে হবে। বাড়িতে যা আনাজপাতি আছে, তাই দিয়েই আমাকে রান্না করতে হবে। অপরের কাছে কি আছে, ওর বাগানে কি আছে, তা দিয়ে তো হবে না। আমরা সাধারণ ভাবে এই জিনিসটা ভাবতে পারি; ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরের কাছে জ্ঞান ভক্তি চাইতে হয়। আমরা একটা কথা বলি ঠিকই, কিন্তু তার পিছনে যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দর্শন রয়েছে, সেটাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে ভিতরে যে ঢুকতে হয়, সেই চেষ্টাটা আমরা করিনা। ঈশ্বর হলেন অন্তর্যামী, তিনি আমার ভিতরে আছেন, তিনি আমাকে চালাবেন, আমার মনকে চালাবেন, তিনি আমাকে শক্তি দেবেন, আমাকে জ্ঞান দেবেন, তিনি কিন্তু অপরের উপর কাজ করবেন না।

যদিও আমরা বলি সবারই অন্তর্যামী এক, কিন্তু সেটা অনেক পরে, আরও গভীরে যাওয়ার পর বুঝতে পারা যায় সবই এক। আমরা ওই জায়গায় যাচ্ছি না, আমি নিজের অবস্থায় আছি; অন্তর্যামী আমার মন, আমার শরীর দিয়ে কাজ করছেন। যিনি আমার ভিতর আছেন, তিনি আমার মন আমার শরীরের উপরেই কাজ করবেন। এই জিনিসটাকে বোঝা আমাদের অত্যন্ত দরকার, এই জায়গাতে এসে আমার আপনার সবারই জীবনে অশান্তি লাগে। আমাদের সমস্যা হল, আমরা যখন প্রার্থনা করি তখন অজান্তায় না বুঝে এমন প্রার্থনা করছি, যেখানে প্রার্থনা করে বলছি, হে ভগবান ওই লোকটি যেন এই রকম করে। ধরুন একটা কথার কথা, আমি প্রার্থনা করছি, আমার যেন চাকরি হয়। তার মানে আমি বলতে চাইছি, হে ঠাকুর তুমি এমন করে দাও যাতে ওই কোম্পানির মালিক আমাকে যেন সিলেক্ট করে নেয়। ভগবান তা কোন দিন করবেন না। ভগবান আমার উপর কাজ করবেন। ভগবান আমাকে শক্তি দেবেন, আমাকে জ্ঞান দেবেন, আমাকে ভক্তি দেবেন; অপর কাউকে কোন ভাবেই করবেন না। অপরের জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি, হে প্রভু, ওর মঙ্গল করো, ওকে শুভ বুদ্ধি দাও, ভগবান করবেন কি করবেন না, সেটা তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমার যেটা দরকার, অর্থাৎ আমার মন, আমার শরীরের উপর দিয়ে যেটা হবে, সেটা তিনি করবেনই করবেন। অপরের উপর যখন আসে, সেখানে তিনি নাও করতে পারেন।

বাচ্চা বয়সে আমরা কত শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে পরীক্ষার আগে প্রার্থনা করতাম, হে ঠাকুর, প্রশ্নগুলি যেন সহজ হয়। তখন বয়স কম ছিল কিছু বুঝতাম না যে, প্রশ্ন কি করে সহজ হবে, ওটা অপরের অধিকারের ক্ষেত্র। আমরা কল্পনা করছি, একটা জঙ্গলে একটা সিংহ আছে, আর একটা হরিণ আছে। সিংহ প্রার্থনা করবে, হে প্রভু, এই হরিণটাকে যেন আমি শিকার করতে পারি। হরিণ প্রার্থনা করবে, হে প্রভু, সিংহ যেন আমায় শিকার করতে না পারে। এখন ভগবান কার প্রার্থনায় সাড়া দেবেন?

একটা হাসির গল্পে একজন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে, সে কালী মন্দিরে খুব করে প্রার্থনা করছে, 'মা এই চাকরিটা যেন আমার হয়ে যায়'। মা কালী তাকে বললেন, 'কিছুক্ষণ আগে একজন এসেছিল, সেও আমাকে ওই চাকরির জন্য বলল'। ছেলেটি রেগে বলছে, 'তোমার যা খুশী তাই কর'। মা বলছেন, 'আমি তাই করি'। অপরের খুশীর মত তিনি করেন না, তিনি তাঁর খুশী মতই করেন। কারণ তাঁকে সিংহকেও দেখতে হয়, তাঁকে হরিণকেও দেখতে হয়। কিন্তু নিজের জন্য যে প্রার্থনাটা করবেন, সেটা তিনি শুনবেনই শুনবেন। মজা করে বলছি, একটা ছেলের অসুখ হয়েছে, ছেলেটি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছে অসুখটা যেন ভাল হয়ে যায়। ঠাকুরকে সবাইকে দেখতে হবে, ঠাকুরকে আপনার ছেলেকে দেখতে হবে, যে ওষুধ বিক্রী করছে তাকে দেখতে হবে; ওষুধ যারা তৈরী করছে তাদেরও দেখতে হয়; ওষুধ যারা প্রেসক্রাইপ করছে সেই ডাক্তারকেও দেখতে হয়; ডাক্তার তৈরী করার জন্য মেডিল্যাল কলেজগুলো রয়েছে তাদেরও দেখতে হয়। আমার বাড়িতে যেন অসুখ বিসুখ না হয় প্রার্থনা করলেই তো হবে না, অসুখ বিসুখ যদি না হয় ডাক্তাররা খাবে কি! ওষুধ প্রস্তুতকারক ও ওষুধ বিক্রেতারা কি খাবে? তাহলে ভগবান কি দেন? একমাত্র আমার নিজের সঙ্গে যেটা জড়িয়ে আছে, সেটাই ভগবান দেবেন। যদি প্রার্থনা করি, হে প্রভু, আমার মন যেন শুদ্ধ পবিত্র হয়; হে প্রভু আমার মনে যেন ভক্তি ভাব আসে, হে প্রভু কারুর প্রতি আমার যেন কোন বিদ্বেষ ভাব না আসে, এগুলো তিনি শুনবেন, এসবের বাইরে অন্য কোন কিছু তিনি শুনবেন না।

ঠিক একই নিয়মে এটাকে যদি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তখন এটাই কর্মযোগের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। কর্মযোগের সিদ্ধান্তে কর্মটা আমি, আর তার ফল বাইরে হয়ে যায়। ফলে কি হয়, আমার অধিকার থাকবে শুধু কর্মের উপরে, ফলের উপর আমার কোন অধিকার নেই। ফল যেটা দেবে, সেটা প্রকৃতি দেবে। ধরুন একজন চাষ-আবাদ করল, চাষের জন্য যাবতীয় যা কিছু করার সে করল।

কিন্তু ফসল যেটা হবে, তার সাথে ক্ষেত, বীজ, সার, বৃষ্টি, রোদ ইত্যাদি অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে এত জটিলতা যে, যার জন্য আমরা বলি তিনি ফল দেন। তাহলে আমি কি করতে পারি? আমি শুধু কাজটুকু করে যেতে পারি। টেকনিক্যাল ভাষায় এটাকেই বলে অধিকার। অধিকার শুধু তোমার রয়েছে কর্মে, ফল তিনি দেবেন। সেই তুলনায় প্রার্থনা অনেক সোজা। প্রার্থনা যদি করা হয়, তা হবেই হবে। যে প্রার্থনাগুলো আপনার মন, আপনার শরীরকে কেন্দ্র করে চলে, সেই প্রার্থনা করুন, অবশ্যই হবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, আমাদের একজনের খুব জপধ্যান করার ইচ্ছে আছে, কিন্তু সময় পায় না। কিন্তু সত্যিই তার খুব ইচ্ছে, আমি জপধ্যান করব। সে এবার প্রার্থনা করতে শুরু করুক, হে ঠাকুর, আমার ঘুমটা একটু কমিয়ে দাও, হে ঠাকুর আমি যেন ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতে পারি। এবার সে প্রার্থনা করতে থাকুক, এক মাস, দু মাস, তিন মাস, দেখবে সত্যিই তার ঘুম কমে যাবে, আর ভোর চারটের সময় উঠতে পারছে।

আপনি প্রার্থনা করুন, প্রভু আমার ভিতরে অনেক লোভ আছে, হে প্রভু, আমার এই লোভ, আমার কামনা-বাসনা, কাম ভাব, এগুলো যেন চলে যায়। কিন্তু এই প্রার্থনাগুলো মরে গেলেও আমরা করব না, আমরা প্রার্থনা অন্য রকম করি। যে ছেলে বিয়ে করতে চাইছে, সে প্রার্থনা করবে, হে ঠাকুর একটা ভাল মেয়ে যেন আমার কপালে জোটে। মেয়েরা বলবে, একটা ভাল ছেলে যেন আমার কপালে জোটে। ঠাকুর করবেন কি করবেন না, আমরা কি করে বলব, কেউই বা বলবে কি করে, অসম্ভব। কর্মযোগে ঠিক একই জিনিস হয়, কর্ম আমাকে করতে হবে, কর্মের ফল আমার এক্তিয়ারের বাইরে, আমার মন, বুদ্ধির এক্তিয়ারের বাইরে, ওই জায়গাতে আমার যাওয়া চলবে না।

এই যে অধিকারের কথা বলা হল, আমার সীমানা কত দূর? আমার সীমানা হল শুধু মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর, এর বাইরে তুমি কথা বলতে পার না। এই অধিকার শব্দটা পরে গীতায় আসবে। আমাদের জীবন পুরো ফলের উপর চলে। বর্তমান দিনের ছেলে মেয়েরা বলবে, গীতা আজকের দিনে চলে না। এখন এসেছে motivational speaker, শ্রোতাদের motive দিয়ে তুলছে। আমরা ঠিক উল্টো বলি, মটিভটাকে সরাও, কোন মটিভ নেই, তুমি এটাকে কর্তব্য হিসাবে করবে। এখনকার দিনে যাঁরা influential speaker, যাঁরা লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন, how to control mind, how to increase power, সবটারই উদ্দেশ্য যাতে আপনি জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ পেতে পারেন, জীবনে সফল হতে পারেন।

গীতা বলছেন, এই যে ফলের প্রতি তোমার আসক্তি, এটাকে নিয়ন্ত্রণ কর। নিয়ন্ত্রণ করা মানেই শক্তি বেশী লাগবে, আগে তাই শক্তি অর্জন করতে হবে। যে কোন জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বেশী লাগে। ঝগড়া করা সোজা, কিন্তু ঝগড়া করার আগে যে ক্রোধ বা রাগ হয়, সেটাকে আটকে দেওয়া খুব কঠিন। বাল্মীকি রামায়ণে একটা বর্ণনা আছে, শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সাথে যাচ্ছেন, পথে একটা শিবের আশ্রম আছে। বাল্মীকি ওই জায়গার খুব সুন্দর বর্ণনা করেছেন, বাল্মীকি ওখানে বলছেন, শিব নিজের শক্তি দিয়ে নিজের শক্তিকে ধারণ করলেন। আসলে দেখাতে চাইছেন, কাম ভাবকে ধরে রাখা। আপনার মধ্যে ভালবাসা এলো, আপনি ওটাকে নামিয়ে দিলেন। যারা নামাতে পারে না, তাদের বলা হয় বীর্যহীন, নপুংসক ইত্যাদি। কিন্তু যাদের আছে, তা সত্ত্বেও আটকে নিচ্ছে, সেখানে শক্তি অনেক বেশী লাগে। মানুষ যেখানে সেখানে নিজের ক্রোধকে বার করে অগ্নিশর্মা হয়ে যাচ্ছে।

একটা হাসির গল্প আছে, একজন ঘোড়ার পিঠে খুব জোরে দৌড়ে যাচ্ছে, একজন দৌড়ে দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করছে, 'বাবু, এত জোরে ঘোড়া চালিয়ে কোথায় যাচ্ছেন'? বাবু চেঁচিয়ে বলছেন, 'আমি জানি না, ঘোড়াকে জিজ্ঞেস করো'। ঘোড়াকে বাগে আনতে পারছে না। যে কুশল ঘোড় সওয়ার, সে ঘোড়াকে নিজের বশে রাখে। ঠিক তেমনি ফলের পিছনে দৌড়ানোর জন্য একটা

শক্তি লাগে, কারণ কাজ করলে তবেই ফল আসবে। কিন্তু ওই ফলের প্রত্যাশাকে ত্যাগ করা; এটা বলা যে, আমার এটা ধর্ম তাই আমি এই কাজ করছি, এর জন্য অনেক বেশী শক্তি লাগে। সেইজন্য কর্ম সবাই করতে পারে, কর্মযোগ সবাই পারে না। কর্মযোগ না পারার জন্য কি হয়? বলে, যার সঙ্গে ঘর করিনি সে খুব ভাল গিন্নি। তার মানে যার সঙ্গে ঘর করছে, সেই গিন্নি ভাল না, কারণ তার ব্যাপারে অনেক কিছু জানা আছে কিনা, ফলে মনে হয়, যার সঙ্গে ঘর করিনি সে অনেক ভাল। এখন কাজ করতে গিয়ে কর্মযোগ হয় না, ফলে আমরা বলি, আমি ধ্যান করব, আমি জপ করব। জপধ্যান করতে নামছে, নেমে দেখছে সেটাও হচ্ছে না। কারণ সব পথই কঠিন, কোনটাই সহজ না। ঠাকুর বলছেন, ভক্তিপথ সহজ পথ, কিন্তু ভক্তি পথে একটু নামলেই বোঝা যায় কত সহজ, ভক্তি হতে হতেই কয়েক জন্ম লেগে যাবে। কারণ যোগ অভ্যাস করা, তা কর্মযোগই হোক, ভক্তিযোগই হোক প্রচণ্ড শক্তির দরকার। আর সব থেকে এটা ভাল বোঝা যায় কর্মযোগে, কারণ সেখানে জিনিসটা বাইরে প্রকাশ্যে রয়েছে। আপনি জপ করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছেন কিনা কে জানে, আপনি ধ্যান করার নামে ঘুমোচ্ছেন কিনা কে জানে। কিন্তু কাজ করার সময় পরিষ্কার বোঝা যাবে, আপনার আসক্তি আছে কিনা, আপনার লোভ আছে কিনা।

স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ খুব রসিক লোক ছিলেন, ওনার হাসিটাই ছিল চিত্তাকর্ষক। খুব মারাত্মক একটা সিরিয়াস কথাকে তিনি ছোট্ট একটা হাসি দিয়ে এমন ভাবে মিষ্টি করে, মজা করে বলতেন, মনে হবে যে তিনি নিছক রসিকতা করছেন; কিন্তু আসলে একটা গূঢ় জিনিসকে রসিকতার মোড়কে উপস্থাপন করে দিতেন। একবার একজন মহারাজ প্রণাম করতে এসে বলছেন, 'মহারাজ আপনি বলেন, এখন সাধুদের মধ্যে সেই ত্যাগ বৈরাগ্য নেই। কিন্তু সব মহন্তরাই তো বলে ঠাকুরের ইচ্ছায় এই মন্দির, এই বাড়ি, এই হাসপাতাল, এই স্কুল হয়েছে'। স্বামী ভূতেশানন্দজীও ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসি লাগিয়ে বলছেন, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, তাইই বলে; কিন্তু প্রথমে এটা জুড়ে দিয়ে তারপর ঠাকুরের ইচ্ছাটা লাগাবে, ''আমার সময়ে ঠাকুরের ইচ্ছায় এই মন্দির হয়েছে''। এটা থেকে বেরোন যায় না, বেরোন অসম্ভব'।

মূল কথা হল কর্মযোগ করার জন্য শক্তি দরকার, এবং কর্মযোগ করতে করতে শক্তি বাড়ে। এখন আমার মধ্যে শক্তি এসেছে কিনা কিভাবে বুঝব? যে কোন কাজ যখন effortless হয়ে যায়, কোথাও কোন চেষ্টা নেই, অনায়াসে কাজ হয়ে যাচ্ছে আর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করছে, তখন বুঝতে হবে তার মধ্যে শক্তি এসেছে। ঠাকুর বর্ণনা করছেন, গ্রামের মেয়েরা ঢেঁকিতে চাল কাড়ে, একদিকে কাড়া ধান সরাচ্ছে, আবার আকাড়া ধান ঢেঁকিতে দিচ্ছে, ওরই মধ্যে খদ্দেরের সাথে দেনা-পাওনার হিসাব করছে, অন্য দিকে বাচ্চাকে মাই দিচ্ছে। যারা মাংস বিক্রী কয়রে, আরামসে মাংসে কেটে চলেছে, কোন বিকার নেই, আমি আপনি ওটা পারব না। তার মানে এরা ওই কাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যদি আমি যে কোন কাজে ওই effortlessএ পৌঁছাতে চাই, যদি আমি শক্তি চাই, যদি আমি গ্রামের মেয়েদের মত effortlessly কাজ করতে চাই, তাহলে প্রথম হল, আমাকে পুরোটা সেই কাজের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে।

ঠাকুরের আরও একটা খুব সুন্দর একটা গল্প আছে, এক গোয়ালিনীর গুরু তাকে বলে দিয়েছে, তাঁর নাম করলে যদি ভবসাগর পেরিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে এই সামান্য নদীকে তো সে অনায়াসেই পেরিয়ে যাবে। গুরুর কথা বিশ্বাস করে গোয়ালিনী দুধ নিয়ে ভগবানের নাম করতে করতে সত্যিই নদীর উপর দিয়ে হেঁটে চলে এসেছে। সেটা শুনে গুরুও ভাবলেন তিনিও নদী পার করবেন, কিন্তু নদীতে নামবার আগে ধুতিটা গোটাচ্ছেন। ধুতি সামলাতে সামলাতেই গুরু নদীতে ডুবে গেলেন। পুরোটা দিতে পারছে না, ধুতিটুকু সামলে রাখছেন।

আমাদের জীবনেও তাই হয়, যে কোন জিনিসে, এমনকি ভালবাসা পর্যন্ত, ভালবাসা এমন জিনিস যেখানে মানুষ নিজেকেও ভুলে যায়, কিন্তু সেখানেও সে একটু ধরে রাখতে চাইবে। আর কাজকর্মে তো কোন প্রশ্নই নেই; এই যে মাইনে দিচ্ছেন, এর থেকে বেশী কাজ আশা করবেন না। মাইনের সঙ্গে কাজের কি সম্পর্ক! কাজ মানেই কাজ। কর্ম মানেই আমাকে সেখানে নিজেকে পুরোটা দিতে হবে, হয় পুরোটা দিতে হবে, না হলে কিছুই দিতে হবে না। কারণ যে কোন কাজের দুটো ফল হয়, একটা ফল বাইরে পরিষ্কার দেখা যায়, আরেকটা ফল হয়, যেটাতে তার ভিতরটা পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রাইমারি স্কুল থেকে উচ্চ বিদ্যালয়, সেখান থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি, আমাদের পড়াশোনা করতে হচ্ছে। এই পড়াশোনার দুটো ফল, একটা ফল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, আরেকটা ফল, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া। উদ্দেশ্য হল জ্ঞান বৃদ্ধি, কারণ পরীক্ষার ফলটা দুদিন পর তাৎপর্যহীন হয়ে যাবে, ওটার আর কোন দাম থাকবে না, কিন্তু জ্ঞান সারা জীবন থাকবে। পরে যখন নাতি-নাতনীদের পড়াবেন, তখনও ওই জ্ঞানটা কাজে লাগবে। ছোটবেলা বাংলা, ইংরাজী যা শিখেছি, এখনও শিক্ষা কাজে লাগছে, তখন কি নম্বর পেয়েছিলাম সেটার কোন দাম নেই, কত পেয়েছিলাম মনেও নেই।

হয় পুরো মন দিয়ে কাজ করতে হবে, তা নাহলে করবে না; যদি দম থাকে তাহলে বলো আমি করব না। একটা সাধারণ কাজ করার সময়েও পুরো মনটাকে ওই কাজে দিতে হবে। শ্রীশ্রীমা দেখছেন একজন ঝাড়ু দিয়ে ঝাঁটাটা ছুড়ে রাখছে। মা বলছেন, ঝাঁটাটারও একটা সম্মান আছে। মা সম্মানের কথা বলছেন, তুমি যে ঝাঁটাটা রাখছ, সেখানেও তোমার মনের সচেতনতা, মনের পুরো একাগ্রতা যেন থাকে।

এখন দেশে টাকা হয়েছে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন দেশে টাকা ছিল না। কারুর কাছেই ছিল না। সব্জী কিনতে গেলাম, মাছ কিনতে গেলাম, সব জায়গায় দু পয়সা, পাঁচ পয়সার জন্য কত দরদাম করতাম। ঠাকুর বলছেন, ফাউ থাকলে সেটাও চেয়ে নিয়ে আসতে হবে। তখনকার দিনে ফাউ যদি থাকত, তখন সেটার জন্য মানুষ খুব সচেতন থাকত, অভাব ছিল কিনা। এখনকার দিনে কে ফাউ দিচ্ছে, কে দিচ্ছে না, ওদিকে কেউ তাকায় না, মলে যাচ্ছে, যা দাম বলে দিচ্ছে, সেই দাম দিয়ে মাল নিয়ে চলে আসছে, কোন দরদামের সুযোগই নেই। কেন? কারণ আমাদের এখন টাকা হয়েছে। যখন টাকা ছিল না, যার কাছে এখনও টাকা নেই, সে এক টাকা দু টাকার জন্য দরদাম করে। আমি নিজেকে পুরো কখন দেব? যখন আমার মধ্যে শক্তি থাকবে। যার মধ্যে শক্তি নেই, সে দিতে পারবে না। পরে ভগবান বলবেন, *কৃপণাঃ ফল হেতবঃ*, ফলের পিছনে যারা দৌড়ায়, বুঝতে হবে তারা কৃপণ, ভিতরে তাদের দম নেই। যারা আসক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, আর যারা ফল ত্যাগ করেছে, বুঝতে হবে তাদের দম আছে।

এই দুটো জিনিস যদি আমরা মনে রাখি, এই জীবনেই আমরা দেবতা হয়ে যাব – passion and compassion। যে কোন জিনিস যখন করছি, সেখানে তখন পুরো নিজেকে ঢেলে দিয়ে করতে হবে, তার সাথে অপরের প্রতি করুণার ভাব, ভালবাসার ভাব যেন থাকে। Passion আর compassion যদি থাকে, অন্য আর কিছু লাগবে না, এই দুটো জিনিস আমাদের জীবনকে পার করে নিয়ে চলে যাবে। তার সাথে দৃঢ়তা, লেগে থাকার ভাব খুব দরকার।

ঠাকুর বলছেন, একজন কুয়ো খুড়বে, এক জায়গায় কুয়ো খুড়তে লেগেছে, দশ হাত খোঁড়ার পর বালি বেরোতে শুরু করল। সে জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গায় খুড়তে গেল, দশ হাত খুড়েছে, পাথর বেরিয়ে এলো, সেটাও ছেড়ে দিয়ে আরেক জায়গায় খুড়তে চলে গেল। এভাবে হয় না, যেটা ধরেছো, ওটাকেই ধরে রাখতে হবে, একবার ধরলে আর ছাড়াছাড়ি নেই। ধরে নিয়েছি মানে ধরে নিয়েছি, আর ছাড়ার কোন প্রশ্নই নেই। আমাদের মুশকিল এটাই, আজ জপ, কাল ধ্যান, পরশু

কর্মযোগ, আজ এই বাবাজী, আগামীকাল তমুক বাবাজী, আজ এই বাবাজীর শেখানো ধ্যান, কাল তমুক বাবাজীর ধ্যান, এভাবে কারুর কিছুই হয়নি, কোন দিন হবেও না।

এর আগের আলোচনায় বলা হয়েছিল, *বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যসায়িনাম্,* অব্যবসায়ি যারা, তারা অনেক কিছু নিয়ে ছটফট করে। শক্তি যদি সঞ্চয় করতে চান, তাহলে আপনি যদি কোন ভাল কাজ করে থাকেন, বা কোন কাজে আপনার যে সাফল্য এসেছে, সেটাকে নিয়ে চারিদিকে ঢাকঢোল পিটিয়ে বলতে যাবেন না। আত্মাশ্লাঘা, নিজের ব্যপারে বলেই যাচ্ছে, এটা করতে নেই। আপনার ভিতর শক্তি সঞ্চয় হয়েছে, লোকেরা এমনিতেই আপনাকে দেখে বুঝে যাবে। নিজেকে নিয়ে যদি কেউ বেশী বলতে থাকে, বিজ্ঞাপন বেশী হলে মনে সন্দেহ হয়। একটা ভাল জিনিস করলে ইনফরমেশান দিতে হয়, সেটা অন্য জিনিস। নিউজপেপারে রোজ পাতার পর পাতা একই বিজ্ঞাপন ছেপে যাচ্ছে, বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। সত্যিকারের যেটা ভাল জিনিস, ইনফরমেশানের জন্য একবার একটা ভাল জায়গায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দিল, ওখানেই তার খেলা শেষ। যারা বোঝার তারা বুঝে নিচ্ছে জিনিসটা খাঁটি।

যখন নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আসে, তখন এই লোক দেখানোর ভাব, আত্মশ্লাঘা চলে যায়। তার সাথে যেটা আসে, তা হল, নিজের বিদ্যার প্রতি বিনয়। বড় সাহিত্যিক, বড় শিল্পী, বড় গায়ক, বড় বিজ্ঞানী, এনারা সব সময় খুব বিনয়ী হন। যেখানে বিনয়ের ভাব নেই, বুঝতে হবে এখনও কর্মযোগ তো দূরের কথা, কর্মই শুরু হয়নি। কর্ম হবে, সাফল্য হবে, উন্নতি হবে, সব হওয়ার পর এগুলোর বাইরে চলে গেলেন, কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তখনই আসে ঠিক ঠিক বিনয়ের ভাব। মানুষ তখন বোঝে, জীবনে যে সাফল্য, উন্নতি যা কিছু হয়েছে, এগুলো আমার ক্ষমতায় হয়নি। তখনই মানুষ বুঝতে পারে, ঈশ্বরীয় কৃপা না হলে কোন বড় কাজে সাফল্য আসে না, কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন করা যায় না। সেইজন্য তখন মানুষ নিজের কাজ, সাফল্য এগুলো নিয়ে বেশী বলে বেড়ায় না, জানে এগুলো আমার ক্ষমতার বাইরে। এই জায়গাতে পৌঁছানর পরই মানুষ ওই ব্যাপারে বিনয়ী হয়। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যার প্রতি বিনয়, এই জিনিসগুলিই যখন মানুষ ধীরে ধীরে অনুশীলন করবে, এই জিনিসগুলি যখন ভিতরে আসতে শুরু হবে, তখন বুঝতে হবে যে, সে আস্তে আস্তে এখন কর্মযোগের পথে চলেছে।

কিন্তু কর্মযোগের মূল, এখন গীতার যে শ্লোকের উপর আলোচনা হবে তার মূল বক্তব্য হল, কর্মটাই আপনার, ফল আপনার নয়। যে কাজটা করা হচ্ছে, যেমন আমি একটা বই পড়ছি, তখন ওটাই পথ, ওটাই লক্ষ্য। যেটা করছে, এটাই তার প্রাপ্তি, বই পড়ছে, এটাই তার আনন্দ, এর বেশী আর কিছু না। যে কোন কাজ যখন করা হচ্ছে, পুরো মন সেই কাজে, পুরো প্রাণ সেখানে। এরপর কেউ প্রশংসা করল, একটু ভাল লাগল ঠিক আছে, ওখানেই ওটা শেষ, এর বেশী কিছু না। শাস্ত্রের কথা শুনছি, ওর মধ্যে ডুবে থাকছি, খুবই ভাল। সব জিনিস তো একদিনে অনুশীলন করা যায় না। ঠাকুরও বলছেন, সময় না হলে হয় না, তবে শুনে রাখা ভাল। শাস্ত্রের কথা শুনতে শুনতে মনের উপর একটা সংস্কার তৈরী হয়, এরপর সেখান থেকে ব্যক্তিত্ব পাল্টাতে শুরু হয়। এই হল কর্মযোগের মূল কয়েকটি কথা। এরপর আমরা সাতচল্লিশ শ্লোক থেকে শুরু করছি।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।।৪৭।।

(কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়। অতএব কর্ম কর। কিন্তু কর্মফলে যেন কখনও তোমার আসক্তি না হয়; কারণ, কর্মফলের তৃষ্ণাই কর্মফল-প্রাপ্তির হেতু হয়। সুতরাং কর্মফল-প্রাপ্তির হেতু হতে যেও না অর্থাৎ কর্ম সকামভাবে করতে যেও না। আবার কর্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি না হোক।)

কর্মণ্যেবাধিকারঃ এর সন্ধি ভাঙলে দাঁড়াবে, *কর্মণি এব অধিকারঃ*, ভগবান বলছেন, অর্জুন, কর্মেই তোমার অধিকার। আমরা প্রথম থেকে যেটা ব্যাখ্যা করলাম, ভগবানকে আপনি বলতে পারেন, terms dictate করতে পারেন না। ভগবান কোন সুপারি কিলার নন যে, আপনি বলবেন, অমুককে শেষ করে দাও, আমার যে শত্রু আছে তাকে শেষ করে দাও। আর ভগবান এমন কোন দুর্বল নন যে, ভগবানকে কিছু দিয়ে আপনি ব্ল্যাকমেল করতে পারবেন; ভগবান তোমাকে পাঁচ টাকার সন্দেশ দিয়েছিলাম, আমার এক কাজটা উদ্ধার করে দাও। ভগবান কোন দিন করবেন না। আবার আমরা যদি ভগবানকে কিছু নাও দিই, কিন্তু যদি প্রার্থনা করি; শুদ্ধ মনে, অশুদ্ধ মনে, দৌড়াতে দৌড়াতে, বসে বসে, শুয়ে শুয়ে, হে প্রভু আমার যেন এই হয়, কিন্তু এটা যেহেতু মনকে নিয়ে, তাই এটা অবশ্যই হবে।

প্রার্থনাতে আমরা প্রায়ই এই জায়গাতে এই ভুলটা করে বসি, আমরা মনে করি আমরা যা চাইব, তাই পাব, কিন্তু হবে না। বলছেন, অর্জুন তুমি কাজ করো, এর আগে আমরা এর ব্যাখ্যা করে দিলাম। *মা ফলেষু কদাচন*, কাজের ফল বেশী হতে পারে, কম হতে পারে, নাও হতে পারে, ওটা তোমার হাতে নেই, ফলের আশা তুমি করো না, কারণ ফলে তোমার অধিকার নেই; একমাত্র কর্মেই তোমার অধিকার। পরীক্ষা যখন দিতাম, তখন পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখাটা আমার এক্তিয়ারে, নম্বর দেওয়াটা শিক্ষকের এক্তিয়ারে। একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনি আমাদের সাহিত্য পড়াতেন, তিনি খুব সুন্দর বলতেন –অঙ্কে নম্বর দেওয়া হয়, সাহিত্য নম্বর awarded। অঙ্ক পরীক্ষায় অঙ্ক যদি ঠিক করে তাকে নম্বর দেওয়া হবে, ভুল করলে দেবে না। সাহিত্যে আপনি একটা প্রবন্ধ লিখেছেন, আপনার প্রবন্ধের মান দেখে শিক্ষক, he awards you। আমি মনে করলাম, তাই তোমাকে এই নম্বর দিলাম। ফল ঠিক তাই, ফলটা অন্য দিক থেকে আসে, ওখানে আপনার অধিকার নেই। আপনি কান্নাকাটি করুন, হাতে পায়ে ধরুন, কিছু হবে না, ওটা তাঁর এক্তিয়ার। সেইজন্য আপনি যেটা একমাত্র করতে পারেন, আপনার অধিকার হল, আপনি শুধু কাজ করে যেতে পারেন। ফল আপনার হাতে নেই। সাতচ্চলিশ নম্বর শ্লোক হল কর্মযোগের প্রাণ।

প্রথমটা বললেন, কর্মেই তোমার অধিকার, কাজ শুধু কাজ করবে। ব্রহ্মচারীদের সব সময় আচার্যরা বলেন, কাজ কর, ফলের পিছনে দৌড়াবে না। কেন দৌড়াবে না? কারণ পরিষ্কার, যদি ফলের পিছনে দৌড়ায়, তার মানে তুমি দুর্বল। দুর্বল মানুষ ইহকাল পরকাল কোনটাই পায় না।

এখানে আসক্তি যেটা বলছে, এটা কামনা-বাসনাকে নিয়ে বলছেন, এটাকেই স্বামীজী বলছেন selfishness, নিষ্কাম কর্মকে স্বামীজী বলছেন, unselfish। স্বামীজী বলছেন, unselfishnees is more paying, only people do not have the patience to practice it। মানুষের ধৈর্য নেই, কারণ নিঃস্বার্থপরতার অনুশীলন করার জন্য শক্তি দরকার, স্বার্থপরতার জন্য বেশী শক্তির দরকার হয় না। স্বার্থপর যে কোন মানুষ হতে পারে, exclusive হওয়া খুব সহজ, inclusive হওয়া খুব কঠিন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ, কর্মের প্রতি যদি আসক্তি থাকে, তখন আর-একটা সমস্যা তৈরী হয়ে যায়। ওই কর্মফলের তুমি কারণ হয়ে যাবে, সেখান থেকে আরও নূতন নূতন কর্মফলের হেতু বেরোতে শুরু হয়ে যাবে। যেমন, একটা বীজ বপন করলে তার গাছ হবে, সেই গাছের ফল হবে। বিষবৃক্ষের বীজ যদি বপন করা হয়, সেখান থেকে বিষবৃক্ষ হবে, এবং তার ফল হবে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ফলের কামনা করা, বিষবৃক্ষের বীজ বপন করা। কিন্তু আমরা তো ফলের কামনাকে ছাড়তে পারব না। পারবে না তা তো জানা কথা, কিন্তু কোথাও তো একটা শুরু করতে হবে। গীতা যখন তুমি শুনছ, তার মানেই তুমি পারবে। একটু একটু করে হবে, একদিনে কোন কিছুই হয় না।

ইউনিভার্সিটিতে অনেক নূতন ব্রহ্মচারী মহারাজরা আছেন, প্রায় পাঁচ-ছয়জন আছেন, যাঁরা সবাই বিদেশ থেকে পড়াশোনা করা বড় বড় ডিগ্রিধারী।

সন্ন্যাসীরা মজা করে বলেন, ভাই, রামকৃষ্ণ মিশন এমনিতেই কর্মযোগ শিখিয়ে দেয়। প্রথমের দিকে যাঁরা জয়েন করেন, মনে করেন আমি এটা করব, সেটা করব। কিছু দিন একটা সেন্টারে খুব কাজ করার পর হঠাৎ একদিন বেলুড় মঠ বলে পাঠালেন, চলো তুমি অন্য জায়গায়, তোমাকে বদলি করা হল। প্রথমে মনটা হতাশ হয়ে গেল। ঠিক আছে, নূতন জায়গায় গিয়ে আবার পুরো উদ্যমে কাজ শুরু করে দিল। কয়েক বছরের মধ্যে আবার বদলির আদেশ এলো। এইভাবে দুবার তিনবার বদলির পর, বুঝতে পারেন, এটা এই রকমই। এরপর মঠ যে কাজ দিল, সেই কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গে করে দিল, হয়ে গেল, এমনিতেই কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সংসারে যাঁরা আছেন, তাঁদেরও এই রকমই হয়। একটু সময় লাগে ঠিকই, কিন্তু নিজেকে একটু অনুশীলন করতে হয়। সংসারে অনেকে ঝড়-ঝাপ্টা আসে, অনেক দুঃখ কষ্ট আসতে থাকে, তখন বুঝে নেয় সংসার এই রকমই, এছাড়া সংসারে কিছু নেই। বলছেন, এমন কাজ কখন তুমি করবে না, যাতে তোমাকে নূতন বীজ বপন করতে না হয়। নূতন বীজ বপন মানেই নূতন গাছ হবে, তার ফল হবে, এতে তুমি অনেক ঝামেলায় পড়ে যাবে।

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল, আমার যুদ্ধ করাটা ঠিক হবে কিনা, আমার পাপ লাগবে কিনা ইত্যাদি, ভগবান সেটাই এখানে বলছেন, তুমি যদি এই জিনিসগুলোকে নিয়ে চিন্তা করো, তাহলে তুমি ঝামেলায় পড়বে। তুমি কাজ করে যাও, তুমি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত, তুমি স্বধর্ম রূপে যুদ্ধ কর, আর ওটাই তোমাকে করতে হবে।

মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি, এক মুহূর্তের জন্য তুমি যেন কাজ ছাড়া না থাক। আমাদের মনে হতে পারে, এটা তো ঠাকুরের কথার সাথে মিলছে না। ঠাকুর যে প্রার্থনা করতে বলছেন, হে ঈশ্বর, আমার কাজ কমিয়ে দাও, বেশি কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে তোমাকে ভুলে যাই। ঠাকুর এখানে সকাম কর্মের কথা বলছেন। যখনই আমরা কামনা-বাসনা নিয়ে কাজ করি, তখন ওই বাসনাগুলি কর্ম করার সময় মাথায় নাড়া দিতে থাকে। ঠাকুর যত কথা বলতেন, তিনি সিদ্ধান্তের দিক থেকে বলতেন কিনা। আসল কর্মক্ষেত্রে নামার পর অনেক তফাৎ হয়ে যায়। হঠাৎ কেউ যদি বলে আমি জপধ্যান নিয়েই থাকব, আমি তপস্যাই করব, আমি হিমালয়ে নির্জন বাস করব। অনেকে যায় ঠিকই, কিন্তু উপরে গিয়ে আবার নেমে আসে। কর্মযোগ করা না থাকলে ক্ষেত্র তৈরী হবে না, আধ্যাত্মিক ভূমি তৈরী হয় না।

কর্মযোগ করার আগে প্রচুর কর্ম করতে হয়। সেইজন্য প্রথমে দরকার প্রাণ ঢেলে মন প্রাণ এক করে কাজ করা, সেখান থেকে আস্তে আস্তে ভিতরে সবার প্রতি করুণার ভাব, ভালবাসার ভাবটা বাড়াতে হয়। খুব আবেগ দিয়ে কাজ করলে মনের মধ্যে ওই ভাবটা আসে, সব কিছু আমার চাই। আমি খাটছি, কারণ আমার টাকা চাই; আমি খাটছি, কারণ আমি এটা পেতে চাইছি। সেখান থেকে আস্তে আস্তে শুরু হয়, না অপরের জন্য আমাকে কিছু করতে হবে। এই যে সবার প্রতি ভালবাসা জাগছে, এবার সে কর্মযোগের পথ নিল। কর্মযোগের পথে আসা মানে, মনটা নরম হতে শুরু হয়। এর পরের ধাপে আসে, আমার এটা কর্তব্য তাই আমি করছি। অনেক সময় আমরা দেখি, কাজ না করেই ফল পেতে চাইছে। *মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি*, এখানে গীতা বলতে চাইছেন, তুমি কাজ করো, কিন্তু ফল চেও না, নূতন করে কর্ম যেন সৃষ্টি না হয়, আর কোন সময় যেন তোমার ফাঁকা না যায়।

ভারতবর্ষের পুরো সমস্যা অন্য রকম, এর মধ্যে যেটা সব থেকে বেশী দেখা যায়, তা হল, কাজ করব না, কিন্তু ফল চাই। এখন করোনা নিয়ে সারা দেশে কত লোকের কত রকম চাহিদা।

এটা কেন হচ্ছে না, ওটা কেন হচ্ছে না, কেউ আবার ওর মধ্যে ওই কোর্টে, কেউ সেই কোর্টে যাচ্ছে, কিন্তু এটা কেউ বলছে না, আমরা দশজন মিলে স্বেচ্ছাসেবকমূলক কাজে নামছি। আম্ফানের কবলে কলকাতায় কত গাছ পড়ল, বিদ্যুতের তার ছিড়ল, আলো নেই, জল নেই। মিস্ত্রিরা চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু একা তারা এই মারাত্মক বিপর্যয়কে কি করে সামলাবে। একটা গাছ কাটার দল একটা পাড়ায় গেছে গাছ কাটতে, সেখানে সবাই দেখছে, দুই একজন লোকে এসে তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আগে আমার বাড়ির সামনের গাছটা কাটুন। ভাই তুমিও তো নিজে কেটে নিতে পারো। একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে গেছে, এখানে কারুর হাত নেই। দশজন মিলে যে এগিয়ে গিয়ে বলবে, আমরা সবাই মিলে এই দুর্যোগে মানুষের পাশে থেকে তাদের সেবা করছি, আমাদের বলতে হবে না, আমরা এমনিই করে দিচ্ছি। কিন্তু তা করবে না। কি করবে? আমাদের দাবী মানতে হবে। দাবী যে মানতে বলছ, কিন্তু তোমার কি কোন কর্তব্য নেই? 'কর্তব্য আবার কি, নেওয়ার সময় আমি আছি, দেওয়ার সময় নেই; বেশী জ্ঞান দেবেন না'।

যে দেশের মস্তিষ্ক থেকে গীতার মত এত উচ্চ চিন্তন বেরিয়েছে, যে দেশের ধর্মের প্রাণ গীতা, যে গীতার প্রাণ হল কর্মযোগ, সেখানে আমরা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। খড়্গপুর আইআইটিতে যে মাঝে মাঝে Pre placement of counseling হয়, যার কথা আমরা আগেও একবার উল্লেখ করেছি, সেখান placement হচ্ছে না, হচ্ছে pre placement counseling। ওখানকার একজন প্রফেসর খুব দুঃখ করে বলছিলেন, 'কি দুঃখের কথা, ছেলেগুলো একবারও জানতে চাইছে না আমার কি দায়ীত্ব হবে, আমাকে কি কাজ করতে হবে। ওরা শুধু জানতে চাইছে, আমার salary কত হবে, আমার parks privilege কত হবে। কাজের দিকে দৃষ্টি নেই, কি পাব সেই দিকে নজর, ফলের দিকে দৃষ্টি'।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ভারতবর্ষের সমস্যা কি, আর তার কি সমাধান? গীতার এই একটি শ্লোকের পুরোটা না, শুধু এর শেষাংশের মর্মার্থ যদি আমরা আমাদের মাথার মধ্য বসিয়ে নিতে পারি, তাহলে ভারতের কি সমস্যা স্পষ্ট ভাবে জানা হয়ে যাবে, আর তার সমাধানও পাওয়া যাবে। কি সেই শ্লোক, *মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি*, এই একটি জিনিস যদি পালন করা হয়, দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে –এক মুহূর্ত তুমি ফাঁকা থাকবে না, কিছু না কিছু কাজ যেন তুমি করতে থাক। কিন্তু কাজের কোন ফল তুমি চাইবে না, আর তার সাথে নূতন করে যে কর্মগুলির সৃষ্টি হবে, সেদিকেও যেন তোমার দৃষ্টি না থাকে। কারণ ফল চাইলেই টেনে তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবে, যেখান থেকে তুমি জন্ম-মৃত্যুর এই চক্র থেকে কখন বেরিয়ে আসতে পারবে না।

বলতে পারেন, যদি ফলের ইচ্ছা আমার নাই থাকে, তাহলে আমি কাজ কেন করব? ভগবান বলছেন, না, কাজ তুমি করবে কিন্তু আসক্তি যেন না থাকে, স্বার্থপরতার ভাব যেন না থাকে। কাজ করলে তোমার উদ্ধার হবে। বর্তমান অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ খুব সুন্দর একটা কথা বলতেন – সপুচ্ছবাদ। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, জগৎটা হল কুকুরের একটা বাঁকা লেজ। কুকুরের লেজ তুমি সোজা করার চেষ্টা কর, কোন দিন সোজা করতে পারবে না। জগতের মঙ্গল করে যাও, অপরের ভাল করতে যাও, কোন দিন জগতের মঙ্গল হবে না, কোন দিন অপর ভাল হবে না, মাঝখান থেকে তোমার মঙ্গলে হবে এবং তুমি ভাল হয়ে যাবে। কাজ তোমাকে করে যেতে হবে, তোমার কাজে কারুর মঙ্গল হবে না, মাঝখান থেকে তুমি সোজা হয়ে যাবে। সেইজন্য কাজ করতে হয়। উদ্দেশ্য যদি অপরের ভাল করা হয়, অপরের কোন দিন ভাল হবে না। ভাল তোমার নিজের হবে। কর্মযোগ এই সিদ্ধান্তকে নিয়ে চলে। তাহলে কি মাইনে নেব না? অবশ্যই নেবেন। কিন্তু সব সময় যদি চিন্তা করতে থাকি, কবে আমার মাইনে বাড়বে, প্রোমশন কবে হবে, এই চিন্তা আপনার ভিতরের শক্তিকে টেনে বার করে নিচ্ছে। লোভ, মোহ যদি এসে যায়, আপনার শক্তিকে ক্ষয় করে দেবে। জীবনের উদ্দেশ্য হল, শক্তি সঞ্চয় করা। ট্যাপের নীচে বালতি পাতা আছে, ট্যাপ থেকে জল

বালতিতে পড়েই যাচ্ছে, কিন্তু বালতিতে জল থাকছে না, কারণ বালতিটা ফুঁটো, সব জল বেরিয়ে যাচ্ছে, জল জমতে পারছে না। কামনা, বাসনা, লোভ, মোহ, এগুলো হল সেই ছিদ্র। এই ছিদ্রগুলিকে আমাদের বন্ধ করতে হবে, তবে গিয়ে শক্তি সঞ্চয় হতে শুরু হবে।

এই জগৎটা হল একটা জিমনাসিয়াম, এখানে আপনি নিজেকে ঠিক করবেন, অপরকে ঠিক করার দায়ীত্ব আপনার নয়। আপনি একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, আপনাকে মালিক নিংড়ে নিচ্ছে, নিতে দিন। যদি একটা জায়গায় ভাল সুযোগ পান, এই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন। সুযোগ যত দিন না পাওয়া যাচ্ছে, চুপ করে ততদিন ওখানে বসে থাকতে হবে, শোষন সহ্য করুন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ করে আপনার কোন লাভ হবে না। আপনি একবার দুবার বলতে পারেন, যেদিন সুযোগ হবে আপনি বেরিয়ে চলে যাবেন। এই হল সাতচল্লিশ নম্বর শ্লোকের ব্যাখ্যা। সাতচল্লিশ শ্লোক হল কর্মযোগের প্রাণ। তৃতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোকটাকে আরও বিস্তারিত ভাবে বলবেন। এর পরে যে তিন চারটে শ্লোক, সেটা এরই সম্প্রসারণ –

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যাক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।৪৮।।

(হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরের জন্য কর্ম কর। ঈশ্বরের জন্য কর্ম করার সময়েও 'ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হন' –এই ধরণের আশাও ত্যাগ করতে হবে। কর্তৃত্বাদি-অভিনিবেশশূন্য হয়ে কার্য করলে সত্ত্বশুদ্ধিজনিত জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিতে হর্ষ এবং তার বিপর্যয়ে বিষাদ উপস্থিত হয়। হর্ষ এবং বিষাদে নির্বিকার থেকে কর্ম কর। ফলাফলে চিত্তের সমত্ব বা নির্বিকার ভাবই যোগ।)

ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, তুমি যোগ অবস্থিত হয়ে কাজ করো। আচার্য যোগের সংজ্ঞা দিচ্ছেন, *কেবলং ঈশ্বরার্থং তত্র অপি ঈশ্বরো মে তুষ্যতু ইতি সঙ্গম্*, ঈশ্বরার্থে কর্ম করার সময় ঈশ্বর আমার উপর প্রসন্ন হন, এই কামনাটাও করবে না। আমরা প্রায়ই বলি, হে প্রভু কৃপা কর, এটাও যেন মাথায় না আসে। আমি ঠাকুরের কাজ করছি ঠাকুরকে খুশী করার জন্য, এই ভাবটাও যেন না আসে। কঠোপনিষদেও আচার্য এই কথা বলছেন, *ঈশ্বরো মে তুষ্যতু ইতি*, প্রভু আমার উপর খুশী হবেন, এই ভাবনাটাও যেন তোমার না থাকে; আমি কাজ করছি আমার ঈশ্বরের জন্য, এতে ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হবেন, এই ভাবনাও থাকবে না। একেবারে পুরো অনাসক্ত ভাবে কাজ করতে হবে, এটাকেই বলছেন *যোগস্থ*, যোগে অবস্থিত। যোগে অবস্থিত মানে, সংসারে ফলের কামনা দূরে থাক, আমার আধ্যাত্মিক মঙ্গল বা উন্নতি হোক, এই চিন্তাটাও মাথায় থাকবে না।

এইভাবে সমস্ত রকম কামনারহিত হয়ে কাজ করলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। কামনা-বাসনা না থাকলে মন পরিষ্কার হয়ে যায়। হৃদয় বা অন্তঃকরণ যখন এভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়, তখনই জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, এটাকে বলছেন সিদ্ধি। *যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি*, যোগে অবস্থিত হয়ে কর্ম কর, এবং *সঙ্গং ত্যাক্ত্বা ধনঞ্জয়*, কোন কিছুতে যেন আসক্তি না থাকে। *সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ*, কাজে সাফল্য এলো, অসাফল্য এলো, *সমো ভূত্বা*, দুটোতে শান্ত থাক। *সমত্বং যোগ উচ্যতে*, সব অবস্থাতেই সম ভাব ধরে রাখা। প্রাণ ঢেলে কাজ করে গেছে, কাজে কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু সাফল্য এলো না; ঠিক আছে, এখানেও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সাফল্য পাওয়া গেছে, তখনও উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই, মাথা দুটো অবস্থাতেই ঠাণ্ডা। এটা তারই জন্য, যদি সে আধ্যাত্মিক জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব পেতে চায়। বলছেন, যখন জ্ঞান প্রাপ্তি হয় তখন এটা সিদ্ধি, যখন জ্ঞান প্রাপ্তি হয় না, তখন এটা অসিদ্ধি, দুটোতেই মনের ভাব কে সমান রাখতে হবে।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।।৪৯।।

(হে ধনঞ্জয়, কাম্য কর্ম নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট। অতএব তুমি কামনাশূন্য হয়ে সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর। যারা ফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে কর্ম করে, তারা অতি হীন।)

সমত্ব বুদ্ধি হল শ্রেষ্ঠ, আর যাদের এই সমত্ব বুদ্ধি নেই, যারা কামনা-বাসনা যুক্ত হয়ে কাজ করে, এই শ্লোকে তাদের কথা বলছেন। সমত্ব বুদ্ধির তুলনায়, যারা কামনা-বাসনা নিয়ে কাজ করে, এরা নিকৃষ্ট। এরা কৃপণ, কৃপণ মনে ছোট মনের। সেইজন্য হে ধনঞ্জয়, তুমি এই যোগবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হও। কাজ করে করে তোমার বুদ্ধি যখন পাকা হয়ে যাবে, সেখান থেকে তুমি সাংখ্য বুদ্ধিতে যেতে পারবে। গীতা পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, আগে তুমি কাজ কর, কাজ করলে তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার হবে, সেখান থেকে সাংখ্য বুদ্ধিতে পৌঁছাতে পারবে, সাংখ্য বুদ্ধি মানে, যেখানে সাধনাদি, জপধ্যান হবে। এগুলো করার পর তোমাকে পরমার্থ জ্ঞানের দিকে এগোতে হবে। কিন্তু তুমি যে পরমার্থ জ্ঞান লাভের সাধনা করবে, ঈশ্বরের দিকে যাবে, এর জন্য আগে তোমাকে কর্মযোগ দরকার। সমস্ত ভয়কে তুমি অতিক্রম করে যাবে, যখন তুমি একবার সাংখ্য বুদ্ধিতে যাবে।

কিন্তু সাংখ্য বুদ্ধিতে যাওয়ার আগে তোমার যোগবুদ্ধি লাগবে, অর্থাৎ আগে তোমাকে প্রচুর কাজ করতে হবে। প্রথম ধাপ হল, প্রচুর কাজ করতে হবে; দ্বিতীয় ধাপ হল কর্মযোগ, কর্মযোগ করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে জ্ঞানপ্রাপ্তির পথ তৈরী হয়ে যাবে, এরপর আসবে জ্ঞানযোগ। একবার বুদ্ধিটা তৈরী হয়ে গেলে, এরপর যে কোন দিক দিয়ে সে ঈশ্বর লাভ করতে পারে। কিন্তু সবার প্রথমে প্রচুর কাজ করে যেতে হয়। ঠাকুর বলছেন, সবটাই কাজ, জপ করাটাও কাজ, ধ্যান করাটাও কাজ, পূজা করাটাও কাজ। বলছেন, কি ফল পায়?

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।।৫০।।

(নিষ্কাম কর্মযোগী ঐহিক জীবনেই পাপ ও পূণ্য উভয় হতে মুক্ত হন। সুতরাং তুমি নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান কর। কর্মের কৌশলই যোগ।)

যোগঃ কর্মসু কৌশলম্, পঞ্চাশ নম্বর শ্লোকের এই চতুর্থ অংশ কর্মযোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত। কর্মযোগের তিনটে মূল সিদ্ধান্ত, প্রথম *মা ফলেষু কদাচন*, দ্বিতীয় *সমত্বং যোগ উচ্যতে* আর তৃতীয় *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*। এই তিনটে বাক্যকে আমাদের মনের মধ্যে খুব ভাল করে বসিয়ে নিতে হবে, এবং চেষ্টা করতে জীবনে এগুলো যাতে আমরা নামাতে পারি। প্রথম বাক্য, ফলের দিকে তাকিও না, দ্বিতীয় বাক্য, মনের মধ্যে সমত্ব ভাব রাখা আর তৃতীয় বাক্য, কর্মের কৌশল। এই শ্লোকে কর্মের কৌশল নিয়ে বলছেন।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ, মনের শুদ্ধি থেকে যখন জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তখন তিনি ভাল-মন্দ দুটোরই পারে চলে যান। ভাল-মন্দের পারে যাওয়টাই তোমাকে শ্রেষ্ঠ জায়গায় নিয়ে যাবে, সেইজন্য এটাই চেষ্টা কর। এই সমত্ব বুদ্ধি কিভাবে পেতে পারো?

যোগ কি? যোগ হল, *কর্মের কৌশল*; যিনি কর্মে কুশল, তিনিই যোগী। সেটা কিভাবে হবে? এখানে তিনটে ধাপে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম হল স্বধর্ম, তোমার যেটা দায়ীত্ব সেটা পালন কর। তুমি স্বামী, স্বামীর দায়ীত্ব পালন কর; তুমি স্ত্রী, তুমি স্ত্রীর দায়ীত্ব পালন কর; একজন শিক্ষক শিক্ষক রূপে তাঁর দায়ীত্ব পালন করবেন। এখন এটাই আমার স্বধর্ম, এই ধর্মে আমাকে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। স্বধর্ম পালন করতে করতে একটা বুদ্ধি তৈরী হয়, যে বুদ্ধিতে সে নিজেকে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত করে দিতে চাইছে; এটাকে বলে স্বধর্ম –ঈশ্বরসমর্পিত বুদ্ধি, এই বুদ্ধি হল একেবারে পরিষ্কার। ওই পরিষ্কার বুদ্ধি থেকে সমত্ব ভাব এসে যায়, এখানে সে সিদ্ধি অসিদ্ধির পারে চলে যায়। এই তিনটে স্টেজ – স্বধর্ম পালন, দ্বিতীয় ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি, তৃতীয়, সেখান থেকে আসে সমত্বের

ভাব; এটাকে বলছেন কুশল। কর্মে কুশল কে? যে এই তিনটে জিনিস করে। যে কোন কাজে চটপট করে দিচ্ছে, এটাকে কুশল বলছেন না, চটপট কাজ করাটা প্রথমে, দ্বিতীয় স্বধর্ম ঠিক ভাবে পালন করছে, তৃতীয় ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে সমর্পিত করে দিয়েছে, শেষে এই ভাব – হে ঠাকুর, ভালটাও তোমার, মন্দটাও তোমার; এই বোধ মনকে স্থির ও শান্ত করে দেয়, মন আর চঞ্চল হয় না।

এর ফলে কি হয়? কর্মের যে স্বভাব বন্ধন সৃষ্টি করা, এরপর যত কর্মই করুক, কোন কর্মই তাকে আর বাঁধতে পারবে না। বাঁধে কে? বাঁধে লোভ, বাঁধে মোহ। তার লোভ নেই, মোহ নেই, বাঁধবে কি করে! চুম্বক লোহাকে টেনে নেয়, সে এখন সোনা হয়ে গেছে, যত শক্তিশালী চুম্বক তার কাছে আসুক না কেন, এক চুলও টানতে পারবে না। পরশমণির স্পর্শে লোহা হয়ে গেছে সোনা। এতদিন সংসার তাকে টেনে রাখছিল, সে এখন সোনা, সোনাকে আর কি টানবে। ভগবান হলেন সেই পরশপাথর, তাঁর ভালবাসা এখন তার হৃদয়ে নেমে এসেছে, তাকে সংসার আর কি করবে!

এটি গীতার অত্যন্ত কঠিন তত্ত্ব, যে তত্ত্ব অনেকবার ঘুরে ঘুরে গীতাতে এসেছে। উদ্দেশ্য নিয়ে যখনই কোন কাজ করা হয় তখন সেই কাজটা আমাদের মনের উপর একটা ছাপ ফেলে সংস্কার রূপে মনের গভীরে চলে যায়। আর উদ্দেশ্য না নিয়ে যখন কোন কাজ করা হয় তখন সেই কাজ কোন দাগ ফেলে না। ছাপ না ফেললেও একটা খুব সূক্ষ্ম অবস্থাতে গিয়ে কিন্তু ছাপ রেখে যাবে। যেমন ধরুন আমি রাস্থা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা ভিখারিকে দেখলাম সে কিছু একটা কষ্ট পাচ্ছে। আমি গিয়ে তাকে কিছু একটা করে দিয়ে তার কষ্টটা লাঘব করে আমি আমার কাজে যেমন যাচ্ছিলাম সেইভাবে চলে গেলাম। আমার মাথাতেও এর আর কিছু নেই। গীতার মতে, আমি এই যে একটা পূণ্য কাজ করলাম, এর ফল কিন্তু আমার আর আসবে না। কারণ আমার এখানে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু স্বামীজী কর্মযোগ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, এই যে আমি একটা ভালো কাজ করলাম, এই কাজটাও খুব সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে একটা ছাপ রেখে যাবে। সেই ছাপটা হচ্ছে, মানবজাতির প্রতি আমার যে করুণা, ভালোবাসার সংস্কার যেটা আগে থেকেই ছিল, সেই সংস্কারটা আরও শক্তিশালী হয়ে গেল। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান যখন হয়ে যায় তখন তো আর কোন সংস্কারের প্রশ্নই থাকছে না, সংস্কার তো মনের, তখন তিনি মনকেও ছাড়িয়ে চলে গেছেন।

এখানে যেটা বলতে চাইছেন তা হল, এই যে তুমি কোন কিছুই চাইছ না, তাতে তোমার কোন ফলই আসবে না। কেন ফল হয় না, কি কারণে ফল আসে না আমাদের ঠিক জানা নেই। কিন্তু পুরো গীতাতেই এই জিনিসটা ঘুরে ঘুরে এসেছে, তুমি যদি ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে কোন কর্ম কর তাহলে সেই কর্মের ফল তোমাকে স্পর্শ করবে না, মানে তোমার মনের কোথাও ছাপ ফেলবে না। এর সাথে অন্যান্য জিনিসও হবে। আমি এখান থেকে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই এমনিই দিল্লী যাচ্ছি। যেতে যেতে ট্রেনের দুর্ঘটনা হয়ে গেল, তখন আমি নানা ঝামেলায় পড়ে গেলাম, তখন বলবে, এই তো আমি ফল পেয়ে গেলাম। এখানে ঠিক এই অর্থে বলা হয় না, আরও গভীর অর্থে বলা হচ্ছে।

যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ হয়, ফলাকাঙ্খা না করে ভালো মন্দ আমি যাই করি না কেন, খুব গভীরে সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে ছাপ একটা ফেলবেই। ভগবান একটু পরেই বলবেন – *রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*। খুব সূক্ষ্ম স্তরে যেটা ছাপ ফেলছে, এই ছাপটা ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত থেকে যাবে। কিন্তু তাই বলে যে বিরাটাকারে ফল দেবে সেটা হবে না। এটা একটা মতও হতে পারে। এখানে শাস্ত্র মতে বলা হচ্ছে ফল পাবে না। ফল পাওয়াটা হল, যেমন বেদ মতে আমি যখন একটা যজ্ঞ করছি, তখন আমি তার একটা ফল পাব, যেমন স্বর্গরূপী, ভালো জন্মরূপী ফল একটা পাব। গীতার মতে যখনই আমি একটা কাজ করছি তার একটা ভালো কিংবা মন্দ ফল হবে। এখন আমি যদি বলি আমার কোন ফল লাগবে না, তখন ঐ ফলটা আমার আসবে না।

কিন্তু এখানে অনেক প্রশ্ন আসতে পারে, কেন এই ফল ছাপ ফেলে না? স্বামীজী কিন্তু বারবার বলছেন, তুমি ভালো মন্দ যাই কর সেটা কিন্তু মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলবে। এই কথা গীতাও বলছে। আমি কাউকে একটা আম দিলাম, কর্মফলের মত কোন না কোন দিন আমাকে ঐ ফল দেবে। রাজসভায় যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হতে যাচ্ছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে জিজ্ঞেস করছেন –তুমি মনে করে দেখ, তুমি কি কখন কাউকে কোন বস্ত্র দান করেছিলে? দ্রৌপদী তখন ভেবে বললেন – হ্যাঁ মনে পড়েছে, এক ঋষি স্নান করার সময় নদীর স্রোতে তাঁর কৌপিন ভেসে গিয়েছিল, আমি আমার শাড়ির আঁচল ছিড়ে তখন তাঁকে দান করেছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন, তাতেই হবে। এটা কি একটা নিছক কাহিনী, না কোন তত্ত্বকে প্রকাশ করতে চাইছে? এটা একটা কাহিনীই, কিন্তু অত্যন্ত একটা মূল্যবান কাহিনী। সাধারণ লোক যারা তারা এই কাহিনী থেকে নিজেদের অবস্থার কথা ভাবতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ নিজের মা, বোন, স্ত্রীকে কখনই বিবস্ত্র দেখতে চাইবে না। তখন সে দান করতে শুরু করে।

কিন্তু এই কাহিনীটাকে যদি আরেকটু ভালো করে কাটা ছেঁড়া করা হয়, দ্রৌপদী কবে কোন্ সাধু বাবাকে একটা কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো দিয়েছিলেন আর ভগবান তাকে শাড়ি দিতেই থাকলেন, এটা যেন ঠিক জমছে না। কেননা বেশির ভাগ মানুষ তার জীবদ্দশায় কিছু না কিছু দান করেই থাকে। তাহলে এদেরও এত কেন কষ্ট হচ্ছে? যে কোন কর্ম সূক্ষ্ম স্তরে আমার ব্যক্তিত্ব তৈরী করছে এটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই, ব্যক্তিত্ব তৈরী হতে বাধ্য। আর যখন পরম জ্ঞান লাভ হয় তখন এই ছাপ পড়াটাও বন্ধ হয়ে যায়, এটাও খুবই যুক্তিযুক্ত, কেননা অনাসক্ত হয়ে যান বলে কর্মের কোন ফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। স্বামী ভূতেশানন্দজীকে একবার এক সিনিয়র মহারাজ কর্মফল নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তার উত্তরে তিনি ঠিক এই জিনিসটাই উল্লেখ করে বলেছিলেন – লঙ্কা খেলে যেমন ঝাল লাগে ঠিক তেমনি কর্ম আর কর্মফলের সঙ্গে কোথাও কোন একটা সম্পর্ক আছে। এখন এটাকেই বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে গেলেই সব সন্দেহের অবসান হয়ে যাবে।

এখানে আমি একজন আচার্য রূপে আধ্যাত্ম শাস্ত্রের ক্লাশ নিচ্ছি, আর আপনারা সবাই শুনছেন। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় আমিই কেন ক্লাশ নিচ্ছি আর আপনারাই বা কেন শুনছে? এর উল্টোটাও তো হতে পারত। তখন এর উত্তরে সহজ ব্যাখ্যা করে বলে দেবেন – কর্মফলের জন্য। এটাই এই প্রশ্নের সহজতম সমাধান, বেশি কাঁটাছেড়া করে ভেতরের দিকে প্রবেশ করতে হল না। এই ক্লাশ নেওয়ার জন্য যিনি আচার্য রূপে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁকে এর জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে হয়েছে, সমস্ত রকমের জাগতিক সুখ ত্যাগ করতে হয়েছে, বছরের পর বছর তাঁকে শাস্ত্রের পিছনে পরিশ্রম করতে হয়েছে, আর আজ তাঁকে আচার্যের পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। একটা কথাতে আমরা বলে দিচ্ছি তিনি কর্ম করেছিলেন বলে আজ এখানে পৌঁছেছেন। যে কোন জিনিসের পেছনে হাজারটা কারণ থাকতে পারে, সেই কারণ গুলোকে কেউ দেখতে পায়না। তাই সবাই বলে দেয় সব কর্মফল। কর্মফল যেই বলে দেওয়া হবে তখন মনটাও শান্ত হয়ে যায়।

মুকেশ আম্বানির বাবা ধীরুভাই আম্বানি কোথা থেকে কোথায় উঠে গিয়ে কোটিপতি হয়ে গেলেন। কোটিপতি হতে গিয়ে কত রকমের চালাকি, মিথ্যে কথা আর কত ভালো মন্দ কাজ করতে হয়েছে। ধীরুভাই আম্বানি কেন এত বড়লোক হয়ে গেলেন, আমি কেন হতে পারলাম না? কিন্তু আম্বানির কর্মগুলো আমরা দেখতে পাইনা, আমরা বলি দিই তার কর্মে ছিল। কর্মফল বলে দিলে আর এত বিশ্লেষণ করতে হয় না। এখন যদি বিশ্লেষণ করে দেখি যে সে এত চুরি করেছিল, এত লোক ঠকিয়েছিল, ঠিক আছে আমিও তাই করে বড়লোক হব। এখানে কিন্তু তাঁর খারাপ কর্মগুলির কথা বলছেন না; কোন জন্মে হয়ত তিনি বড় দান করেছিলেন সেইজন্য তিনি, তাঁর পরিবার আজ এত বড়লোক হতে পেরেছে। এখন এই কথা শোনার পর সবাই দান পূণ্য করতে শুরু করে দেবে। এতে সমাজের একটা স্থিতিশীলতা এসে যাবে।

সেইজন্য হিন্দু ধর্মের দর্শনকে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত দর্শন বলা হয়। যদি বলি আমার কপালে বড়লোক হওয়ার থাকলে এমনিতেই হব, এটাই নেতিবাচক মানসিক বৃত্তি হয়ে গেল, এই ধরণের বৃত্তি বশতঃ সে আর কোন কাজ করতে চাইবে না। গীতা কিন্তু কখনই এই কথা বলবে না, সেইজন্য গীতা বলছে –*মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি*, তোমার অকর্মণি যেন কখন না হয়, কাজ তোমাকে সব সময়ই করতে হবে। যখন হাতের কাজ তখন কাজ কর, যখন যেটা করার সেটা কর, যখন হাতে কাজ নেই তখন পড়াশুনা করে, উচ্চ চিন্তন নিয়ে নিজেকে ব্যাস্ত রাখ। যখন কোন কাজ নেই, উচ্চ চিন্তনও হচ্ছে না তখন মনের কাজ কর, মানে জপ-ধ্যান কর। এই তিনটে কাজ যেন সব সময় চলতে থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই আমরা কি করি, ঠাকুর বলছেন – কুমড়ো কাটা বট্ঠাকুর। সারাক্ষণ বসে বসে তামাক টানছে, মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, তাই মাঝে মাঝে ঘরের ভেতরে গিয়ে কুমড়োটা কেটে দিয়ে আসে। কর্মের মাধ্যমে আমাকে ঈশ্বর লাভ করতে হবে এই বোধ কারুরই নেই।

বেলুড় মঠের মহারাজদের কত কাজ করতে হয় যে তাদের আমোদ ফুর্তি করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, সময়ই পাবে না, আমোদ ফুর্তি বলতে ঐ সন্ধ্যা আরতির সময়টুকু। গীতাতে আমোদ ফুর্তি একেবারে বন্ধ, লোকে তাই বলে গীতা এখন থাক। অফিস থেকে এসে একটু টিভি না দেখলে চলবে না, সপ্তাহে একদিন ছুটি, ঐদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মারা, তারপর বিয়ে বাড়ি, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী এগুলো তো আছেই। আধ্যাত্মিক জীবন এভাবে চলে না, আধ্যাত্মিক জীবন অত্যন্ত কঠিন ও ক্ষুরধার। আধ্যাত্মিক জীবন আমাকে এক মুহূর্তের আমোদ প্রমোদের সময় দেবে না। আধ্যাত্মিক জীবনে যে কাজই করা হবে সেটাই ঈশ্বরের কাজ, অফিসের কাজই হোক, ঘরের কাজই হোক, কারুর গলা কাটা হোক সবই ঈশ্বরের কাজ মনে করে করতে হবে, এই বোধকে ধরে রাখতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনে জপ-ধ্যান, অধ্যয়ণ আর কাজ এর বাইরে আর কিছু নেই। সাধু সন্ন্যাসীদের এই কারণে অন্য কোন ধরণের আমোদ-প্রমোদের অবকাশ নেই, জপ-ধ্যান, অধ্যয়ণ আর কর্মই তাঁদের একমাত্র আমোদ-প্রমোদ ।

এখানে তাই বলছেন *যোগঃ কর্মসু কৌশলম্*, যোগ হচ্ছে কর্মের কৌশল। কর্মের কৌশল মানে, তুমি কর্মটা কিভাবে, কি কৌশলে করবে। কি কৌশল? সমত্ব বুদ্ধি নিয়ে এবং ফলাকাঙ্খা রহিত হয়ে কর্ম করা, এইটাই কৌশল। তুমি কত বড় কর্মযোগী, তোমার কাজ কত ভাল বোঝা যাবে তোমার বুদ্ধি কতটা শান্ত। বুদ্ধি যদি শান্ত না থাকে, সমত্ব বুদ্ধি যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কোথাও তোমার গোলমাল আছে। সমত্ব বুদ্ধি তখনই হয়, যখন কর্মের ভালো মন্দ সব ফল ঈশ্বরকে অর্পণ করে দেওয়া হয়, হে প্রভু এটা তোমারই কাজ। আচার্য ক্লাশ নিতে আসছেন, তিনি বলছেন – ঠাকুর ক্লাশ নেওয়াটা তোমার কাজ। আচার্য তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা শিক্ষকতার কাজে লাগিয়ে দেবেন। তখন ভালো মন্দ কোনটাই তাঁকে স্পর্শ করবে না। ঠাকুর যেটা গিরিশ ঘোষকে বলছেন –কিছুই যদি না করতে পার তাহলে আমাকে বকলমা দিয়ে দাও। পরে গিরিশ ঘোষ যখন কোন কাজের ব্যাপারে বলছেন, এই কাজটা আমিই করব, তখন ঠাকুর বলছেন – খবরদার, 'আমি করব' বলার কোন এক্তিয়ার তোমার নেই, সব এখন আমার। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, রোজ কোটি কোটি টাকা নাড়াচাড়া করে যাচ্ছে, কিন্তু একটা টাকাতেও তার কোন অধিকার নেই। আমরা যাবতীয় যা কিছু করছি সবটাই ঈশ্বরের, জগতে আমার বলতে আমাদের কিছুই নেই। এখানে আমার বলতে যখন কিছুই নেই তাহলে আমার আসক্তি কোন্ জিনিসটার প্রতি হবে। কিন্তু মানুষের মন এই জিনিসটাকে বুঝতেই পারেনা, আমরা এখনও উচ্চ আদর্শের জন্য তৈরীই নই। উচ্চ আদর্শ যে কত কঠিন, যারা ধরে রেখেছেন তারাই বুঝতে পারেন। ফলে কি হয়, একান্ন নম্বর শ্লোকে বলছেন –

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।।৫১।।

(নিষ্কাম কর্মযোগী মনীষিগণ কর্মজাত ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং সর্বপ্রকার উপদ্রবরহিত (সংসারস্পর্শশূন্য) ব্রহ্মপদ লাভ করেন।)

একবার এই ধরণের বুদ্ধি হয়ে গেলে, কর্মজনিত যে ফল; পাস-ফেল, সাফল্য-অসাফল্য এগুলো না; আরও উচ্চস্তরে নিয়ে গিয়ে বলছেন, শুভ দেহ অশুভ দেহ প্রাপ্তি, ওর পুরো বীজটাই নাশ হয়ে যায়। শুভ জন্ম, অশুভ জন্মের পারে তুমি চলে যাবে। পারে চলে গেলে কি হয়? এই শরীরেই, এই জীবনেই তোমার জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে যাবে। কাশীতে মারা গেলে মুক্তি হবে; অন্যান্য ধর্মে বলবে, মরলে স্বর্গে যাবে, এগুলো কিছু না; এখান এই শরীরে, এই জীবদ্দশাতেই তোমার মুক্তি হবে, বেঁচে থেকেই তুমি শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করবে। শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করার জন্য তোমাকে মরতে হবে না, এই স্থূল শরীরে থাকতে থাকতেই পেয়ে যাবে। পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান আবার বলবেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানেই তুমি সব কিছু জয় করবে। হিন্দুদের জীবনের ঠিক ঠিক আদর্শ, জীবদ্দশাতেই আমার যেন আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এই জীবদ্দশাতেই আমি যেন বুঝতে পারি আমার সমস্ত কর্মে আমার সমত্ব বুদ্ধি, জীবদ্দশাতেই আমি যেন বুঝতে পারি, লোভ, মোহ আমাকে নাড়াতে পারে না।

বলছেন, *জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্*, জন্ম-মৃত্যুর সমস্ত বন্ধন তার খুলে যায়, আর কর্মযোগের ফলে বুদ্ধি যে শুদ্ধ হয়েছে, এটাকে আচার্য বলছেন, *পরমার্থজ্ঞানরূপ বুদ্ধি*, এই বুদ্ধি পরমার্থ জ্ঞানকে এনে দেয়। তার মানে পরমার্থ জ্ঞানের জন্য আগে বুদ্ধি দরকার, ওই বুদ্ধির জন্য আগে সমত্ব বুদ্ধির দরকার, সেই সমত্ব বুদ্ধির জন্য আগে কর্মযোগ দরকার। বড় বড় জেট প্লেন যেখানে সেখানে নামতে পারে না, নামার জন্য তার বড় এয়ারফিল্ড লাগে। মশা, মাছি যেখানে খুশী নেমে যেতে পারে। ঈশ্বররূপী যে জেট প্লেন নামবে, তার জন্য আগে বিশাল এয়ারফিল্ড তৈরী করতে হবে। এয়ারফিল্ড তৈরী করা শুরু হয় কর্মযোগ দিয়ে।

হিন্দু ধর্মের এই দর্শন অন্য কোন ধর্মের সাথে মিলবে না। আমি যদি এই শরীর দিয়ে, যেটা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করছি, যেটাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে আছে, এই শরীরটা দিয়ে যদি ভোগ নাইই করলাম, তাহলে মৃত্যুর পর, যার সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই, কেউ স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, সেই স্বর্গ পেয়ে আমার লাভটা কি? সেইজন্য স্বামীজী বলছেন – I don't believe in God who will give me eternal heaven after death, but cannot give me a piece of bread here, যে ভগবান এখানে আমাকে এক টুকরো রুটি দিতে পারেনা আর মরার পর আমাকে স্বর্গ দেবে এই রকম ভগবানে আমার বিশ্বাস নেই।

অন্যান সব ধর্মে যা কিছু সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠ সব মরার পর। আর স্বর্গের বর্ণনা কি রকম? দশ লক্ষ ধরণের ফল সেখানে আমার জন্য রাখা আছে, সুন্দর ঠাণ্ডা শুদ্ধ জল, ওখানে যত পুরুষ থাকবে তারা সব সময় তিরিশ বছরের যুবক হয়ে থাকবে, আর সবাইকে দেখতে সুন্দর হবে, যত মেয়েরা থাকবে তাদের সবাই বাইশ বছরের যুবতী। এক বিদেশী জার্নালিস্ট লিখছেন, কোরান পড়ে আমার মনে হচ্ছে আমি কেন খ্রীশ্চান হয়ে জন্মালাম, মুসলমান হয়ে জন্মালেই হত, তাহলে স্বর্গের যা বর্ণনা, তাতে মনে হচ্ছে এটাই ঠিক ঠিক বসবাসের উপযুক্ত স্থান। অথচ পাকিস্থান আফগানিস্থানের কত লোক না খেয়ে মরছে, এক অপরের গলা কাটছে। কেন কাটছে, মরার পরে আমি স্বর্গে যাব, স্বর্গে গিয়ে আমি হুড়িদের পাব, হুড়ি হচ্ছে আমাদের পরীর মত। আমাদের রামানুজম, মাধ্বাচার্য যত দর্শন দিয়েছেন তাতেও আমাকে মরতে হবে। একমাত্র অদ্বৈত বেদান্ত বলছে, না, এখানেই যা হবার হবে, এখানে যদি না হয় তাহলে আমার লাভ কি। এইটাই গীতা এই একান্ন নং শ্লোকে বলছে – *জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ*, এইখানেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে হবে। এটা বলার পর পরের শ্লোকে বলছেন –

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতবস্য শ্রুতস্য চ।।৫২।।

(যখন তোমার বুদ্ধি মোহাত্মক অবিবেকরূপ কলুষ অতিক্রম করবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্মফল-বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করবে অর্থাৎ শ্রোতব্য ও শ্রুত উভয়ই তোমার নিকট নিষ্ফল হবে।)

মোহকলিলং, কলিল মানে কলুষিত করে দেওয়া, তোমার অন্তঃকরণ, তোমার বুদ্ধিকে কলুষিত করে দিয়েছে। কিসের দ্বারা কলুষিত? অজ্ঞান আর মোহ। এই মোহ ও অজ্ঞানরূপ কলুষ দ্বারা যে বুদ্ধি নোংরা হয়ে আছে, এই বুদ্ধিকে তোমাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। আমরা এখন যে অবস্থায় আছি, এই অবস্থায় আমরা সব সময় কামনা-বাসনাতে ডুবে আছি, আমরা মোহের মধ্যে পড়ে আছি, এটাই আমাদের বুদ্ধিকে কলুষিত করে রেখেছে। এই মোহ থেকে বেরিয়ে এলে তোমার বুদ্ধি শুদ্ধ হতে থাকবে, সেখান থেকে বেদ আদি সাধারণ জিনিসগুলির পারে চলে যাবে। শোক, মোহ আদি মনের এই কলুষ যখন দূর হয়ে মন শুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তুমি সব কিছুর পারে চলে যাবে, সমস্ত কর্মই তখন তোমার কাছে নিষ্ফল হয়ে যাবে। তুমি যদি জানতে চাও তুমি কবে পরামার্থ জ্ঞান লাভ করবে? তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছেন –

শ্রুতিবিপ্রতিপন্নাতে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।৫৩।।

(নানা কর্মফলশ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার চিত্ত যখন পরমাত্মাতে স্থির ও অচল হবে, তখন তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে।)

আমার ভক্তি কবে হবে, কবে আমার জ্ঞান হবে, ঈশ্বর কবে কৃপা করবেন? এই প্রশ্নগুলো বেশির ভাগ ভক্তদের মনে আনোগোনা করে। ভগবান বলছেন, তোমার যে এই বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি, যেটা চারিদিকে দৌড়াচ্ছে, এটা চাই, সেটা চাই করে যাচ্ছে। কি কি চাই? জ্ঞান চাই, ঈশ্বরের ভক্তি চাই, টাকা চাই, কামিনী চাই, কাঞ্চন চাই, সব সময় চাই চাই চাই, চাই আর শেষ হতে চাইছে না। তোমার বুদ্ধির এই এটা চাই সেটা চাইএর চাঞ্চল্য যখন শান্ত হয়ে যাবে, তখন তোমার মন বুদ্ধিতে গিয়ে ঠিক ঠিক সমাহিত হবে। বুদ্ধির চাঞ্চল্য নাশ হলে বুদ্ধি স্থির হয়।

এই জায়গাতে আমরা রাজযোগে চলে এলাম, রাজযোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলছেন। বুদ্ধিকে স্থির করতে হয়। কিভাবে স্থির হবে? মনে যে নানা রকমের চাঞ্চল্য, কামিনী, কাঞ্চন, টাকা-পয়সা, নামযশ, বন্ধুবান্ধব, পরিবার; সেখান থেকে স্বর্গপ্রাপ্তি, শুভ দেহ প্রাপ্তি; সেখান থেকে আরও উপরে, কি করে ঈশ্বরের ভক্তি পাবো, জ্ঞান প্রাপ্ত কি করে করব; চেষ্টা করে করে, কর্ম করে এই সব কিছুর যখন নাশ হবে, তখন তোমার বুদ্ধি স্থির হবে। *সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি*, মন যখন তোমার বুদ্ধিতে সমাহিত হয়ে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে যাবে, তখন তুমি গিয়ে যোগে অবস্থিত হবে।

যোগ কি? বলছেন, বিবেক, বৈরাগ্য থেকে যে বুদ্ধির জন্ম হয়, সেই বুদ্ধির তখন সমাধিনিষ্ঠা হয়। ঠাকুর বলছেন ভক্তি পথ সহজ পথ, আমরাও মনে করি খুব সহজেই হয়ে যায়। সত্যিই কি সহজ? তাহলে আমাদের যত ঋষিরা ছিলেন, তাঁদের যখনই কোন বর্ণনা করছেন, তখনই দেখছি বলছেন, অমুক অমুক ঋষি হাজার হাজার বছর তপস্যা করেছিলেন। কারণ, এটাই পথ। মনকে স্থির করার জন্য প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়। এখানে বলছেন, সমাধিনিষ্ঠা; সমাধিনিষ্ঠা হওয়ার জন্য কি হয় –বিবেক বৈরাগ্য দিয়ে যে বুদ্ধির জন্ম হয়, সেই বুদ্ধিতে কোন ধরণের চাঞ্চল্য থাকবে না। এটার জন্য দরকার কর্মযোগ, কর্মযোগের আগে দরকার পড়ে কর্ম। এই হল কর্মযোগের একটা ছোট্ট ভূমিকা, এটাকেই আরও বড় রূপে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে পাব। এরপর ভগবান স্থিতপ্রজ্ঞের কথা বলবেন, যা কিনা পুরো অন্য প্রসঙ্গ।

চুয়ান্ন নম্বর শ্লোক থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোক পর্যন্ত যে বিষয়কে নিয়ে বলা হবে, এটাকে বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ। এর আগে পর্যন্ত আমরা কর্মযোগ নিয়ে আলোচনা করলাম, স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ সরাসরি কর্মযোগের সাথে জড়িয়ে আছে। নিষ্কাম কর্মের কথা যেখানে বলা হচ্ছে, যেখানে অনাসক্ত কর্মের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে বলা হচ্ছে নিঃস্বার্থপর হয়ে কর্ম করতে, এর সবটার অর্থ হল, পুরোদমে কাজ কর। তোমার কাজের প্রচেষ্টা এমন হবে, যাতে তুমি নিজেই জানবে, you are the best। তার সাথে তোমার আশেপাশে যারা আছে, তারাও জানবে, you are the best।

আমরা এখানে একটা অত্যন্ত স্থূল উদাহরণ নিয়ে আসছি। এই যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, চুয়ান্ন নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হচ্ছে, এই শ্লোকগুলো আমরা কবে থেকে পড়ছি এখন আর মনে নেই, ১৯৮২-৮৩ সাল থেকে হতে পারে। এটা আমার এবং অনেকেরই খুব প্রিয় section, পুরো হিন্দু ধর্মের সার, গীতার সার, সাধনার সার, সমস্ত কিছুর সার এই আঠারোটি শ্লোকে দেওয়া হয়েছে, সমস্ত কিছু এর মধ্যেই পাওয়া যাবে। সবারই উচিৎ পঞ্চান্ন নম্বর শ্লোক থেকে বাহাত্তর নম্বর শ্লোক পর্যন্ত এই আঠারোটি শ্লোক সবারই মুখস্ত করে নেওয়া। সম্ভব হলে, রোজ স্নানের পর রোজ এই আঠারোটি শ্লোক আবৃত্তি করা। এর উপর আমাকে অনেকবার অনেক জায়গায় ক্লাশ নিতে হয়েছে, নরেন্দ্রপুরে বলেছি, কানপুরে বলেছি, ছাপড়া মঠে বলেছি, ইউটিউবে হিন্দী ও ইংরাজী দুটো ভাষাতেই এই বিষয়ের উপর আমার লেকচার আপলোড করা আছে। আমাদের এখানকার কোর্সে দু-তিনবার এর উপর আমার ক্লাশ নেওয়া হয়ে গেছে। আশা করা যায় যে, আমার মত একজন সাধারণ কেউ যদি শুধু এটাকে নিয়ে সাত আটবার ক্লাশ নিয়ে থাকে, নিশ্চয়ই এই জিনিসটা তাঁর মাথায় বসে আছে। আর আমাকে দিনরাত এটাকে মাথায় নিয়ে চলতে হয়, তা সত্ত্বেও আজ ক্লাশে আসার আগে আমাকে নোটস তৈরী করে আসতে হয়েছে, কারণ আমার মাথায় আছে কোন পয়েন্ট যেন বাদ না চলে যায়। এটাকে বলে প্রস্তুতি, এটাকেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগ মানে এটাই, আমার সব জানা আছে, আমাকে কি বলতে হবে, কি বলব না। কাগজ রাখতে হয়, যাতে বিস্তারে না যাই, এখানে বই আছে, শ্লোক আছে, আচার্য শঙ্করের ভাষ্য আছে, তা সত্ত্বেও আমার কাগজে অনেক কিছু লেখা আছে। কারণ, আমার নিজের যা ক্ষমতা, সেই ক্ষমতায় আমি আমার best possible দেব। এখন ধরুণ, উদাহরণ দিচ্ছি, আমি সব রকম প্রস্তুতি নিলাম, ক্লাশ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে শ্রোতারা সবাই অপেক্ষা করছেন। এসে দেখছি এখানে কিছু সমস্যা হয়ে গেছে। ধরা যাক ইলেক্ট্রিসিটির সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেছে, বা ইন্টারনেট চলছে না বা অন্য কোন সিস্টেমে গণ্ডগোল হয়ে গেছে। এখন আমার কি হবে?

এই জায়গাতে কর্মযোগ কাজে লাগে। প্রথমে বলছেন, প্রস্তুতি তোমাকে নিয়ে রাখতে হবে, কিন্তু ফল যদি না আসে, মনকে বিচলিত হতে দিও না। কারণ ফল তোমার হাতে নেই, ফল অপরের হাতে। মানুষ যেমন তার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, লক্ষ্য থাকে আমার ব্যাঙ্ক ব্যলেন্সটা যেন ঠিক থাকে। কিন্তু মানুষের আসল ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স হল তার মস্তিষ্ক, এটাকে কখনই চঞ্চল হতে দেওয়া যাবে না। চঞ্চল মস্তিষ্ক নিয়ে কাজ করতে গেলে কাজ হবে না। আবার কাজের ফল যখন আসে, মানুষ তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে। কর্মযোগ এটাই বলে, কাজ যখন করবে প্রাণ দিয়ে করবে। কোন বাচ্চা যদি কোন প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে চায়, তাহলে তাকে বলতে হবে, তুমি অবশ্যই প্রস্তুতি নেবে। এমন প্রস্তুতি নেবে যে তুমি সদর্পে বলতে পার, তোমার পাড়াতে, তোমার জেলাতে, তোমার রাজ্যে তোমার মত প্রস্তুতি কেউ নেয়নি। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তোমার নখদর্পণে। কিন্তু কোন কারণে তুমি যদি সফল না হওর, সেইজন্য মন খারাপ করবে না। কিন্তু যে জানে, বাংলার মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ, সে কি কখন চিন্তা করতে পারে যে, সে সিলেক্টেড হবে না?

আসলে আমরা কাজের চেষ্টা করি না, উপরন্তু মনটা আমাদের ফলের দিকে পড়ে থাকে, ফলস্বরূপ আমরা হতাশ হয়ে যাই। গীতা বলছেন, ফলের দিকে তাকিও না, কাজে মন দাও। যারা ম্যানেজমেন্ট পড়তে বড় বড় সংস্থায় প্রচুর টাকা দিয়ে ভর্তি হয়, তাদের লক্ষ্য হল রোলস রয়েস গাড়ির মালিক হওয়া, একটা দামী গাড়ি তার থাকবে। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু কোন কারণে পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে, রোলস রয়েস ছেড়ে আমাকে Maruti-800তে নামতে হবে, তখন মনকে চঞ্চল হতে দেওয়া যাবে না। শ্রীকৃষ্ণ এত শক্তিমান, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে জিতিয়ে দিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে মহাভারত যুদ্ধের পর গান্ধারী অভিশাপ দিলেন, আমি যেমন চোখের সামনে আমার বংশের সবাইকে নাশ হয়ে যেতে দেখলাম, তুমিও একদিন এইভাবে তোমার নিজের বংশের নাশ প্রত্যক্ষ করবে। শ্রীকৃষ্ণ মাথা পেতে সেই অভিশাপ গ্রহণ করলেন, একটা উচ্চবাচ্চও করলেন না। একজন শত সন্তানের জননী, একটি সন্তানও বেঁচে নেই, সেই সন্তপ্ত মায়ের একটা আর্ত কথা মর্মস্থল থেকে বেরিয়ে এসেছে, শ্রীকৃষ্ণ চুপচাপ মাথা পেতে নিলেন। এটাকেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে দুটো ফল আসে। আমাদের আলোচনায় খুব সহজ করেই সব কিছুকে উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু তার মধ্যে যে তত্ত্বগুলো আসে, সেগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য, এই কথাগুলো আমাদের বারবার শুনতে হবে, তা নাহলে মাথা থেকে সব বেরিয়ে যাবে। যোগ দুটো স্তরে চলে, প্রথমটা হল কর্মফলত্যাগ, যার কথা এতক্ষণ বলা হল। আমাকে সব প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে, এরপর হলে হবে, না হওয়ার থাকলে হবে না। আম্ফান ঝড়ে আমাদের ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে গেল, কতদিন অনলাইন ক্লাশ নেওয়া গেল না। কিছু করার নেই, কিন্তু আমরা আমাদের প্রস্তুতি চালিয়ে গেছি, এটাকে বলে কর্মফলত্যাগ।

কর্মফলত্যাগের পর যাঁরা ঈশ্বরের দিকে মন দিয়েছেন, একটা সময়ের পর তাঁদের কর্মত্যাগ হয়ে যায়। কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন, কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড, প্রথমের দিকে প্রচুর কাজ করতে হয়। কাজ করতে করতে ফলের প্রতি যে লিপ্সা, সেটাকে ত্যাগ করতে হয়। আমি জয়ী হব, লোকে জানুক আমি শ্রেষ্ঠ, লোকে জানুক আমি কত বড়লোক, লোকে জানুক আমার কত ক্ষমতা, এই জিনিসটাকে মন থেকে পুরোপুরি চলে যেতে হবে। এটা চলে গেলে মন ধীরে ধীরে inclusive হয়, নিজেকে আরও বিস্তার করতে থাকে, হৃদয়টা সবার জন্য খুলে যেতে থাকে। সেখান থেকে কর্মত্যাগ হয়ে যায়। মানুষ কর্ম করে কিছু পাওয়ার জন্য। কিন্তু যে জেনে গেল আমি ঈশ্বরের সাথে এক, তার তো এখন চাওয়ার কিছু নেই, কেন সে কর্ম করতে যাবে!

যাদের কর্মফলত্যাগ হয়ে গেছে, তাদের জ্ঞাননিষ্ঠা বলছেন, জ্ঞাননিষ্ঠা মানে আত্মজ্ঞানের প্রতি তার নিষ্ঠা এসেছে। সহজ ভাষায় বলা যায়, তখন ঈশ্বরের প্রতি ঠিক ঠিক ভালবাসা আসে। আমরা এটা কিন্তু কথামৃতের ভাষায় বললাম। মন থেকে যখন সব কামনা-বাসনা চলে যায়, আমাকে সবাই জানুক মানুক, আমি জয়ী হব, এই ভাবনাগুলো মন থেকে যখন চলে যায়; আমাদের একজন মহারাজ ছিলেন, তিনি আমাদের এই কথা বারবার বলতেন, আমি জয়ী হব, এই ভাবনটা ত্যাগ করতে হয়, তখনই ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে মন যাবে। এত লোক বিভিন্ন জায়গা থেকে দীক্ষা নিচ্ছে, কত জপ করছে, ফরর ফরর করে কত ঈশ্বরীয় কথা বলে যাচ্ছে; ঠাকুরও বলছেন, কলকাতার মেয়েগুলো লক্ষ লক্ষ জপ করছে, কিন্তু কিছুই তো হয় না।

কেন হয় না? কারণ আগে আগে কাজ করেনি। কাজ করলে তার ফল আসে, ফলের সাথে মান সম্মান এগুলোও আসে, অপবাদ আসে, কলঙ্ক আসে, এই সব কিছুকে ছাড়িয়ে উঠে আসার পর ঈশ্বরের দিকে মন যায়। ঠাকুর এটাই বলছেন, কর্মকাণ্ড আদিকাণ্ড। আচার্য এটাকে বলছেন জ্ঞাননিষ্ঠা; ঈশ্বরের প্রতি যে ভালবাসা, আত্মজ্ঞানের প্রতি যে নিষ্ঠা, এটাকে বলা হয় জ্ঞাননিষ্ঠা। তখন

সে জ্ঞাননিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, বুদ্ধি স্থির হয়ে যায়। বুদ্ধি একবার স্থির হয়ে গেলে আর নড়বে না, এটাকে বলে কূটস্থ, এটাই *সোহম্ তত্ত্ব*, এটাই এখন আমরা আলোচনা করছি। ভগবান কর্মযোগের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, মানুষ কিভাবে কর্মফল ত্যাগ করে, কিভাবে কর্ম ত্যাগ করে; সব বলার পর এখানে বলছেন *সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি*, কর্মফল ত্যাগ, কর্মত্যাগ করে তোমার বুদ্ধি স্থির হয়ে যাবে, তখন তুমি যোগাবস্থা প্রাপ্ত হবে।

সব শোনার পর অর্জুন জানতে চাইছেন, আমি কি করে বুঝব যে, এই লোকটি যোগে প্রতিষ্ঠিত? অর্জুন এই যে যোগে প্রতিষ্ঠিতের কথা জিজ্ঞেস করলেন, এই যোগে যিনি প্রতিষ্ঠিত তাঁকে বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞ। এখানে স্থিতপ্রজ্ঞ বলতে দুটোই বোঝায়, যিনি চেষ্টা করে করে সেই অবস্থায় গেছেন, তাঁকেও বোঝায়, আর যিনি স্বাভাবিক ভাবে সেই অবস্থায় গেছেন, তাঁকেও বলছেন। স্থিতপ্রজ্ঞ মানে, প্রজ্ঞা অর্থাৎ বুদ্ধি যাঁর কখন বিচলিত হয় না।

অর্জুন কেন এই রকম জানতে চাইছেন? কারণ ফাক্কা অনেকেই লেকচার দিয়ে দিতে পারে, খুব নামকরা কথা –ফলেন পরিচিয়তে। একটা গাছকে যদি জানতে হয়, সেই গাছের ফল দিয়েই আমি বিচার করতে পারব গাছটা কেমন। ঠাকুরের যাঁরা ভক্ত, তাঁদের আচার ব্যবহার, আচরণ দেখে অন্যরা জানতে পারবে ঠাকুরের ভক্তরা এই রকম হয়ে থাকে। একজন নিজেকে ঠাকুর ভক্ত বলছে, কিন্তু অন্য দিকে চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে; তখন অন্যরা দেখে বলবে, শ্রীরামকৃষ্ণের চেলারা চোর হয়, ঠাকুরের চেলারা মিথ্যেবাদী হয়। লোকেরা আমাকে দিয়ে ঠাকুরকে জানবে। আমি কি রকম? আমি শ্রীরামকৃষ্ণ বৃক্ষের ফল। হিন্দু ধর্ম যা কিনা একটা বিরাট বৃক্ষ, যার মূল রয়েছে বেদে, তার ফল হল প্রত্যেক হিন্দু। হিন্দুকে বিদেশীরা কিভাবে দেখছে? সম্মানের দৃষ্টিতে কেউ তাকায় না। বিদেশীরা জানে, আমরা গেঁয়ো, অশিক্ষিত, আমরা কুসংস্কারচ্ছন্ন, আমরা দরিদ্র। মুখে আমরা যত যাই নিজেদের নিয়ে বড়াই করি না কেন, বিদেশীরা আমাদের এটাই ভাবে। যে যখন পারছে এসে আমাদের পিটিয় যাচ্ছে। এই ধরণের নানা রকম জিনিস হিন্দুদের নিয়ে হচ্ছে, কেন? কারণ কিছু লোক আছে যারা এই রকম। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা গেলেন, সেখানকার লোকেরাও তাঁকে সেই রকম একজন ভাবছে। পরে স্বামীজীর কথা শুনে, তাঁর কাজকর্ম দেখে সবাই অবাক! আরে হিন্দু ধর্মে এই রকম লোক হয়!

অর্জুনও তাই জানতে চাইছেন, আপনি যে জ্ঞাননিষ্ঠা, স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগ এই ধরণের কথা বলছেন, এই ধরণের লোককে আমি কি করে জানব? কি করে বুঝব যে ইনি স্থিতপ্রজ্ঞ। আমাদের ভাষায়, একজন মহাপুরুষকে আমরা কি করে জানব। সত্যিই বিরাট সমস্যা। ঠাকুরকেও অনেক প্রশ্ন করতেন, সাধু কে, সাধুকে চিনব কি করে? আমাদের পরিচিত অনেকে আছেন, যাঁরা রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে জড়িত নন, তাঁরা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন, আপকে ইঁহা পৌঁছে হুয়ে মহাত্মা হ্যায়? মানে জানতে চাইছনে কোন মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ মিশনে আছেন কিনা। আমরাও মজা করে বলি, কেন আমিই তো আছি, আপনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করুন, কেন আমি মহাত্মা নই।

টাইমস ইণ্ডিয়াতে স্পিকিং ট্রীতে একটা আর্টিকেল বের হয়। মাঝে মাঝে কোন সংশয় হলে ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করে। একবার জিজ্ঞেস করলেন, জীবনমুক্তি জিনিসটা কি? স্থিতপ্রজ্ঞ আর জীবনমুক্তি একই। আমি মজা করে বললাম, আমি জীবনমুক্ত। আর ওরা ওটাই ছেপে দিল। তারপরে অবশ্য আমি বলি, আপনি প্রমাণ করুন আমি জীবনমুক্ত নই। কারণ, জীবনমুক্তের কোন লক্ষণ থাকে না। যে কোন প্রতারক বলে দিতে পারে আমি জীবনমুক্ত। প্রশ্নই নেই যে আমি জীবনমুক্ত, কিন্তু আমি যদি নিজেকে দাবী করে বলি, আমি জীবনমুক্ত, আমি যদি দাবী করি আমি একজন মহাত্মা, আপনি কি করে না বলবেন; জানার কোন পথ নেই।

যোগশাস্ত্রে, কথামৃতে বা যোগবাশিষ্ঠে কিছু কিছু লক্ষণের কথা বলছেন ঠিকই, কিন্তু এগুলোকে যে কেউ নকল করে নিজেকে জীবনমুক্ত বলে চালিয়ে দিতে পারে। আর সত্যিই লোকেরা তাই করে। হাতির দুই রকম দাঁত, মুখের ভিতরে আর মুখের বাইরে। সাধু বাবাজীরা মুখের বাইরের দাঁত দেখিয়ে লোকেদের আকর্ষণ করছে, কিন্তু তার ভিতরের দাঁত অন্য রকমের; ওই দাঁতের খবর কেউ পায় না। যার জন্য, সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে লোকেদের প্রতারণা করা খুব সহজ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও অর্জুন যখন প্রশ্ন করছেন, ভগবানও উত্তর দিচ্ছেন। আর জগৎকে কেউ ঠকায় না, মানুষ ঠকায় নিজেকে। তবে ঠাকুর যেমন বলছেন, সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে সাধুকে বুঝবি। ভগবান এখানে যে কথাগুলো বলছেন, সেই কথা দিয়ে মোটামুটি বোঝা যায়, আধ্যাত্মিক চেতনায় কারা উপরে উঠেছেন। এটা হল একটা broad outline। কিন্তু অপরের বর্ণনা করে আমার কি হবে। বিল গেটসের কত টাকা আছে, টাটা, বিড়লা, আম্বানির কত টাকা আছে জেনে আমার কি হবে, আমাকে জানতে হবে, আমি কিভাবে উপরে যাব।

আচার্য শঙ্কর বলছেন, সিদ্ধ পুরুষের যা যা লক্ষণ, এটাই সাধারণ মানুষের জন্য সাধনা হয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। শাস্ত্র আমরা কেন পড়ি? আমরা কথামৃত কেন পড়ি, বিশেষ করে মাস্টারমশাই ঠাকুরের যে বর্ণনাগুলি দিচ্ছেন, সেগুলো আমরা কেন পড়ি? কারণ ওখানে আমরা সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ জানতে পারছি। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আমরা কেন পড়ি? ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের জীবনী আমরা কেন পড়ছি? কারণ সেখান থেকে আমরা সিদ্ধ পুরুষের লক্ষণ জানতে পারছি। সিদ্ধ পুরুষদের যেটা লক্ষণ, সেটাই সাধারণ পুরুষদের জন্য সাধনা। সাধনাতে ওটাই করতে হয়, সিদ্ধ পুরুষরা যেটা করেন। পরে গীতাও বলবেন, *যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ*, বা মহাভারতেও বলছেন, *মহাজনো যে ন গতাঃ স পন্থা*, মহাপুরুষরা যে পথে গেছেন সেটাই ধর্ম।

কিন্তু গীতার এই জায়গায় ধর্মের কথা চলছে না, আমরা এখানে আলোচনা করছি একজন সিদ্ধপুরুষকে আমি কি করে জানব, সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ কি। আমি যাকে ভালবাসি, আমার দেখার খুব ইচ্ছে তিনি কিভাবে কথা বলেন, আমি দেখতে চাই তিনি কিভাবে কাজ করেন, আমি দেখতে চাই তাঁর দৈনন্দিন চর্চা কি রকম। এই যে সিদ্ধপুরুষের লক্ষণ, এটাই একজন সাধকের জন্য হয়ে যায় সাধনা, আর এটাই সাধারণ লোকেদের জন্য হয়ে যায় মূল্যবোধ। যেমন বলা হয়, সত্য কথা বলবে। সত্য কথা কেন বলতে হয়? সত্য কথা কেন বলবে, এর উপর আমরা বিরাট ভাষণ দিয়ে দিতে পারি, সত্য কথা বললে এই হয়, সেই হয়। কিন্তু আসলে জিনিসটা তা না। আসল হল, যদি আমরা যীশু খ্রীষ্টের দিকে তাকাই, ভগবান বুদ্ধের দিকে তাকাই, ঠাকুরের কথা যদি দেখি, বার বার ঠাকুর বলছেন, সত্য কলির তপস্যা।

ঠাকুর দেখালেন তিনি সব সময় কিভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজী সত্যের অনুশীলন করলেন, ঠাকুর সত্যের অনুশীলন করেননি, ঠাকুর সত্যে প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুরের কাছে মিথ্যা বলে কিছু ছিল না; সূর্যে যেমন অন্ধকার হতে পারে না, সেইজন্য সূর্যে দিন আর রাত নেই। সূর্যলোকের যদি কোন বাসিন্দা হন, তিনি জানবেনই না দিন কাকে বলে, রাত বলে কিছু হয় কিনা। তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভবই না, কারণ সূর্যে সব সময় আলো। ঠিক তেমনি ঠাকুরের কাছে মিথ্যা জিনিসটার কোন ধারণাই নেই, কারণ তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীজী কিন্তু সত্যের যে মূল্যবোধ, সেই বোধে প্রতিষ্ঠিত। সেখান থেকে যখন আমাদের কাছে আসছে, তখন সত্য আমাদের জন্য হয়ে যাচ্ছে একটা মূল্যবোধ। কিন্তু সাধকদের কাছে এটা হয়ে যায় সত্যের জন্য সাধনা। পরিস্থিত যদি এমন হয়ে যায়, আমি একটা কথা বলে দিয়েছি কিন্তু পালন করতে পারব না, তখন সত্য রক্ষার জন্য সামান্য একটু করে নিতে হয়, এই হল value system। তিনটে স্টেজে চলে, প্রথম হলেন সিদ্ধ, দ্বিতীয় হলেন সাধক এবং তৃতীয় স্টেজে আসে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ মূল্যবোধের অনুশীলন করে, যাঁরা সাধু মহাত্মা, তাঁরা সাধনা করেন, আর যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ, যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁরা ওটাতেই প্রতিষ্ঠিত।

একজন ভদ্রলোক ও আর-একজন সাধুর মধ্যে তফাৎ এটাই। ভদ্রলোক এই মূল্যবোধগুলি খুব সচেতন ভাবে অনুশীলন করেন, চেষ্টা করে করে মূল্যবোধগুলিকে পালন করেন। একজন মহাত্মা মূল্যবোধগুলিকে সাধনা রূপে নেন, তিনি মনে করেন এটা দিয়ে আমি ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছে যাব। আর যিনি সিদ্ধ, তিনি ওটাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ভদ্রলোক, মহাত্মা ও সিদ্ধপুরুষ, এই তিনটে ধাপ, বাকীদের এখানে ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না। এবার দেখব অর্জুন ঠিক কি কি জানতে চাইছেন –

অর্জুন উবাচ
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।।৫৪।।

(অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন –হে কেশব, ব্রহ্মসমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কি লক্ষণ? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে কথা বলেন ও কিরূপে অবস্থা করেন এবং কিভাবেই বা তিনি বিচরণ করেন?)

স্থিতপ্রজ্ঞের কি পরিভাষা? আমরা কি করে বুঝব যে ইনি স্থিতপ্রজ্ঞ? শাস্ত্রে মন ও বুদ্ধির কথা বলছেন, বুদ্ধি যখন সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত হয়ে যায়, কখন আর অশুদ্ধ হয় না, তখন এটাকে বলে ধী। ধী থেকে আসে প্রজ্ঞা, যেখান থেকে বিশেষ জ্ঞান আসে। প্রজ্ঞা হল শ্রেষ্ঠ, যে পরিষ্কৃত বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান আহরণ করে ধরে রাখতে পারা যায়, সেই বুদ্ধিকে বলছেন প্রজ্ঞা। স্থিতপ্রজ্ঞা আর স্থিতধী একই, যেখানে বুদ্ধি আর নড়ে না।

বলছেন *স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব*, সমাধি মানে মন নিজের মনের মধ্যে ঢুকে গেছে। মন দুই প্রকার, একটা মন বাইরের দিকে অর্থাৎ বহির্জগতের দিকে যায়, এটা হল সাধারণ মন, আমার আপনার মন। এই মনই যখন মনের ভিতরে ঢুকে যায়; সাপ যেমন কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে থাকে, ঠিক সেইভাবে মন যখন নিজেকে গুটিয়ে বসে যায়, এটাকে বলে সমাধি। মন যেটা বহির্মুখী ছিল, সেই মনই অন্তর্মুখী হয়ে গেছে, এটাই সমাধি, এটা permanent, আর নিজের ইচ্ছায়।

দুঃখ পেলে আমরাও অন্তর্মুখী হয়ে যাই। আমরা তখন দিব্যি খেয়ে বলি, ওর কাছ থেকে আমি এত কষ্ট পেয়েছি, আর আমি ওর সাথে কথা বলব না। ও আমাকে অনেক ধোকা দিয়েছে, কোন দিন আর ওর দিকে ফিরেও তাকাব না। এই সংসার ধোঁকার টাটি, কার সঙ্গে মিশব, কার সঙ্গেই বা থাকব, তখন আমরা নিজেকে গুটিয়ে ফেলি। এটাকে সমাধি বলা যাবে না। নিজের ইচ্ছায়, যখন খুশী, যে কোন জায়গায় নিজের মনকে গুটিয়ে নেবে, এটাকে বলে সমাধি।

অর্জুন জানতে চাইছেন, যিনি সমাধিস্থ, নিজের মনকে যখন খুশী নিজের মনের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারেন; এই ধরণের স্থিতধী পুরুষরা যখন লোকের সঙ্গে থাকছেন, তখন তাঁরা কি ধরণের কথাবার্তা বলেন। তিনি কি ভোগের কথা বলেন? মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কথা বলেন? কাকে নিয়ে কথা বলেন? *কিমাসীত*, যখন একা থাকেন, চুপচাপ বসে আছেন, তখন তাঁর ব্যবহার কি রকম? *ব্রজেত কিম্*, সমাজের মধ্যে বা রাস্তাঘাটে যখন চলাফেরা করেন, তখন তাঁর ব্যবহার কি রকম? তিনটে অবস্থার কথা অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন। যখন নিজের মধ্যে নিজে ডুবে আছেন, মানে যখন অন্তর্দশা, তখন তিনি কি করেন? দ্বিতীয় অর্দ্ধবাহ্য, যখন তিনি কথাবার্তা বলেন, তখন কি কথা বলেন? তৃতীয় পুরো বাহ্যদশা, এবার তিনি লোকেদের মধ্যে ঘুরছেন, তখন তিনি কি রকম ব্যবহার করেন? স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন তাঁর ব্যবহার কি রকম ছিল? লোকেদের সাথে যখন কথাবার্তা করতেন তখন কি রকম? যখন কেউ নেই, তিনি একা আছেন, তখন কি রকম? এই হল অর্জুনের প্রশ্ন।

এবার ভগবান পঞ্চান্ন নম্বর শ্লোক থেকে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করছেন, গীতার এই অংশটাকে বলছেন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। আচার্য এখানে বলছেন, আচার্যের সংস্কৃত অত্যন্ত সহজ এবং অত্যন্ত মিষ্টি। জ্ঞানীপুরুষদের কথা অত্যন্ত সহজ ও সরল হয়। যেখানে পাণ্ডিত্যের বেশি প্রকাশ, বুঝতে হবে সেখানে জ্ঞানের অভাব আছে। যেখানে ভাষার খেলা দেখা যাবে, বুঝতে হবে লোকটার জ্ঞান নেই। ঈশ্বর সহজ, যিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা কথাবার্তা, তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও সরল হয়ে যায়। আচার্য শঙ্করের ভাষাও অত্যন্ত সহজ সরল।

আচার্য বলছেন, *সর্বত্র এব হি অধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণানি যানি তানি এব সাধনানি উপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ*। অধ্যাত্মশাস্ত্রের সব জায়গায় যিনি কৃতার্থ, যাঁর জীবন ধন্য হয়ে গেছে, তাঁর যে লক্ষণ, সেটাই যত্ন দ্বারা, চেষ্টা করে অন্যদের জন্য সাধনা করার উপদেশ দেওয়া হয়। আমরা কি নিয়ে সাধনা করব? যাঁকে আপনি মহাপুরুষ মনে করেন, তাঁকে দিনে দেখুন, রাতে দেখুন; আর তাঁর মত আচরণ করার চেষ্টা করুন। ভগবান এই লক্ষণগুলি এবার বলছেন –

শ্রীভগবানুবাচ
প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।৫৫।।

(শ্রীভগবান বললেন –হে পার্থ, বাহ্যলাভে নিরেপেক্ষ ও পরমার্থদর্শনে প্রত্যগাত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়ে যখন যোগী সমস্ত মনোগত বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলে উক্ত হন।)

সংসারে আমরা দৌড়ে চলেছি, সংসারের পিছনে দৌড়াচ্ছি, মানুষের পিছনে দৌড়াচ্ছি, বিষয়ের পিছনে দৌড়াচ্ছি। বাল্মীকি আমাদের জন্য কত সুন্দর একটা ধারণা নিয়ে এলেন, শ্রীরামচন্দ্র সীতার সাথে বনবাসে আছেন, সেখানে মারীচ রাক্ষস সোনার হরিণের রূপ নিয়ে সামনে চলে এলো। শ্রীরামচন্দ্র জানেন সোনার হরিণ হয় না, লক্ষ্মণ জানেন সোনার হরিণ হয় না। সীতার তখন তেরো বছর বনবাস হয়ে গেছে, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছেন, সোনার হরিণ দেখার পর সীতার মন কিন্তু প্রলুব্ধ হয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্র জানতেন সোনার হরিণ হয় না, কিন্তু তিনি সোনার হরিণের পিছনে দৌড়ালেন। কারণ সীতার মন রাখতে হবে, তাঁকে খুশী রাখতে হবে, তিনি চান না সীতার মনে সোনার হরিণের জন্য কোন আক্ষেপ হোক। আমরাও ঠিক এই রকম সোনার হরিণের পিছনে দৌড়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওটা মৃগ মরীচিকা, ওটা রাক্ষস, যে কিনা সোনার হরিণের রূপ ধারণ করে এসে আমাদের মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার সব কিছু অবলুপ্ত করে আমাদের সত্তাকে হরণ করে নেয়।

সোনার হরিণের পিছনে কে দৌড়াচ্ছে? আমার মনে হবে, আমি দৌড়াচ্ছি। আপনি বলবেন, আপনার ইন্দ্রিয় দৌড়াচ্ছে। না, সবটাই দৌড়ায় এই মন, কোথাও কিছু নেই, যা কিছু আছে সব এই মনে। অক্টোপাসকে যদি আমরা মাথায় রাখি, তাহলে বুঝতে পারব আমি কি। অক্টোপাসের ওই ছোট্ট একটা মাথা, আর তার লম্বা লম্বা অনেকগুলো হাত বেরিয়ে আছে, যেগুলোর সাহায্যে সে শিকার করে। আমাদের এই শরীরটাও এই অক্টোপাসের মত, এই মস্তিষ্কটাই আসল, বাকি ইন্দ্রিয়সমূহ, শরীরের অঙ্গসমূহ, সব অক্টোপাসের হাত পা, আর কিছু না। আমরা যখন দেখি, আসলে পুরোটা দেখি, কিন্তু জিনিসটা ঠিক তা নয়। এই ছোট্ট মস্তিষ্কটুকুই সত্যিকারের আসল আমি, এই 'আমি' যেটা চায় বাকিরা সেটাই করে। মনের মধ্যে কামনা-বাসনা গিজগিজ করছে, কামনা-বাসনার পুর্তির জন্য মন ইন্দ্রিয়গুলিকে আদেশ দেয়। ইন্দ্রিয়গুলি তখন আমাদের শরীরের অঙ্গগুলিকে আদেশ করে। যেমন আমাদের চোখ, চোখ শরীরের অঙ্গ, এটা ইন্দ্রিয় না, চোখের আসল যে ইন্দ্রিয় সেটা রয়েছে মস্তিষ্কের কেন্দ্রে। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এগুলোকে বলা হয় করণ। হাত দিয়ে কত কাজ করছি, খারাপ কাজ, ভাল কাজ, যে কাজই হাত দিয়ে করি না কেন, হাত কখনই কোন কাজের জন্য দায়ী না, আর হাতের পিছনে যে ইন্দ্রিয়গুলি ব্রেন সেন্টারে আছে, তারাও দায়ী না। দায়ী আসলে মন,

ওখানেই সমস্ত কিছুর ঝড় চলছে, যত রকম অঙ্কট-বঙ্কট আছে, কাম-ক্রোধের যত পোকাগুলো আছে, সব মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রেখেছে।

এটা আমরা একটা রূপক রূপে বললাম। মন মানেই নানান রকমের কামনা-বাসনা, এই কামনা-বাসনা কারুরই যায় না। ঠাকুর ভগবান, তিনি অবতার, তিনি জ্ঞানের আলো দিতে এসেছেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে আছেন, সাধনা করছেন, ওনারও একটা সময় কামবেগ এসেছিল। তিনি দেখাচ্ছেন, কিভাবে এই কামভাব মনের মধ্যে থাকে। তারপর তিনি মাটিতে মুখ রগড়ে রগড়ে মা কালীকে বলছেন, মা এরপর যদি আবার আসে আমি গলায় ছুরি দিব। ঠাকুরের মত এভাবে আমার আপনার পক্ষে করা সম্ভব না, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাটা খুব জরুরি। সব মনের মধ্য বাসা বেঁধে আছে। থেকে থেকে মনের মধ্য থেকে একটা করে চাড়া মারে, সেখান থেকে ইন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল হয়, সেখান থেকে অঙ্গগুলো কাজে নেমে পড়ে।

অরুণাচলে আলংএ রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম আছে, সেখানে স্থানীয় আদিবাসীদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। ট্রাইবাল ছেলেরা খুব বুদ্ধিমান ও দক্ষ হয়। ওখানে আরশোলার মত দেখতে এক রকম পোকা হয়, ওর একটা আলাদা স্থানীয় নাম আছে। ছেলেরা ওই পোকা খেতে খুব ভালবাসে। একটু আগুনে সেঁকে নেয়, অনেক সময় কাঁচা কাঁচাই খেয়ে নেয়। দুটো ট্রাইবাল ছেলে একবার সন্ন্যাসীদের ঘরে এসেছে একটা কোন আমন্ত্রণ পত্র নিয়ে। সন্ন্যাসীদের কোয়ার্টারে দেওয়ালে দেখছে একটা বড় সাইজের সেই পোকা। পোকা দেখে বাচ্চাগুলোর হাত নিশপিশ করছে, নিজেকে সামলাতে পারছে না। সন্ন্যাসীর সাথে কথা বলছে, কিন্তু দৃষ্টিটা পোকার দিকে। মহারাজ ওদের মতলবটা বুঝতে পেরেছিলেন, ওনারও হাসি পাচ্ছিল। শেষে একটা বাচ্চা নিজেকে আর সামলাতে পারল না। ছেলেটা বলছেন, 'স্বামীজী, ওটাকে ধরব'। মহারাজ আর কি বলবেন, 'ধরো'। আমাদের মন ইন্দ্রিয় দিয়ে অঙ্গগুলিকে ঠিক এইভাবে কাজ করায়। মন বলছে এটা আমার চাই, অঙ্গ তখন ছটফট করতে থাকে। তখন আমার মনে হবে, আমার হাত আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, আমার পা নিয়ন্ত্রণে নেই, শরীরটাও আর নিয়ন্ত্রণে নেই। আমাদের মনে হতে পারে সমাধিবান পুরুষের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হয় কি করে, এটা পরে বলবেন। এখানে প্রথমে লক্ষণ বলে দিচ্ছেন। নারদীয় ভক্তিসূত্র, পতঞ্জলি যোগসূত্র এনারা প্রথমে সিদ্ধান্তের কথা বলে দেন, সাধনার কথা পরে বলেন। এখানেও সিদ্ধান্তের কথা প্রথমে বলে দিচ্ছেন, সাধনার কথা পরে বলবেন।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্, হে অর্জুন, মনে থেকে সমস্ত কামনাগুলো খসে পড়ে যায়। কি রকম খসে পড়ে যায়? যেমন জোঁকের মুখে লবণ দিলে জোঁকগুলো শরীর থেকে খসে পড়ে। ঠিক সেই রকম মন থেকে কামনা-বাসনাগুলি যদি খসে পড়ে, তখন কি হয়? *আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ,* নিজের ভিতর নিজের আনন্দে মশগুল হয়ে থাকে। একেবারে শিশুর মত হয়ে যায়। চার-পাঁচ মাসের শিশুর এখনও বুদ্ধি বিকশিত হয়নি, খিদে পেলে দুধ খাইয়ে দেওয়া হল, তৃপ্ত হয়ে গেল, তারপর নিজের মত থাকে। এই শিশুই দু-তিন মাসের হয়ে গেলে, ওই অবস্থায় সে নিজের মত হাসতে থাকে, হাত-পা ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। ঘুম পুরে গেছে, পেট ভরে দুধ খেয়ে নিল, ব্যস, নিজের মত আনন্দ করতে থাকে। কিন্তু এটা হল ঘোর অজ্ঞানের অবস্থা, কারণ এখনও তার বুদ্ধি বিকশিত হয়নি; বুদ্ধি দূরের কথা মস্তিষ্ক এখনও উন্নত হয়নি। যিনি পরমহংস, তিনিও এভাবেই আচরণ করেন। একটা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন শিশু আর একজন শ্রেষ্ঠতম পরমহংস, দুজনের আচরণে কোন তফাৎ থাকে না।

শিশু যখন আরও বড় হয়ে যায়, তখন সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটা পদার্থ রূপে দেখে। যাদের মন অজ্ঞানে পড়ে আছে, বুদ্ধি যাদের বিকশিত হয়নি, তারা পুরো জিনিসটাকে একটা পদার্থ রূপে দেখে, যেমন অন্ধকারে পুরো জিনিসটা এক হয়ে যায়। অজ্ঞানে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ওই এক রূপে

দেখায়। বুদ্ধি যখন একটু একটু করে বিকশিত হতে থাকে, তখন বহু দেখতে শুরু করে। আমরা দেখি মা আলাদা, বাবা আলাদা, ভাই আলাদা, বোন আলাদা, এখান থেকে মনে অশান্তি শুরু হয়। সেখান থেকে যখন চৈতন্য হয়ে যায়, তখন আবার সব এক দেখে। তফাৎ হল, আগে যেটা পদার্থ রূপে এক দেখছিল, এখন চৈতন্য রূপে এক দেখছে। সাধনা আমাদের অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে নিয়ে যায়। অজ্ঞানে সমস্ত কিছুকে একটা পদার্থ দেখছে। বুদ্ধির একটু বিকাশ হলে, তখন ওর মধ্যে একটু তফাৎ দেখতে শুরু করে। কিন্তু সেখান থেকে আবার সেই একত্বে নিয়ে চলে যায়, তখন সব কিছুকে চৈতন্য রূপে দেখে। ওই চৈতন্যে মানুষ যখন পৌঁছে যায়, তখন সে নিজেতেই নিজে তুষ্ট থাকে, আনন্দে থাকে।

কথামৃতে বর্ণনা আছে, মাস্টারমশাই ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন। ঠাকুর সেই সময় ভাবাবস্থায় আছেন। মাস্টারমশাই দেখছেন, ঠাকুর নিজে নিজেই হাসছেন। শিশুরাও ঠিক এই রকম নিজে থেকে হাসতে থাকে। কিন্তু শিশু অন্য অবস্থায় থাকে, কিন্তু পরমহংস, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁর তুষ্টি নিজের মত থাকে। এই অবস্থাকে বলে *আত্মারাম*, এটাকেই বলে *আত্মক্রিড়ঃ*, এটাকেই বলে *আত্মরতি*। নারদীয় ভক্তিসূত্রে এই শব্দগুলির বর্ণনা আছে। আত্মারাম, আত্মক্রিড়া, আত্মরতি আলাদা আলাদা শব্দের ব্যবহার করা হয় ঠিকই, কিন্তু সব শব্দের মূল ভাব একই, আত্মার অর্থাৎ নিজের মনকে নিয়েই আনন্দে ডুবে থাকে। কিন্তু মনের মূল সেই চৈতন্যের সাথে একাত্ম হয়ে আছে।

আচার্য শঙ্কর এখানে খুব সুন্দর কথা বলছেন, মনের কামনা-বাসনাগুলি খসে পড়ে গেছে, কিন্তু শরীরতো আছে। অবতারদের কথা বাদ দিলে, সবারই কিছু কামনা থাকার জন্যই তো এই শরীরটা হয়েছে। আমারও অবশ্যই কিছু কামনা ছিল, তা নাহলে কেন আমাকে শরীর ধারণ করতে হবে। কোন সন্ন্যাসীকে যদি কেউ এসে বলে, আপনার মধ্যে এই গোলমাল আছে। সন্ন্যাসীও তার উত্তরে বলেন, 'আরে ভাই, যদি গোলমাল না থাকত, তাহলে তো আমার জন্মই হোত না। গোলমাল আছে বলেই না জন্ম নিতে হয়েছে'। এতটুকু আমাদের সবাইকে মেনে নিতে হবে। আমরা যে কজন এখানে আছি, আমাদের সবারই কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে, দুর্বলতা যদি না থাকত, তাহলে কেন আমরা জন্ম নিতাম। এবার যদি আমি জেনে যাই আমার কোন দুর্বলতা আমাকে জন্ম দিয়েছে, ওই দুর্বলতা কিন্তু পরেও আমাকে জন্ম দেওয়াবে। আপনি কি আরও এই জন্ম-মৃত্যু চক্রে ঘুরতে চান? যদি চান, তাহলে ঠিক আছে। আর যদি না চান, তাহলে আপনার ভিতরে যে শুভ গুণগুলি আছে, শক্তি দিয়ে এই শুভ গুণ দিয়ে ওই অশুভ গুণকে কেটে দিন। যদি না কাটানো হয়, তাহলে ওই দুর্বলতা গুলি বাড়বে, আপনাকে বারবার এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরপাক খাওয়াতে থাকবে।

যেমন যার ভিতর ক্রোধ আছে, তার ভিতর ভালবাসাও আছে, শক্তিও আছে; ওই ভালবাসা দিয়ে ধীরে ধীরে ক্রোধ রিপুকে জয় করুন। যদি না করেন, ওই ক্রোধই আপনাকে আবার একটা শরীর ধারণ করাবে এবং ঘোরাতে থাকবে। যে কোন জিনিসই হোক না কেন, যেমন কেউ হয়ত সঙ্গীত খুব ভালবাসে, সঙ্গীতকে ভালবাসা, সঙ্গীত শুনতে ভাল লাগা, এতে দোষের কিছু নেই; কিন্তু ওর প্রতি যদি আসক্তি থাকে, তার মানেই ওটার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে। এটাই তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘোরাতে থাকবে। কখন কোকিল হয়ে সব সময় কুহু কুহু করে গান করে যাবে, কখন টুনটুনি বা দোয়েল হয়ে শিস্ দিয়ে গান করবে, নয়তো ঝিঁঝি পোকা হয়ে সারা রাত একটা ছন্দে ঝিঁ ঝিঁ করতে থাকবে, আবার কখন মানুষ রূপে বড় শিল্পী হয়ে জন্মাবে আর জলসায় জলসায় গান করে বেড়াবে। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরোতে হলে প্রথমে আসক্তিটা ত্যাগ করতে হবে।

আচার্য বলছেন, আসক্তিটা না হয় ত্যাগ করল, আর এই জন্মেই ত্যাগ করল; কিন্তু শরীরটা তো থেকে গেছে, এই শরীরের পিছনে যে কামনাগুলো ছিল, যে কামনা-বাসনার জন্য এই শরীর ধারণ করতে হয়েছিল, সেগুলো তো থেকে গেল। তার মানে, একটা জিনিস সর্বদা আমাকে সামনের

দিকে ঠেলে যাচ্ছে, আর অন্য দিকে সামনে আর কোথাও যাওয়ার নেই, তখন কি হবে? তাহলে তো সে পাগল হয়ে যাবে। কারণ তাঁর দেহটা আছে, কিন্তু দেহের কোন উদ্দেশ্য নেই। কোন লোককে যদি বাজারে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়, তখন পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সে কিছু কিনতে এসেছে। কিন্তু যার কেনার কিছু নেই, কিন্তু এমনিতেই বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কোন বন্ধু দেখলে তাকে জিজ্ঞেস করবে, 'কি! কোন কাজ নেই, এমনি হাওয়া খেতে ঘুরতে বেরিয়ে গেছ'? বড় বড় শপিং মলে অনেকেই এমনি ঘুরে বেড়ায়, কিছুই কিনবে না। বুঝতে হবে মাথায় গোলমাল আছে। মাথায় গোলমাল না থাকলে, কোন কিছু কেনার নেই, মিছি মিছি কেন সে ঘুরে বেড়াবে! যার কাজকর্ম নেই, সময় কাটতে চাইছে না, তারা ওই জল কাদায় প্যাচপ্যাচ করা, আঁষটে গন্ধ ছড়ানো মাছের বাজার, সবজীর বাজারে ওই ভীড়ের মধ্যে কেন ঘুরে বেড়াবে। বুঝতে হবে মাথায় নির্ঘাৎ কোন গোলমাল আছে। কিন্তু যার দরকার আছে, সে যত অসুবিধাই হোক সেখানে যাবে। মর্গে, লাশকাটা ঘরে কে যেতে চাইবে? যার ওখানে কাজ থাকে, ডিউটি থাকে তারাই যাবে। বিনা কাজে যদি কেউ মর্গে যেতে চায়, তাহলে বুঝতে হবে তার মাথায় গণ্ডগোল আছে। ঠিক সেই রকম এই সংসারে যার কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন অভিপ্রায় নেই, সে কেন সংসারে থাকতে যাবে, কি নিয়ে সংসারে থাকবে! আচার্য বলছেন, তাহলে বুঝতে হবে সে উন্মত্ত প্রমত্ত, ওর মাথাটা গেছে।

আচার্য তখন বলছেন, কিন্তু তা হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞরা এই জগতে এই শরীরে থাকেন ঠিকই, কিন্তু *আত্মন্যেবা আত্মনা তুষ্টঃ*, সে নিজের আত্মাকে নিয়ে আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে। আত্মার আনন্দে, আত্মার চৈতন্যে নিজেকে তিনি ডুবিয়ে রাখেন। ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, এবার তাঁর সময় কাটতে চাইবে না। উত্তরকাশীতে সন্ন্যাসীদের খাওয়া-পড়া জুটে যায়, নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই পেয়ে যাবেন, শুধু সময় কাটানোর উপায় পাবেন না। উত্তরকাশীতে একটা আশ্রমে শাস্ত্র পাঠ হত। শাস্ত্র পাঠ শোনাটা কারুর জন্যই বাধ্যতামূলক নয়, সব সাধুই স্বাধীন। ওদিকের লোকেরা হিন্দী ভাষী, ওনারা কথাগুলোকে ছন্দে বেঁধে একটু ছড়ার মত করে বলে। একজন পাঞ্জাবী সাধু সেখানে শাস্ত্র পাঠ শুনছিলেন। একজন সন্ন্যাসী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি নিয়মিত এখান শাস্ত্র পাঠ শুনতে আসেন'? উনি বললেন যে নিয়মিত এখানে আসেন। তার সাথে উনি মানছেন যে আমি সব কিছু বুঝতে পারি না। কিন্তু তারপরেই হিন্দীতে যে কথাটা বললেন, খুব সুন্দর কথা, 'পঠন পাঠন করনে সে ভটকন্ সে বাচ যাতে হ্যায়', নিয়মিত শাস্ত্র শ্রবণ, শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্র আবৃত্তি করলে মনের চঞ্চলতা থেকে বেঁচে যায়।

সাধুরও মন চঞ্চল হয়ে দৌড়াতে থাকে, কারণ ফাঁকা সময়, কোন কাজ করতে হচ্ছে না, অন্নছত্রে খাবার পেয়ে যাচ্ছে, এখান ওখান থেকে জামাকাপড় কম্বল পেয়ে যাচ্ছে; ভারতবর্ষ এমন একটা জায়গা, যেখানে মহামুর্খ সাধুও দু-চারজন ভক্ত পেয়ে যাবে। এভাবে তার খাওয়া-পরাটা চলে যায়। কিন্তু এরপর সারাটা দিন সে করবেটা কি? সেইজন্য পাঞ্জাবী সাধু বলছেন, 'পঠন পাঠন করনে সে ভটকন্ সে বাচ যাতে হ্যায়'। বয়স্ক মানুষরা এত অশান্তিতে কেন ভোগেন? কারণ তার কোন অবলম্বন নেই, যেটা দিয়ে মনটাকে ধরে রাখবেন। বাড়িতে, আশেপাশের পরিচিতদের একবার বলে দেখুন, চলুন গীতার আলোচনা হচ্ছে শুনি। শুনবে তো নাই, উল্টে বলবে, আরে ঠাকুর বলে দিয়েছেন দশবার গীতা বললে যা হয়, ত্যাগী, এই তো হয়ে গেল, আর কি গীতাতে জানার আছে! এতটুকুতেই যদি গীতা বুঝে নেওয়া যেত তাহলে তো হয়েই যেত, কিন্তু কোথাও কি কিছু ত্যাগের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? কথামৃতও একটা কথাতেই বুঝে ফেলা যায়, ঈশ্বরই সত্য বাকি সব অসৎ। তাও লোকেরা এত কথামৃত পড়ছে কেন? পড়ছে যাতে মন ভটকনে না চলে যায়। শাস্ত্র পঠন পাঠন করলে ভটকন্ থেকে বেঁচে থাকে। সাধুদের এই ভটকনের জন্য মাথা খারাপ হয়ে যায়। আত্মারাম যদি না হয়, ঈশ্বর চিন্তনে মন যদি ডুবে না থাকে সাধুদের মাথার গোলমাল হবেই হবে। সাধুদেরই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে ভাবুন সংসারে যারা আছে, যারা বয়স্ক, তাদের কি দুরবস্থা!

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখন একটা নূতন শাখা এসেছে, যেমন বাচ্চাদের রোগের জন্য paediatric, ঠিক সেই রকম এখন এসেছে geriatric, যারা বৃদ্ধ মানুষ শুধু তাঁদের জন্য। তাঁদের জন্যও নাকি কাউনসেলিং দরকার। কিসের কাউনসেলিং, সারা জীবন আপনি কাটিয়ে এলেন, এখন বৃদ্ধ বয়সে এসে আপনার দরকার পড়ল কাউনসেলিংএর? কারণ ধর্মের কাজ বৃদ্ধ বয়সে হয় না, ধর্ম জীবন অনেক অল্প বয়স থেকে শুরু করতে হয়। গীতা শোনা, কথামৃত শোনা অনেক কম বয়স থেকে শুরু করতে হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে পঠন পাঠনের মাত্রাটাও বাড়িয়ে দিতে হয়। আচার্য এটাই বলছেন, সংসারে যা কিছু আছে, যা কিছু অনাত্ম বস্তু আছে, সেখান থেকে সন্ন্যাসীর অলং বুদ্ধি হয়ে যায়, সেখান থেকে সন্ন্যাসী সরে আসে। ফলে এই তিনটে এষণা; পুত্রৈষণা, বিত্তৈষেণা আর লোকৈষণা, ত্যাগ হয়ে যায়। পুত্রৈষণা, আমার সন্তান হোক, বৃদ্ধাবস্থায় যে আমার অবলম্বন হবে; বিত্তৈষণা, আমার টাকা হোক, যাতে আমার সংসার নির্বাহ করতে পারি আর লোকৈষণা, মৃত্যুর পর আমি যেন উত্তম লোকে যেতে পারি। পুত্র আর বিত্ত এই সংসারের জন্য, লোকৈষণা মৃত্যুর পরে। সন্ন্যাসী ইহলোক আর পরলোক কোনটাই চায় না, সন্ন্যাসী এই দুটো লোকের পারে। তাহলে সন্ন্যাসী কি নিয়ে থাকবে? আত্মারাম হয়ে, নিজের মনের মধ্যেই তুষ্টি, ঈশ্বর চিন্তন নিয়ে, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, যার কোন কামনা-বাসনা নেই, যার কোন বিকার নেই, যে সব কিছুর পারে, আমি সেই অনন্ত, আমি সেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক; এই ভাবকে নিয়েই সে দৃঢ় হয়ে যায়, এই ভাবকে নিয়েই সে বসে থাকে।

অর্জুন জানতে চাইলেন, তিনি যখন একা থাকেন তখন কি করেন? তিনি চুপচাপ নিজের মধ্যে ডুবে থাকেন, মনে কোন কামনা-বাসনা নেই, মন থেকে তাঁর সব কামনা-বাসনা খসে পড়ে গেছে। সমস্ত কামনাগুলিকে তিনটে শ্রেনীতে ফেলে দিলেন, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা আর লোকৈষণা। সন্তান লাভের ইচ্ছা, টাকা-পয়সার ইচ্ছা, ভাল লোকে যাওয়া, এই ইচ্ছাগুলো যদি না থাকে আমরা তো পাগল হয়ে যাব। বলছেন তা না, স্থিতপ্রজ্ঞ ঈশ্বর চিন্তন নিয়ে ঈশ্বরে ডুবে থাকেন; আত্মাতে আত্মার আনন্দেই বুঁদ হয়ে থাকেন। তাঁর আর বাইরে কোন অবলম্বন দরকার পড়ে না। পরের মন্ত্রে দেখাচ্ছেন, আমরা আরও কিভাবে স্পষ্ট বুঝতে পারব, ইনি স্থিতপ্রজ্ঞ কিনা –

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।৫৬।।

(দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে নিঃস্পৃহ এবং আসক্তিশূন্য, ভয়মুক্ত ও ক্রোধরিহিত মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলে উক্ত হন।)

আগের শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞের কথা বললেন, এই শ্লোকে বলছেন স্থিতধীর কথা। দুঃখে যাঁর মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখে স্পৃহা শূন্য আর তার সাথে তিনটে জিনিস যাঁর চলে যায়, রাগ, ভয় ও ক্রোধ; এই ধরণের মানুষকে বলা হয় স্থিতধী। বলছেন দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, দুঃখ তিন প্রকার– আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। কিছু দুঃখ হয় যেটা ভিতর থেকে আসে, যেমন জ্বর, কারু যদি করোনা হয়, এটা তার ভিতরের দুঃখ। কারণ জ্বর হলে ভিতর থেকে তাপ সৃষ্টি করে। আধিভৌতিক মানে –কিছু দুঃখ বাইরের প্রাণীদের কাছ থেকে সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন মানুষই মানুষের জন্য কিছু সমস্যা তৈরী করে; তাছাড়া সাপ, বিছে, বন্যপশুও সমস্যা সৃষ্টি করে। আর কিছু সমস্যা দেবতারা দেন, এটাকে বলছেন আধিদৈবিক। যেমন বন্যা, খরা, ভূমিকম্প হল। কিছু সমস্যা আছে যা দেবতাদের কাছ থেকে আসে; কিছু সমস্যা আসে আশপাশের মানুষ ও জীবজন্তু থেকে, এটাকে বলছেন আধিভৌতিক। আর কিছু আসছে ভিতর থেকে। করোনা প্রথমে আধিভৌতিক হয়ে আসছে, কারণ বাইরে থেকে একটা ভাইরাস থেকে আসছে। মানুষের ভিতরে এসে গেলে যার প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাল সে করোনাকে absorb করে নিল, তার কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। যদি সেই ক্ষমতা না থাকে তখন তার জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি হয়ে যাবে, তখন করোনা আধ্যাত্মিক হয়ে গেল।

বলছেন, সাধু সন্ন্যাসীদেরও এই তিন প্রকার দুঃখ আসে। আম্ফান চলে যাওয়ার পর মঠের সন্ন্যাসীরাও চারদিন বিদ্যুৎ বিহীন ছিলেন; জল নেই, আলো নেই; আম্ফান একটা দুর্যোগ, এটা আধিদৈবিক। সন্ন্যাসীদেরও গালাগাল শুনতে হয়, তাঁদেরও সমালোচনা হয়, ঝগড়াঝাটি হয়। এই তিন প্রকার দুঃখ সাধুদেরও আসে, আবার যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁদেরও আসে, কিন্তু এই দুঃখের জন্য তাঁরা উদ্বিগ্ন হন না। ঠিক তেমনি যখন সুখ আসে, ভাল কিছু হয়ে গেল, তাঁরা মনে করেন, এসেছে আসুক। এতে আহামরি কিছু হয়ে যায় না।

দুঃখকে বলে অনিষ্টপ্রাপ্তি, সুখকে বলে ইষ্টপ্রাপ্তি। মনের মত কিছু হয়ে গেলে সেটা হয়ে যাবে সুখপ্রাপ্তি, মনের বিপরীত কিছু হয়ে গেলে সেটাকে বলছে দুঃখ। ছোটবেলা একবার যদি জ্বর হয়ে যেত, সবাই খুব খুশী হয়ে যেতাম, আজ আর স্কুল যেতে হবে না। বড় হওয়ার পর জ্বর হলে বিরক্ত লাগত। আর এখন হলে তো আতঙ্ক লেগে যাবে, কি জানি করোনা হয়নি তো। বলার আগেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ আর একজন সাধুপুরুষ, এই দুজনের মাঝখানে তফাৎ কোথায় হয়? কারণ দুঃখ সবারই আসে, আর সুখও সবারই আসে। সাধারণ মানুষ এটা বোঝে না যে, আমার যে দুঃখ এসেছে আমার কর্মের জন্য এসেছে, কিংবা পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। গ্রামে একজন একটা বাড়ি বানালো, ঝড়ে সেই বাড়ি উড়ে গেল। বাড়িটা রক্ষা করার জন্য সব রকম চেষ্টাই করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়ি রক্ষা করতে পারল না। এখন তার টাকা-পয়সাও সে-রকম নেই যে আরেকটা বাড়ি বানাবে, কিন্তু যে কারণেই হোক একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। জ্ঞানী পুরুষ বলবেন, ভাই বাড়ির যা হবার হয়ে গেছে কি করা যাবে, এখন চলো কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাক। অজ্ঞানী পুরুষ কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। আমার মত অভাগা আর কেউ নেই, হে ঠাকুর আমারই কেন এই দুরবস্থা হল। তারপর এখানে মাথা ঠুকছে, ওখানে মাথা ঠুকছে।

একজন ভাষ্যকার বলছেন, জ্ঞানীরা একটা শাস্তি পান, আর অজ্ঞানীরা ডবল শাস্তি পায়। কিভাবে ডবল শাস্তি পায়? একেই তো তার সমস্যা হয়ে গেছে, সেটার জন্য দুঃখ আছে, তার সাথে এবার দৌড় করতে শুরু করে দিল। এই মন্দিরে যাচ্ছে, ওই বাবাজীর কাছে যাচ্ছে, এর-ওর কাছে থেকে মাদুলি আদি জোগাড় করতে যাচ্ছে, এটাকে বলছেন ডবল শাস্তি। দুঃখ এসেছে, ধৈর্য ধারণ করে সহ্য কর, কিছু দিন পর চলে যাবে। কারণ এই জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, এই দুঃখও একটা সময়ের পর চলে যাবে, ধৈর্য ধরো। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি ধৈর্য ধরে বসে থাকেন। যারা অজ্ঞানী, তারা ছটফট করে, ফলে তাদের কষ্টটাও দ্বিগুণ হয়ে যায়।

যখন সুখ আসে তখনও তাই। জ্ঞানী জানেন, আমার কর্মে ছিল তাই এই সুখ এসেছে। কিন্তু অজ্ঞানীর আর আনন্দের সীমা থাকে না, আমার মত ভাগ্যবান, আমার মত সুখী কেউ নেই। একটা পঞ্চায়েত ইলেকশান জিতে আসার পর এক বিশাল বিজয় মিছিল বার করবে। ইলেকশানে জেতাতে তোমার কি আছে! মানুষ ভোট দিয়েছে, ঠাকুরের কৃপা আছে, তোমার কর্ম আছে, তুমি জিতেছ। কিন্তু এবার বিজয় মিছিল বার করতে হবে। যারা হেরে গেছে, তারা মনে রাখে, এবার না হয় জিতে গেলে, সামনের বার যখন তুমি হারবে, তখন তোমাকে আমি শিক্ষা দেব।

১৯৮৮-৮৯ সালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এক এক করে যখন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির পতন হতে লাগল, তখন লোকেরা বাড়ি থেকে কম্যুনিস্ট ক্যাডারসদের টেনে হিঁচড়ে বার করে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। কারণ যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এত লাফিয়েছে, নিজের আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষদের তারা এত কষ্ট দিয়েছে যে, তাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার পর পাবলিক রাস্তায় টেনে এনে পিটিয়ে মেরেছে। এমন বাজে ভাবে মেরেছে, এটাকে কেউ আমরা অনুমোদন করতে পারি না, কিন্তু এই রকমই সব জায়গায় হয়ে থাকে।

যারা ভদ্রলোক, বিশেষ করে যাদের আমরা বনেদী বলি, যারা সত্যিকারের শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের লোক, তারা কখন তাদের টাকা, ঐশ্বর্যকে দেখিয়ে বেড়ায় না। একটা বিশেষ কোন ক্ষেত্রে, মেয়ের বিয়ে দিল, একটা ভাল অনুষ্ঠান করে দিল, লোকেরা বুঝতে পারে এর ঐশ্বর্য আছে। কিন্তু যার কাঁচা টাকা, সে সবাইকে দেখিয়ে বেড়াবে। তারপর যখন অবস্থা পড়ে গেল, তাকে দেখে তখন সবাই হাসাহাসি করে। স্থিতপ্রজ্ঞ জানেন, দুঃখ যেটা এসেছে, এটা আমার জন্য আসেনি; সুখ যেটা এসেছে, এটাও আমার জন্য আসেনি। সেইজন্য তিনি উভয় ক্ষেত্রেই শান্ত থাকেন। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের মন একমাত্র বর্তমানকে নিতে পারে, মন অতীতকেও নিতে পারে না, ভবিষ্যতকেও নিতে পারে না।

আগেকার দিনে সিনেমায় যে প্রজেক্টর থাকত, তাতে রিল ঘুরছে, আলোর সামনে যে ফ্রেম আসছে, সেই ফ্রেমটাই পর্দায় দেখাবে। যে ফ্রেম বেরিয়ে গেল, সেটারও দাম নেই, যে ফ্রেম আসছে, সেটারও দাম নেই। মন হল সেই প্রজেক্টরের মত, যেখানে রীলগুলো চলছে। আমাদের কাছে বর্তমানটাই সত্য, আর বর্তমানকে অনন্ত বলে বোধ হয়। দুঃখ এলে আমাদের মনে হয়, কোন দিন আমার এই দুঃখ যাবে না। তেমনি সুখ যখন আসে, তখন মনে হয়, কোন দিন আমার এই সুখ যাবে না। কিন্তু পিছনে একটা শঙ্কা লেগে থাকে, তাই মন্দিরে মন্দিরে দৌড়ায়, হে ঠাকুর তোমার কৃপায় এই সুখ এসেছে, এই সুখ যেন আমার জীবন থেকে চলে না যায়। তাদের এই বোধ নেই যে, এই জগতে চিরস্থায়ী বলতে কিছু নেই। জ্ঞানী এই সত্য সম্বন্ধে সজাগ, সেইজন্য তিনি ধৈর্য ধরে সুখে ও দুঃখে সমানভাবে অবিচল থাকেন।

ফলে কি হয়, *বীতরাগভয়ক্রোধঃ*, এই তিনটে ইমোশান রাগ, ভয় আর ক্রোধ আমাদের সবাইকে নাচিয়ে বেড়ায়। রাগ মানে এখানে অনুরাগ, ভালবাসা, আসক্তি, যার জন্য সব কিছুকে ধরে রাখতে চায়। সব সময় আশঙ্কা, আমার ভালবাসার জন যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। আর সত্যিই যখন হাতছাড়া হয়ে যায় তখন ক্রোধের উৎপত্তি হয়। গীতাতেই পরে শ্লোক আসবে, যেখানে বলবেন মানুষের কেন ক্রোধ হয়। আসক্তি আছে বলে ভয়, আর চলে গেল, তখন হবে ক্রোধ। ওর জন্য আমার এটা হয়েছে, আমি ওকে দেখে নেব, এর বদলা আমি নিয়ে ছাড়ব। নিজে যদি না পারে, তখন বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়ে বদলা নেওয়ার চেষ্টা করে যাবে। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি রাগ, ভয়, ক্রোধ এই তিনটের পারে চলে যান, এগুলোতে তাঁর কিছুই হয় না। তখন বলা হয় স্থিতধী।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভাবধারায় এবং পরম্পরাতে সবাইকে গীতা মুখস্থ করতে বলা হয়। শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ চাইতেন, যাঁরা ব্রহ্মচারী হয়ে সঙ্ঘে এসেছেন, তাঁরা যেন পুরো গীতা মুখস্থ করে নেন। ব্রহ্মচারী ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিং শেষ করা পর্যন্ত যদি কোন ব্রহ্মচারী পুরো গীতা মুখস্থ করে নিতেন, উনি ওনার তরফ থেকে সেই ব্রহ্মচারীকে স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলীর একটা পুরো সেট উপহার স্বরূপ দিতেন। তখনকার দিনে কোন সাধু ব্রহ্মচারী যদি স্বামীজীর কমপ্লিট ওয়ার্ক্স পেয়ে যায়, তাও আবার স্বামী রঙ্গনাথানন্দের হাত থেকে, তাঁর কাছে একটা বিরাট ব্যাপার। সাধু, সন্ন্যাসীদের কাছে তখন এত টাকা-পয়সা থাকত না, এখনও নেই, কিন্তু তখনকার দিনে একেবারেই ছিল না। অনুষ্ঠান করে স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর হাত থেকে স্বামীজীর সমগ্র রচনাবলী পাওয়াটা যে কোন ব্রহ্মচারীর কাছে একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। এটা গেল সাধু ব্রহ্মচারীদের জন্য।

কিন্তু যাঁরা গীতা শুনতে আগ্রহী, গীতা কি বলছেন জানতে আগ্রহী, তাঁদের জন্যও বলা হয় গীতা পুরোটাই মুখস্ত করে নিতে। তবে পুরো গীতা যদি না মুখস্থ করা যায়, তবে খুব কম করে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের আঠারোটা শ্লোক অবশ্যই সবার মুখস্থ করে রাখা দরকার। এরপর হল পঞ্চোদশ অধ্যায়, ছোট্ট এই অধ্যায়টাই একটা সম্পূর্ণ শাস্ত্র। হিন্দুদের আধ্যাত্মিক পরম্পরার যে সারতত্ত্ব, তার পুরোটাই এর মধ্যে দেওয়া আছে। পঞ্চোদশ অধ্যায়ের পর দ্বাদশ অধ্যায়ও খুব মূল্যবান অধ্যায়।

পুরো গীতা মুখস্ত করা সম্ভব না হলে, এই তিনটেকে –দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণের আঠারোটি শ্লোক, পঞ্চোদশ অধ্যায় আর দ্বাদশ অধ্যায় সবাইকে মুখস্ত করতে বলা হয়।

আমরা আলোচনা করলাম ভগবান বলছেন দুঃখে উদ্বিগ্ন হয়ো না। দুঃখ সবারই জীবনে আসে, সাধু মহাত্মাদেরও আসে, ঠাকুরেরও এসেছে, স্বামীজীরও এসেছে, দুঃখের মত সুখও সবারই জীবনে আসে। একটা প্রচলিত কথা আছে, This too shall pass, কিন্তু আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলি না। অপরকে উপদেশ দেওয়া সহজ, লেকচার বাজীও সোজা, কিন্তু যার হয় সে বোঝে। আমরা যদি বিচার করি, জীবনে সবচেয়ে বেশী কষ্ট আমাকে কে দিয়েছে? দেখা যাবে যারা আমার ভাল চেয়েছেন, তারাই সব থেকে বেশী আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। বাবা-মা তাঁদের আশা-আকাঙ্খা মেটাতে আমার ঘাড়ে ধরে আমাকে দিয়ে সব করিয়ে গেছেন। তারপর স্কুলের শিক্ষকদের কড়া শাসন, এরপর সমাজ তার শৃঙ্খলার বেড়াজালে আটকে রেখে আমাকে ভাল করতে চেয়েছে, আর ইদানিং বুদ্ধিজীবিরা, যুক্তিবাদীরা আমার ভালর জন্য কত কথা বলে যাচ্ছে।

যুক্তিবাদী বন্ধুরা বলছে, সূর্যগ্রহণে 'এই করতে হবে, সেই করতে হবে' বলা সব কুসংস্কার। কিসের কুসংস্কার? তোমার বিজ্ঞান বলবে racial memori; তোমরা বলবে collective unconscious; আর আমরা দুটোকে মিলিয়ে বলি racial consciousness, একজন মানুষের চিন্তা-ভাবনা আরেকজন মানুষকে ছোঁবে, এটা সবাই জানে। সবাই যেখানে খুশী আছে, সেখানে আপনিও যদি যান, আপনি মনমরা হলেও আপনার খুশী খুশী লাগবে। একজনের মন আরেকজনকে প্রভাবিত করে এটা জানা কথা। এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই, এটা বাস্তব। একটা জাতি সাত হাজার আট হাজার বছর ধরে জানে, এই নক্ষত্র, এই গ্রহ আর এই ক্ষণ, এটা অশুভ। আমরা এটা মানি, মানি বলেই আমরা হিন্দু। যারা মানবে না, তারা অন্য কিছু হয়ে যাবে। আপনি একদিকে বলবেন আমি হিন্দু, অন্য দিকে মানবেন না, সেটা হয় না। একজন খ্রীশ্চান, সে বলছে আমি খ্রীষ্ট ধর্মের এগুলো মানি, কিন্তু এই জিনিসগুলিকে মানি না। এভাবে হয় না, তাহলে আপনি আলাদা একটা ধর্ম তৈরী করুন। যেমন মার্টিন লুথার কিং, তিনি বলছেন, আমি খ্রীশ্চান কিন্তু আমি চার্চকে মানব না। তিনি অন্য ধর্ম দাঁড় করিয়ে দিলেন, প্রোটেস্টান্ট। সেইজন্য ধর্মের জিনিসগুলোকে নিয়ে চেঁচামেচি করার কোন অর্থ হয় না।

আর এটা হচ্ছে, collective consciousness। একটা জাতি এগুলোকে যে কোন কারণেই হোক, হাজার হাজার বছর ধরে মেনে আসছে। তার মধ্যে ভুল থাকতে পারে, সেটা কোন মহাপুরুষ এসে ঠিক করে দেবেন। আমাদের মধ্যে সেই ক্ষমতা নেই যে, ধর্মের চেতনাকে আমরা চাইলেই অন্য খাতে নিয়ে যেতে পারব, এখানে সামাজিক চেতনার কথা বলা হচ্ছে না, এটা ধার্মিক চেতনা। আগে আপনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হন, আগে সেই অবস্থায় যান, তারপর আপনি নিজের ক্ষমতায় পাল্টে দেবেন, স্বামীজী যেমন অনেক কিছু পাল্টে দিয়ে গেছেন। এখানে কোন উপদেশ দিচ্ছেন না, গীতা কোন উপদেশ দিচ্ছেন না, গীতা একবারও বলছেন না যে, তুমি এটা কর, সেটা কর।

হিন্দু ধর্ম অন্য ধর্ম থেকে আলাদা। এই আলাদার পিছনে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, হিন্দু ধর্ম কাউকে উপদেশ দেয় না। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, তোমাকে এই রকম করতে হবে, যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, তোমাকে এটাই করতে হবে; হিন্দুরা কখন উপদেশ দিয়ে কাউকে বলে না যে, তোমাকে এটাই করতে হবে। আমরা যখন বলছি গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই রকম বলেছেন, তার মানে এই নয় যে তোমাকে এই কথা মানতে হবে। হিন্দুরা বলতে চাইছেন, এই সত্যটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে এসেছে, তুমি যদি অনুশীলন কর, তুমিও এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে।

একজন হঠাৎ উদয় হয়ে বললেন, 'ভগবান আমাকে আদেশ করেছেন, তোমাদের আদেশ দেওয়ার জন্য'। তোমাকে ভগবান আদেশ দিয়েছেন, আমি কি করে জানব? একবার এক সাধু

আমাদের জেনারেল সেক্রেটারিকে গিয়ে বলছেন, 'ঠাকুর আমাকে বলেছেন, এই রকম করতে'। জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ হেসে বললেন, 'ঠাকুর আমাকে এ-রকম কিছু বলেননি, এরপর ঠাকুর যদি আপনাকে কিছু বলতে আসেন, বলবেন আমাকে এসে বলতে'। যে কোন প্রফেট যখন বলেন, ঈশ্বর তাঁকে এটা আদেশ করেছেন অপরকে বলার জন্য। তাহলে বলতে হবে, ঈশ্বরকে বলবেন, আগে আমাকে এসে যেন বলেন। হিন্দু ধর্ম শাশ্বত সত্য নিয়ে চলে, এখানে এভাবে কেউ বলতে যাবেন না যে, ভগবান বলেছেন, তুমি শোন। আমি বলছি তুমি শোন, এই ভাবে হিন্দু ধর্ম একেবারেই চলে না। হিন্দু ধর্ম বলে, এটাই সত্য, তুমি সাধনা কর, তুমিও জানতে পারবে। এই সত্যটা কার মুখ দিয়ে এসেছে? শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে। এই সত্য কার মুখ দিয়ে এলো? শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে। এই সত্য কোথা থেকে এলো? বেদ থেকে এসেছে, উপনিষদ থেকে এসেছে; এ-ছাড়া আর কিছু না। উপনিষদ যখন বলছেন, *ইত্যাদেশঃ*, সেখানে এটা বলছেন না যে, আমি বলছি তুমি শোন। আমি কেন শুনব আপনার কথা, আপনি যা আমিও তাই, ঊনিশ বিশের তফাৎ। আপনার বয়স বেশী, আপনার পড়াশোনা বেশী কিন্তু তাই বলে আপনার কথা মত আমি আমার জীবনটাকে কেন দিয়ে দেব! হিন্দু ধর্ম কখন এভাবে কাউকে আদেশ দেয় না, হিন্দু ধর্ম বলে, এটা শাশ্বত চিরন্তন সত্য। গীতা আমরা যা কিছু আলোচনা করছি, এগুলো সব হল সেই শাশ্বত সত্য। যাই হোক, পরের শ্লোকে ভগবান বলছেন –

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৭।।

(যিনি সব বস্তু ও ব্যক্তিতে স্নেহবর্জিত এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় উপস্থিত হলে যিনি যথাক্রমে আনন্দিত বা দুঃখিত হন না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছেন।)

এতক্ষণ দুঃখের কথা, সুখের কথা বললেন; বলার পর বলছেন, *বীতরাগভয়ক্রোধঃ*, অনুরাগ, আসক্তি, ভয় আর ক্রোধ এই তিনটে থেকে বেরিয়ে এসো। এই তিনটে থেকে যে বেরিয়ে গেল, যার কোন কিছুর প্রতি অনুরাগ নেই, আসক্তি নেই, ভয় নেই, ক্রোধ নেই, তিনি তো এমনিতেই একজন মহাত্মা হয়ে গেলেন। গীতা বলছেন বলে এটা শুধু সত্য না, এটাই শ্বাশত সত্য। গীতা কেবল আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যে মানুষ এই ধরণের, সংসার তাঁর মনে কোন ভাবেই ছাপ ছাড়তে পারে না। সংসার আমার আপনার উপর কেন ছাপ ফেলতে পারে? কারণ আমাদের ভিতর এই তিনটে জিনিস আছে –কিছু জিনিসকে ভালবাসি, কিছু মানুষকে ভালবাসি। তারা আমার জীবন থেকে চলে যেতে পারে, আমি তাদের জীবন থেকে চলে যেতে পারি, ভাবলেই ভয় হয়। যার ক্ষমতা নেই, তার মনে ভয়, যার ক্ষমতা আছে তার ভিতর ক্রোধ। এরপর তো বাকি সব কিছুই জুটে যাবে, সংসারখেলা পুরো জমে উঠবে।

গীতা দু-ভাবে এটাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসছেন। প্রথম হল, মহাপুরুষরা এর বাইরে। তা এসব শুনে আমার কি হবে! বিল গেটসের কত টাকা আছে জেনে আমার কি হবে? তখন বলছেন, তা না, তুমিও এর অভ্যাস করতে পার। প্রথম প্রথম তোমার কষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু তাও কর। সিদ্ধপুরুষ যাঁরা, মহাত্মা যাঁরা, তাঁদের কাছে যে জিনিসটা স্বাভাবিক, সেটাই সাধারণ মানুষদের চেষ্টা করে করতে হয়। শচীন তেণ্ডুলকার চোখ বন্ধ করে খেললেও চার ছয় মারবে, আমি আপনি পারব না। কিন্তু যে সত্যিই ক্রিকেট খেলতে চাইছে, তাকে কোথাও তো একটা শুরু করতে হবে। শচীন, সৌরভের খেলা দেখে কেউ যদি চায়, আমিও একজন ক্রিকেটার হতে চাই। কেন হবে না, তুমিও ক্রিকেটার হতে পারবে, কোন অসুবিধা নেই। কোথাও তো তাকে একটা জায়গায় শুরু করতে হবে। তখন তাকে বলতে হয়, শচীন তেণ্ডুলকারের ক্রিকেটের মধ্যে কি কি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। এবার তার প্র্যাক্টিস করে করে সেখানে তাকে পৌঁছাতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা আজ ভগবান বলছি। আজ আমাদের এখানে সূর্যগ্রহণ ছিল, ঠাকুরকে যে নির্দিষ্ট সময়ে নৈবেদ্য আদি নিবেদন করা হয়, গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগে নিবেদন করা হয়েছে। কারণ গ্রহণে সমস্ত কিছু অশুদ্ধ হয়ে যায়। গ্রহণ চলাকালীন ভজন-কীর্তন ছাড়া কোন ধর্মীয় কাজ হয় না। সেইজন্য ঠাকুরের ভোগ গ্রহণ লাগার আগেই নিবেদন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঠাকুর যখন প্রথমের দিকে দক্ষিণেশ্বর ছিলেন, তখন কে জানত যে তিনি ভগবান। কেশব সেন, বিদ্যাসাগর ওনাদের ছেড়ে দিন, সাধারণ মানুষ যাঁরা যেমন নরেন এসেছেন, মাস্টারমশাই এসেছেন। এনারা এসে ঠাকুরের কিছু ব্যবহার, আচরণ, কথাবার্তা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। অবাক হয়ে ভাবতেন, একজন মানুষ এ-রকম কি করে হতে পারেন! ওনাদের ভিতর কোথাও একটা নাড়া পড়েছে, আমিও তো এই রকম হতে চাই, প্রকাশ্যে বলছেন না। কিন্তু আমরা যখন বলি, আপনার কথা আরও শুনতে চাই, আসলে বলতে চাইছি আমরা আপনার মত হতে চাই। ঠাকুর বলছেন, ভক্তি লাভ কর, সাধনা কর। আমাদের বলে দিলেন, কলিযুগে ভক্তিই সহজ পথ। আর অন্য দিকে সেই সময় নরেনাদি ছোকড়া শিষ্যদের দিয়ে ঠাকুর মুণ্ডু কাটা সাধনা করিয়ে নিচ্ছিলেন। সবাইকে কোথাও তো শুরু করতে হবে, গীতা আমাদের এটাই বলছেন। দুটোই বলছেন, যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ, তাঁরা যে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁর যে স্বাভাবিক গুণগুলি, সেটা বলে দিয়ে বলছেন, এখান থেকে শুরু কর।

এখানে বলছেন, *যঃ সর্বত্রানভিস্নেহঃ*। মায়াবতীতে প্রচুর জোঁক আছে। সন্ন্যাসীরা মায়াবতীতে লম্বা রাস্থায় হাঁটাচলা করেন। একদিন মহারাজরা হাঁটতে হাঁটতে চলেছেন, হঠাৎ দেখতে পান রাস্থার মাঝখানে একটা জোঁক পিছনের অংশটাকে মাটিতে লাগিয়ে সামনের অংশটাকে ঘোরাচ্ছে, যদি কোন জিনিসের আশ্রয় পেয়ে যায়, মুখটা চট করে সেখানে লেগে যাবে। যদি ওটা লোহা বা কাঠ হয়, তখন ওটা ছেড়ে দেবে। কিন্তু কোন বড় প্রাণী, মানুষ, গরু কিংবা মোষের শরীর হয়, তখন জোঁকের মুখটা ওর শরীরে লেগে যাবে। জোঁকের মুখ দিয়ে এক ধরণের কেমিক্যাল বেরোয়, যেটা চামড়ায় লাগার পর লোকাল এ্যনাস্থেসিয়ার মত জায়গাটা অবশ করে দেয়। তারপর চামড়াটা ফুটো করে ওখান থেকে জোঁক রক্ত শুষতে শুরু করে। লোকাল এ্যনাস্থেসিয়ার জন্য যার শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে সে টেরও পায় না যে, জোঁক তার শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে। এরপর ওর পেট ভরে গেলে আপনা থেকেই খসে পড়ে যাবে। চামড়ার যে জায়গাতে ফুটো করেছিল, সেখান থেকে রক্ত বেরোতে থাকবে।

আমরা মনে করি, বস্তুগুলি আমাদের কাছে আসে, এসে আমাদের প্রভাবিত করে। হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে তা হয় না। হিন্দু দর্শনে বলা হয়, বস্তু থেকে সিগনালগুলো আসতে থাকে আর চেতনাটা ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। একটা জিনিসের প্রতি যে আকর্ষণ হয়, এই আকর্ষণটা ভিতর থেকে আসে। তখন মনে হল, আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি, পঞ্চেন্দ্রিয়, যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়, আমাদের যে চেতনা, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বেরিয়ে ওই জোঁকের মত চক্কর মারতে থাকে। যেমনি দেখার মত একটা কিছু পেল, চট করে ওখানে এঁটে গেল। এবার আমি ওটাকে শুষতে শুরু করব। আমরা সবাই জোঁক, আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় জোঁকের মত ঘুরছে। আর মনও জোঁকের মত চক্কর মারছে, ভাল পুরনো স্মৃতি, ভাল কথাগুলোকে ধরার চেষ্টা করছে। এরপর আমাদের আর কষ্টের শেষ নেই। আমাদের সমস্ত কষ্টের সাধারণ কারণ এটাই। জোঁক একটা জীবন্ত প্রাণী, সে নিজের লেজের উপর দাঁড়িয়ে শুরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চক্কর দেয়, যেখানেই যেমনি লেগে গেল, খট্ করে ধরে নেবে। যেখানে আমরা ভালবাসার জিনিস পাই, যেটা আমার ইন্দ্রিয়ের ভাল লাগে, মনের যেটা ভাল লাগে; আমাদের ইন্দ্রিয়, মন ঠিক এভাবে খট্ করে বিষয়কে ধরে নেয়। বলছেন, যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ, স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁরাও ঘোরেন, কিন্তু কোন কিছুর সঙ্গে জোঁকের মত এঁটে যান না।

তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্, উনিও দেখছেন এটা শুভ, এটা অশুভ। উনি যে শুধু শুভই দেখেন, অশুভ দেখেন না, তা না। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, রাবণের মা নিকষা রাম আসছেন দেখে পালিয়ে

যাচ্ছিলেন, তাঁকে ধরা হল। ধরে আনার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, 'তোমার এত বয়স হয়ে গেছে, এখনও তোমার এত মৃত্যু ভয় কেন'? নিকষা বলছেন, 'হে রাম, আমি এতদিন বেঁচে ছিলাম তাই তোমার এত লীলা দেখলাম, বেঁচে থাকলে আরও কত তোমার লীলা দেখতে পাবো'। নিকষা জগতের সব কিছুতে ঈশ্বরের লীলাকে দেখে আনন্দ উপভোগ করছেন, যেখানে ভাল সেখানে আনন্দ করছেন, যেখানে খারাপ সেখানে দুঃখ পাচ্ছেন; কিন্তু কোন কিছুতে নিজেকে জড়াচ্ছেন না, এঁটে যাচ্ছেন না। এটাই তাঁর জীবন। ঠাকুরও শুভ অশুভ দেখছেন, স্বামীজীও দেখছেন, কিন্তু যেখানে যা কিছু আছে সবটাই স্নেহ বর্জিত হয়ে যায়, তার মধ্যে কোন স্নেহ থাকে না; ওখানে এঁটে যাওয়ার কোন ব্যাপার থাকে না। এটা যেন জোঁক লোহার উপর দিয়ে শুড়টা ঘোরাচ্ছে, কোন কিছুতে এঁটে যাবে না, বেরিয়ে চলে যাবে।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা, তাঁর কোন কিছুর প্রতি কোন অভিনন্দনও নেই, কোন দ্বেষ ভাবও নেই। *অভিস্নেহ*, কি রকম অভিস্নেহ? আচার্য এখানে বলছেন, *দেহজীবিতাদিষু*, নিজের শরীর, নিজের জীবন, এগুলোর প্রতিও তাঁর আসক্তি থাকে না। আমি বেঁচে থাকব, এই বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে যোগের ভাষায় বলা হয় অভিনিবেশ। প্রত্যেকের কাছে নিজের শরীর অত্যন্ত প্রিয় জিনিস। আর জীবন, বলা হয় বড় বড় সাধুরাও মরতে চান না। করোনার আতঙ্কে সবাই কেমন ভিতরে সিঁদিয়ে আছে, কেউই মরতে চায় না। আচার্য বলছেন, যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁদের এসবের কোনটাই হয় না।

একটা খুব সুন্দর ঘটনা দিয়ে বোঝালে জিনিসটাকে আমরা খুব সহজে বুঝে নিতে পারব। এমনিতেও এটা না বোঝার কিছু নেই। যে কোন গীতা পড়ি না কেন, অনুবাদ পড়ি, যে ভাবেই পড়ি না কেন, সহজে বুঝে নিতে পারব। কোন ইংরাজী বই বোঝার তুলনায় গীতা বোঝা অনেক সহজ। কিন্তু জীবনে আমরা নামাতে পারছি না কেন? কারণ গীতার কথাগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সেই তুলনায় আমাদের বুদ্ধি অত সূক্ষ্ম নয়। ফলে ঘটনা দিয়ে, কাহিনী দিয়ে, উপমা দিয়ে, উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হয়। এই ভাবে বুঝতে বুঝতে মনটা তৈরী হতে থাকে। এই শ্লোকটাকে ব্যাখ্যা করার অনেক উপায় আছে, চারিদিকে অনেক ঘটনা আছে, যেটাকে দিয়ে এই শ্লোকটাকে খুব সহজে বোঝান যেতে পারে।

এ্যলবার্ট স্প্যাল্ডিং আমেরিকার একজন নামকরা বেহালা বাদক ছিলেন। ওনাকে বলা হয় শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ট বাদ্যযন্ত্রী। এক সময় ওনার বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ গিয়েছিলেন। এ্যলবার্ট স্প্যাল্ডিং নিজের আত্মকথা লিখেছেন, যার নাম Rise to Follows, যদিও বইটা সহজে পাওয়া যায় না। তবে যাঁরা বইটা পড়েছেন, তাঁরা খুবই ভাগ্যবান, কারণ বইটা এক কথায় অপূর্ব। স্বামী বিবেকানন্দ ওনাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন, এবং কয়েক দিন ছিলেন। উনি তখন ছোট ছিলেন, আর ছোটবেলা থেকেই তিনি বেহালা বাজাতেন। কিন্তু তাঁর সব ঘটনা মনে ছিল। উনিও খুব সুন্দর লিখছেন, আমাদের বংশের পরম্পরার মধ্যে বসে গেছে যে, আমাদের বাড়িতে স্বামীজী ছিলেন। স্বামীজীকে কেন্দ্র করে উনি দু-চারটে ঘটনা লিখেছিলেন, যেটা পরে পরে স্বামীজীর জীবনীতেও লেখা হয়। স্প্যাল্ডিং খুব শান্ত-শিষ্ট, অত্যন্ত ভদ্র মানুষ ছিলেন। ওনার জীবনের অনেক ঘটনা তিনি এই বইতে লিখেছেন, প্রত্যেকটি ঘটনাই পাঠকের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়, খুব ভাল লাগে। এখানে আমরা দুটি ঘটনা বলছি।

তখনকার দিনে ইউরোপ ছিল শিল্পকলার কেন্দ্র। তিনি ইউরোপের একটা শহরের এক কলাকেন্দ্রে বেহালা বাজিয়েছেন। পরের দিন কাগজে ওনার বাজনাকে নিয়ে খুব সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচনা হওয়াতে তিনি খুব ভেঙে পড়লেন, ঠিক করলেন আর বেহালা বাজাবেন না। ওই শহরে তাঁর গুরুর মত একজন ছিলেন, উনি তাঁর কাছে গিয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন। গুরু

স্থানীয় যিনি, তিনি অবাক হয়ে বলছেন, But I thought you are a musician। খুব সুন্দর কথা, এর অর্থ হল, তুমি একজন মিউজিসিয়ান্, তোমার কাজ হল মিউজিকে নিজেকে পুরো ঢেলে দেওয়া, কে তোমার নিন্দা করল, কে তোমার প্রশংসা করল, তাতে তোমার কি আসে যায়। তোমার তো সঙ্গীতকে নিয়েই থাকার কথা।

আলবার্ট স্পাল্ডিংএর আর-একটা ঘটনা হল, অন্য একটা শহরে তিনি গেছেন। সেই শহরের যিনি তাঁর এজেন্ট, তিনি সব কিছু ঠিকঠাক ভাবে অর্গানাইজ করেছেন। আলবার্ট স্পাল্ডিং সব জায়গায় নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। স্ত্রী খুব বুদ্ধমতি, অতি সুন্দরী আর খুব পরিশীলিত এবং একজন সত্যিকারের সংস্কৃতিসম্পন্না মহিলা। তখনকার দিনে তাঁরও চারিদিকে খুব প্রশংসা ছিল। সকালবেলা উনি একটা জায়গায় বাজাবেন ঠিক আছে। ঘুম থেকে উঠে উনি কাগজ খুলতেই দেখেন কোথাও কোন ঘোষণা নেই যে, আজ সকালে আলবার্ট স্পাল্ডিং এই শহরের এই হলে বেহালা বাজাবেন। স্পাল্ডিং তো রেগে আগুন হয়ে গেছেন। ভোরবেলা এজেন্ট চলে এসেছেন, এজেন্টকে দেখেই উনি বকাবকি করতে লাগলেন। One of the rarest যে স্পাল্ডিং রাগারাগি করছেন। এজেন্টকে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, এজেন্ট কিন্তু শান্ত মনে শুনে যাচ্ছেন, কিছু বলছেন না, কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি করে হাসছেন। উনি আরও রেগে গিয়ে বলছেন, 'আমি এই রকম সিরিয়াস হয়ে তোমাকে বলে যাচ্ছি আর তুমি হাসছ? আমি কি এইজন্য এত দূর থেকে এসেছি? পুরো অনুষ্ঠানটাই দেখছি নষ্ট হয়ে যাবে'। স্পাল্ডিং চেঁচিয়েই যাচ্ছেন। উনি যত চেঁচাচ্ছেন, এজন্টও মিষ্টি করে হেসে যাচ্ছেন। রাগ একটু যখন কমল, তখন এজেন্ট খুব শান্ত ভাবে বলছেন, 'স্যার, আমরা এক মাস আগে ছোট করে একটা announcement করেছিলাম – আলবার্ট স্পাল্ডিং এই তারিখে এই শহরের এই হলে অনুষ্ঠান করবেন। এক দিনে আমাদের সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। হলে কোন টিকিট, এমন কি একটা পাসও অবশিষ্ট নেই। সেইজন্য আমরা আর কোন বিজ্ঞাপন দিইনি'। স্পাল্ডিং তাঁর আত্মকথায় বলছেন, আমার তো লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল।

এখানে আমরা স্পাল্ডিংকে নিয়ে বলছি না, বলতে চাইছি ওনার এজেন্টকে নিয়ে। এজেন্টের চরিত্রে আমরা দুটো জিনিস দেখছি। প্রথম, তিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; কি জ্ঞান, একদিন মাত্র স্পাল্ডিংএর নাম দিয়েছি, আর মুহূর্তে সমস্ত টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। তখনও স্পাল্ডিংএর সে-ভাবে নামডাক হয়নি। তিনি এমন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত যে, স্পাল্ডিংএর চেঁচামেচিতেও তাঁর কিছু হচ্ছে না। দ্বিতীয়, আমার একটা জানা জিনিসকে নিয়ে কেউ যদি প্রতিবাদ করতে আসে, তখন আমরা কি বলব? এত ফটর ফটর করছেন কেন, আসল ব্যাপারটা জানলে আপনি চুপসে যাবেন। এজেন্ট কিন্তু সে-ভাবে বলছেন না। এজেন্ট স্পাল্ডিংকে খুব ভালবাসেন, ওই ভালবাসার জন্য ঠাকুরমা তাঁর নাতিকে যে-ভাবে দেখবেন, indulgent love, যেখানে আপনি সবাইকে ভালবাসছেন, total inclusive love। এজেন্ট সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, উনি জানেন ইনি যা বলছেন সবটাই বকওয়াস্, অন্য দিকে তাঁর প্রতি ভালবাসা, সব সহ্য করে যাচ্ছেন। এই যে বলছেন, *যঃ সর্বত্রানভিস্নেহঃ*, পরে পরে শ্লোকে বলবেন, ঈশ্বর ব্যাতিরেকে আর কিছু নেই – তুমি যখন সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন কি হবে? আমি কেন আপনাকে ভালবাসি? কারণ আপনি আর আমি আলাদা, আর আমি চাইছি আপনাকে টেনে আমার নিজের করে নিতে। আর কাউকে দেখলে কেন আমি অসন্তুষ্ট হই? কারণ আমি মনে করি, সে আমার লোক নয়, সে আমি নই। যাকে বা যে কোন বস্তুকে যে আমি ভালবাসি, তার কারণ আমার ভালবাসাটা গিয়ে তার উপর পড়ে যায়।

এই কলমটা আমি প্রায়ই উদাহরণের জন্য ব্যবহার করি। যাঁরা দেখা করতে আসেন, তাঁরা এই পেনটা দেখে বলেন, আপনি কতবার আপনার লেকচারে এই পেনটাকে দেখিয়েছেন। অনেকে আবার এই পেনটাকে স্মৃতি হিসাবে রাখার জন্য বলে, 'আমাকে এই পেনটা দেবেন'? ইতিমধ্যে কয়েকটা পেন আমার দেওয়া হয়ে গেছে। যদি এই কলমের কোন বৈশিষ্ট্য থাকত, তাহলে সবাই এই

কলমটকেই কিনত, কিন্তু কলমটার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। যাঁরা এই কলমটা চাইছেন, তাঁরা কোথাও আমাকে ভালবেসেছেন, কোথাও আমার talksগুলো তিনি পছন্দ করেছেন। তার মানে ওনার নিজের যে ভালবাসা, সেটা এই কলমের উপরে এসে পড়ছে, সেখান থেকে তাঁর ইচ্ছা, এটাকে নিজের কাছে রাখা। তার মানে objective reality বলে কিছু হয় না। যা হয়, সব subjective reality।

এ্যরিস্টটল খুব নামকরা গ্রীক ফিলজফার ছিলেন, তিনি objectivismকে খুব দাম দিতেন। পরে Ayan Rand খুব নামকরা লেখিকা তিনিও objectivismকে খুব দাম দিয়েছিলেন; পাশ্চাত্যে objectivismএর খুব দাম। আমার ভালবাসা তার উপর বা বস্তুর উপর গিয়ে পড়ছে, এই subjectivismএরই যে শুধু দাম আছে তা না। এমন অনেক জিনিস আছে, যেটাকে সবাই ভালবাসে। যেমন তাজমহল, ওটা কি একটা objective reality, নাকি একটা subjective reality? যারা objectivismকে বিশ্বাস করে, তারা বলবেন, একটা বস্তুকে, যেমন তাজমহলকে সবাই ভালবাসে। কিন্তু আমার কাছে এটা একেবারেই ঠিক না, আমি যখন তাজমহল গেলাম, আমার মাথায় সব সময় ঘুরছিল, এটা একটা কবরস্থান। দেখতে সুন্দর হোক, যাই হোক, কিন্তু কবরস্থান তো। শ্মাশানকে কেউ ভালবাসে না, কবরকেও কেউ ভালবাসে না। এই কথা শুনলে লোকেরা আমার দিকে তেড়ে আসবে। তারা বলবে, তাজমহল একটা ভালবাসার প্রতীক।

যে জায়গাটাকে তাঁরা objectivism বলছেন, সেই জায়গাতেও objectivism থাকে না, থাকে subjectivism। *যঃ সর্বত্রানাভিস্নেহঃ*, এটা subjectivismকে দেখাচ্ছে যে, একটা বস্তুতে যে তোমার ভালবাসা যাচ্ছে, সেই ভালবাসাকে আগে তো তুমি রাঙিয়ে দিয়েছ, ওর উপরে ভাল করে মধু লাগিয়ে দিয়েছ, তারপর তুমি সেই মধুকেই চাটছ। যোগীরা এই জিনিস কখনই করেন না। যোগীদের কাছে বস্তু যেমন বস্তু তেমন, ওখানেই শেষ, আর এগোবেন না। নিজের ভিতর থেকে ভালবাসা গিয়ে আগে তাকে ঢাকা দেবে, তাকে মধুর বানাবে, তারপর ওটাকে টেনে নেবে; এই যে আপন করে নেওয়া, এই জিনিস যোগীরা করেন না। ফলে কি হয়, *নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টী* তিনি কোন জিনিসের অভিনন্দনও করেন না, নিন্দাও করেন না। এই হল যোগীদের স্বভাব।

যদা সংহরতে চায়ং কর্মোহঙ্গনীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৮।।

(ভয় পেলে কূর্ম যেমন মস্তক ও হস্তপদাদি অঙ্গসমূহ সঙ্কুচিত করে, ঠিক সেই রকম যে জ্ঞাননিষ্ঠ যোগী শব্দাদি বিষয়ঞ্চক থেকে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন।)

এক্ষুণি আমরা ব্যাখ্যা করলাম, কিভাবে আমাদের মন গিয়ে একটা বস্তুকে বা ব্যক্তিকে ঢেকে নেয়। এই শ্লোকে দুটো শব্দ আসছে – প্রথম শব্দ ইন্দ্রিয়, দ্বিতীয় শব্দ ইন্দ্রিয়ার্থ। ইন্দ্রিয় আমরা সবাই জানি, আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। জগতে যত পদার্থ থাকুক, ১১০ কিংবা ১২০ যত পদার্থই থাকুক, আগে যদিও এর সংখ্যা অনেক কম ছিল, তাতে আমাদের হিন্দুদের কিছু আসে যায় না। হিন্দুদের বক্তব্য, তোমার একশ পদার্থ থাকুক আর হাজারটা পদার্থ থাকুক, আমি যেটাকে নেব, আমি আমার এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়েই সেটা নেব। সেইজন্য আমি যে জিনিসটাকে দেখতে পারব, শুঁকতে পারব, যেটাকে আস্বাদ করতে পারব, শুনতে পারব এবং বলতে পারব –এই হল জগৎ আর এই হল বস্তু; সেটাকেই আমি নেব। আমাদের শাস্ত্র বলেন, তোমরা বস্তুকে বস্তু বলছেন ঠিকই, কিন্তু যেখানে আধ্যাত্মিক ব্যাপার এসে যায়, তখন এই বস্তুকে আমরা বলি ইন্দ্রিয়ার্থ, অর্থাৎ এই বস্তুগুলো হল ইন্দ্রিয়ের জন্য। বাংলায় আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলি। বলছেন, এই জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে, সব ইন্দ্রিয়ের জন্য। আমরা ফেঁসে যাই এই ইন্দ্রিয়ার্থগুলিকে নিয়ে। যেগুলো মনের জিনিস, সেগুলোতে আমরা ফাঁসি না। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পড়ে মনে মনে যে আনন্দ নিচ্ছি, সেটা আমাকে ফাঁসাবে না।

কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো জোঁকের মত ঘুর ঘুর করছে, আর এই ইন্দ্রিয়ার্থ, ইন্দ্রিয়ের জন্য যে বস্তুগুলো রয়েছে, সেখানে গিয়ে এঁটে যাচ্ছে। কচ্ছপ যখন বুঝতে পারে এখান থেকে তার বিপদের সম্ভবনা আছে, তখন সে নিজের হাত, পা, মুখ ভিতরে গুটিয়ে নেয়। একবার গুটিয়ে নেওয়ার পর, কচ্ছপকে কেটে দিলেও নিজের অঙ্গগুলি আর বার করবে না। আমাদের অঙ্গগুলি সব সময় বেরিয়েই আছে। যেখানে অপছন্দের ব্যক্তি বা বস্তু থাকে সেখানে আমরা অঙ্গগুলি গুটিয়ে নিই। কিন্তু ততক্ষণে তার পছন্দ অন্য দিকে থাকে, ভিতরে মন তখন ছটফট করতে থাকে। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলি গ্রহণ করে, আর বাকি পাঁচটি বাহ্যেন্দ্রিয় দিয়ে আমরা কাজ করি। বাজারে গিয়ে ভাল জিনিস দেখলে আমাদের ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, একটু দেখি তো জিনিসটা কেমন। অনেক সময় মনে হয়, আমার হাতটা যেন আমার শরীর অঙ্গই নয়, তার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বাচ্চারা যেমন, সামনে খেলনা দেখলে, না চাইলেও আস্তে আস্তে তার হাত খেলনার দিকে এগিয়ে যায়, এটা তার স্বাভাবিক আকর্ষণ।

একটা গল্প শুনেছিলাম, যদিও এই বিষয়ের সাথে সম্পর্ক নেই, কিন্তু আইডিয়াটা বুঝতে সুবিধা হবে। একটা চোর ছিল, কপাল এমন তার স্ত্রীও নামকরা চোর। বিয়ের পর ওদের সন্তান হয়েছে। বাচ্চার জন্মের পর নার্স, আয়ারা দেখছে বাচ্চাটার একটা হাত মুঠো করা। কিছুতেই তার মুঠিটা আলগা করা যাচ্ছিল না। অনেক রকম চেষ্টা করা হচ্ছে, মুঠিটা কেউ খুলতে পারছেন না। একজন বিজ্ঞ ডাক্তারকে নিয়ে আসা হয়েছে। ডাক্তার এসে বাচ্চার পুরো ব্যাকগ্রাউণ্ডটা নিলেন; পরিবারের ইতিহাস জানলেন। জানতে পারলেন, স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই চোর, চুরিতে সিদ্ধহস্ত। সব ইতিহাস জানার পর, ডাক্তার বাচ্চাটার সামনে একটা পিতলের খেলনা দিলেন, দেখলেন কিছুই হল না। তারপর রূপোর খেলনা দিলেন, ডাক্তার দেখছেন, বাচ্চাটার হাতটা যেন একটু আলগা হয়েছে। এরপর উনি একটা সোনার খেলনা দিলেন। তখন দেখা গেল, বাচ্চাটার হাতটা খুলে গেল, আর বাচ্চাটার হাত থেকে একটা কানের দুল ঢং করে পরে মেঝেতে গিয়ে পড়ল। বাচ্চাটা যখন জন্ম নিয়েছে, আর জন্মজাত সংস্কার এমন প্রবল যে, জন্ম নিতেই নার্সের কানের দুলটা খুলে হাতের মুঠোটা বন্ধ করে দিয়েছে। বাচ্চাটার সেই বোধ নেই, ইচ্ছে নেই, কিন্তু তার বাহ্য ইন্দ্রিয় এমন কাজ করল যে, গপ্ করে নার্সের কানের দুলটা ধরে খুলে নিয়ে হাতের মুঠটা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আরও বেশী দামী জিনিস যেমনি দেখল, তখন তার হাতটা খুলে গেল। এটা একটা কাহিনী, বোঝানর জন্য বলা হল। আমরা সংসাররূপী বাজারে ঘুরছি, ইন্দ্রিয়গুলি ছটফট করে যাচ্ছে –এ-রকম দেখছি, এ-রকম গন্ধ আসছে, তখন আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি বস্তুগুলোর উপর কাজ করতে চায়।

ইদানিং একটা নূতন শব্দ এসেছে, compulsive shopping। এটা এক ধরণের মানসিক ব্যাধি। বাজারে, শপিং মলে ঘুরতে যাওয়া, কোন দরকার নেই, তাও তাকে কিছু কিনতে হবে; এটাই এই ব্যাধির লক্ষণ। বাড়ির মায়েদের ধারণা নেই যে, তার আলমারিতে কত শাড়ি আছে, কত অন্য জিনিস আছে। ঠাকুর বলছেন, কুবের রাজার ভাণ্ডারে কত রত্ন পড়ে আছে, কুবের নিজেও জানে না। ছোটবেলা আমরা একটা গল্প পড়েছিলাম, জানি না এটা কতটা সত্যি। এথেন্সে সক্রেটিস থাকতেন, তিনি প্রায়ই বাজারে যেতেন, কিন্তু কিছু কিনতেন না। অনেকেই তাঁকে বলতেন, 'কিছুই কেনাকাটা করেন না, বাজারে ঘুরে ঘুরে কি দেখেন'? সক্রেটিস বলছেন, 'আমি দেখছি জগতে কত কি জিনিস আছে, কোন জিনিসটা আমার কাছে না থাকলেও আমার কাজ চলে যাবে'। খুব মজার কথা। বাজারে কত কি জিনিস আসছে, বিক্রী হয়ে যাচ্ছে, অথচ আমার কিছু লাগবে না।

যাঁরা প্রকৃত সন্ন্যাসী, যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ, সংসার বাজারের মাঝখান দিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন, নামযশ, রূপ, রস, গন্ধ কোন কিছুই তাঁকে স্পর্শ করবে না। চারিদিকে চুম্বক পাথর ঝুলছে, লোহার বল একবার এদিকে যায়, আরেকবার ওদিকে যায়। গঙ্গোত্রির ওদিকে বাসে করে

যাওয়ার সময় থ্রী-সিটার বাসের সিটের মাঝখানে যদি কেউ বসে, রাস্তায় এত টার্নিং পড়ে যে, তাকে একবার এপাশের যাত্রীর ঘাড়ে, আরেকবার ওপাশেরর যাত্রীর ঘাড়ে গিয়ে পড়তে হয়। জগৎ ঠিক তাই, একবার এর দিকে পড়ছি, আরেকবার ওর দিকে পড়ছি। কিন্তু যাঁর মন ধীর, স্থির, শান্ত হয়ে গেছে, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি তো সোনা হয়ে গেছেন, সমস্ত পাওয়ারফুল চুম্বকের মাঝখান দিয়ে চলে যাবেন, চুম্বক তাঁকে টানতে পারবে না। কেন টানতে পারবে না, পরে বলবেন।

আমরা বিখ্যাত বেহালা-বাদক স্পাল্ডিংএর গল্প বললাম। তাঁর সেই এজেন্টের কথা ভাবুন, তিনি সেই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে কেউ আর তাঁকে টলাতে পারছে না। স্পাল্ডিংএর তিরস্কার, চেঁচামেচি, ভর্ৎসনা, কোনটাই তাঁকে এক চুলও নড়াতে পারছে না। দ্বিতীয়তঃ স্পাল্ডিংর প্রতি তাঁর যে ভালবাসা, সেই ভালবাসার জন্য সে আরও বেশী শান্ত ভাব অবলম্বন করে আছেন। কিন্তু আমি যাকে পছন্দ করি না, তাকে বলি, এই থুতু ফেললাম তোমার মুখে, আর তোমার মুখদর্শন করতে চাই না, তোমাকে এই আমি ত্যাগ করলাম। উর্দুতে একটা খুব সুন্দর সায়ের আছে, কভি জান কে কসম খাতে থে, অব জনাজে মে সামিল হোনি কি কসম খাতে হ্যায়। এক সময় এমন প্রেম ছিল যে, তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবন বলে মাথা খারাপ করে দিত। আর এখন ঝগড়া হয়ে গেছে, এক অপরকে সহ্য করতে পারছে না, তখন বলছে, তুমি মরো, তোমার শবযাত্রায় আমি সামিল হব, বলতে চাইছে তুমি মরো; এই হল আমাদের প্রকৃতি। আমাদের ত্যাগ কখন হয়? কারুর উপর রেগে গিয়ে যখন থুতু ফেলি। কখনই এই মনোভাব থাকা ভাল না। যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ, তুমি আমাকে পছন্দ করো না, ঠিক আছে; তুমি আমাকে পছন্দ করো, আমাকে ভালবাসো, কোন সমস্যা নেই। ঠাকুর, স্বামীজী এনারা স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন।

গান্ধীজী সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলন করলেন, স্বদেশী আন্দোলন যদিও ওনার আগে শুরু হয়েছিল, কিন্তু তিনি এটাকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গেলেন। স্বদেশী আন্দোলনে বিদেশী কাপড় বর্জন হল, অনেক বিদেশী কাপড় পোড়ান হল। ফলে ম্যাঞ্চেস্টারের অনেক কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে গেল। শ্রমিকদের অনশনে দিন কাটানো শুরু হল, কারণ কাজ বন্ধ, মাইনে বন্ধ, খাবার-দাবার পাবে কোথায়! গান্ধীজী সেই সময় ইংল্যাণ্ডে সেকেণ্ড রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে গেলেন। তিনি বললেন, আমি ম্যাঞ্চেস্টার যাব। ওখানকার প্রশাসনের কর্তৃপক্ষ বললেন, 'ম্যাঞ্চেস্টারে আপনার একেবারেই যাওয়া চলবে না, ওখানে গেলে আপনি খুন হয়ে যেতে পারেন, ম্যাঞ্চেস্টারের সব শ্রমিক আপনার উপর প্রচণ্ড খাপ্পা হয়ে আছে। ওদের বিশ্বাস, আপনার জন্যই আজকে ওদের অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে'। গান্ধীজী তখন বললেন, 'আমার তো ওদের সাথে কোন বিবাদ নেই, আমি যাবো'। গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টার গেলেন, এবং ওখানকার লোকেরা গান্ধীজীকে দেখে পুরো violent হয়ে উঠেছে, এই লোকটার জন্য আমাদের আজ এই দুরবস্থা। গান্ধীজী খুব শান্ত ভাবে ওদের বোঝালেন, 'দেখুন আমার দেশের যারা কর্মি আছে, তারাও আপনাদের ভাই বোন। কিন্তু আপনারা তাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন, তাদের কি দুরবস্থা ছিল। তূলা আসছে ভারত থেকে ম্যাঞ্চেস্টারে, আপনারা সেই তূলা দিয়ে কাপড় মেশিনে বানাচ্ছেন, সেই কাপড় আমার দেশে গিয়ে চার গুণ, পাঁচ গুণ বেশী দামে বিক্রী হয়। গান্ধীজী খুব শান্ত ভাবে তাদের যখন বোঝাতে লাগলেন, আস্তে আস্তে সবাই কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে গেল। তারাও শান্ত হয়ে গেল, আর গান্ধীজীর প্রতি রাগ, কিংবা ভারতের শ্রমিকদের উপর রাগ, কোনটাই আর থাকল না।

এই হচ্ছে একটা গুণ, তোমাদের প্রতি আমার কোন রাগ নেই, তোমাদের আমি মানতে পারছি না বলে যে রাগ হবে তা না। তোমাকে আমি পছন্দ করি না, তাই তুমি মরো, আর তোমার মুখে গিয়ে থুতু ফেলে আসব, এই ধরণের মনোভাবকে কখনই আসতে দেওয়া যাবে না। বলছেন, কচ্ছপ যেমন নিজের হাত, পা, অঙ্গগুলিকে গুটিয়ে নেয়; জ্ঞানীরা, স্থিতপ্রজ্ঞ যিনি, তিনি এভাবে নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে গুটিয়ে নেন। সক্রেটিস যেমন বলছেন, আমার কিছু লাগবে না। অন্য দিকে

compulsive shopper, পকেটে পয়সা আছে, চোখের সামনে পছন্দের কিছু দেখল, গপ্ করে ধরে নিয়ে ব্যাগে পুরে দিল। স্থিতপ্রজ্ঞ আর সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দুটি তফাৎ। কিন্তু যাঁরা তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে টেনে নিয়েছেন, তাদের এবার সাবধান করে বলছেন –

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোপহস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।।৫৯।।

(বিষয় গ্রহণে অসমর্থ আতুর ব্যক্তি বা বিষয়ভোগপরাঙ্মুখ কঠোর তপস্বী ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে নিবৃত্ত হন বটে কিন্তু তাঁর বিষয়াসক্তি দূর হয় না। আর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে বিষয় ও বিষয়তৃষ্ণা উভয়ই চিরতরে নিবৃত্ত হয়।)

বলছেন, শুধু স্থিতপ্রজ্ঞের কথা কেন বলছ; যে রোগী বিছানায় পড়ে আছে, সেও তো কোন কিছু ভোগ করতে চায় না। একজন মহারাজ আমাদের বলতেন, 'ষাট, পয়ষট্টি বয়স হয়ে যাওয়ার পর শরীর ও ইন্দ্রিয়ের এমনিতেই আর ক্ষমতা থাকে না যে ভোগ করবে। কিন্তু ভিতরে যে কামনা-বাসনার বীজ জমে আছে, এগুলো তো যাবার না। বয়স্ক মানুষদের আগে থেকে যদি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না হয়ে থাকে, এই বয়সে যে তাদের ভিতরে কি জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়, কল্পনা করা যায় না'। যারা আত্মহত্যা করে, এদের প্রেতাত্মাদেরও এই দুরবস্থা হয়। কারণে তার মনটা তো থেকে গেছে, সেখানে সমস্ত কামনা-বাসনাগুলো রয়েছে, কথা বলতে চাইছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না, কাউকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু পারছে না, কারণ তার অঙ্গগুলি নেই। আবার বিশেষ ধরণের রোগ হলে, যেমন ডায়বেটিস হলে আর মিষ্টি খেতে পারে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মিষ্টির প্রতি প্রবল আসক্তিটা থেকে গেছে। এখানে 'বিষয়' এই শব্দটাকে নিয়ে আসবেন, বিষয় মানে ইন্দ্রিয় যে জিনিসগুলির প্রতি ধাবিত হয়, ইন্দ্রিয়ার্থ যা, বিষয়ও তাই, দুটো একই।

এবার এই শ্লোকে সাবধান করছেন, জোর করে তুমি ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ার্থ থেকে অর্থাৎ বিষয় থেকে টেনে আনতে হয়ত সমর্থ হলে, কিন্তু তাই বলে তুমি মনে করো না যে, তুমি একজন মহাত্মা হয়ে গেলে; উল্টে তুমি অনেক বিপদে পড়ে যেতে পার। এটা ঠিক যে লোকে দেখে বলবে, বাঃ আপনি তো খুব ইন্দ্রিয় সংযম করেছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির যে রস, সেই রসটা তোমার ভিতরে যে থেকে গেছে, সেটা বাইরের কেউ বুঝতে পারছে না, তুমি নিজেও বুঝতে পারবে না। বিশ্বামিত্রের কাহিনী আমরা সবাই জানি। বিশ্বামিত্র বিরাট তপস্বী, জোর তপস্যা করে যাচ্ছেন। কিন্তু স্বর্গের অপ্সরা মেনকা এসে এমন নৃত্য করতে শুরু করল, বিশ্বামিত্র অপ্সরা আর তার নৃত্য দেখে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না, মুগ্ধ হয়ে ভোগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি ঋষি, একজন বড় সাধু, তপস্বী, সবটাই ঠিক; কিন্তু কামভাব, কামভোগের যে রস, সেই রসটা তাঁর ভিতরে থেকে গিয়েছিল। তিনি একজন রাজা ছিলেন, স্ত্রী ছিল, পুত্র ছিল; স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য সব ত্যাগ করে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু কাম রিপু, তার যে রস, সেটা থেকে গেছে।

বিষয়রস একেবারে কখন যায় না। আর যেমনি সুযোগ পায়, ঠিক সময়, ঠিক জায়গায় গাছের ডালপালা বেরিয়ে আসে। ঠাকুর অশ্বত্থ গাছের উপমা দিচ্ছেন। একটা পোড়ো বাড়ি, সেখানে একটা ছোট্ট অশ্বত্থ গাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঁকি মারছে। কবে একটা ছোট্ট বীজ সেখানে পড়েছিল, সেই বীজ থেকে এখন একটা গাছ বেরিয়েছে, কালে এক বিশাল বৃক্ষে পরিণত হবে। যারা জোর পূর্বক ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে টেনে নিয়েছে, এটাকে কেউ নিন্দা করছে না, যত দিন টেনে রাখছে এটাই তার কৃতিত্ব। কিন্তু সাবধান করছেন, তুমি যদি নিজেকে জোর করে বিষয় থেকে টেনে নিয়েছ, তার মানে এই নয় যে তুমি মহান্ হয়ে গেলে। কারণ, *বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ*, যে নিরাহারী, বিষয় থেকে যে কোন কারণে সরে এসেছে, সে একজন মহৎ কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিষয়ের রস তার থেকে যায়।

রসবর্জং রসোহপস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে, এই একটা লাইনে সত্যটাকে কিভাবে রাখছেন কল্পনা করা যায় না। ঠাকুর খুব সহজ ভাষায় বলছেন, মিছরির শরবৎ খেলে চিটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না। চিটে গুড় মানে, আখের রস জাল দিয়ে রিফাইন করার পর যে বর্জ্য অংশটা পড়ে থাকে, সেটাকে চিটে গুড় বলে। চিটে গুড় গরুকে খাওয়ানো হয়। চিটে গুড়ের পানা, মানে এক বালতি জলে হয়ত দু চামচ চিটে গুড় গুলে দেওয়া হয়েছে, হাল্কা একটু মিষ্টি মিষ্টি লাগবে।

অশ্বত্থামার বাবা দ্রোণাচার্য খুব গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন। অশ্বত্থামার বন্ধুরা দুধ খাচ্ছে, তারও ইচ্ছে হল সে দুধ খাবে। মায়ের কাছে গিয়ে দুধ খাওয়ার আবদার করল। মা কোথা থেকে ছেলেকে দুধ দেবে, তাদের গরু নেই, টাকা নেই। মা জলে একটু আটা গুলে দিয়ে বললেন, এই নাও বাবা দুধ খাও। বাচ্চা ছেলে, সেও বলতে লাগল, আমি দুধ খাচ্ছি। বন্ধুরা বলছে, ওটা দুধ না, ওটা আটা গোলা জল। সেই সময় দ্রোণাচার্য ওখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই ঘটনাটা দেখে ওনার মনটা ভেঙে গেল, আমি আমার ছেলেকে দুধ পর্যন্ত খাওয়াতে পারছি না। তখন উনি চাকরির জন্য কৌরবদের কাছে গেলেন।

যে একবার দুধ খেয়েছে, তাকে আর আটা গোলা জলকে দুধ বলে খাওয়ানো যাবে না। যে একবার মিছরির শরবৎ খেয়েছে, সে আর চিটে গুড়ের পানা খেতে চাইবে না। যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেছে, যিনি আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন, তিনি এই ইন্দ্রিয় জগতের আনন্দে কখনই থাকবেন না। ঠাকুর একেবারে নিজের উপলব্ধি থেকে বলছেন, ঈশ্বর দর্শনের পর রম্ভা, তিলোত্তমাকে চিতার ভস্মের মত মনে হয়। যে কোন ভাল জিনিসের কেউ যদি আস্বাদ করে নেয়, এখন যদি তাকে কম্প্রোমাইজ করতে হয় করবে, কিন্তু রমতে, রমণ করা অর্থাৎ আহা কি সুখ, কি আনন্দ; এই জিনিস আর হবে না, এগুলো আর ভাল লাগবে না। মজা করার জন্য হয় বলতে পারে, হ্যাঁ এই নিয়ে কত কি করেছি। যেমন আগেকার দিনে গরুগাড়ি চলত, ছোটবেলায় গরুগাড়িতে চড়াটাও খুব মজা লাগার ব্যাপার ছিল। একবার যেই ট্রেন, প্লেন, বাস, ট্যাক্সি চড়া শুরু করলাম, তারপর সখ করে কখন সখন গরুগাড়িতে উঠলাম সেটা আলাদা, কিন্তু গরুগাড়ি যানবাহনের একটা প্রধান অবলম্বন কোন দিন আমার কাছে তা আর মনে হবে না। আমাকে কেউ যদি বলে, চলুন গরুগাড়ি করে আপনাকে এখান থেকে দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি, এতে রাজী হওয়া অসম্ভব আমার কাছে ।

রসবর্জং রসোহপ্যস্য, বিষয়ের যে রস, সেটাও ত্যাগ হয়ে যায়। কবে? *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্তন্তে*, পরম্, মানে সবার উপরে, সব কিছুর পারে। সব কিছুর পারে, সবার উপরে কে? একমাত্র ঈশ্বর, যাঁকে আমরা ব্রহ্ম বলি; ব্রহ্মই একমাত্র সব কিছুর পারে। ওই পরমের জ্ঞান যখন হয়ে যায়, ওই পরমের জ্ঞান আর তাঁর প্রতি ভালবাসায় যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন জাগতিক ছোটখাটো কোন ভালবাসা, কোন কিছুই তাকে আর আকর্ষিত করতে পারে না, এগুলো একদিকে পড়ে থেকে যায়। এই যে বোধ, ব্রহ্মই শেষ কথা, আর আমিই সেই ব্রহ্ম, এই জ্ঞানে একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, সে আর কোন দিকে যায় না।

আমরা যখন প্রথম মঠে জয়েন করি, তখন নূতন একটা কথা শুনতাম, Religious Management, Swami Vivekananda and Management, সবাইকে দেখতাম ম্যানেজমেন্টের উপর লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন। তারপর এলো বিজ্ঞান, Vedanta and Science, ইদানিং এসেছে mind control। সবাই এখন mind controlএর উপর লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন, এনাদের নিজের মন কত নিয়ন্ত্রণে আছে আমাদের ভাল জানা আছে, কারণ আমরা একই জাতের কিনা। আর-একজন ছিলেন, তিনি শুরু করলেন stress management নিয়ে। ওনার আশপাশে যাঁরা থাকতেন, ওনাকে যাঁরা জানতেন, তাঁরা ভাল করে জানতেন উনি সব সময় কি পরিমাণ

stress নিয়ে থাকতেন। ওনার কাছের লোকেরাও ওনার stress দেখে stressed হয়ে যেতেন, অথচ সব জায়গায় উনি stress management নিয়ে বলতেন। এখন কত কি ম্যানেজমেন্ট এসেছে, stress management, anger management, time management, যদি দেখতাম একজনেরও কারুর এই সব লেকচার শুনে তার ম্যানেজমেন্ট ভাল হয়েছে। গীতার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে, গীতার জ্ঞান! all nonsense। কেন, এখানে একটু পরেই পরপর বলবেন, ধাপে ধাপে মনের অধঃপতন কি করে হয়, কেন হয়। এত মানুষ কেন আত্মহত্যা করছে? আসলে মনের নিয়ন্ত্রণ এমনি এমনি মুখে বললেই হয়ে যায় না, মনের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা ঠিক ঠিক আদর্শ দরকার। একটা উচ্চ আদর্শ যদি না থাকে সেটা হবে একটা এ্যডহক ম্যানেজমেন্টের মত; একটা কিছু হল আর জোড়াতাপ্পি মেরে দিলেন।

অনেক আগেকার কথা, দেওঘর বিদ্যাপীঠে একজন ইলেক্ট্রিসিয়ান ছিলেন। বিদ্যাপীঠের আর্থিক অবস্থায়ও তখন ভাল ছিল না, সন্ন্যাসী, ছাত্র কারুর ঘরে তখন পাখাও ছিল না, টিউব লাইট ছিল। কিন্তু ওখানে ভোল্টেজ খুব ফ্লাকচুয়েট করত, টিউব লাইটগুলো ভল্টেজ কম থাকলে ভুক্ ভুক্ করে জ্বলত আর নিবত। একটা টিউব লাইট অনেক দিন ধরে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ভুক্ ভুক্ করে যাচ্ছিল। ইলেক্ট্রিসিয়ানকে কমপ্লেন করে জানাতে হবে। প্রথমে তো ওকে ধরা যাবে না, যদি একবার ধরে আনা হয়, প্রথম দিন একবার দেখে চলে যাবে। তারপর আবার তাকে ধরা হল, কিছু করুন। এবার একটা সিড়ি এনে টিউব লাইটটাই খুলে নিয়ে চলে যেত। আর কোন সমস্যা থাকল না, মাঝখান থেকে আমাদের টিউব লাইটটাই চলে গেল। এরপর তিন চার বার কমপ্লেন করার পর কিছু একটা করবে। সমাধান সহজে করবে না, একটা এ্যডহক করে দেবে। বেশী হলে টিউব লাইটই খুলে নাও, আর কারুর চোখে পড়বে না। বিদ্যাপীঠের ক্যাম্পাসের রাস্থায় যত টিউব লাইট ছিল, তার একটা যদি ভুক্ ভুক্ করত, খুলে নিয়ে চলে যেত।

এভাবে হয় না, treatment যদি করতে হয় পুরোটাই treatment করতে হবে। কিভাবে treat করবে? *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*, যখন তুমি যা, যখন তুমি সেই তুমি হয়ে বসবে, তোমার সব চাঞ্চল্য ওখানেই শেষ হয়ে গেল। আমাদের সমস্যা, আমরা জানি না আমরা আসলে কি। মুখে বলে দিচ্ছে *অহং ব্রহ্মাস্মি*, মুখে বলে দিলেই অহং ব্রহ্ম হয়ে যাবে না। সাধনা করে, গুরুর কাছে শাস্ত্রের কথা শুনে অনুধ্যান করে, গুরুর মুখ থেকে যখন জানলেন আপনি ঈশ্বরের সন্তান, যখন জানলেন আপনি ঈশ্বরের সাথে এক, যখন জানলেন ঈশ্বরের পরম সত্তা, যথার্থ যে সত্তা, শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম, আপনি সেই শুদ্ধ চৈতন্যের সাথে এক, তখন সংসারের যত দু পয়সার ঝামেলা সব খসে পড়ে যায়।

বলছেন, *রসবর্জং রসোঽপ্যস্য*, আমরা দৌড়াচ্ছি, এটা ভাল লাগে, সেটা ভাল লাগে; বিষয়রস ভিতরে আমাদের টগবগ করছে। যিনি সন্ন্যাসী, সংসার থেকে তিনি সরে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু সংসারের কিছু কিছু বস্তুর প্রতি যে আকর্ষণ, সেটা কি চলে গেছে? না যায়নি। কিন্তু তিনি যদি চান, এই আকর্ষণ গুলি চলে যাক, তখন একটাই পথ –ঈশ্বরের সাধনায় ডুবে যাওয়া। ঈশ্বরের সাধনায় ডুবে থাকলে মন বিষয়ের থেকে কিছুটা সরে আসে। বিষয়ানন্দকে সরানো যাবে ভজনানন্দ দিয়ে। তাতেও কিন্তু পুরোটা ঠিক হয় না। কিন্তু সেখান থেকে যখন ঈশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তখন হয় ব্রহ্মানন্দ। ঠাকুর এই তিন প্রকার আনন্দের ঠিকানা দিলেন, বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দের আনন্দ যখন পায় তখন বিষয়ানন্দ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়।

সাংসারিক ভাব থেকে যাঁরা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন, শাস্ত্রে বলছে খুবই ভাল। কিন্তু তখন প্রশ্ন ওঠে, কেন, আমরা তো দেখেছি তাঁদের মধ্যে অনেকের পতন হয়ে যায়, পুরাণেই আমরা বিশ্বামিত্র আদির ঘটনা পাই, তাহলে এভাবে সরিয়ে নিয়ে কি লাভ হল? সাধনা করতে গিয়ে আমি যদি সফল নাই হতে পারি, তাহলে কেন আমি সাধনা করব? ভগবান তখন বলছেন, মানুষ যখন

জোর করে নিজেকে সরিয়ে নেয় এবং সরেও আসে, কিন্তু মনের ভিতরে ওই জিনিসগুলোর চাহিদাটা থেকে যায়। যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন বা আত্মজ্ঞান না হয়, ততক্ষণ ভয় থেকেই যায়। ঠাকুর বার বার বলছেন, আগে ঈশ্বর লাভ কর, তারপর নির্ভয়ে সংসার কর। ঈশ্বর জ্ঞান যদি না থাকে, মানুষকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে বুঝতেই পারবে না। মানুষ যদি নিজেকে জোর করেও সরিয়ে নেয়, ঘরসংসার ভাল লাগছে না, অশান্তি লেগেই আছে, চলে গেল হিমালয়ে। এভাবে হয় না, কারণ নেউলের লেজে ইট বাঁধা আছে, আবার তাকে টেনে নামিয়ে আনে।

এই বিষয়রস আমার আপনার সবারই ভিতরে থাকে, ফলে যেমনি ইন্দ্রিয় আর তার বিষয় কাছাকাছি চলে আসবে, সব কিছু এলেমেলো হয়ে যাবে। বলে যে, পুরুষ মানুষ ভাল, নারীও ভাল, কিন্তু যখন কাছাকাছি আসে, সব এলেমেলো হয়ে যায়। কি রকম? মাটি ভাল, জলও ভাল, কিন্তু দুটো যখন মিলে যায় তখন কাদা হয়ে যায়। সেইজন্য বলা হয়, যেটা ভোগ্য বস্তু, ইন্দ্রিয়ার্থ যেটা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের জন্য যে জিনিসগুলো রয়েছে, সংসারের যা কিছু ভোগবস্তু আছে, এর থেকে সরে আসতে হয়।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজ, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান, লাটু মহারাজ নামেই বেশী পরিচিত, তিনি বিহারের ছাপড়া জেলার ভূমিপুত্র। সেখানে গ্রাম দেশে তাড়ি খাওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল, তিনিও হয়ত কোন সময় গ্রামের লোকেদের খেতে দেখে থাকবেন বা নিজেও কোন সময় খেয়ে থাকবেন। ঠাকুরের কাছে এসে তিনি আশ্রয় পেয়েছেন, ঠাকুরের অনেক কথা শুনছেন। যেদিন তিনি এই কথা শুনলেন, তারপর থেকে যে রাস্থায় মদ বিক্রী হয়, সেই রাস্থাকে পরিহার করার জন্য বিরাট লম্বা ঘুরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। যাঁরা ঈশ্বরের জন্য সাধনা করছেন, জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিষয় থেকে দূরে থাকা অত্যন্ত দরকার। যদি দূরে না থাকেন তাহলে কি হতে পারে? এখান থেকে আমরা এখন শুরু করছি। পরের শ্লোকে বলছেন –

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।।৬০।।

(হে কুন্তীপুত্র, বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গুলি অতি যত্নশীল মেধাবী (শাস্ত্রজ্ঞ) পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে।)

যাঁরা সাধন-ভজন করছেন, একটা ভাল জীবন-যাপন করছেন, তাঁদের জন্য এই ষাট নম্বর শ্লোক খুব মূল্যবান। এটাকে তাঁদের মুখস্ত করে মাথার মধ্যে বসিয়ে রাখাটা খুব দরকার।

যততো হ্যপি, খুব প্রযন্ত করে যাচ্ছেন, অর্থাৎ খুব জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তার সাথে তাঁর বুদ্ধিও রয়েছে, এই শ্লোকে তাঁদের কথা বলছেন। যারা মন্দ বুদ্ধির তাদের দ্বারা ধর্ম হয় না, মুর্খদের দ্বারা ধর্ম হয় না। এই সংসারে যাঁরাই ধর্ম জগতে বড় বড় গুরু হয়েছেন, তাঁরা হয়ত খাতা কলমে শিক্ষা পাননি, যেমন প্রফেট মহম্মদ, ঠাকুরও পাননি, কিন্তু সবাই প্রচণ্ড মেধাবী ছিলেন, আর সাংঘাতিক বুদ্ধি ধরতেন। যাঁরা চেষ্টা করছেন, বলছেন *বিপশ্চিতঃ,* তাঁরা আবার মেধাবী, বুদ্ধি খুব ভাল। কিন্তু তাঁরাও যদি ভোগ বস্তুর মধ্যে থাকেন, তাঁদের ইন্দ্রিয়কে প্রমথন করে দেয়, ক্ষুভিত করে দেয়। দইকে মন্থন করে মাখন বা ঘি তৈরী করা যদি কেউ দেখে থাকেন, তাহলে তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, দইকে যখন মন্থন করা হয়, তখন কিভাবে একটা ঘুর্নির মত তৈরী হয়ে যায়। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় তার বিষয়গুলোকে যখন ভিতরে নিতে থাকে, তখন সেখানে এমন মন্থন শুরু হয়ে যে কল্পনা করা যায় না। আর বাকি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে আদেশ করতে থাকে, তোমাকে এটা করতেই হবে। কারুর হয়ত গান খুব ভাল লাগে, একটা কোথাও গান হচ্ছে, সেটা তার কানে এসে একটু ধাক্কা মেরেছে, তাতেই তার কর্ণেন্দ্রিয় এমন মন্থন হয়ে যাবে যে, সে তার পদযুগলকে বলবে,

তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে চল। পা বেচারী আর কি করবে, সে চলতে শুরু করে দেবে। আমরা বলি, মন ইন্দ্রিয়কে নাচিয়ে দেয়, না, নাচানো না, নাচানো অত্যন্ত সাধারণ শব্দ, ওটা হয়ে যায় মন্থন। নদীতে যখন স্পীড বোট চলে, তখন তার পিছনের দিকে জল কি প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে, ঐটা দেখলে বুঝতে পারা যাবে ইন্দ্রিয়গুলির কি দুরবস্থা হয়।

এখানে যাঁরা বিবেকযুক্ত, সাধারণ লোকেদের থেকে যাঁরা উপরে, তাঁদেরকে নিয়ে বলছেন। আমাদের প্রায়ই প্রশ্ন করে, আমি তো চেষ্টা করেও পারছি না। তুমি কি পারবে, বিশ্বামিত্রের মত অত বড় ঋষিও পারলেন না। স্বর্গের অপ্সরা মেনকা এসে নাচ শুরু করতেই বিশ্বামিত্রের ভিতরে যে রসবোধ সঞ্চিত হয়ে ছিল, সেটা বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এসে বিশ্বামিত্রের মনকে মন্থন করে দিল। কিন্তু পরে তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। এরপর রম্ভা যখন এলো, তাকে দেখেই বিশ্বামিত্র বললেন, ভাগ্ এখান থেকে, তা নাহলে তোকে আমি এক্ষুণি ভস্ম করে দেব। রম্ভা ভয়ে প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

ভিতরের এই রস থেকে কোন উপায় নেই বাঁচার। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নিজেকেই করতে হবে, কেউ অপরের হয়ে করে দিতে পারবে না। যদি মনে করি, ঠাকুর আছেন ঠাকুরই আমার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়ে দেবেন, ঠাকুর না হোক আমার গুরু করে দেবেন; কিংবা কৃষ্ণ এসে করবেন। কেউ করবেন না, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে হবে নিজেকে। বাচ্চাদের যেমন আমরা উৎসাহ দিয়ে থাকি, সেই রকম আমাদেরও বলা হয়, ঠাকুর আছেন, তিনি সব শুনছেন, তিনি সব দেখছেন, তিনি সব জানেন, শেষে তিনিই রক্ষা করবেন। কিন্তু তা হয় না, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ আপনাকে নিজেকেই করতে হবে। কেউ যদি এই আশায় বসে থাকেন, তিনি রক্ষা করবেন, তাহলে তিনি খুব ভুল পথ বেছে নিলেন। শাস্ত্রও এই কথা বলছেন না যে, তিনি আমার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করে দেবেন। এখন কোন গুরু যদি বলে থাকেন, 'তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি আছি, আমিই সব কিছু দেখব'; সেখানে আমাদের বলার কিছু নেই। আমরা এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, শাস্ত্রের ভাষ্যকাররা যেভাবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে গেছেন, আমাদের সেটাই অনুসরণ করতে হবে।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনী, আচার্য এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, *আকুলীকুর্বন্তি,* বিষয় থেকে যে পুরুষ বিমুখ হয়ে আছে, তার মনকেও ব্যাকুল করে দেয়। বাচ্চা যেমন কোন কিছু না পেলে, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করে, আমাদের ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলোর অবস্থা ঠিক সেই রকম হয়। সেইজন্য সাবধান করে দিচ্ছেন, ইন্দ্রিয়ের যে বস্তুগুলো আছে, যাকে আমরা ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয় বলছি, তার ধারে কাছে যেতে নেই। ঠাকুর বলছেন, যত সেয়ানাই হও না কেন, কাজলের ঘরে ঢুকলে একটু না একটু দাগ লাগবেই। বিষয়ের ধারে কাছে ঘুর ঘুর করলেই ইন্দ্রিয়ের এই দশা হবেই। পরে এই ভাবটাকেই গীতায় আবার পুনরাবৃত্তি করা হবে। সেইজন্য এখানে বলছেন –

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬১।।

(অতএব, যোগী সেই ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে সমাহিতভাবে আত্মস্থ হয়ে অবস্থান করবেন। কারণ যাঁর ইন্দ্রিয়সমুদয় বশীভূত হয়েছে, তাঁরই বিবেকজা (ঋতম্ভরা) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ।)

অর্জুনের প্রশ্ন ছিল স্থিতপ্রজ্ঞ কে? ভগবান একেবারে পরিষ্কার করে বলছেন; প্রজ্ঞা কার প্রতিষ্ঠিত হয়? ইন্দ্রিয় যাঁর সংযমে আছে। কিন্তু আমরা কি পারব ইন্দ্রিয়ের সংযম করতে? পারব না। কেন পারব না? এই যে আগে বলা হল, *রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে,* আমি ইন্দ্রিয়গুলির চোখে ঠুলি লাগিয়ে দিলাম, তাতেও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হবে না। কারণ আমাদের মনের ভিতরে আগে থেকেই যে স্মৃতিগুলি রয়েছে, সেই স্মৃতিগুলি জলের তল দেশ থেকে ভুরভুরি উঠে জলের উপরি

ভাগে যেমন তরঙ্গ সৃষ্টি করে, তেমনি মনের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করবে। জোর করে কখন কিছু হয় না, বিশেষ করে ইন্দ্রিয় সংযম তো জোর করে একেবারেই হবে না। ইন্দ্রিয়কে প্রথমে একটু একটু করে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি থেকে টেনে নিয়ে আসতে হয়, এবং তার সাথে একটা উদ্দেশ্য রাখতে হয়। যেমন ঠাকুর বলছেন, তুমি যত পূব দিকে যাবে, তত তুমি পশ্চিম দিক থেকে সরে আসবে।

এখানে একটা স্থূল উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যদিও এটা শাস্ত্রের সাথে মিলবে না। একজন পরিচিত এসে বললেন, আমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে, আমরা ডিভোর্স নেব। আমি তাকে বললাম, 'ডিভোর্স নিয়ে তুমি কি করবে, তোমার লাভ কি হবে? তোমার চোখে তোমার স্ত্রীর থেকে আরেকজন কেউ ভাল আছে'? 'না নেই'। 'তাহলে তুমি ডিভোর্স নিয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে বেরিয়ে করবেটা কি'? যাই হোক, একটা লম্বা আলোচনা হল। উনি বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাইছি।

আমরা প্রায়ই অনেক সময় বলি, আমি আর এই জিনিস সহ্য করতে পারছি না; আমি বাড়ির লোকদের সহ্য করতে পারছি না, আমি আমার কর্মস্থলের লোকগুলিকে সহ্য করতে পারছি না। চাকরি সহ্য করতে পারছে না, তাহলে ছেড়ে দাও চাকরি। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলে তোমাকে মাসের শেষে মাইনেটা কে দেবে, ভেবে দেখেছ? তবে যদি কেউ দেখে, একটা ভাল চাকরি তার জন্য অপেক্ষা করছে, চলে যাও সেখানে। কিন্তু তোমার সামনে এই চাকরি ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই, তখন যতই তোমার রাগ হোক, যতই তোমার মন খারাপ হোক, তোমাকে ওই চাকরিতেই পড়ে থাকতে হবে, বোকার মত চাকরি ছেড়ে দিও না। ঠাকুর এক জায়গায় সাঙ্গপাঙ্গোদের সঙ্গে গেছেন। সেখানে তাঁদের ঠিক ভাবে সমাদর করা হয়নি। রাখাল রেগে গিয়ে বলছেন, 'চলুন আমরা চলে যাই'। ঠাকুর রাখালকে বলছেন, 'ফাক্কা রোখ করে কি হবে, গাড়ি ভাড়া কে দেবে, আর দক্ষিণেশ্বরে এত রাতে গিয়ে খাবোটা কি'? কথাগুলো শুনতে অত্যন্ত সহজ মনে হয়, কিন্তু অত সহজ না, অনেক গভীর তত্ত্ব আছে। আপনি এই চাকরিটা ছেড়ে দেবেন বলছেন, এর পিছনে আপনার কি কোন সাপোর্ট আছে? চাকরি ছেড়ে আপনি করবেনটা কি?

আপনার ভিতর খুব রোখ আছে, আপনি ইন্দ্রিয় সংযম করে নিলেন। কিন্তু এবার ইন্দ্রিয়গুলি কি নিয়ে থাকবে? আপনি নিজেকে জগৎ থেকে টেনে নিলেন, সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেন। কিন্তু ভেবে দেখেছেন, এরপর কি নিয়ে থাকবেন? এখানে এসে গোলমাল বাঁধে। আমরা অনেক সাধু, অনেক গৃহস্থদের দেখেছি, তাঁরা নিজেকে সংসার থেকে টেনে নিয়েছেন, স্বাভাবিক ভাবে ইন্দ্রিয়গুলিও বিষয় থেকে সরে আসে। কিন্তু কিছু দিন পরেই ছটফট করতে শুরু করে, এবং পরিণতি স্বরূপ ভিতরের রাগ আদি রিপুগুলি অনেক বেড়ে যায়, নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন না। তার থেকেও যেটা মারাত্মক, মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। মাথা খারাপ হওয়ার জন্য মানুষের সঙ্গে তার ব্যবহারটাও রুক্ষ হয়ে যায়। এর মূল কারণ হল, একটাকে তো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আর-একটাকে যে ধরবে, সেটার দিকে একেবারেই নজর দেওয়া হয়নি। বানর একটা ডাল থেকে ঝাঁপ মারতে যায়, তখন সে জানে আমাকে এই ডাল ছেড়ে ওই ডালটা ধরতে হবে। যদি না ধরতে পারে, ধপাস করে নীচে পড়ে মারা যাবে।

সেইজন্য বলছেন, *তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ*। গীতার এই *মৎপরঃ* শব্দটা অত্যন্ত সুন্দর একটা শব্দ, আর এই শব্দ গীতায় অনেকবার আসবে। আচার্য *মৎ* শব্দের খুব সুন্দর বিশ্লেষণ করছেন। *মৎ* শব্দের সাথে জুড়ে আছে শ্রীকৃষ্ণের এই কথা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে এখানে এনে বলছেন, *অহং বাসুদেবঃ সর্বপ্রত্যগাত্মা পরো যস্য মৎপরঃ*, অর্থ হল, সবারই অন্তরাত্মা আমি সেই বাসুদেব। আর *পরঃ* মানে শ্রেষ্ঠতম। প্রথম তাঁকে বুঝতে হবে, ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই ঈশ্বর সবারই অন্তরাত্মা, দ্বিতীয় সেই ঈশ্বর সবারই হৃদয়ে বাস করেন। আর তৃতীয় হল, সাধক বলবে,

আমি তাঁর সাথে অভিন্ন। এখানে যার যেমন ভাব, কেউ বলতে পারে, আমি ঈশ্বরের ভক্ত, কেউ বলতে পারে আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি ঈশ্বরের সাথে এক, সবটাই ঠিক, তাতে কিছু আসে যায় না। চৈতন্যের সাথে যতক্ষণ আমি নিজেকে এক মনে করছি, ততক্ষণ ঠিক আছে। তিনটে ভাব আনতে হয়, প্রথম জগতে যা কিছু আছে, জগতে যত ভোগের বস্তু আছে, জগতে সম্মানের যত বস্তু আছে, জগতে পাওয়ার মত যা কিছু আছে, সব কিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ ভগবান।

পরে এক জায়গায় আচার্য ব্যাখ্যা করে বলবেন, একজন কামাসক্ত পুরুষ রমণীতে মনটা পুরো দিয়ে রেখেছে, কিন্তু সেও জানে ঈশ্বর এই রমণী থেকে উপরে। এই জিনিসটাকে বোঝা – সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম কে, ভগবান; এটা বুঝতে হয়। সেই ভগবান কে? যিনি সবারই হৃদয়ে বাস করেন। আমার সাথে সেই ভগবানের কি সম্পর্ক? কোন না কোন রূপে তুমি তার সাথে এক। এই ভাবের মধ্যে মনকে পুরো বসিয়ে দিতে হয়। মন বসে গেলে কি হয়? ইন্দ্রিয়গুলোর মনমড়া হয়ে নিজের জায়গায় বসে থাকে, তার সব দাপাদাপি বন্ধ হয়ে যায়। কথায় বলে, ফাঁকা মন মানে চঞ্চল মন। বাচ্চা ছেলেকে যদি কোন কিছুতে ব্যস্ত না রাখা হয়, তা নাহলে সে সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াবে, তার দুরন্তপনায় বাড়ির লোকরা নাজেহাল হয়ে যাবে। কিন্তু বাচ্চাকে যদি একটা খেলার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়, বা কোন হাতে কাজের মধ্যে বা তার যে কোন পছন্দের কাজের মধ্যে আটকে রাখা হয়, তখন সে ঠিক থাকে। আমাদের মনের অবস্থাও বাচ্চার মত, একটা সুনিশ্চিত ভাবে যদি কিছু না দেওয়া থাকে মন চঞ্চল হয়ে থাকবে। যেমন ইন্দ্রিয়ের বস্তুগুলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আসবে, তখন মন চঞ্চল হয়ে উঠবে। ঈশ্বর আছেন, আমি সেই ঈশ্বরের সাথে এক, এই ভাবটাকে নিয়ে মন যদি পুরো স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে, ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি পুরো সংযম করে রাখতে পারে, তখন কিন্তু ফাঁকা থাকলেও মন আর চঞ্চল হবে না।

সবাই এসে বলে, মহারাজ মন স্থির হয় না; কি করে মন স্থির করব? মন তো তোমার স্থির আছে, মন যদি স্থির না থাকত, তাহলে তো তোমাকে পাগলা গারদে ভরে দিত। যারা বলে, আমি কি করে মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখব, তাদের জন্য এটাই বলতে হয়, পাগল বাদে সবারই মন নিয়ন্ত্রণে থাকে। বাচ্চা মানেই চঞ্চল, কিন্তু তাকেও যদি টিভিটে তার মনের মত কার্টুন চালিয়ে দেওয়া হয়, সে মন দিয়ে সেটাই স্থির হয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে থাকবে। আমাদেরও আমাদের মনের মত কোন কিছু, কোন সিরিয়াল, সিনেমা, ক্রিকেট ম্যাচ চালিয়ে দেওয়া হয়, একেবারে একাগ্র মন দিয়ে আমরা দেখতে থাকব। মনের একাগ্রতা না হওয়াটা সমস্যা না, সমস্যা হল, যে কাজগুলো আমার কাছে আসছে, সেই কাজে আমার মন যায় না। যেমন খেলার সময় বাচ্চারা পুরো মন লাগিয়ে খেলে, কিন্ত পড়াশোনা করার সময় সেই মনটাকে লাগাতে পারে না, কারণ পড়াশোনাতে তার মন যায় না। একাগ্রতার সমস্যা নেই, আমাদের এটা ভুল ধারণা, আমরা প্রায়ই বলি, আমার একাগ্রতার বড় অভাব, কিছুতেই মনটাকে একাগ্র করতে পারি না। যে বলে আমার একাগ্রতা নেই, তাহলে তাকে কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। পাগল ছাড়া একাগ্রতার অভাব কারুর হয় না, শুধু যে কাজটা আমার করা দরকার, সেই কাজটা আমার করতে ইচ্ছা করে না। এখানে একাগ্রতার জন্য ট্রেনিংএর দরকার পড়ে না, দরকার সেই ট্রেনিংএর যে ট্রেনিংএ আমাকে শেখাবে কি করে কাজকে ভাল লাগাতে হবে। যদি তাকে বোঝান যায় যে, কেন এই কাজ করাটা তার জন্য দরকার, কেন সেই কাজ মন দেওয়াটা দরকার, নিজে থেকেই তখন কাজে মন চলে যাবে।

সমস্যা কখন একাগ্রতাকে নিয়ে না, সমস্যা হল যে জিনিসটা করা হচ্ছে, সেটাকে নিয়ে। মন যখন বুঝে নেয় আমাকে ঈশ্বরের ভাবে থাকতে হবে, তখন তার মন নড়বে না। কোন মানুষ যদি নিজের স্ত্রীকে ঠিক ঠিক ভালবাসে, সে কখন অন্য নারীর দিকে মন দেবে না। যদি ভালবাসা না থাকে, তখন এদিকে সেদিক মন যাবে। আমিও যদি আমার অন্তরাত্মাকে ঠিক ঠিক ভালবাসি, ঈশ্বরকে যদি ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারি, জগতের দিকে কক্ষণ মন যাবে না।

তাহলে ইন্দ্রিয় সংযম কিভাবে হবে? সবার আগে বুঝতে হবে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের স্বরূপ কি। ঈশ্বর, তাঁর স্বরূপ কি? তিনি শুধু আমার আপনার না, সবারই অন্তরাত্মা; সেই জায়গাতে মনকে স্থির করে দেওয়া। যখন মন পুরোপুরি স্থির হয়ে যায়, সেই অবস্থায় কোন দিন আর ইন্দ্রিয় চঞ্চল হবে না, তাকে বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞ। যদি এটা আমরা না করি, যেটা আমরা কেউই করি না; জানেন সবাই কিন্তু কেউ করে না। এখান থেকে ভগবান একটা নূতন বিষয়কে নিয়ে এবার বলতে যাচ্ছেন।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে।।৬২।।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।৬৩।।

(বিষয়সমূহ চিন্তা করতে করতে সেই বিষয়গুলিতে মানুষের আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কামনা (তৃষ্ণা) হয়, কামনা প্রতিহত হয়ে ক্রোধে পরিণত হয়, ক্রোধ থেকে কর্তব্যাকর্তব্যরূপ বিবেকনাশ এবং বিবেকনাশ থেকে শাস্ত্র এবং আচার্যের উপদেশজনিত সংস্কারের স্মৃতিবিলোপ, স্মৃতিবিভ্রম থেকে পুরুষের সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হলে মানুষ পুরুষার্থের অযোগ্য হয়।)

এতক্ষণ একটা উচ্চ দর্শন ও উচ্চ চিন্তন নিয়ে বলে যাচ্ছিলেন –ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান নিয়ে বলছিলেন। সেখান থেকে এবার একেবারে ব্যবহারিক জীবনে চলে আসছেন। এই অংশটাকে আমরা বলতে পারি সর্বনাশের কারণ আর তার নিদান। জীবনে সর্বনাশ কেন নেমে আসে? আমার আপনার জীবনে বা আমাদের কোন না কোন পরিচিত ব্যক্তি অবশ্যই এই কথা বলেছে, আমার জীবনের সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি, আমারা সব শেষ হয়ে গেল। গীতা এই দুটি শ্লোকে পুরো বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন, মানুষের জীবনে কিভাবে চূড়ান্ত সর্বনাশ নেমে আসে, কেন হয়। তারপরে আবার এর নিদানের উপায় বলবেন, কি করে এর থেকে বাঁচা যায়।

আপনার জীবনে কি দুঃখ আছে? আপনার কি মনে হয় আপনার জীবন প্রায় শেষ? আপনি কি মনে করছেন আপনার জীবন নাশ হয়ে গেছে? আপনি কি মনে করছেন আপনার জীবনে শান্তি নেই বা শান্তি খুঁজে পাচ্ছেন না? আপনি কি মনে করেন, চিতায় ওঠার পরেই আপনার শান্তি হবে? আপনি কি কাউকে জানেন যার depression আছে? আপনি কি কাউকে জানেন কারুর মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা আছে? জীবনে মনের যত রকম সমস্যা হতে পারে, সাইকলজি, সাইকেয়েট্রি, সমস্ত কিছুকে ভগবান মাত্র এই দুটি শ্লোকের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

যাদের অবসাদ আছে, আত্মহত্যার প্রবণতা আছে, এদের দুটো জিনিস হয় – একটাকে বলে এণ্ডোজেনিক, যাতে বলা হয় যে তার মস্তিষ্ক ম্যাল ফাংশানিং করছে। আর দ্বিতীয়টা হল, যেটা চিন্তা-ভাবনা থেকে হয়। এই চিন্তা-ভাবনাটাই ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে সত্যিকারের ডিস-অর্ডার এনে দেয়। যেমন আমার হাতের উপর যদি রোজ জোরে জোরে আঘাত করতে থাকি, প্রথমে ব্যাথা হতে শুরু হবে, ব্যাথা হতে হতে একদিন হাতটা ভেঙে যাবে। মনেও ঠিক তাই হয়, মারতে মারতে একদিন ভেঙে যায়। মন ভেঙে গেলে ডাক্তারের ওষুধ ছাড়া ওটা আর ঠিক হয় না। কিন্তু পুরো যদি না ভেঙে থাকে, তখন মনোবিদের কাছে গিয়ে কাউন্সেলিং করাতে বলে। এই সব কিছুকে পুরো দুটি শ্লোকের মধ্যে বলে দিয়েছেন। ফ্রয়েডের যত থিয়োরী, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানে যা কিছু আছে সবটাই এই দুটি শ্লোকে বলে দেওয়া হয়েছে। মানুষের সমস্ত নাশের যে মূল, এই দুটি শ্লোকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

এখানে ক্রোধকে নিয়ে আলোচনা করবেন। ঠাকুর একবার মথুরবাবুর সঙ্গে ঘোড়াগাড়ি করে যাচ্ছেন। ঠাকুর বেশীর ভাগ সময় বিভিন্ন ভাবে থাকতেন। ঘোড়াগাড়ি করে যাচ্ছেন, সেই সময় হঠাৎ তাঁর ভাব হল যে, রাবণ সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করেছে,

রাবণের রথকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। উনি ওই ভাবাবস্থায় গিয়ে এসব ভাবছেন। সেই সময় একটা দুর্ঘটনা হয়ে ঘোড়াগাড়িটা ভেঙে গেল। ঠাকুর তখন মথুরবাবুকে বললেন, এতক্ষণ তাঁর মনের ভিতর কি হচ্ছিল। মথুরবাবু ঠাকুরকে বলছেন, বাবা, আপনার সাথে আমার গাড়ি চাপা যাবে না। আপনি কখন কি ভাবে চলে যাবেন, আর সেই ভাব থেকে কি অঘটন ঘটবে কোন ঠিক নেই।

ঘটনাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা যখন কারুর উপর ক্রোধ করি, সেই ক্রোধটা ঘুরে আমাদের কাছে চলে আসে। এই দুটি শ্লোক ক্রোধকে কেন্দ্র করে ক্রোধের পিছনটা আর ক্রোধের সামনের দিকটা নিয়ে আসবেন। ইদানিং anger managementএর আলোচনাতে এই কথাগুলো প্রচুর আসে। যেমন বলা হয়, ক্রোধ এলে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে থাকবে, এই ধরণের আরও অনেক কথা বলা হয়। গীতা এই জিনিসগুলিকে আনবেন না, গীতা পুরো মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখাচ্ছেন, জিনিসগুলো কিভাবে হয়। জিনিসটাকে একবার বুঝে নিলে, তারপর তাকে সামলানো সহজ হয়। বলা হয়, শত্রুর বাসস্থানটা যদি জানা যায়, শত্রুকে নাশ করা সহজ হয়ে যায়।

ধ্যায়তো বিষয়ান্, বিষয় মানে ইন্দ্রিয়ার্থ যাকে বলা হল, বস্তু যাকে বলা হল। এই বস্তুর যদি ধ্যান করা হয়, একটা জিনিসের বারবার চিন্তা করে যাচ্ছি, বস্তুটা মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করে যাচ্ছে, তখন সেই বস্তুর প্রতি একটা সঙ্গ, একটা আকর্ষণ জন্মায়। এই বস্তু যে কোন জিনিস হতে পারে। প্রথমে শুরু হয় আমাদের নিজের শরীর দিয়ে। সেখান থেকে আসে আমাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব। সেখান থেকে খেলনা, পছন্দের খাবার, সেখান থেকে বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদিতে। একটা জিনিসকে দেখলাম, ভাল লাগল। আবার ভাবলাম, আরও ভাল লাগল। আরও ভাবলাম, আরও ভাল লাগল। এরপর জোঁকের মত সেই বস্তুর সাথে আমি এঁটে গেলাম। একজন মহারাজ বলতেন, একটা জিনিস দেখলে তোমার চোখে পড়ে যেতেই পারে। চোখে পড়লে ভাল লাগতেই পারে, মুখেও বললাম, 'বাঃ খুব সুন্দর তো', এটা হতেই পারে। কিন্তু এরপর যদি ওটাকে স্মৃতিতে নিয়ে আসা হয়, দ্বিতীয়বার যখন দেখার ইচ্ছা করবে, তখন বুঝতে হবে এবার কিছু গোলমাল হতে যাচ্ছে।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের সেবকের কাছে একটা ঘটনা আমরা শুনেছিলাম। একদিন মহারাজ ভক্তদের প্রণাম নিচ্ছেন, ভক্তরা প্রণাম করতে এসেছেন। একটা চার পাঁচ বছরের বাচ্চা তার মা-বাবার সাথে এসেছে। বাচ্চাটি একেবারে পুতুলের মত। একজন সেবক বাচ্চাটির থুতনি বা গালে হাত দিয়ে বলছে, 'বাঃ কি সুন্দর দেখতে'। মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে খুব জোর নিষেধ করে উঠলেন। আইডিয়াটা হল, তুমি সন্ন্যাসী, তোমার মনে এই ভাব আসা উচিৎ না। আমাদের শাস্ত্রে এটাকে বলে *শোভন অধ্যাস*, একটা দৃশ্য বা বস্তু বা কোন ব্যক্তিকে দেখে খুব সুন্দর লাগল, ভাল লেগে গেল, এরপর এই ভাল লাগাটাই বস্তুতে গিয়ে একটা attachment তৈরী হয়ে যায়। একজন যুবক একটা চাকরি চায়, সে আগে থেকেই মন ঠিক করে রেখেছে, আমি ডাক্তার হব। আমি ডাক্তার হব, এটাকে সে এতবার ভেবেছে যে, সে আর তার কামনা এক হয়ে গেছে। একজন চাইছে, আমাকে একটা গাড়ি কিনতে হবে, আমার এই কোম্পানির এই মডেলের গাড়ি চাই, সেও এই ভেবে ভেবে তার কামনার সাথে এক হয়ে যায়। মা সীতা সোনার হরিণ দেখে ফেললেন, দেখেই ভালবেসে ফেললেন। সীতা মাকে আর বোঝান যাচ্ছে না যে, সোনার হরিণ হয় না। এরপর শ্রীরামচন্দ্র গিয়ে মারীচকে তীর মারতেই, মারীচ শ্রীরামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর নকল করে 'হা লক্ষ্মণ হা লক্ষ্মণ' বলে চিৎকার করতে লাগল। শ্রীরামচন্দ্রের ওই আর্তনাদ শুনে সীতা নিজেকে আর সামলাতে পারছেন না, এমনকি লক্ষ্মণকে গালাগাল দিতেও বাকি রাখলেন না।

একটা জিনিসকে নিয়ে একবারের বেশী যদি চিন্তা করা হয়, তখন সেই জিনিসের প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মে যায়। *সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ*, সঙ্গ মন থেকে হয়, ফিজিক্যাল হয় না। এই সঙ্গ থেকে আসে কামনা, আমার এটা চাই, মা সীতা যেমন বলছেন, আমার সোনার হরিণ চাই। এটা

আমরা বুঝতেও পারি না। একটা হাল্কা বাতাস থেকে কখন সাইক্লোন হয়ে গেল আমরা যেমন টের পাই না, তেমনি একটু সঙ্গ থেকে কামনার ঝড় কখন উঠল আমরা টের পাই না। তখন আমরা যে কোন কিছু করতে রাজী হয়ে যাই। ব্যক্তিগত ভাবে আমরা তাই করি, সম্প্রদায়গত ভাবেও আমরা তাই করি, সমাজেও আমরা তাই করি, জাতি রূপেও আমরা তাই করি। একজনের উপর আমার রাগ হল, সেই রাগের প্রতি আমার সঙ্গ হয়ে গেল, সেখান থেকে বলতে শুরু করলাম, লোকটাকে একটা উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষা দিতে হবে এতবার বলতে থাকবে যে, সেখান থেকে একটা কাম উৎপন্ন হবে, ওকে শিক্ষা দিতে হবে।

ওই কামে যদি কোন বিঘ্ন হয়, তখন ক্রোধের জন্ম হবে। কাউকে যদি কেউ কটূ কথা বলে থাকে, বুঝতে হবে তার ভিতরে ক্রোধ আছে। কতটা ক্রোধ আছে? আপনার ভিতরে কি আগ্নেয়গিরি সব সময় অগ্নুৎপাৎ করছে? ভিতরে জ্বালা এত বেশী যে, মুখ দিয়ে বিষবাণ বেরোতেই থাকে? তখন বুঝতে হয়, আপনার ভিতরে প্রচুর অপূর্ণ কামনা-বাসনা আছে। যে একটুতে রেগে যায়, একটুতেই যে সবার নিন্দা করে, ঝগড়া করে, বুঝতে হবে এর ভিতরে অফুরন্ত অপূর্ণ কামনা-বাসনা জমে আছে। শুধু এক জন্মের না, জন্মজন্মান্তরের অপূর্ণ কামনা-বাসনা গুলি বাসা বেঁধে আছে। এই জন্মেও এত বেশী রয়েছে যে, নিজেকে আর সামলাতে পারছে না। ভিতরে দাউ দাউ করে দাবানল জ্বলছে।

আর-একটা খুব সাধারণ জিনিস হল অহঙ্কার, সামান্য একটু অহঙ্কার। জান আমি কে? জান আমি কে, এই ভাবতে ভাবতে এমন হয়ে যাবে যে, পুরো সংসারকেই পুড়িয়ে শেষ করে দিতে চাইবে। আমাকে সম্মান দিল না, আমি দেখিয়ে দেব তাকে, তোমার মজা আমি দেখাচ্ছি; নিজের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। কিভাবে?

বলছেন, *ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ*, আমরা জানি ক্রোধ কাম থেকে আসে। কাম কোথা থেকে আসে? একটা জিনিসকে নিয়ে বার বার ভাবতে ভাবতে কামের আবির্ভাব হয়। বলছেন ক্রোধ হলে সম্মোহ হয়; মনে মোহ তৈরী হয়। বলা হয়, মোহ হলে মানুষ কর্তব্য ও অকর্তব্যের যে বিবেক, এই বিবেককে সে হারিয়ে ফেলে। আমার জন্য কোনটা করা উচিৎ আর আমার জন্য কোনটা করা অনুচিত, এই বিচারটা তার হারিয়ে যায়। আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি; বাবা-মা, বাড়ির বড়রা, বন্ধুরা, স্কুলের শিক্ষকরা, সবাই আমাদের বলেছেন কোনটা করতে হয়, কোনটা করতে নেই। কিন্তু যার ভিতর ক্রোধের জন্ম হয়েছে, ক্রোধে যে বশীভূত হয়ে আছে, সে কর্তব্য ও অকর্তব্য ভুলে যায়।

আচার্য এটাকে কি সুন্দর ভাবে যে ব্যাখ্যা করছেন, অবাক হয়ে যেতে হয়; *ক্রুদ্ধো হি সংমূঢ়ঃ সন্ গুরুম্ অপি আক্রোশতি*, আচার্যার ভাষা অত্যন্ত সহজ, একটা ছোট্ট কথাতে পরিষ্কার করে দেন। একটা লোক রেগে আছে কিনা আমরা কি করে বুঝব? আমার ভিতরে রাগ আছে কিনা কি করে বুঝব? দেখতে হবে, মনে মনে, কিংবা মুখের বাক্য দিয়ে আমি কি আমার কোন গুরুজনকে, যিনি আমার সম্মান পাওয়ার যোগ্য, তাঁকে আমি অপমানিত করেছি কিনা। শুধু মুখে না, মুখে অপমানজনক বাক্য বলা মানে আমি শেষ হয়ে গেলাম, মনে মনেও যদি তাঁকে কটূ কথা বলি, তার মানে আমার ভিতর ক্রোধ আছে। ভিতরে ক্রোধ থাকা মানেই, এমন কিছু একটা কামনা আছে, যেটা তাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে, হোয়াটস্ আপ, ফেসবুকে যা যা কথাবার্তা বেরিয়ে আসছে, বোঝাই যাচ্ছে কারুর কোথাও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে গান্ধীজী, নেতাজী কাউকেই কটূ কথা বলতে ছাড়ছে না। এমনকি স্বামীজীর নামে, সাধু সন্ন্যাসীদের নামে যা নয় তাই গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা সম্মানের যোগ্য, যাঁদের সম্মান করার কথা তাঁদের সম্বন্ধে যে ধরণের সব উক্তি করা হয়, যে ভাষায় কটূ কথা বলে, লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। কাউকে ছাড়ছে না। এই কথা বললে আবার সঙ্গে সঙ্গে লিখে

পাঠাবে, আপনি আমাকে শিক্ষা দেবেন না, কাকে সম্মান দিতে হবে। একবারও কেউ ভেবে দেখছে না, ভিতরে কত অপূর্ণ কামনা-বাসনা জমে আছে। কেন? কারণ সম্মোহ, সম্মোহ মানে বুদ্ধি যেটা সব সময় পিউরিফাইড ওয়াটারের মত স্বচ্ছ থাকার কথা, সেটা রঙিন হয়ে গেছে।

সম্মোহ যখন বাড়তে থাকে তখন কি হয়? *সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ*, স্মৃতিটা খারাপ হয়ে যায়। এই স্মৃতি বাংলা স্মৃতি না, এই 'স্মৃতি' শব্দ গীতায় অনেকবার আসবে, স্মৃতির সংজ্ঞায় বলছেন, *শাস্ত্র আচার্যঃ উপদেশাহিত সংস্কার*, শাস্ত্র ও আচার্য, এই দুজনের কাছ থেকে যে উপদেশ আসে এবং যে প্রশিক্ষণ এনারা দেন, সেই উপদেশ ও প্রশিক্ষণ থেকে যে সংস্কার তৈরী হয়, সেটাকে বলা হয় স্মৃতি। সংস্কার এখানে কালচার অর্থে বলছেন। অনেক সময় আমরা রেগেমেগে বলি, তুমি কেমন বাড়ির ছেলে, তোমার মুখের ভাষা এই রকম নোংরা! একজন ভদ্রলোক, তাঁরা আগেকার দিনে কোন রাজা ছিলেন। ওদের পাঁচ-ছয় বছরের একটা বাচ্চা ছেলে তাদের মালিকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছে। তাতেই ছেলেটির বাবা তিনবার বললেন, 'তুমি তাকে তুমি বলে ডাকলে'? তার মানে, আমরা যে কালচারে বড় হয়েছে, সেই কালচারে সবাইকে সম্মান দিতে হয়। যারা সম্মান দিতে জানে না, দিতে চায় না; ইদানিং যেমন সন্ন্যাসীদের দেখলেই বলবে, সন্ন্যাসীরা কত ঢপ হয় আমার সব জানা আছে; তার মানে তার স্মৃতি হারিয়ে গেছে। তাকে তার কালচারে যে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল, কাকে সম্মান দিতে হবে, সেটা ভুলে গেছে, তার স্মৃতি বিভ্রম হয়ে গেছে। স্মৃতি বিভ্রম মানে মেমরি চলে যাওয়া না, এখানে হল সংস্কার, কালচারটা তার হারিয়ে গেছে।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো, স্মৃতি যেমনি চলে গেল, বুদ্ধিটাও তার শেষ হয়ে গেল। রাজযোগে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারটে জিনিসকে নিয়ে খুব বিস্তারিত ভাবে বলা হয়। এখানে আমরা অত বিস্তারে না গিয়ে শুধু মন আর বুদ্ধিকে নিচ্ছি। মন হল, যে ভাবছে এটা করব কি, করব না; আর বুদ্ধি হল, যে বলছে, এটা কর। এই বুদ্ধিটা সংস্কার থেকে আসে। এই সংস্কারটা আসে শাস্ত্র ও আচার্য থেকে। বাবা-মা, আমাদের গুরুজনরা আমাদের ছোটবেলা থেকে যে ট্রেনিং দিয়ে আমাদের বড় করেছেন, সেখান থেকে আমাদের ভিতর একটা সংস্কার তৈরী হয়। জাপানের কালচার যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানবেন, জাপানীরা বয়স্ক মানুষদের খুব সম্মান দেন, একেবারে পরিবারের লোকের মত সম্মান দেন। ছোটবেলায় আমরা একটা খুব মজার কথা শুনেছিলাম, মিথিলার নামে বলা হয় যে, মিথিলার দুজন মহিলা যদি ঝগড়া করে, আর সেই সময় বাইরের কোন লোক, যে মৈথিলী ভাষা জানে না, যদি এসে যায়, সে মনে করবে দুজন মহিলার মধ্যে যেন প্রেমালাপ চলছে। মৈথিলী ভাষা এমন একটা ভাষা যেখানে কোন কটূ শব্দই নেই। উর্দুতেও তেমনি, কটূ শব্দ নেই। ওরা যদি রেগেও যায়, কিন্তু ভাষাটা এত মার্জিত, লঘু, কটূ কোন শব্দই নেই, তাই কথাবার্তা এত নিয়ন্ত্রণে থাকে। যার জন্য মৈথিলী কালচার এত সমৃদ্ধ যে হাজার হাজার বছর ধরে চলছে। রাজা জনক, যাজ্ঞবল্ক্যের সময় থেকে সেই ট্রাডিশান সমানে চলছে। শাস্ত্র আর আচার্য থেকে যে বুদ্ধি আসছে, যে বুদ্ধি বলে দেয় কোনটা কর্তব্য, কোনটা অকর্তব্য, এই বুদ্ধিটাই নাশ হয়ে যায়।

শেষে কি হয়? বলছেন *বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি*, যার বুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে, তার বিনাশ হয়ে গেল। কারুর জীবনে সর্বনাশ কেন আসে? কারণ তার বুদ্ধিটাই নাশ হয়ে গেছে। বুদ্ধি নাশ মানে, বিবেক, বিচারটাই সে হারিয়ে ফেলেছে। বিবেক বুদ্ধি কেন হারিয়ে যায়? কারণ তার স্মৃতিটা নষ্ট হয়ে গেছে। স্মৃতিটা কেন নষ্ট হয়ে গেছে? কারণ একটা সম্মোহ হয়ে গেছে, কামনা-বাসনার জন্য মনটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মনটা কেন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল? কারণ ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছিল। ক্রোধ কেন হল? কামনা থেকে হয়েছে। আসলে কামনা যদি পুর্তি হয়ে যায়, তখন কামনা বাড়ে। আর কামনাতে যদি কোন বিঘ্ন হয়, তখন ক্রোধের জন্ম হয়। ক্রোধ হলে তখন তার কোন কিছুতে নিয়ন্ত্রণ থাকে না; তার লঘু-গুরু কোন জ্ঞান থাকে না, গুরুজনকেও কটূ কথা শুনিয়ে দেবে।

আচার্য এখানে খুব সুন্দর বলছেন, *তাবৎ এব হি পুরুষো যাবদ্ অন্তঃকরণং তদীয়ং কার্যাকার্যবিষয়বিবেকযোগ্যং তদযোগ্যত্বে নষ্ট এব পুরুষো ভবতি*। ঠাকুর যেমন বলছেন, মানুষ কে, যার মানে হুঁশ আছে, আমিত্বে যার হুঁশ আছে। আমিত্বে যার হুঁশ নেই সে কিসের মানুষ! আচার্য এখানে সেই আমিকে নিয়ে বলছেন, আমি কে, যার বুদ্ধি আছে। এই বুদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ভিতর যে শুভ সংস্কারগুলি আছে, তার উপর। এই সংস্কার বলতে, আমরা জন্ম জন্ম থেকে সংস্কারের পুঁটলি নিয়ে আসছি, এখানে সেই সংস্কারের কথা বলছেন না, এই সংস্কারটা হল কালচার। আবার অনেক সময় বলা হয়, বুদ্ধি আছে, কিন্তু কোথায় লাগাতে হয় জানে না। এটাই হয় বুদ্ধির অভাব। বুদ্ধি মানে তা নয়, খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কিন্তু জানে না কোথায় লাগাতে হবে, এটা তা না। বুদ্ধি মানে কোথায় একে প্রয়োগ করতে হবে এই ক্ষমতাটা তার থাকবে। যার এই বুদ্ধি আছে, তার ভাষা অত্যন্ত মার্জিত, গুরুজনকে কক্ষণ কোন পরিস্থিতিতে কটূ কথা বলবে না।

মহাভারতে খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, অর্জুন একবার রেগে গিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে কটূ কথা বলছেন। শুনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'অর্জুন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি কখন বৃদ্ধজনের সেবা করোনি, তুমি বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সঙ্গ করোনি'। ক্রোধ হল একমাত্র লক্ষণ, যেটা বলে দিচ্ছে তার সংস্কৃতির অভাব। যার ক্রোধ হয়, বুঝতে হবে তার কালচার নেই, হয় তোমার বাড়িরই কালচার ছিল না, আর তা নাহলে তোমার স্মৃতিবিভ্রম হয়ে গেছে। বাচ্চা যখন খুব চেঁচামেচি করে, তখন আমরা আদর করে বলি, 'বাবুসোনা এ-রকম করো না, লোকে কি ভাববে, বলবে তুমি পাগল হয়ে গেছ'। কারণ পাগলরা ঠিক এই রকমই আচরণ করে, কারণ তাদের মনের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। একটা মুহূর্তের জন্য কারুর যখন ক্রোধে মাথাটা খারাপ হয়ে যায়, তখন সে ঠিক এই ভাবেই আচরণ করে।

আচার্য এটাই বলছেন, *তাবৎ এব হি পুরুষো*, মানুষ ততক্ষণই মানুষ, যতক্ষণ *যাবদ্ কার্যাকার্যবিষয়*, কোনটা করতে হবে, কোনটা করা যাবে না, এই ব্যাপারে *বিবেকযোগ্যং*, এই বিবেকটা যতক্ষণ আছে। কি করতে হবে আর কি করতে নেই; যার এই বিবেক নেই; যার বিবেক নেই কাকে কি বলতে হয়, সে তাহলে কিসের মানুষ! সে পুরুষও না নারীও না, সে নপুংসক। স্বামী মোক্ষদানন্দজী মহারাজ বলতেন, 'যিনি সত্যিকারের ভদ্রলোক, তাঁর সাথে কারুর যদি কখন বন্ধুত্ব বা পরিচয় হয়, তিনি তার কোন দোষ কক্ষণ কোন পরিস্থিতিতে অপরকে বলবেন না; সামনেও না, পিছনেও না'। আমরা যখন কারুর দোষ ধরি, তখন তাকে তার দোষটাকে শোধরাবার জন্য বলি না, নিন্দা করার জন্যই বলি। মহারাজ ওটা নিন্দা করার অর্থে বলছিলেন। তিনি এই কথা বলে, সবাইকে বলতেন, 'সবার আগে একজন ভদ্রলোক হও'। ভদ্রলোককে পরিভাষিত করছেন – যে কারুর নিন্দা করে না, সামনেও না আড়ালেও না। নিন্দা করছে, তার মানে ভিতরে ক্রোধ গজগজ করছে। যদি সত্যিই আমি তার ভাল চাই, তাহলে আমাকে একান্তে গিয়ে তাকে ডেকে ফিসফিস করে বলতে হবে, 'আপনি এ-রকম করলেন! এটা ভাল লাগল না'। এটাকে কিন্তু নিন্দা করা বলে না। ভালবেসে আমি তাকে সামলাচ্ছি। আড়ালে বা পিছনে নিন্দা করাকে বলা হয় পিশুনিবৃত্তি। সামনে করলে বলা হয় ঔদ্ধত। যারা বলে, আমি স্পষ্ট কথা বলতে ভয় পাই না, বুঝতে হবে এ সত্যিকারের একজন ঔদ্ধত, এর জীবন শেষ হয়ে গেছে। যেমন বললেন, *বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি*, *প্রণশ্যতি* মানে বিশেষ রূপে নাশ, কারণ তার বুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে।

বুদ্ধি নাশ কেন হল? এত বিরাট ঝড় আম্ফান কেন এসেছিল? যখন শুরু হয়েছিল, তখন তো কিছুই ছিল না, অল্প একটু হাল্কা হাওয়া দিচ্ছিল। একটা জিনিসকে দেখেছিলাম, একটা জিনিসকে অনুভব করেছিলাম, সেটার প্রতি আমার আসক্তি হয়ে গেল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'আমার অহঙ্কার', তুমি জানো আমি কে, তুমি জানো আমি কি করতে পারি। আচার্য বলছেন, *অতঃ তস্য অন্তঃকরণস্য বুদ্ধেঃ নাশাৎ প্রণশ্যতি পুরুষার্থযোগ্য ইত্যর্থঃ*, চারটে যে পুরুষার্থ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও

মোক্ষ, এদের এই চারটেকে পাওয়ার যোগ্যতা নেই, এই চারটের কোনটাই সে পেতে পারে না। পুরুষার্থ যার চলে যাবে, সে আর জীবনে কোন দিন সাফল্য পাবে না। জীবনে যদি সাফল্য পেতে হয়, তার বুদ্ধিকে ঠিক রাখতে হবে। বুদ্ধি ঠিক রাখতে হলে ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা চাই। একটা বাচ্চাকে শাসন করছেন, সেখানে একটু ক্রোধ দেখানো যেতে পারে, ওই ক্রোধের মধ্যেও আপনার ওই বাচ্চার প্রতি ভালবাসাটা আছে। সেখানে সে নিন্দা করছে না। কোন মা অপরের কাছে নিজের সন্তানের নিন্দা করে না। আপনজনের সম্বন্ধে কেউ নিন্দা করে না। যার নিন্দা করছেন, তার মানে আপনি তাকে দূরে করে দিয়েছেন। দূরে করেছেন সেটা আলাদা, কিন্তু আপনার নিজের বুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে।

সব কিছুর শুরু হয় ক্রোধ থেকে, ক্রোধের জন্ম হয় কাম থেকে। এই কাম হল, যখন আমরা কোন জিনিসকে চাই বা আমরা কোন কিছু থেকে যখন সরে আসতে চাই, এটা রাগ আর দ্বেষ। রাগ মানে বাংলা রাগ না, এটা সংস্কৃতের রাগ, সংস্কৃতে রাগ মানে ভালবাসা বা অনুরাগ আর দ্বেষ মানে বিদ্বেষ, তার থেকে সরে আসা। এই রাগ আর দ্বেষকে পরের শ্লোকে টেনে নিয়ে যাবেন। যাদের জীবনে প্রচুর অশান্তি, ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, কোথাও তারা এমন একটা কামনার মধ্যে ডুবে আছে, যেটাকে অনেক দিন ধরে তারা পুষে রেখেছে।

এখানে আমার নিজের একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে, একবার আমার পায়ে একটা পাথরের কণা ঢুকে গিয়েছিল। আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি। কিন্তু অনেক বছর ধরে ব্যাথা হচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছে না, কিসের থেকে ব্যাথা হচ্ছে। একজন পরিচিত অর্থোপেডিক সার্জেনের সাথে দেখা হতে আমি তাকে পায়ের ব্যাথার কথাটা বললাম। উনি দেখটেখে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এটা কত দিন পুষে রেখেছেন'? পুষে রাখা কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। তারপর তিনি লোকাল এ্যনাস্থেসিয়া করে অপারেশন করে একটা বালির কণা বার করলেন। যেখানেই দেখা যাবে প্রচুর অশান্তি লেগে আছে, সেখানে বুঝতে হয় অনেক দিন ধরে আমরা একটা কোন কামনাকে পুষে রেখেছি। এই যে পুষে রাখা হয়েছে, এবার ওখান থেকে আস্তে আস্তে ফেরৎ আসতে হবে।

গীতা এতক্ষণ দুটো শ্লোকে মানুষের বিনাশের কারণ এবং কিভাবে ধাপে ধাপে মানুষ বিনাশের দিকে চলে যায় বললেন। এরপর এর বিপরীতে সুখ শান্তি কিভাবে হয় বলবেন। এখানে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমি একজন চিকিৎসককে জানতাম, উনি অনেক কিছু মিলিয়ে চিকিৎসা করতেন। ঠিক হোমিওপ্যাথি না, আবার কিছুটা হোমিওপ্যাথির মত একটা চিকিৎসা। উনি আট দশ রকমের গ্লোবিউলস্ রাখতেন। প্রচুর লোক ওনার কাছে ওষুধ নিতে আসত। কিন্তু রোগ ভাল হত কিনা আমার জানা নেই। একদিন আমি ওনার কাছে বসেছিলাম, সেই সময় একজন কেউ ফোন করেছে। ফোনে জিজ্ঞেস করছে, 'আপনি আমাকে হাঁটু ব্যাথার ওষুধ দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন আমার পেটেও একটু ব্যাথা হচ্ছে'। এ প্রান্ত থেকে উনি বলে দিলেন, 'ওই ওষুধই কাজে দেবে'। আবার ওই প্রান্ত থেকে বলল, 'কিন্তু জানেন, আমার একটু জ্বর জ্বর ভাবও লাগছে'। এখান থেকে বলে দিলেন, 'ওই ওষুধেই কাজ হয়ে যাবে'। ওখানে আমরা দু-তিনজন ছিলাম, শুনে আমরা খুব হাসতে শুরু করেছি। সব কিছুতেই ওনার একটাই ওষুধ কাজ করবে। কারো ভাল হয় কিনা ভগবান জানেন। এভাবে যদি সব রোগ ভাল হয়ে যেত তাহলে তো কেউ এত টাকা খরচ করে, এত খেটে এমবিবিএস ডিগ্রি নেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগত না।

গীতা হল মহা ঔষধ, সমস্ত সমস্যার নিদান দেন। কিন্তু একই কথা, বা একটা কথাই বলেন না, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করছেন। তাছাড়া গীতা হল মায়ের মত। তিন চার বছরের বাচ্চার কত রকম আবদার, তাকে নিয়ে কত রকম সমস্যা, বাবা অতটা সহ্য করবে না, কিন্তু মা বাচ্চার সব সহ্য করে নেয়। বাচ্চার আধো আধো কথা, যে কথাকে বাচ্চা মনে করে এর উপর

আমার সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার কোন কথারই দাম নেই, মা সব কথা মন দিয়ে শোনে। একটু ব্যাথা লাগলে, একটু মন মত কিছু না হলে, সবাটাই দৌড়ে মাকে গিয়ে বলে। মা সবটাই দেখেন, যার জন্য সমাজে, শাস্ত্রে মাকে খুব উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়। যিনি অধ্যাত্ম শিক্ষা দেন, গুরু যিনি, তাঁর পরেই মায়ের স্থান। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে গুরুকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি ভববন্ধন, জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। মা এই জীবনের সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি দেন। গীতা মায়ের মত, গীতা জগজ্জননীর মত। গীতা এই জীবনের সমস্যাকেও মিটিয়ে দেন, জন্ম জন্মান্তরের যে সমস্যা, সেখান থেকেও আমাদের উদ্ধার করেন। গীতার বাণী জীবনে লাগাতে পারলে, জীবনের অনেক সমস্যা আমাদের কমে যাবে।

একজন প্রশ্ন করলেন, গীতা পড়লে কি আমার সমস্যা মিটে যাবে? যিনি জগৎকে গীতার বাণী দিলেন, সেই অর্জুনেরই জাগতিক সমস্যা মিটল না, সেখানে আমরা কি করে আশা করতে পারি, আমাদের সব সমস্যা মিটে যাবে। তাঁর চোখের সামনে তাঁর সমস্ত জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন এক অপরের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেল। কিন্তু ভগবানের ঠোঁটের ফাঁকে সেই জগৎ ভোলান হাসিটা শেষ দিন পর্যন্ত লেগেছিল। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা, সংসারের নানা রকম সমস্যা, এগুলো আসবে; গীতা কেন কেউই এটাকে আটকাতে পারবে না। আমরা মুখে বলে দিতে পারি, ভগবান আছেন, তিনি সব সমস্যা আটকে দেবেন। ভগবান আটকান না। ভগবান যেটা করেন, তা হল, তিনি ভিতরে সেই শক্তিটা দিয়ে দেন, যে শক্তি দিয়ে জগতের সর্বপ্রকার জ্বালা যন্ত্রণার মোকাবিলা করে জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যায়। প্রত্যেক জ্বালা যন্ত্রণা, সমস্যার প্রতি আমাদের প্রত্যেকের একটা প্রতিক্রিয়া থাকে, এই শক্তির জন্য প্রতিক্রিয়াকে আটকাবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আসে।

দুঃখ কখন বাইরে থেকে আসে না, সমস্যা বাইরে থেকে আসে। এই জিনিসটাকে আমাদের একটু ভাল করে বুঝতে হবে। ভগবান, শাস্ত্র, আচার্য, এনারা সমস্যাকে আটকান না। সমস্যা নিজের মত আসতে থাকে। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, শীত, গ্রীষ্ম সব নিজের মত আসে, নিজের মত চলে যায়। কিন্তু আমাদের ভিতর থেকে যে প্রতিক্রিয়া আসে, যেটাতে আমরা কষ্ট পাই, আমরা যে কষ্ট পাই, শোক পাই, তাপ পাই, এগুলো ভিতর থেকে আসে, বাইরে থেকে আসে না, সমস্যা বাইরে থেকে আসে। এই শাস্ত্রগুলি বা গুরুকৃপা, ঈশ্বরকৃপা, এরা সমস্যাকে আটকায় না। তাহলে এনারা কি করেন? ভিতরের শক্তিটাকে বাড়িয়ে দিয়ে দুঃখ, কষ্টের প্রতি যে প্রতিক্রিয়াটা হয়, সেটাকে আটকে দেন। গীতা হল এক অমৃতময়ী জননী। যিনি জগজ্জননী তিনিই গুরু রূপে আমাদের সামনে আসেন, তিনিই মাতৃরূপে আমাদের গর্ভে ধারণ করেন। জন্মের পর তিনিই প্রথম গুরু, যিনি আমাদের শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। গীতা জীবনের শিক্ষা দেয়, গীতা মোক্ষদায়িনী, গীতা মোক্ষশাস্ত্র, জন্মমৃত্যুর সমস্যা থেকেও মুক্তি দান করেন।

এখানে কয়েকটা শ্লোকের মাধ্যমে গীতা জীবনের সমস্যার সমাধান দিচ্ছেন। আর সেখান থেকে কিভাবে জন্মমৃত্যুর সমস্যার বাইরে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। বলছেন –

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।৬৪।।

(কিন্তু সংযতচিত্ত পুরুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি ও অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ হতে মুক্ত হয়ে স্ববশীভূত ইন্দ্রিয় দ্বারা অবর্জনীয় (দেহস্থিতিহেতু অপরিহার্য) বিষয়সমূহ পতিত তৃণের ন্যায় অনাসক্তভাবে গ্রহণ করে চির-প্রসন্নতা লাভ করেন।)

আমরা কি কখন একবারও ভেবে দেখার অবসর পেয়েছি যে, আমাদের মনকে কে চালায়? যাঁরা উপর উপর দু-একটা শাস্ত্র পড়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উত্তর দেবেন –ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা

গাছের পাতাটিও নড়ে না, ঈশ্বরই মনকে চালান। যাঁরা ভক্তিশাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা বলবেন, তিনিই সদ্বুদ্ধি দেন, তিনিই অসদ্বুদ্ধি দেন। গীতা এই ধরণের কথা বলবেন না, গীতার approach একেবারে practical approach। বেশীর ভাগ সময় গীতার approach, রাজযোগের approachএর সাথে মিলে যায়। রাজযোগ পুরো যৌক্তিকতার উপর চলে। রাজযোগে আপনাকে কোন কিছু বিশ্বাস করার দরকার হয় না, A সমান সমান B, B সমান সমান C, তাই A সমান সমান C, এই যুক্তিতে চলে।

বলছেন মন দুই প্রকার – একটা হল স্বাধীন মন, স্ব-অধীন, অর্থাৎ নিজের নিয়ন্ত্রণে, আর-একটা হল পরাধীন মন। পরাধীন মানে অপরের নিয়ন্ত্রণে চলে। অপর মানে? রাগ আর দ্বেষ। সংসারে যত বস্তু আছে, সেই বস্তুর প্রতি যে আকষর্ণ, সেটা হয়ে গেল রাগ। আর যে বস্তু থেকে আমাদের যে সরে আসার ইচ্ছা, পছন্দ হচ্ছে না, সরে আসছি, এটা হল দ্বেষ। কিছু লোকের নাম শুনলেই আমরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠি। কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে বেগুন দিলে যেমন ঝং করে ওঠে, নাম শুনলেই সেই রকম জ্বলে যাই। 'তোমাদের পার্টিতে ওকেও নিমন্ত্রণ করেছ? ও যদি থাকে আমি কোন মতেই তোমাদের পার্টিতে আসছি না'। এটাকে বলে দ্বেষ। তাহলে মনের মালিক কে? রাগ আর দ্বেষ। যাকে ভালবাসি, মন বলল চলো ওর দিকে, চললাম; তার পিছন পিছন দৌড়ালাম। যাকে পছন্দ করি না, তাকে যদি কোথাও দেখে নিই, অন্য রাস্থা ধরে তাকে এড়িয়ে যাব। মন ইন্দ্রিয়গুলির মালিক, ইন্দ্রিয়গুলো শরীরের মালিক। আর মনের মালিক, রাগ আর দ্বেষ। স্বামীজী সেইজন্য বলছেন, Avoid not seek not।, কোন কিছু থেকে সরে আসবে না, কোন কিছুর দিকে দৌড়ে যাবে না। কুড়ি পঁচিশ বছর আগে টেলিভিশন যখন ঘরে ঘরে সব সময় চলত, তখন বলা হত, বাড়ির মালিক কে, এটা যদি বুঝতে হয়, তাহলে দেখতে হবে বাড়িতে টিভির রিমোট কার হাতে আছে। টিভির রিমোট যার হাতে, সে হল বাড়ির ঠিক ঠিক মালিক। মালিক কে, এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অনেক জোকস্ আছে।

মালিক কে? আমার রাগ আর দ্বেষ। আমার জীবনে ভাল মন্দ যা কিছু হচ্ছে, জীবনে যা সুখ পাচ্ছি, যা কষ্ট পাচ্ছি, আমাদের চোখে যত জল, মুখে যত হাসি – সব কা দাতা দো, রাগ ঔর দ্বেষ। আসলে দুই না, দুটো একই। আমাদের মুখে হাসি ভগবান ফোটান না, আমাদের চোখ দিয়ে জল ভগবান ফেলান না, সব দেয় আমাদের মনের কামনা। কামনা এই দুটি রূপে আসে – রাগ আর দ্বেষ, কিছু জিনিসের দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যায়, কিছু জিনিসের থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে আসে। এরা হল এক ধরণের মানুষ।

আর অন্য ধরণের মানুষ হল, যাঁরা পরাধীন নন। আচার্য স্বাধীন মনকে এভাবে বলছেন, স্বাধীন অন্তঃকরণ, এই হল সত্যিকারের স্বাধীনতা। সত্যিকারের স্বাধীন কে? যে রাগ আর দ্বেষ থেকে মুক্ত। রাগ আর দ্বেষ থেকে কে মুক্ত? এই যে আগে বাষট্টি আর তেষট্টি শ্লোকে বলা হল, *ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ* থেকে শুরু করে *বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি* পর্যন্ত বলে তারপর বলছেন *রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্, আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছিত*, এখানে আত্মা বলতে অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনের কথা বলছেন। আত্মা অনেকগুলো অর্থে আসে, আত্মার একটি অর্থ হয় দেহ, আর-একটা অর্থ হয় বুদ্ধি; এখানে বুদ্ধির অর্থে বলছেন। বলছেন, যার বুদ্ধি নিজের নিয়ন্ত্রণে সেই হল প্রকৃত স্বাধীন।

আপনি কি স্বাধীন হতে চান? আপনি কি বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন? দাসত্ব, গোলামী থেকে মুক্ত হতে চাইছেন? তাহলে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসুন। নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে বলছেন, তাহলে এখন কার নিয়ন্ত্রণে আছে? এখন তো মন আপনার গোলাম। কার গোলাম? রাগ আর দ্বেষের। গীতাতেই পরে বলবেন, রাগ আর দ্বেষ এরা শত্রু, সেখানে ভগবান বলবেন, *মহাশনো মহাপাপ্মা*, রাগ আর দ্বেষ আগুনের মত সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। *বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্*,

এরা আমাদের শত্রু, মনেতে বাস করে আর মনকেই পোড়াতে থাকে। আমাদের জীবনে যত দুঃখ, যত কষ্ট, যত ব্যাথা যন্ত্রণা সব এখান থেকে আসে, উপর থেকেও কিছু আসে না, বাইরে থেকেও কিছু আসে না। কিছু পরিস্থিতি বাইরে হয়, যেমন রোদ বৃষ্টির কথা বলা হল। একজন কিছু হয়ত বলে দিল, বদমাইশি করে হয়ত বলেছে বা ভুলেই বলেছে, কিন্তু তারপরেই বলতে শুরু করে দেবে, 'কি কি কি, কি বললি, আবার বল! তোর এই দুঃসাহস এই কথা আমাকে বললি, তোর বংশের আমি নাশ করে দেব, তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব'।

টলস্টয়ের খুব সুন্দর একটা গল্প আছে। একজনের একটা মুরগী তার প্রতিবেশীদের উঠোনে গিয়ে ডিম দিয়েছে। এই ডিমের মালিক এখন কে হবে? এই নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। সেখান থেকে আস্তে আস্তে দুটো বংশেরই বিনাশ হয়ে গেল। একটা দিন যদি আমরা নিজেদের বিশ্লেষণ করে দেখি, যেমন আজকে সারাদিনে আমি কি কি করেছি, তার মধ্যে কোন কোন কাজ আমার রাগপ্রেরিত ছিল, আবার কোন কোন কাজ আমার দ্বেষপ্রেরিত ছিল আর তার সাথে কোন কোন কাজ আমার কামনা-বাসনা প্রেরিত। আমি কিছু ভাল খেতে চাইছি – কামনা। আমি কোথাও বেড়াতে যেতে চাইছি –কামনা। কারু সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলেছি –কামনা। সারা দিনে একটি মিনিটও নেই, যেখানে আমি বলতে পারব, এই এক মিনিট আমি স্বাধীন। অনেকে এসে প্রায়ই আমাদের কাছে অভিযোগ করে, বাড়িতে থাকা খুব কষ্ট, এদের সঙ্গে থাকা যায় না, কি করে থাকব একবার বলবেন? এসব না ভেবে আগে আপনি নিজের মনটাকে ঠিক করুন, মনকে রাগ-দ্বেষের বাইরে নিয়ে যান। যদি রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারেন, যদি আপনি স্বাধীন হয়ে যেতে পারে, তখন কি হবে?

আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি, মানুষ তখন প্রসাদ লাভ করে। স্বামীজী চারটে যোগ দিয়ে গেছেন, এখন ভক্তরা তার সাথে আরেকটা যোগ নিয়ে এসেছেন, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, কর্মযোগ আর ভক্তিযোগের সাথে এখন এসেছে খিচুরিযোগ। খিচুরি পেয়ে গেলেই সব হয়ে গেল, প্রসাদ যদি পেয়ে যাই, সব দুঃখ কষ্ট ঘুচে যাবে। গীতার এই 'প্রসাদ' মানে তা নয়। গীতাতে যে প্রসাদ বলছেন, আচার্য তার অর্থটা বলছেন, *প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যম্*। প্রসাদ মানে মনের প্রসন্নতা, মনের আনন্দ আর মনের স্বাস্থ্য।

এই প্রসাদ কার হয়? যে রাগ আর দ্বেষ থেকে মুক্ত। প্রসন্ন কে থাকে? যে রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত। আর মন থেকে স্বস্থ কে? যে রাগ-দ্বেষ থেকে মুক্ত। তাহলে আমি, আপনি কি? মানসিক ভাবে অসুস্থ। যারা মানসিক ভাবে অসুস্থ তারা কি ধ্যান করতে পারবে? সম্ভবই না। যারা মানসিক ভাবে অসুস্থ, তারা কি জীবনে বড় কিছু পাবে? কোন দিন না। আমরা সবাই করছি গোলামী, গোলামের কি কখন আনন্দ হতে পারে! ঠাকুর বলছেন, চাকরি! সে তো সাহবের বুটের গোজা খাওয়া। আমার আপনার সাহেব কে? রাগ আর দ্বেষ। দিনরাত আমাদের গোজা মারছে। চল ব্যাটা এইদিকে, আমরাও সেই দিকে চলতে লাগলাম। সরে যা ওখান থেকে, সরে গেলাম। আমরাও সাধু সন্ন্যাসীদের প্রণাম করে বলি, মহারাজ শান্তি কি করে পাবো একটু বলে দিন। একজন পাশ থেকে উত্তর দিল, চিতায় শান্তি। চিতায় কি করে শান্তি পাবে! চিতায় কি কখন শান্তি হয়! চিতা গেটটা খুলে দিল, যাতে আগামী জন্মেও আপনি অশান্তিতে থাকেন। এটা কি একবারও ভেবে দেখেছেন কেউ, যেমনটি আছি তেমনটি পরের জন্মেও চলতে থাকবে? যা করার এই জন্মে এখানেই করে নিতে হবে, আর তা নাহলে আপনি চিতার পর চিতায় উঠতেই থাকবেন, অশান্তিতে ভুগতেই থাকবেন। কোন দিন এই প্রসাদ আসবে না।

প্রসাদম্ কিভাবে আসবে? *আত্মবশৈর্বিধেয়াত্মা*, যার মন নিজের নিয়ন্ত্রণে। মনকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা মানেই সে স্বাধীন, তা নাহলে পরাধীন। প্রসাদ পেলে কি হবে?

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হ্যানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে।।৬৫।।

(প্রসন্নতালাভ হলে স্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তির সর্বদুঃখের বিনাশ হয়; কারণ তাঁর বুদ্ধি আত্মস্বরূপে শীঘ্র নিশ্চল হয়।)

জীবের দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, আগে আগে আমরা এই তিন প্রকার দুঃখকে নিয়ে আলোচনা করেছি। তিনটেই সমস্যা, এর জন্য যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটা আপনার নিজের। বাইরে থেকে যেটা আসছে সেটা দুঃখ না, দুঃখটা আমাদের প্রতিক্রিয়া। বাইরে থেকে যেটা আসে, সেটা সমস্যা। বাইরে থেকে যেটা আসে সেটা পরিস্থিতি, দুঃখটা হল আমার ভিতরের প্রতিক্রিয়াটা।

বলছেন, যখন প্রসাদ হয়, অর্থাৎ রাগ আর দ্বেষ থেকে যখন মুক্ত হয়ে গেল, তখন কি হবে? *প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হ্যানিরস্যোপজায়তে*। জীবনে যে আমাদের এত দুঃখ, এই প্রসাদ দুঃখকে নাশ করে দেয়। আপনি কি জীবনে সুখ চান, জীবনে শান্তি চান? গীতা খুব স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন কিভাবে করতে হবে, *প্রসাদে সর্বদুঃখানাং*, সমস্ত দুঃখকে নাশ করে দেবে, যদি প্রসাদ হয়। আজ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, খুব শীত করছে, উলের যত পোষাক আছে সব চাপাচ্ছি, কিন্তু শীতে শরীরটা ঠক ঠক করে কাঁপছে। আচার্য এটাকে অন্য জায়গায় বলছেন, আগুন যেমন শীতের নাশ করে দেয়, আগুন হল হিমনাশক। ঠিক তেমনি *প্রসাদম্* হল প্রসন্নতা আর স্বাস্থ্য, মানে রাগ আর দ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে গেলে সমস্ত দুঃখ থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা দিব্যি খেয়ে রেখেছি, আমি শোধরাব না।

প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে, *হ্যাশু* মানে শীঘ্র, যার মন প্রসন্ন, শান্ত, তাদের মন আকাশের মত স্থির হয়ে যায়। আমরা কজন গর্ব করে বলতে পারি, আমার জপধ্যান ভাল হয়? সবাই বলবে, আমার জপধ্যান ভাল হয় না। ঈশ্বরে মন ঠিক ঠিক বসে এ-রকম কজন পাওয়া যাবে? আমরা মুখে ঈশ্বরের কথা বলতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরে মন বসে না, মনে ভক্তির উদয় হয় না, ধ্যান করতে ইচ্ছে করে না, আধ ঘন্টা জপ করলেই ক্লান্তি এসে যায়। দিনে আধ কি এক ঘন্টা জপ করলে কি ঈশ্বরে মনে যাবে! দিনে ছয় থেকে আট ঘন্টা কিছু না করলে কখন কি কিছু হয়! কেন আমরা জপধ্যানে বসতে পারি না, কেন শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করার পরেও ধারণা করতে পারি না? কারণ মন আমাদের সব সময় চঞ্চল। চঞ্চল মনকে বলা হয় অস্থির মন। অস্থির মনকে আকাশের মত স্থির করতে হবে। আকাশ নড়ে না, চরে না, যেমন আছে তেমনই আছে। এই অবস্থা কখন হয়? যে প্রসন্ন একমাত্র তার হয়। তার মানে, জপধ্যান কে করতে পারে? যার মন শান্ত। অশান্ত মন দিয়ে জপধ্যান কখনই হয় না।

সবাই এসে বলে, আমাকে ধ্যান শিখিয়ে দিন; আরে ভাই ধ্যান হল তাদের জন্য, যাদের মন পুরোপুরি শান্ত। এখানে উলটো, যাদের মন অশান্ত তারাই বলছে, আমি ধ্যান করব। একজনের জীবনে প্রচুর অঘটন হয়েছিল, তারপর থেকে তার খুব অশান্তি হয়েছিল। তাকে কে একজন শিখিয়ে দিয়েছে, তুমি ধ্যান কর, সব অশান্তি কেটে যাবে। তারপর থেকে সে ধীরে ধীরে পাগলের মত হয়ে যাচ্ছিল। কিভাবে কিভাবে আমার সাথে তার যোগযোগ হয়। আমি সব শুনে বললাম, এক্ষুণি আপনি ধ্যান বন্ধ করুন। উনি একজন সর্দারজী। আপনি এক্ষুণি গুরুদোয়ারে যান, সেখান বড় বড় হাণ্ডাগুলো মাজতে থাকুন। উনি যেতে শুরু করলেন, এবং দিনের পর দিন যেতে লাগলেন। প্রচুর কাজ করতে হবে, তার সাথে সেবা কাজ। এখন তিনি একেবারে ঠিক আছেন। উনি যদি ধ্যান করতে থাকতেন, একটা সময় এমন হত যে তাকে আত্মহত্যা করতে হত।

আগে প্রচুর কাজ করতে হবে, প্রচুর কাজ করতে করতে মন যখন স্থির হয়, শান্ত হয়, তখন গিয়ে ধ্যান হবে। কিন্তু এখন ইন্টারনেট, টিভি হয়েছে, সেখানে রোজই প্রচুর বাবাজীদের আবির্ভাব

হচ্ছে, বাবাজীদের টাকার দরকার, তারও টাকার দরকার। কি আর করবে, বাবাজীরাও সব ধর্মের নামে entertainment দিয়ে যাচ্ছেন, আর চেলাগুলোও গুরুর পর গুরু পাল্টাতে থাকে। ট্রেন যেমন স্টেশন থেকে স্টেশন পাল্টাতে থাকে, চেলাগুলোও গুরু থেকে গুরু পাল্টাতে থাকে। ঠাকুর বলছেন, ইত্যাদি গুরুর ইত্যাদি চেলা, এইজন্যই কিছু হয় না। একবার শাস্ত্র খুলে পড়ুন, দেখুন কি বলছে শাস্ত্র। শাস্ত্র বলছেন, রাগ দ্বেষ নিয়ন্ত্রণ কর, সেখান থেকে তোমার বুদ্ধি স্বাধীন হবে, বুদ্ধি স্বাধীন হলে সেই বুদ্ধি স্থির হবে, তখন গিয়ে ধ্যান করতে পারবে।

বুদ্ধি তোমার স্থির হয়ে গেলে, এবার তুমি কৃতকৃত্য হবে। আচার্য বলছেন, *তস্মাদ্ রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ শাস্ত্রাবিরুদ্ধেষু অবর্জনীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদ্ ইতি বাক্যার্থঃ*, যদি জীবনে তুমি শান্তি চাও, তোমার প্রথম কাজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। কোন শাস্ত্র পড়ব? যে কোন শাস্ত্র, যে হিন্দু সে হিন্দু শাস্ত্র পড়বে, গীতা পড়বে। শাস্ত্রে যে জিনিসগুলি নিষেধ করা হয়েছে, আগে ওটাকে বন্ধ কর। স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজকে খুব কাছ থেকে আমাদের দেখার সৌভাগ হয়েছিল। ভক্তরা এসে তাঁর কাছে অশান্তির কথা বলতেন। মহারাজ সবাইকে কিছু কথা বলার পরেই এই কথা বলতেন, দেখো অনৈতিক কিছু করবে না। বলতে চাইছেন, অনৈতিক, মানে চরিত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন হয়, এমন কোন কাজ করবে না। আমাদের জীবনে যদি কোন দুঃখ আসে, বুঝতে হবে কোথাও আমরা মর্যাদ লঙ্ঘন করেছি। চরিত্র বলতে, একটা লক্ষণ রেখা দিয়ে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, লক্ষণ রেখাকে উল্লঙ্ঘন করলেই রাবণ এসে অপহরণ করে নিয়ে যাবে। টিয়া পাখি যতক্ষণ খাঁচায় আছে ততক্ষণ ঠিক আছে, খাঁচা থেকে বেরোলেই তাকে বিড়ালে ধরবে। রাগ আর দ্বেষ আমাদের এই লক্ষণ রেখার বাইরে নিয়ে চলে যায়, তখন রাবণ গপ্ করে ধরে নেয়। আমাদের জীবনে যে অশান্তি, এই অশান্তি হল সেই রাবণ। রাবণ বাইরে অপেক্ষা করে বসে আছে, কখন আমি লক্ষণ রেখা ডিঙোব, যেমনি লক্ষণ রেখার বাইরে বেরিয়ে এলো, রাবণ এসে খপ্ করে ধরে নিল। কটূ কথা বলা, মিথ্যা কথা বলা, অপরের জিনিসের প্রতি লোভ করা, পরস্ত্রী বা পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, এগুলো সব হল মর্যাদা লঙ্ঘন। করেছে কি মরেছে। ধর্ম জীবনে বা জীবনে শান্তি পাওয়ার জন্য কোন শর্টকাট মেথড নেই, কঠিন পথ। সহজ পথ যদি চাও, তাহলে পাঁকে নেমে পড়, তারপর বাচ্চারা যেমন একে অপরের প্রতি কাদা ছুঁড়ে আনন্দ পায়, তুমিও সেই ভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি করে যাও। শূয়োরও ঐ ভাবেই থাকে, কাদার মধ্যে ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ করে ওদের কি আনন্দ। এরপর বলছেন –

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।৬৬।।

(অসমাহিত ব্যক্তির আত্মস্বরূবিষয়িণী শুদ্ধাবুদ্ধি নাই এবং তার পরমার্থবিষয়ে অভিনেবেশও হয়নি। আর পরমার্থ-চিন্তাশূন্য ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণায় বিরতি নাই। এই প্রকার বিষয়তৃষ্ণার্ত পুরুষের প্রকৃত সুখ কোথায়?)

মা যেমন বাচ্চাকে বোঝায়, গীতাও ঠিক মায়ের মত আমাদের বুঝিয়ে যাচ্ছেন, গীতা আমাদের প্রাণদায়িনী মা, শক্তিদায়িনী মা, জ্ঞানদায়িনী মা, মুক্তিদায়িনী মা।

জীবনে আমাদের কেন সুখ নেই? কোথা থেকে তোমার সুখ আসবে! *নাস্তি বুদ্ধিঃ অযুক্তস্য*, যে অযুক্ত, ঈশ্বরের সঙ্গে যে নিজেকে জুড়ে রাখেনি, আত্মার সঙ্গে যে জুড়ে রাখেনি, নিজের মনকে যে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি; সুখ তার কোথা থেকে আসবে। আচার্য বলছেন, *বুদ্ধিঃ আত্মস্বরূপবিষয়া*। আমি কে? আমি আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছি আমি কে? আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি ঈশ্বরের সন্তান। এই চেতনাটা যদি সদা সর্বদা জাগ্রত না রাখতে পারি, এই ভাবের সাথে সর্বক্ষণ যদি যুক্ত না থাকতে পারি, তাহলে তখন আমি হয়ে গেলাম অযুক্ত। এর বিপরীতে, আমি শুদ্ধ আত্মা, আমি ঈশ্বরের সন্তান; এই চেতনাটা যার সব সময় জাগ্রত, তিনি যুক্ত। পাড়ার উঠতি মস্তানরাও বলে, জানো আমি কে! আমি অমুক মস্তানের চামচা। জানো আমি কে, আমি তমুক মস্তানের চামচা। মস্তান

কে? রাগ আর দ্বেষ। আমি আপনি, সবাই তা না, আমরা সবাই সেই শুদ্ধ আত্মা। এই বোধটাকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

বলছেন, যদি তুমি অযুক্ত হয়ে থাক, *ন চাযুক্তস্য ভাবনা*, অর্থাৎ সর্বব্যাপী চৈতন্যের সাথে যে যুক্ত নয়, আচার্য বলছেন, *আত্মজ্ঞান অভিনিবেশেম্*, আত্মজ্ঞানের প্রতি তার নিষ্ঠা হয় না। ঈশ্বরের দিকে মন কেন যায় না, জপধ্যানে কেন মন লাগে না, কেন আমরা ভাল হতে চাই না, সুখ-শান্তি পাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও কেন পাই না? কারণ *ন চাযুক্তস্য ভাবনা*, তোমার যে আসল স্বরূপ, সেই আসল সর্বব্যাপী চৈতন্য স্বরূপের সাথে তুমি যুক্ত নও বলে তোমার মনে এই ভাবনার উদয় হয় না। এই ভাবনা বাংলার ভাবনা না, এটা গীতার টেকনিক্যাল ভাবনা।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য, যে অযুক্ত তার বুদ্ধিই নেই, এই বুদ্ধি মানে সাধারণ অর্থে যে বুদ্ধি মনে করি সেটা না। আমরা আগে বুদ্ধির উপর আলোচনা করেছি। এই বুদ্ধি হল, কার্য কি আর অকার্য কি জেনে সেই মত করা। ফলে কি হয়, *আত্মস্বরূপবিষয়া*, শাস্ত্র আর আচার্য যে উপদেশ দিয়েছেন, সেই উপদেশ ঠিক ঠিক ধারণা করার পর সেই উপদেশ অনুযায়ী যে আচরণ করা হয়।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ, যার ভাবনা নেই, যে আত্মবিষয়কে নিয়ে, ঈশ্বরকে নিয়ে ধ্যান করে না, সে কোথা থেকে শান্তি পাবে! রাগ আর দ্বেষের জন্য তার মন সব সময় চঞ্চল হয়ে থাকবে। *অশান্তস্য কুতঃ সুখম্*, যার মন অশান্ত, যার শান্তি নেই, সে সুখ কোথা থেকে পাবে! তার মানে, সুখ পেতে গেলে আগে চাই শান্তি, শান্তি পাওয়ার জন্য চাই ভাবনা, ভাবনা পাওয়ার জন্য চাই যুক্ত হওয়া। যুক্ত হওয়ার জন্য চাই বুদ্ধি। শাস্ত্রের এই সব অমূল্য কথা আমাদের মন দিয়ে শুনতে হয়। এখন তো তাও ইন্টারনেট যুগ এসে গেছে বলে আমরা এইসব কথা শুনতে পাচ্ছি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে মানুষ গীতার কথা, শাস্ত্রের কথা শোনার সুযোগও পেত না। শাস্ত্রের কথা শুনতে হবে, শুনে গ্রহণ করতে হবে, গ্রহণ করার পর ধারণা করতে হবে। গরু যদি ঘাস না খায় দুধ দেবে কোথা থেকে! শাস্ত্র পড়ুন, এখন কত বই, রামকৃষ্ণ মিশন, অদ্বৈত আশ্রম কত বই বার করে দিয়েছেন। এগুলো পড়ুন, গরুর পেটে একটু ঘাস যেতে দিন।

অশান্তস্য কুতঃ সুখম্, এর উপর আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, *ইন্দ্রিয়াণাং হি বিষয়সেবাতৃষ্ণাতো নিবৃত্তিঃ যা তৎ সুখম্*, সুখকে পরিভাষিত করতে গিয়ে আচার্য বলছেন, ইন্দ্রিয়সুখ থেকে যখন নিবৃত্ত হয়, ইন্দ্রিয়সুখ থেকে মানুষ যখন বেরিয়ে আসে, এই যে নিবৃত্তি, এই যে বেরিয়ে আসা, এটাই সুখ। সুখের কি পরিভাষা? বিষয়তৃষ্ণা থেকে বেরিয়ে আসাটাই সুখ, বিষয়তৃষ্ণা থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত সুখ হবে না।

দুঃখ কি? বলছেন, *ন বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা, দুঃখম্ এব হি সা*, বিষয়ের প্রতি যে তৃষ্ণা, এটাই দুঃখ। আর তার সাথে বলছেন, *ন তৃষ্ণায়াং সত্যং সুখস্য গন্ধমাত্রম্ অপি উপপদ্যতে*, খুব সহজ ভাষায় আচার্য বলছেন, তৃষ্ণাতে সুখের গন্ধমাত্র নেই; মানে, সুখের কথা ছেড়ে দাও, সুখের গন্ধটুকুও নেই। বিরিয়ানির মত কিছু কিছু রান্না আছে, যাতে একটু মশলা ছড়িয়ে দেওয়া হয়, মশলার গন্ধটাই এমন দারুণ যে, ওই রান্নাটা খাওয়ার জন্য মানুষ এক শহর থেকে আরেক শহরে দৌড়ে আসে। আচার্য বলছেন, এই সংসারে যে বিষয়তৃষ্ণা, মনে হয় এই বিষয়টা পেয়ে গেলে আমার জীবন সুখের বন্যা হয়ে যাবে, কিন্তু বুঝতে পারছে না যে, এতে সুখের গন্ধটুকুও নেই।

জীবনে যদি সুখ চাও, শান্তি চাও, তাহলে এই বিষয়তৃষ্ণা থেকে সরে এসো, রাগ-দ্বেষ থেকে বেরিয়ে এসো। তুমি কে, এই ভাবটাকে বোঝ। মনটাকে এবার ভিতরে গিয়ে তোমার ওই আসল যে ভাব, তাতে মনকে সমাহিত কর। সেখান থেকে তুমি ধীরে ধীরে চরম জ্ঞানের দিকে এগোতে শুরু করবে। পরপর এই তিনটে শ্লোক, চৌষট্টি, পয়ষট্টি আর ছেষট্টি শ্লোকে গীতা বলে দিলেন সুখ আর

শান্তির উপায়। এই উপায়কে যদি না কাজে লাগাতে পারি, তাহলে অশান্তি ছাড়া কিছু আসবে না। কি রকম অশান্তি –

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিম্ভসি।।৬৭।।

(ঘূর্ণয়মান বায়ু যেমন জলস্থিত নৌকাকে উন্মার্গগামী করে, সেই রকম স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয়গুলির যেটাকে মন অনুসরণ করে, সেই ইন্দ্রিয়টিই অসংযত ব্যক্তির আত্মানাত্ম বিবেকবুদ্ধি হরণ করে ও তার মনকে বিষয়াভিমুখী করে।)

ইন্দ্রিয় জগতে যার মন বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, *তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং*, তার সব প্রজ্ঞা হরণ করে নেয়। যখন ক্লাশ ফোর ফাইভে আমরা পড়ছি, তখন চরিত্রগত ভাবে যা যা করা দরকার সব জেনে গেছি। কি কি জেনে গেছি? সত্য কথা বলতে হয়, কাউকে কষ্ট দিতে নেই, পরের দ্রব্যে লোভ করতে নেই। বড় হয়ে আরও নীতিকথা জেনেছি, যেমন, চুরি করতে নেই, পরস্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দিতে নেই। সব নীতিকথা আমাদের জানা আছে, কিন্তু পালন করতে পারি না কেন? কারণ মন আমাদের বিষয়ের জগতে ঘুরঘুর করে যাচ্ছে। তাহলে কোথায় ঘুরঘুর করতে হবে? স্থিতপ্রজ্ঞ আলোচনা করা সময় বলা হয়েছিল, তৎ তৎ *প্রাপ্য শুভাশুভম্*, মহাপুরুষরাও এই জগতে বিচরণ করছেন, ঠাকুরও কলকাতার রাস্থায় চলাফেরা করছেন, স্বামীজীও আমেরিকার রাস্থায় ঘুরছেন, প্যারিসের রাস্থায়, লণ্ডনের রাস্থায় ঘুরছেন; তাঁদের দৃষ্টিতে শুভও আসছে, অশুভও আসছে, কিন্তু তাঁরা যেমন আছে তেমনটা দেখে এগিয়ে গেলেন। আমরা কিন্তু তা করি না, আমাদের মন কিছু ভাল দেখলেই ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করবে। এর ফলে কি হয়? *তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং*, তাদের বুদ্ধিকে টেনে অন্য দিকে নিয়ে যাবে। কি রকম ভাবে টেনে নেয়? উপমা দিচ্ছেন নৌকার, *বায়ুঃ নাবম্ ইব অম্ভসি*, ঝড় যেমন নৌকাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। জগৎ এমনই এক জিনিস, যে জগতের বিষয়গুলি, বস্তুগুলি আমাদের মনকে টেনে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে।

সারা জগৎ এই ভাবেই একবার এদিকে ধাক্কা খাচ্ছে, আরেকবার ঐদিকে ধাক্কা খাচ্ছে। আমরা এই ভব সাগরে সবাই একটা ছোট ছোট ডিঙি নৌকার মত, আর এই সাগরে কামনা-বাসনা, শোক-মোহের ঝড় লেগেই রয়েছে, এই ঝড় নৌকাকে উড়িয়ে নিয়ে এই কুলে ফেলছে আরেকবার ঐ কুলে নিয়ে ফেলছে। এর থেকে বাঁচার কি উপায় কোন উপায় নেই? নিশ্চয়ই আছে; শান্তি আর সুখ, শান্তি আর সুখের জন্য চাই বুদ্ধি ভাবনা, বুদ্ধি ভাবনার জন্য নিত্য বস্তু, যেটা আমার আসল সত্তা, তার সাথে যুক্ত হতে হবে, মনটাকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যেতে হবে বা আত্মচিন্তনে মনকে সর্বদা যুক্ত করে রাখতে হবে। আত্মচিন্তনের জন্য চাই মনের প্রশান্তি ভাব, চঞ্চলতার অভাব হতে হবে। চঞ্চলতার অভাব কখন হবে? যখন রাগ আর দ্বেষ থেকে সরে আসব। রাগ আর দ্বেষ যদি থাকে তখন কি হবে সেটাই এই শ্লোকে বলছেন, *ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনুবিধীয়তে*, রাগ আর দ্বেষ থেকে প্রেরিত হয়ে যারা ইন্দ্রিয়ের পেছনে দৌড়াচ্ছে তাদের মধ্যে যার গান ভালো লাগছে সে গান শুনবার জন্য দৌড়াচ্ছে, যে খেতে ভালোবাসে সেই ভোজবাড়ি আর রেস্টুরেন্টের খোঁজে দৌড়াচ্ছে, এদের বুদ্ধি ঝড়ের নৌকার মত হারিয়ে যায়। সেইজন্য হে অর্জুন তুমি কি করবে? এর থেকে রক্ষা পেতে হলে মনকে ইন্দ্রিয় জগতে বেশী ঘুরতে দেওয়া একেবারেই চলবে না।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬৮।।

(হে মহাবাহো, সেইহেতু যাঁর ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয় থেকে সর্বপ্রকার নিবৃত্ত হয়েছে, তাঁর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।)

ভগবান অর্জুনকে আবার পিছনের দিকে নিয়ে গেলেন। অর্জুন, তুমি প্রশ্ন করেছিলে স্থিতপ্রজ্ঞ কে? এটাই তার উত্তর –*তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ*, যিনি সব দিক থেকে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রতি করে নিয়েছেন, যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে টেনে নিয়ে এসেছেন, তিনিই হলেন স্থিতপ্রজ্ঞ। এর আগে বলে দিলেন, শান্তি পাওয়ার কি উপায়, সুখ পাওয়ার কি উপায়, তার সাথে বিনাশের কি কি কারণ বললেন। এবার এই টপিকটা শেষ করতে যাচ্ছেন, শেষ করার আগে ভগবান দেখাচ্ছেন একজন জ্ঞানী পুরুষ আর একজন সংসারীর মধ্যে তফাৎ কোথায়। আচার্য এই জায়গাতে একটা বড় ভাষ্য দিয়েছেন।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।৬৯।।

(সর্বভূতের পক্ষে যা রাত্রিস্বরূপ (অজ্ঞাত), সেই ব্রহ্মে স্থিতপ্রজ্ঞ জাগ্রত থাকেন (সর্বদা ব্রহ্মদর্শন করেন)। আর, যে অজ্ঞানরূপ রাত্রিতে ভূতগণ জাগ্রত থাকে (সংসারদর্শন করে) স্থিতপ্রজ্ঞের পক্ষে তা রাত্রিস্বরূপ অর্থাৎ ইনি সংসার অনুভব করেন না।)

মুনি শব্দের অর্থ, যিনি মননশীল, ঈশ্বরকে নিয়ে যিনি মনন করেন, ঈশ্বরে তাঁর মন সব সময় ডুবে থাকে। এই ধরণের পুরুষ, যাঁদের মুনি বলছেন, তাঁদের সাথে সাধারণ মানুষের কি তফাৎ? বলছেন, যে জায়গাতে সাধারণ মানুষ রাত দেখে, মুনিরা সেখানে দিন দেখেন, আর যেখানে বাকিরা দিন দেখে, মুনিরা সেখানে দেখেন রাত। এই রাত আর দিন হল, ইন্দ্রিয়জগৎ আর আত্মার জগৎ। মুনিরা আত্মার জগতে বিচরণ করেন, তাঁদের আলোচনা চলে একমাত্র আত্মাকে নিয়ে, শুধু ঈশ্বরকে নিয়ে। আত্মা, ঈশ্বর; এর বাইরে অন্য কোন কিছুর দিকে মুনিদের দৃষ্টি নেই। আত্মজ্ঞানের জন্য যে চেষ্টা, আত্মজ্ঞানে যে বিচরণ করা, এটাকে বলা হয় দিন।

ইন্দ্রিয়জগৎকে বলা হয় রাত। আচার্য বলছেন পেঁচারা রাত্রি জেগে যেমন অন্ধকারে তাদের সব কাজ করতে থাকে; মানুষ ঠিক পেঁচার মত, যেখানে আত্মার অন্ধকার সেখানেই তারা আলো দেখে। যোগীরা দিনের পাখির মত, তাঁরা শুধু আত্মার আলো দেখেন। একটা পায়রা আর আর-একটা পেঁচা, পায়রা দিনের আলো দেখে, আর দিনের আলোতে পেঁচার চোখ বন্ধ হয়ে যায়। রাত্রিবেলা অন্ধকারে পেঁচা সব দেখতে পায়, কিন্তু পায়রার চোখ বন্ধ হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়জগৎ অন্ধকারের মত, আত্মজ্ঞান দিনের আলোর মত। পুরো যে world of mind, মনের যে পুরো এলাকা, এটাই ইন্দ্রিয়ের এলাকা, এটাই *সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ*, এটাই মুনি, যোগীদের কাছে রাত। যেখানে মন সেখানেই রাত, আর মনের পারে আত্মা, যেখানে আত্মা, সেটাই তাঁদের কাছে দিন।

এখানে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। বলছেন, যত শাস্ত্র আছে সবটাই মনের এলাকার। ঠাকুর বলছেন, এখানকার অনুভূতি বেদা-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। কেন এই কথা ঠাকুর বলছেন? কারণ বেদ-বেদান্ত এগুলো সব মনের এলাকা। তবে মনের এলাকা হলেও, এনারা পথ দেখিয়ে দেন, কিভাবে তুমি মনের এলাকার বাইরে যাবে। যতক্ষণ মানুষ মনের এলাকায় আছে, আমরা যেমন আছি, আমরা কখনই শাস্ত্রকে, বেদ-বেদান্তকে অবিদ্যা বলতে পারব না। ইদানিং কালে যাঁরা অদ্বৈত জ্ঞান নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা একটা ভুল করেন। আচার্য শঙ্কর পরিষ্কার বলছেন, যতক্ষণ তুমি মায়ার রাজ্যে আছ, ততক্ষণ এটাকে অবিদ্যা বলা যাবে না। মায়ার রাজ্যে সবটাই সত্য, আমার সমস্যা সত্য, শাস্ত্র সত্য, সাধনা সত্য। এই মনের এলাকার বাইরে যখন বেরিয়ে যায়, তখন দেখে যে, সত্যিই এগুলোর দরকার ছিল না। মন যখন পবিত্র হয়ে যায়, তার মানে রাগ আর দ্বেষ থেকে যখন মুক্ত হয়ে যায়, তখন আত্মজ্ঞান আসে।

আত্মজ্ঞান আসাটা কি নূতন কোন জ্ঞান হওয়া, যেমন ফিজিক্স কেমেস্ট্রি পড়ে জ্ঞান হয়? বলছেন, তা না, আত্মা আপনার স্বরূপ। আত্মা স্বতঃ প্রমাণ, আমার গায়ে জামা আছে, আমি পরিষ্কার জামা দেখতে পাচ্ছি, এর জন্য কোন প্রমাণ লাগবে না। মানুষ যখন ওই আত্মজ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন দেখে, অবিদ্যা কি, আর দেখে শাস্ত্রগুলি কেমন একধারে পড়ে আছে। ঠাকুর কেমন বলছেন, আমার মন যখন একশ হাত নেমে আসে তখন ওঁম্ আসে। এদিকে কঠোপনিষদ বলছেন, সমস্ত বেদ, উপনিষদের বক্তব্য হল ওঁম্। তার মানে, মানুষ যখন ঈশ্বর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সব কিছু কোথায় ছাড়িয়ে চলে যায়, তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। এইসব কথা আমরা এখন কিছুই বুঝতে পারব না। দিনে ছয় থেকে সাত ঘন্টা জপ কিছু না হোক, আট থেকে দশ বছর ধরে জপ না করলে ধারণা হবে না। তবে আমাদের শুনে যেতে হবে, শুনে যাওয়াটাও সাধনা, শাস্ত্র শুনতে শুনতে ভিতরে একটা ভাল সংস্কার তৈরী হয়।

ইন্দ্রিয়ের জগতেই সব মানুষ সুখ পায়, সেটাই তাদের কাছে দিনের আলোর মত। মানুষ যখন ওই ইন্দ্রিয় জগতের সুখ বিসর্জন দিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে বলে, আমি যতি হব, আমি তপস্বী হব, তখন কি হয়?

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।৭০।।

(যেমন জলরাশি পরিপূর্যমাণ সমুদ্রে প্রবেশ করলেও সমুদ্র স্ফীত হয় না এবং বেলাভূমি লঙ্ঘন না করে অবিকৃত থাকে, সেই রকম অজ্ঞ ব্যক্তির কাম শব্দাদি-বিষয়সমূহ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষে প্রবেশ করে বিলীন হয়, অর্থাৎ যাকে বিচলিত করতে পারে না, তিনিই চির শান্তিলাভ করেন। কিন্তু যিনি বিষয় কামনা করেন, তাঁর পক্ষে শান্তিলাভ অসম্ভব।)

গীতা এই শ্লোকে সমুদ্রের উপমা নিচ্ছেন। বলছেন, কত নদী, কত খাল দিয়ে কত জলরাশি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে এসে পড়ছে, এসে তারা সবাই সমুদ্রেই মিশে যাচ্ছে, সমুদ্রে মিশে সব নদী, খাল একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে। কত নদী এইভাবে সমুদ্রে ঢুকে একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে। এত জলরাশি এনে সমুদ্রে ঢালছে, কিন্তু তাতে সমুদ্রে এক বিন্দুও ক্ষোভণ হয় না, সমুদ্র যেমনটি ছিল, তেমনটিই থাকে।

আপূর্যমাণম্, একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে *অচলপ্রতিষ্ঠং*, নিজের অচল ভাবের উপর পুরো প্রতিষ্ঠিত, *সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ*, এই ধরণের সমুদ্রে নদীর জল যেভাবে প্রবেশ করে হারিয়ে যায়, *তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে*, ঠিক সেই ভাবে ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে যে অনবরত টোকা মেরে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে সব হারিয়ে যাচ্ছে। যে মানুষ নিজের ইন্দ্রিয়কে পুরো সংযম করে নিয়েছে, তাকেও বাইরের ইন্দ্রিয়জগৎ টোকা মেরে যাচ্ছে, কিন্তু ওখানে গিয়ে সব হারিয়ে যায়, তাঁর ভিতর কোন ক্ষোভণ হয় না।

বাল্মীকি রামায়ণে মহাবীর হনুমানের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে। মহাবীর হনুমান হয় গদা নিয়ে, আর তা নাহলে খালি হাতেই যুদ্ধ করতেন। রাক্ষসগুলো হনুমানকে বাণ মারছে, উনি সেই বাণগুলি হাত দিয়ে ধরে গিলে ফেলছেন। কামদেব হলেন কামের মূর্ত রূপ, তিনি যখন কামের ইচ্ছা করেন, তখন জগতের সবার ভিতরে কামের ইচ্ছা জেগে ওঠে। শিব গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন। ওনার মনকে চঞ্চল করতে হবে। কামদেব ওখানে পৌঁছে গেলেন, পৌছাতেই সেখানে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হয়ে গেল, মিষ্টি মিষ্টি বাতাস, পাখীর কুজন, পাতা ঝরা গাছ আবার নূতন কিশলয়ে পল্লবিত হয়ে

উঠেছে, বাল্মীকি খুব সুন্দর বর্ণনা দিচ্ছেন। কামদেব এবার কামবাণ চালাতে শুরু করলেন। পুরো জগৎ কাম ভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠল, যোগীদেরও ভিতরে কাম ভাব জেগে উঠল। কামদেব এবার বাণ চালালেন শিবের উপর, তাঁর পাঁচ পাঁচটি বাণ চালিয়ে দিয়েছেন, শিবের তাতে কিছুই হল না। কিন্তু শিব বুঝতে পারছেন যে, কোথাও কিছু গোলমাল হচ্ছে। শিব তাঁর তৃতীয় নেত্রটা একটু খুলে দেখলেন সামনে কামদেব। শিব খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, এগুলো কি হচ্ছে, এটা কি বাঁদরামো করার জায়গা, তিনি চোখ পুরো খুললেন, কামদেব সেখানেই ভস্ম হয়ে গেলেন। যে কামদেবের ইচ্ছামাত্রেই জগতে কামের ভাব জেগে ওঠে, বাণ চালাবার কোন দরকারই হয় না, আর সেখানে শিবের উপর কামদের তাঁর সব বাণ চালিয়ে দিলেন। শিব বুঝতেও পারলেন না কি হয়েছে। গণ্ডারকে যাই চালানো হোক কিছু হয় না। তবে গণ্ডারের ক্ষেত্রে যেটা চালাবে সেটা ঠিকরে ফেরত চলে আসে, কিন্তু সমুদ্রে গেলে হারিয়ে যায়। এই জগতের বিষয়রূপ বাণ একবার ঢুকে গেলে আর কিছু হয় না, নদীর জল যেমন সমুদ্রে গিয়ে হারিয়ে যায়, সেই রকম হারিয়ে যায়।

বলছেন *তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি*, যার ভিতরে কাম প্রবেশ করে হারিয়ে যায়, কোন ক্ষোভণ হয় না, *স শান্তিমাপ্নোতি*, সেই একমাত্র শান্তি পায়; *ন কামকামী*, যার মধ্যে কামের ইচ্ছা আছে, ভোগের ইচ্ছা আছে, তার কোন দিন শান্তি হয় না। যে বলছে, আমি শান্তি চাই, তাহলে তুমি আগে কাম থেকে বেরিয়ে এসো। পরের শ্লোকে এটাকেই একটু অন্য ভাবে বলছেন –

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।৭১।।

(যিনি নিঃশেষরূপে সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করেন, শরীর ও জীবনধারণার্থ প্রয়োজনীয় বিষয়েও 'মমত্ব'ভাববর্জিত ও বিদ্যাবত্তাদি অহঙ্কাররহিত হন এবং শরীরের ও জীবনে স্পৃহাশূন্য এবং জীবনধারণমাত্রে চেষ্টাযুক্ত হয়ে পর্যটন করেন, তিনি সকল সংসারদুঃখের নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি (ব্রহ্মনির্বাণ) লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।)

আবার পুনরাবৃত্তি করে বলছেন, *বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্*, সমস্ত কামনা-বাসনাকে মানুষ যখন ত্যাগ করে দেয়, এবং *পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহ*, ত্যাগ করে এই জগতে বিচরণ করে, তখন তার কোন কিছুর প্রতি কোন স্পৃহা থাকে না। *নির্মমঃ*, মমত্বের ভাব, এটা আমার, এই ভাব কোথাও তার নেই, আর *নিরহঙ্কারঃ*, কোথাও কোন আমিত্বের ভাব থাকে না। মমত্ব আর আমিত্ব, আমি ও আমার এই দুটোই তো মায়া। আমি ও আমার এই ভাবটা তো থাকেই না, এমনকি নিজের দেহ এত প্রিয়, সেই দেহের প্রতিও তার কোন মমতার ভাব থাকে না।

তাহলে কিভাবে থাকে? আচার্য বলছেন, *শরীরজীবনমাত্রক্ষিপ্তপরিগ্রহে*, শরীর ও জীবন চালানোর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই রাখেন, তার বেশী রাখেন না। আমার কাছে বিশেষ কিছু নেই, কিছু বই আর টুকটাক কিছু কাগজপত্র আছে। তাও আমি মনে করার চেষ্টা করি, আমার তাকের কোন র‍্যাকে কোথায় কি রাখা আছে। যে জিনিসটার ব্যাপারে আমার কিছু মনে নেই, সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিসটা বার করে আমি বিদায় করে দিই। যেটার ব্যাপারে আমার মনে নেই, তার মানে এটার আমার কোন প্রয়োজন নেই, এটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আপনারাও দেখুন আপনাদের ঘরে কত রকম জিনিসে ভর্তি আছে, বেশিরভাগ জিনিসই হল, যেগুলোর ব্যাপারে আপনি জানেন না। ঠাকুর বলতেন, কুবের রাজা জানেন না, তাঁর ভাণ্ডারে কত কি আছে। তাঁর যে জ্ঞান, বিদ্বত্ব, এগুলোর জন্যও তাঁর কোন অহঙ্কার নেই, এগুলো থেকে তিনি একেবারে মুক্ত।

এই ধরণের যিনি জ্ঞানী, আচার্য বলছেন, *সর্বসংসারদুঃখোপরমলক্ষণাং নির্বাণাখ্যাম্*, নির্বাণ কাকে বলে, মোক্ষ কাকে বলে, মুক্তি কাকে বলে, বলছেন, এই সংসারে যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে, যত

দুঃখ আছে, এটার নাশ হয়ে যাওয়া। নাশ কিভাবে হবে? রাগ আর দ্বেষ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হয়, মনের মধ্যে নিজেকে ঢোকাতে হয়, ঈশ্বর চিন্তন, আত্ম চিন্তনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সেখান থেকে আর সে নড়ে না। জগতের মাঝে সে বিচরণ করে, কিন্তু জগতের কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না, এটাকেই বলে নির্বাণ। ঈশ্বর দর্শন মানে কি? ঈশ্বর দর্শন মানে এই নয় যে, ঠাকুর ম্যাজিকের মত আমাদের সামনে হাজির হয়ে বলবেন, বল বৎস কি চাও। ঈশ্বরদর্শনের অর্থ হল, রাগ আর দ্বেষ থেকে প্রথমে মুক্তি, সেখান থেকে এবার সে ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যানে বসতে পারবে। সেখান থেকে যিনি তার ইষ্ট, বা আত্মা হন, ঈশ্বর হন, সেখান থেকে সে আর নড়বে না। সেখান থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, যে ইন্দ্রিয়জগৎ তার কাছে অন্ধকারের মত হয়ে যাবে আর আত্মার জগৎ দিনের আলোর মত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে বলছেন –

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি।।৭২।।

(হে পৃথাপুত্র, এই অবস্থাই ব্রাহ্মী স্থিতি। এই অবস্থা লাভ করলে আর কেউ মোহগ্রস্থ হন না। অন্তিম সময়েও যিনি এই অবস্থা লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন।)

গীতা বলছেন, এটাকেই ব্রাহ্মী স্থিতি বলে, ব্রহ্মজ্ঞান বলতে এটাই। এই জ্ঞান একবার যদি কারুর হয়ে যায়, এখান থেকে আর কক্ষণ তার স্খলন হবে না। যে একবার আত্মস্বরূপকে জেনে যায়, তার আর কোন দিন পতন হবে না। *স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি*, মৃত্যুর সময়েও যদি এই জ্ঞান কারুর হয়ে যায়, সেও *ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি*, তারও ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যায়। একবার যদি এই জ্ঞান লাভ হয়ে যায়, তার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়ে যায়, মুক্তি হয়ে যায়, জন্ম-মৃত্যুর সংসারে তার আর ঘুরে ঘুরে আসতে হবে না। জীবদ্দশায় যদি কেউ এই জ্ঞান পেয়ে যায়, তাহলে তো আর বলার কিছু থাকে না। মৃত্যুর সময়েও যদি কেউ পেয়ে যায়, তারও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়ে যাচ্ছে, আর এই জীবদ্দশায় পেয়ে গেলে তো কোন কথাই থাকে না।

হিন্দু ধর্ম কখন, মৃত্যুর পরের জিনিসকে দাম দেয় না। কাশীতে মরলে মুক্তি হবে, এগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট কথা। গীতাও বার বার বলছেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানেই, এই শরীরেই তোমাকে মন, বুদ্ধির পারে যেতে হবে, তোমাকে এই শরীরেই আত্মজ্ঞান অর্জন করতে হবে, মৃত্যুর পরে না। এখানে বিদ্যার স্তুতি করার জন্য বলছেন, মৃত্যুর সময়েও যদি তোমার এই জ্ঞান হয়, তোমার মুক্তি হয়ে যাবে। বলছেন, যে ব্রহ্মচর্য থেকে সরাসরি সন্ন্যাসে চলে গেছে, আর সারা জীবন এই ভাবে আছে, তার আর বলার কি কথা, তিনি শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম। এখানেই দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। এরপর আসবে কর্মযোগ।